ডঃ [illegible] অধীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

M.Phil

[illegible] - [illegible]

[illegible] (১৯৩০ [illegible])

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

GIFT

400914

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ইউ. জি. সি. স্কলারশীপ অধীন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

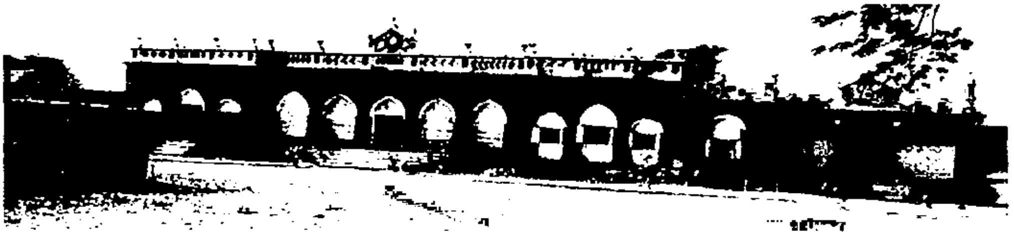

মহিয়ষী করিমুন্নেসা খানম	নবাব স্যার আবদুল করিম গজনবী	স্যার আবদুল হালিম গজনবী
	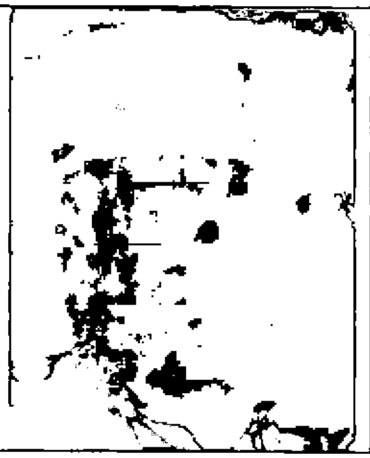	

বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দেলদুয়ারের জমিদার পরিবার (১৯৫৩ পর্যন্ত)
(সারসংক্ষেপ)

Dhaka University Library
400914

গবেষকঃ
মোঃ ইমাম উদ্দীন
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিসেম্বর-২০০২

400914
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভ শিরোনাম ঃ

বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দেলদুয়ারের জমিদার পরিবার (১৯৫৩ পর্যন্ত)

গবেষনা তত্ত্বাবধায়ক ঃ
প্রফেসর এ.কে.এম. ইদ্রিস আলী
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400914

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক	ঃ	মোঃ ইমাম উদ্দীন
বিভাগ	ঃ	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ	ঃ	১৯৯৬-৯৭
রেজি নং	ঃ	৬০
হল	ঃ	মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, 'বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দেলদুয়ারের জমিদার পরিবার (১৯৫৩ পর্যন্ত)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি মোঃ ইমাম উদ্দীন-এর গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা এবং এটি এম. ফিল ডিগ্রী প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য।

11.12.02

(এ. কে. এম. ইদ্রিস আলী)
প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ।

400914

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় নিবেদিত সাহসী, কর্মসফল ও ব্যতিক্রমী তিন জন উদ্যোক্তা স্বনামে খ্যাত ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস; শিল্পপতি ও আধুনিক সংস্কারের প্রবক্তা আবদুল আউয়াল মিন্টু এবং শিল্পপতি, সংগঠক আবুল কাসেম হায়দারকে। যাদের সান্নিধ্য, চিন্তা, চেতনা আমার মানসলোককে বিকশিত করছে প্রতিনিয়ত।

কয়েকজন প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর মুসা আনসারী, প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমেদ ও সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নানকে যাদের চিন্তা চেতনা ও লেখনি আমাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন গবেষণায় আগ্রহী এবং জীবন সংগ্রামে সাহসী, আত্মপ্রত্যায়ী ও নৈতিকবোধে উজ্জীবিত করেছে ।

আমার শ্রদ্ধেয় দাদা, বাবা, মা, বড়ভাই, বড়বোন যাদের স্নেহ শাসন আমাকে পৃথিবীর আলোক পথের বিভিন্ন পর্বে উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করেছে।

আমার স্নেহের ছোট ভাই ও ভাগ্নে ভাগ্নি যাদের মায়া, ভালবাসা আমাকে পৃথিবীর মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এবং পৃথিবীর মানুষগুলোকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।

আমার দু'জন প্রিয় বন্ধু সহ অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও একাধিক কর্মস্থলের সহকর্মীবৃন্দ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের সকল প্রিয় সাথীদেরকে যাদের সাহচর্য, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আমার অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক যুগিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

উপক্রমনিকা			১৫
১.	ভূমিকা		১৯
২.	প্রথম অধ্যায় ঃ	পারিবারিক জীবন ধারায় দেলদুয়ার জমিদারীর উৎপত্তি ও বিকাশ (১৫০০- ২০০০ খৃঃ)।	২৮
৩.	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে দেলদুয়ার জমিদারীর প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা (১৭৯৩-১৯৫০ খৃঃ)।	৮৯
৪.	তৃতীয় অধ্যায় ঃ	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে দেলদুয়ারের জমিদারদের ভূমিকা ও অবদান মূল্যায়ন (১৭৬১-১৯৬১)।	১৮০
৫.	উপসংহার ঃ		২৯৩
৬.	গ্রন্থতালিকা ঃ		৩০১
৭.	পরিশিষ্ট ঃ	অধ্যায় সংশ্লিষ্ট	৩৪৮
৮.	চিত্র সূচী ঃ	নং ৪.১ থেকে ৪.৫০	৪২৮-৪৫০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

২.০ পারিবারিক জীবন ধারায় দেলদুয়ার জমিদারীর উৎপত্তি ও বিকাশ ধারা (১৫০০-২০০০ খৃঃ)

২. ১ ঃ ভূমিকা ২৮

২.২ ঃ পাঁচশত বছরের (১৫০০-২০০০) পারিবারিক ইতিহাসের শিকড় সন্ধান ঃ বারভূইয়া নেতা ওসমান খান লোহানীর বংশ ধারার বিকাশ। ২৯

২.৩ ঃ আতিয়া পরগনা ও পন্নী জমিদারী থেকে দেলদুয়ার জমিদারীর উৎপত্তি ও বিকাশ ধারা। ৩৫

২.৪ ঃ চারানের জমিদার কন্যা রওশন খাতুনের বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত আতিয়ার জমিদারী থেকে দেলদুয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠা ও চারটি ধারায় বিভক্তির মাধ্যমে জমিদারীর বিকাশ ধারা। ৪১

২.৫ ঃ দেলদুয়ার দক্ষিন বাড়ী ও পাকুল্লা জমিদারীর সৈয়দ বংশ ধারার বিকাশ। ৪৫

২.৬ ঃ দেলদুয়ার উত্তর, মধ্য ও বড় বাড়ীর লোহানী গজনবী বংশ ধারার বিকাশ। ৫০

২.৭ ঃ মীর মশাররফ হোসেনের 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপাখ্যান ও 'কুলসুম জীবনী' থেকে দেলদুয়ার জমিদারদের পারিবারিক চিত্র উদ্ধার। ৫৩

২.৮ ঃ দেলদুয়ারের জমিদারদের বহুমুখী প্রতিভা ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। ৬১

২.৯ ঃ দেলদুয়ার জমিদারদের আত্মীয়তা সূত্রের অন্যান্য জমিদার বংশের তুলনামুলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা। ৬৫

২.১০ ঃ জমিদারী উচ্ছেদ পরবর্তী জমিদার বংশধরদের বর্তমান পারিবারিক অবস্থা। ৬৭

তথ্য সূত্র ঃ ১ ৬৯-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩.০ ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে দেলদুয়ার জমিদারীর প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা (১৭৯৩-১৯৫০)।

৩.১ ঃ ভূমিকা ৮৯

৩.২ ঃ দেলদুয়ার-আতিয়া (দক্ষিণ টাঙ্গাইল) অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক গঠন। ৯১

৩.৩ ঃ প্রাক-কোম্পানি ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আতিয়া পরগনার জমিদারী ও জন অর্থনীতির বিকাশ। ৯৭

৩.৪ ঃ কোম্পানির অন্তর্বর্তীকালীন (১৭৬৫-১৭৯৩) ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আতিয়া, দেলদুয়ার, পাকুল্লা, জমিদারী ও আঞ্চলিক অর্থনীতির স্বরূপ। ১০৩

৩.৫ ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ভাগে(১৭৯৩-১৮৫৯) ও ঔপনিবেশিক জমিদারী শোষণের স্বর্ণযুগে দেলদুয়ার, গোড়াই, পাকুল্লা সহ আতিয়া জমিদারী ও জন অর্থনীতির স্বরূপ। ১১০

৩.৬ ঃ প্রজাস্বত্বের বিকাশ যুগে (১৮৮৫-১৯২৮) দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারী ও দক্ষিণ টাঙ্গাইলের জন অর্থনীতির বিকাশ ধারা। ১২৬

৩.৭ ঃ কৃষি পণ্য, ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগ (১৯০০-১৯৪৫) বিকাশের নয়া প্রেক্ষিতে দেলদুয়ার জমিদারের ভূমিকা। ১৩৮

৩.৮ ঃ জমিদারী পতন পর্বে (১৯২৮-১৯৫০) দেলদুয়ার-আতিয়ার জমিদারী ব্যবস্থাপনা ও দক্ষিন টাঙ্গাইলের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ। ১৫০

৩.৯ ঃ জমিদারী উচ্ছেদ কালে (১৯৫০-১৯৬১) ভূমি বন্টন ও ব্যবস্থাপনায় দেলদুয়ার-আতিয়ার পতিত জমিদার, জোতদার, বর্গাদার, ভূমিহীন মজুর শ্রেণীর নয়া অর্থনীতির স্বরূপ। ১৫৮

৩.১০ ঃ জমিদারী উচ্ছেদ পরবর্তী জমিদার বংশধরদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা। ১৬১

তথ্য সূত্র ঃ ২ ১৬২-১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে দেলদুয়ারের জমিদারদের ভূমিকা ও অবদান মূল্যায়ন (১৭৬১-১৯৬১)।

৩. ১	ঃ	ভূমিকা	১৮০
৪.২	ঃ	দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারদের এবং দক্ষিণ টাঙ্গাইলের জনসমাজের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।	১৮২
৪.৩	ঃ	ইংরেজ কোম্পানি শাসন কাঠামোতে দেলদুয়ার- আতিয়ার সমাজ সংস্কৃতির ভাঙ্গন ধারায় স্থানীয় জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা।	১৮৯
৪.৪	ঃ	ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফারায়েজী-মোহাম্মদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা।	১৯১
৪.৫	ঃ	কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে দেলদুয়ার - আতিয়ার জমিদার-প্রজা সম্পর্কের স্বরূপ।	১৯৭
৪.৬	ঃ	কোম্পানির ঔপনিবেশিক আইন, বিচার ও প্রশাসনিক নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারী ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের জনজীবন ধারা।	১৯৯
৪.৭	ঃ	বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে নয়া সমাজ সংস্কৃতির বিকাশে দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা।	২০২
৪.৮	ঃ	ঔপনিবেশিক শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষা উন্নয়ন ও জনকল্যাণে জমিদারদের ভূমিকা।	২০৪
৪.৯	ঃ	আঞ্চলিক সাহিত্য, সংবাদপত্র-সাময়িকী ও সভা-সমিতি আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ ও সংস্কৃতির নয়াজাগরণে জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা।	২১৬
৪.১০	ঃ	প্রজাসৃত্ত্বের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম, বর্ণ ও পেশাভিত্তিক নয়া সমাজ শ্রেণীর বিকাশে জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা।	২৩৬
৪.১১	ঃ	স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গ্রামীণ উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা।	২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২ ঃ দেলদুয়ার-টাঙ্গাইলের সমাজ সংস্কৃতিতে জমিদারদের অভিজাত ও নৈতিক জীবন ধারার প্রভাবঃ প্রেক্ষিত 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপাখ্যান ও সমকালীন সাহিত্য। ২৫৮

৪.১৩ ঃ স্থাপত্য ও প্রত্নকীর্তি এবং লোকশিল্প-ঐতিহ্য ধারার বিকাশে দেলদুয়ারের জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা। ২৬৫

৪.১৪ ঃ জমিদারী উচ্ছেদ পরবর্তী জমিদার বংশের বর্তমান সামাজিক অবস্থা। ২৬৯

তথ্য সূত্র ঃ ৩ ২৭১

৫.০ উপসংহার ২৯৩-৩০০

৬.০ ঃ **গ্রন্থপঞ্জি**

ক) অপ্রকাশিত উৎস ঃ

১। অমুদ্রিত সরকারী নথিপত্র। ৩০১

২। মুদ্রিত সরকারী নথিপত্র। ৩০১

৩। জমিদারীর ব্যক্তিগত নথিপত্র। ৩০৪

৪। ইংরেজি-বাংলা অভিসন্দর্ভ। ৩০৫

৫। জমিদারদের স্মৃতিকথা ও অন্যান্য রচনা। ৩০৬

খ) প্রকাশিত উৎস ঃ

৬। সরকারী রিপোর্ট ও প্রকাশনা। ৩০৭

৭। গেজেট ও সংবাদপত্র। ৩১১

৮। ইংরেজিতে প্রকাশিত গ্রন্থ। ৩১২

৯। ইংরেজি জার্নালে ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ। ৩২৯

১০। ভ্রমন বৃত্তান্ত, মানচিত্র ও নির্দেশিকা। ৩৩২

১১। বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও পুস্তিকা। ৩৩৩

১২। বাংলা সাময়িকী ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও রিপোর্ট। ৩৪৩

১৩। স্মৃতিকথা, স্থানীয় পর্যায়ে সাক্ষাৎকারও আলোক চিত্র সংগ্রহ। ৩৪৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

(প্রথম অধ্যায় সংশ্লিষ্ট)

পরিশিষ্টঃ ১.১ সূত্র ঃ ইন্ডিয়ান ইয়ার বুক 'হুজ হু' ১৯৩৬-৩৭, গ্রন্থে দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জমিদার নবাব স্যার আবদুল করিম গজনবীর সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত। ৩৪৮

পরিশিষ্টঃ ১.২ সূত্রঃ লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'নাইট ব্যাচেলর' ১৯৩৮-৩৯, গ্রন্থে দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জমিদার স্যার আবদুল হালিম গজনবী এবং গজনবী জামাতা, কুমিল্লা রতনপুরের জমিদার নবাব স্যার কে, এম, ফারুকীর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত। ৩৪৯

পরিশিষ্টঃ ১.৩ সূত্রঃ খোন্দকার আবদুর রহিম, টাঙ্গাইলের ইতিহাস গ্রন্থে প্রদত্ত আতিয়ার আদি পন্নী জমিদারীর বংশতালিকা (অপূর্ণাঙ্গ) ৩৫০

পরিশিষ্টঃ ১.৪ সূত্রঃ টাঙ্গাইলের ইতিহাস গ্রন্থে প্রদত্ত আতিয়ার মূল জমিদার করটিয়া পন্নীদের বংশ তালিকা। ৩৫১

পরিশিষ্ট-১.৫ সূত্র ঃ টাঙ্গাইলের ইতিহাস গ্রন্থে প্রদত্ত দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারদের সৈয়দ বংশের তালিকা। ৩৫২

পরিশিষ্ট- ১.৬ সূত্রঃ গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর সৈয়দ মারহামাত আলী চৌধুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত আদি সৈয়দ বংশ তালিকা। ৩৫৩

পরিশিষ্ট-১.৭ সূত্র ঃ টাঙ্গাইলের ইতিহাস গ্রন্থে প্রদত্ত দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জমিদারদের গজনবী বংশ তালিকা (অসম্পূর্ণ)। ৩৫৫

পরিশিষ্ট- ১.৮ সূত্রঃ গবেষক কর্তৃক ১৯৩৬ সালের টাঙ্গাইল রেজিষ্ট্রি অফিসের সিল মোহরকৃত 'ওয়াক্ফ আল আওলাদ' দলিল সংকলন থেকে প্রাপ্ত গজনবীদের বংশ তালিকা। ৩৫৬

পরিশিষ্ট- ১.৯ সূত্রঃ টাঙ্গাইলের ইতিহাস গ্রন্থে প্রদত্ত পন্নী ও গজনবী বংশধরদের আত্মীয়তা সুত্রের টাঙ্গাইলের অপর বৃহৎ মুসলিম জমিদারদের বংশ তালিকা। ৩৫৭

পরিশিষ্ট-১.১০ সূত্রঃ গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত পন্নী ও সৈয়দ সূত্রের আত্মীয় বংশধর পাবনার দুলাই চৌধুরীদের বংশ তালিকা। ৩৬১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১.১১ সূত্র ঃ গবেষক কর্তৃক প্রণীত আটিয়া পরগনার বহুধা বিভক্ত জমিদার বংশধরদের বংশচক্র। · ৩৬২

পরিশিষ্ট- ১.১২ সূত্র ঃ ১৭৯৩ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বাংলার জমিদারদের সংখ্যাগত তথ্য কনিকা। ৩৬৩

(দ্বিতীয় অধ্যায় সংশ্লিষ্ট)

পরিশিষ্ট- ২.১ সূত্রঃ ন্যাশনাল আকাইর্ভাস এ রক্ষিত ১৭৭৮ সনে প্রকাশিত র‍্যানেলের মানচিত্রে 'আতিয়া' পরগনার চিত্র। ৩৬৬

পরিশিষ্ট-২.২ সূত্র ঃ ১৮৪৮-৫২ সালের রেভেনিউ সার্ভে, 'আতিয়া' পরগনা সার্ভে এর ৫ খন্ডে প্রনীত ফিল্ডবুকের প্রতি খন্ডে প্রদত্ত সাধারণ তথ্য (প্রথম খন্ডের প্রথম পাঁচ পাতা)। ৩৬৭

পরিশিষ্ট-২.৩ সূত্র ঃ রেভেনিউ সার্ভে প্রণীত গ্রাম বা মহাল ভিত্তিক 'খাসরা ম্যাপ'। পরগনার মোট ৯৫০ টি গ্রামের মধ্যে গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রধান জমিদার বাড়ীর তিনটি গ্রামের জরিপ ম্যাপ, যথাক্রমে দেলদুয়ার, পাকুল্লা ও চারান (দেলদুয়ার জমিদারদের আদি তালুক)। ৩৭২

পরিশিষ্ট- ২.৪ সূত্রঃ মোহাম্মদ বাকের সম্পাদিত টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থে প্রদত্ত ১৮৫০ সালের রেভেনিউ সার্ভে ' আতিয়া পরগনা' এর সাধারণ তথ্য চার্ট। ৩৭৫

পরিশিষ্ট- ২.৫ সূত্র ঃ এফ, এ, সাকচী প্রণীত ময়মনসিংহ জেলার ১৯০৮ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্টে প্রদত্ত থানা ভিত্তিক মৌজা ম্যাপ সমূহের নমুনা। এতে একটি মৌজার বাউন্ডারী বা তৌজি নম্বর কৃত নকশা এবং তার অধীন ক্ষুদ্র প্লট বা দাগ নাম্বার। ৩৭৬

পরিশিষ্ট- ২.৬ সূত্রঃ এফ, এ সাকচীর ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দ্যা ডিস্ট্রিকট অব ময়মনসিংহ ১৯০৮-১৯১৯' এর পরিশিষ্টে প্রদত্ত আতিয়ার ল্যান্ড মেজারমেন্ট এবং জমিদারদের বিভিন্ন এজমালি সম্পত্তির বিভিন্ন তৌজির শরিকদের অংশ বর্ণিত চার্ট। ৩৭৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ২.৭ সূত্রঃ ১৯১৩ সালে লেডিনজ কমিশন প্রস্তাবিত ময়মনসিংহ জেলাকে তিনটি জেলায় বিভক্তির পরিকল্পনা ম্যাপ। ৩৮৪

পরিশিষ্ট- ২.৮ সূত্রঃ ১৯২০ সাল পর্যন্ত টাঙ্গাইল মহকুমার ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও প্রশাসনিক মানচিত্র, এতে আতিয়া পরগনাভুক্ত দক্ষিণ টাঙ্গাইলে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ৫টি থানা। ৩৮৫

পরিশিষ্টি-২.৯ সূত্রঃ দুলাই জমিদারীর আতিয়া পরগনাস্থ সম্পত্তির লীজ দলিল। ৩৮৬

পরিশিষ্টি-২.১০ সূত্রঃ ১৯৯০ সাল পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলার ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক মানচিত্র। এতে আতিয়া পরগনা ভুক্ত দক্ষিণ টাঙ্গাইলের স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ৭টি থানা। ৩৮৭

পরিশিষ্টঃ ২.১১ সূত্রঃ গবেষক প্রণীত দেলদুয়ার ও আতিয়া জমিদারীর জমিদারী অঞ্চল চিহ্নিত মানচিত্র। ৩৮৮

(তৃতীয় অধ্যায় সংশ্লিষ্ট)

পরিশিষ্ট-৩.১ সূত্র ঃ ১৯১৪ সালে গঠিত মুসলিম এডভাইজরি কমিটি বা হর্নেল কমিটির বিবেচনার জন্য মুসলিম শিক্ষা সর্ম্পকে বড়লাট পরিষদের সদস্য আবদুল করিম গজনবীর প্রদত্ত একটি নোট। ৩৮৯

পরিশিষ্ট- ৩.২ সূত্রঃ ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত আবদুল করিম গজনবীর ভাষন। ৩৯৯

পরিশিষ্ট-৩.৩ সূত্র ঃ ১৯২৭ সালে কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী রূপে আবদুল করিম গজনবীর ভাষন্। ৪০৮

পরিশিষ্ট-৩.৪ সূত্র ঃ ১৬ এপ্রিল, ১৯১০ কেন্দ্রীয় বাজেট আলোচনায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য আবদুল হালিম গজনবী প্রদত্ত ভাষন্। ৪১৩

পরিশিষ্ট-৩.৫সুত্র ঃ টাঙ্গাইলের পৌরসভা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত তথ্য কনিকা। ৪১৮

পরিশিষ্ট- ৩.৬ সূত্রঃ মীর মশাররফ হোসেন ও বেগম রোকেয়া কর্তৃক দেলদুয়ারের জমিদার বেগম করিমুন্নেসা খানমকে উৎসর্গ পত্র। ৪২৪

পরিশিষ্ট-৩.৭ সূত্র ঃ দেলদুয়ারের জমিদারদের ও সংশ্লিষ্ট জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত লেখক, সম্পাদক, সংবাদ পত্রের তালিকা। ৪২৫

পরিশিষ্ট-৩.৮ সূত্র ঃ দেলদুয়ারের জমিদারদের সমকালীন বাংলার জমিদার এবং ভুমি সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী ও অন্যন্য শ্রেণী সম্পর্কিত তথ্য কনিকা। ৪২৬

পরিশিষ্ট-৩.৯ সূত্র ঃ দেলদুয়ারের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক কাজের তালিকা। ৪২৭

পরিশিষ্ট-৪, চিত্রসুচী বা অ্যালবাম ঃ

চিত্র নং- ৪.১ ঃ দেলদুয়ার গজনবী ভবন। দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী আদি জমিদার ভবন। ৪২৮

চিত্র নং- ৪.২ ঃ দেলদুয়ার মসজিদ। ১৮০৬ সালে দেলদুয়ারের জমিদার রওশন খাতুন প্রতিষ্ঠিত।

চিত্র নং- ৪.৩ ঃ লন্ডনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনরত অবস্থায় ১৮৮৫ সালে তোলা আবদুল করিম খান। ৪২৯

চিত্র নং- ৪.৪ ঃ এ, কে, গজনবীর পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

চিত্র নং- ৪.৫ ঃ এ. কে. গজনবীর বয়োঃসন্ধিক্ষনের ছবি। ৪৩০

চিত্র নং- ৪.৬ ঃ পরিণত বয়সে নবাব, স্যার আবদুল করিম খান গজনবীর ছবি।

চিত্র নং- ৪.৭ ঃ এ, এইচ, গজনবীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং- ৪.৮ ঃ এ, কে, গজনবীর ফাইল ফটো। ৪৩১

চিত্র নং- ৪.৯ ঃ ধনবাড়ীর জমিদার নওয়ার আলী চৌধুরীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং- ৪.১০ ঃ সন্তোষ ছয় আনির জমিদার শ্রীমতি জাহ্নবী চৌধুরীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং-৪.১১ ঃ সন্তোষ ছয় আনি জমিদার শ্রীমতি প্রমথ নাথ রায় চৌধুরীর ফাইল ফটো। ৪৩২

চিত্র নং- ৪.১২ ঃ হেম নগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং-৪.১৩ ঃ সন্তোষ ছয় আনির বিখ্যাত জমিদার মহারাজা মন্মথ রায় চৌধুরীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং-৪.১৪ ঃ পুর্ব বাংলার মহসিন ও আতিয়ার চাঁদ খ্যাত করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার।

চিত্র নং-৪.১৫ ঃ ১৬০৮ সালে সাঈদ খান পন্নী নির্মিত আতিয়া মসজিদ।

চিত্র নং- ৪.১৬ ঃ হিন্দু জমিদারদের নির্মিত পাকুল্লা মঠ। ৪৩৩

চিত্র নং- ৪.১৭ ঃ মুসলমান জমিদার নির্মিত কদিম হামজানি মসজিদ। ৪৩৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.১৮ ঃ রওশন খাতুন নির্মিত দেলদুয়ার মসজিদ।

চিত্র নং-৪.১৯ ঃ কাগমারী পরগনার (সন্তোষ) প্রতিষ্ঠাতা পীর শাহ্‌জামানের মাজার, সমাধি। ৪৩৫

চিত্র নং-৪.২০ ঃ দেলদুয়ারের জমিদার রওশন খাতুন নির্মিত পাকুল্লা মসজিদ।

চিত্র নং- ৪.২১ ঃ সুলতানি যুগের নিদর্শন গোপালপুর খামার বাড়ী মসজিদের ধ্বংশাবশেষ। ৪৩৬

চিত্র নং- ৪.২২ ঃ সাদাত আলী খান পন্নী নির্মিত করটিয়া জমিদার বাড়ী।

চিত্র নং- ৪.২৩ ঃ সাদত কলেজে রক্ষিত হাতে লেখা শাহনামা। ৪৩৭

চিত্র নং- ৪.২৪ ঃ আতিয়া মসজিদের অভ্যন্তরস্থ দেয়াল চিত্র।

চিত্র নং- ৪.২৫ ঃ সন্তোষ জমিদারদের নির্মিত জাহ্নবী হাইস্কুল। ৪৩৮

চিত্র নং- ৪.২৬ ঃ সাকরাইল, চাদ্র নারায়ন দাস এর মঠ।

চিত্র নং- ৪.২৭ ঃ টাঙ্গাইলের কাঁসা শিল্প। ৪৩৯

চিত্র নং- ৪.২৮ ঃ তালপাতায় লেখা পদ্মপুরান।

চিত্র নং- ৪.২৯ ঃ ধনবাড়ীর জমিদারীর দুই আদি প্রতিষ্ঠাতার কবর। ৪৪০

চিত্র নং- ৪.৩০ ঃ গোপালপুরের হেমনগর জমিদার বাড়ী।

চিত্র নং- ৪.৩১ ঃ সন্তোষ জমিদার বাড়ী (কাগমারী), পরে মাওলানা আজাদ কলেজ, বর্তমানে কাগমারী কলেজ। ৪৪১

চিত্র নং- ৪.৩২ ঃ দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা রায় চৌধুরী খ্যাত মহেড়া জমিদার বাড়ী। বর্তমানে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

চিত্র নং- ৪.৩৩ ঃ করটিয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান প্রতিষ্ঠিত সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। ৪৪২

চিত্র নং- ৪.৩৪ ঃ টাঙ্গাইলের সাধারণ গ্রন্থাগার ও রমেশচন্দ্র হল।

চিত্র নং- ৪.৩৫ ঃ নাগর পুরের জমিদার বাড়ী (বর্তমানে মহিলা কলেজ)। ৪৪৩

চিত্র নং- ৪.৩৬ ঃ ঐতিহ্যবাহী গারো পোষাকে মধুপুর বনের উপজাতি।

চিত্র নং- ৪.৩৭ ঃ টাঙ্গাইল-দেলদুয়ারের তাঁত শিল্প। ৪৪৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৩৮ ঃ টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ী চমচম ও মিষ্টান্ন শিল্প।

চিত্র নং- ৪.৩৯ ঃ সন্তোষ (কাগমারী) মাওলানা ভাসানীর মাজার। ৪৪৫

চিত্র নং- ৪.৪০ ঃ মির্জাপুরের কুমুদুনি হাসপাতাল ও ট্রাষ্ট।

চিত্র নং- ৪.৪১ ঃ টাঙ্গাইলের সার্কিট হাউজ। ৪৪৬

চিত্র নং- ৪.৪২ ঃ টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ ভবন।

চিত্র নং- ৪.৪৩ ঃ ১৮৫৪ সালের আলাপসিং পরগনার সার্ভে ম্যাপের ভিউকার্ড। ৪৪৭

চিত্র নং- ৪.৪৪ ঃ ৩১ জানুয়ারী ১৮২৭ সালে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক ঢাকার কালেক্টর বরাবরে লেখা চিঠির ভিউকার্ড।

চিত্র নং- ৪.৪৫ ঃ কোম্পানি শাসনকালে জমি সংক্রান্ত মামলায় ডিপুটি কালেক্টরের আপীল রায়ের কপির ভিউকার্ড। ৪৪৮

চিত্র নং- ৪.৪৬ ঃ ধনবাড়ীর জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ভাষনসহ ভিউকার্ড।

চিত্র নং- ৪.৪৭ ঃ দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদার ভবন। ১৯৭৩ সালে তোলা ছবি।

ঃ দেলদুয়ারের দক্ষিণ বাড়ী জমিদার ভবনের প্রধান ফটক। ৪৪৯

চিত্র নং- ৪.৪৮ ঃ পাবনা দুলাই জমিদারদের শহরের বাড়ী।

চিত্র নং- ৪.৪৯ ঃ ধনবাড়ী জমিদারদের প্রাসাদ ৪৫০

চিত্র নং- ৪.৫০ ঃ ধনবাড়ী জমিদারদের মসজিদের চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

উপক্রমনিকা

"বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দেলদুয়ারের জমিদার পরিবার" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর এ,কে,এম, ইদ্রিস আলী-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই "অভিসন্দর্ভ"টি রচিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়কের পান্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতার ফলেই এই অভিসন্দর্ভটি বর্তমান রূপ পেয়েছে। তার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর বেশী কাল দেলদুয়ারের জমিদার পরিবার টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে এমনকি সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছে। ঢাকার নবাব পরিবার ব্যতীত বাংলার অন্য কোন মুসলিম পরিবারের পক্ষে এমন বিরল গৌরব ও কৃতিত্বের সুযোগ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব ঢাকার নবাব পরিবারকেও ছাড়িয়ে গেছে। সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক গতিধারার প্রেক্ষাপটে তাদের পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেগুলো এতদাঞ্চলের আঞ্চলিক অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে কি কি অবদান রেখেছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

এম, এ শ্রেণীতে রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রুপে অধ্যয়ন কালে প্রফেসর মুসা আনসারী ও প্রফেসর এ,কে,এম ইদ্রিস আলী এর সান্নিধ্য ও সাহচর্যে এসে বৃটিশ পিরিয়ডের কার্যক্রমের উপর গবেষণা কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এ,কে,এম ইদ্রিস আলী এর পরামর্শে তারই তত্ত্বাবধানে উক্ত শিরোনামে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করি। এই অভিসন্দর্ভটি উক্ত অনুসন্ধিৎসু মনের বাস্তব ফসল। এই বিষয়ে প্রকাশিত বই পুস্তকের মধ্যে 'বাংলাদেশের দশ দিশারী' গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ গবেষণার সূত্র হিসাবে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। এই তথ্য সূত্র ধরে গবেষণা করতে যেয়ে গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র দেখতে পাই এবং গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস গবেষণার কঠিন ও পরিশ্রমলব্ধ দিকগুলো বুঝতে পেরে ঘাবড়ে যাই। এ সময় তত্ত্বাবধায়ক এ,কে,এম ইদ্রিস আলী এবং "ন্যাশনাল আর্কাইভস' এর পরিচালক, ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দীন আহমেদ এর সহজ পদ্ধতিগত ও তথ্যগত নির্দেশনা পাই, সর্বোপরি প্রফেসর মুসা আনসারী ও ডঃ হাবিবা খাতুনের উৎসাহ ও পরামর্শে গবেষণা কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১ম বর্ষের ফলাফলের ভিত্তিতে ২য় বর্ষের থিসিস পর্বে প্রাপ্ত ইউ,জি,সি বৃত্তি লাভ এবং বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান খান এবং বিভাগীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা কবির আহমেদের সার্বিক উৎসাহ আমার এ গবেষণাকে এগিয়ে নিতে আরো বেশী সাহায্য করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা রতন বাবু, আমান সাহেব, রেয়ার সেকশনে খায়ের সাহেব, মাইক্রোফিল্ম সেকশনের কর্মকর্তাগণ, ন্যাশনাল আর্কাইভস এর সহকারী পরিচালক মীর ফজলে আহমেদ চৌধুরী সহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আতিয়া পরগনার ১৮৫০ সালের রেভেনিউ সার্ভের দুষ্প্রাপ্য রিপোর্ট এবং আর্কাইভসে রক্ষিত যাবতীয় তথ্য দিয়ে গবেষণা কাজে অমূল্য সহযোগিতা করেছেন। এদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ।

দেলদুয়ারের জমিদার পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বর্তমান উত্তরা নিবাসী এডভোকেট সৈয়দ মারহামাত আলী বহুবার সাক্ষাৎকার ও মূল্যবান তথ্য দিয়ে সবিশেষ সহযোগিতা করেছেন। দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জমিদারদের একমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ খোদাদাদ খান গজনবী তার শত ব্যস্ততার মাঝে মূল্যবান সাক্ষাৎকার ও তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। একইভাবে সহযোগীতা করেছেন করটিয়ার পন্নী পরিবারের বায়েজীদ খান পন্নী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী গবেষক,পাকুল্লা জমিদার বংশের কনিষ্ঠ সদস্য সৈয়দ আল মামুন চৌধুরী কিছু তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। দুলাই জমিদারী সংক্রান্ত সংযুক্ত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন দুলাই জমিদার পরিবারের মেয়ে, আমারই বিভাগের জুনিয়র, এম ফিল গবেষক প্রিয় বোন ও বন্ধু নাজলী চৌধুরী, এরা সকলে বিভিন্নমুখী তথ্য, ছবি, ডকুমেন্টস দিয়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন; তাদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ শাখা, মাইক্রোফিল্ম ও পান্ডুলিপি শাখার অফিসার কর্মচারীগণ, ন্যাশনাল আর্কাইভসের পরিচালক, বিশেষ করে সহকারী পরিচালক মীর ফজলে আহমেদ চৌধুরী, সিনিয়র আর্কিওলজিষ্ট হাসানুজ্জামান হায়দার, ইলিয়াস খান প্রমুখ কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ; ন্যাশনাল লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মকর্তা, কর্মচারী আমাকে তথ্য সংগ্রহে বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়েছেন। আমি তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রাপ্ত তথ্য ও উপকরণ বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করে সঠিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ ও পরিবেশন করাই ঐতিহাসিক ও গবেষকের কাজ বলে মনে করি। স্থান, কাল ও পাত্র; সে সাথে ইতিহাস চেতনা ও দর্শনের নিরিখে আবেগ উচ্ছ্বাসমুক্ত হয়ে অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে পেরেছি বলে সন্তুষ্টি বোধ করছি। আমার মধ্যে ইতিহাস বোধ সৃষ্টি, ইতিহাসের চালিকা শক্তি সমূহ ও তার কার্যকর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে যে কয়েকজন পন্ডিতের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত আদর্শ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তন্মধ্যে প্রফেসর মুসা আনসারী, প্রফেসর এ,কে,এম ইদ্রিস আলী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম এবং প্রফেসর ডঃ শরীফ উদ্দীন আহমেদ অন্যতম। তাদের নিকট আমি মানসিক ভাবে ঋণী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডির বাইরে তিন জন ব্যতিক্রমী ও কর্মসফল মানুষের সান্নিধ্য আমার সাধনা ও গবেষণাধর্মী সামাজিক পরিবর্তনের চেতনাকেই বিকশিত করেছে। সেজন্য তাদের কাছেও মানসিক ভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ, এরা হলেন- সাবেক সচিব, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শাহ আবদুল হান্নান, বিশিষ্ট শিল্পপতি, পরিবর্তনের আধুনিক নেতা ও শিল্পপতি আবদুল আউয়াল মিন্টু এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি ও লেখক আবুল কাসেম হায়দার। আমার গবেষণা কাজ শেষ করতে পরোক্ষ ভাবে সহায়তা ও উৎসাহ দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এডভোকেট গিয়াস উদ্দীন চৌধুরী, বড় বোন শাহীন আরা জাহাঙ্গীর সহ সকল ভাই বোন। বিশেষ করে বন্ধুরমত ছোটভাই বাপ্পী এবং প্রিয় ভাগ্নি মৌসুমী, শায়েরী ও প্রিতুলের খুনসুটি নিরবিচ্ছিন্ন কাজের ক্লান্তির মাঝে আনন্দ দিয়েছে, নতুন ভাবে কাজে উজ্জীবিত করেছে। এছাড়া একাধিক কর্মস্থলের সহকর্মীগণ, বন্ধুবান্ধবসহ সকলেই কমবেশী উৎসাহিত করেছেন। এদের সকলের নিকটই আমি ঋণী ও সকৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য আমার কর্মস্থল ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ এর শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মাহফুজুল হক কলেজ থেকে এক মাসের ছুটি দিয়েছেন। আমার খন্ডকালীন অপর কর্মক্ষেত্র বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি, অর্থনৈতিক সমাজ পরিবর্তনের নেতা, এফ.বি.সি.সি.আই-এর সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুল আউয়াল মিন্টু তার 'উপদেষ্টা কার্যক্রম' থেকে সাময়িক ছুটি দিয়েছেন। এছাড়া অপর কর্মস্থল লয়েডস ইন্সুরেন্স লিঃ এর শাখা ব্যবস্থাপক সাইফুল ভাইকে এবং ইয়ুথ গ্রুপের চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দারকে ধন্যবাদ যে, তারা গবেষণা কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব অবহেলা ও কার্য বিরতিকে সানন্দে মেনে নিয়েছেন। কিছু বানান ত্রুটি দেখিয়ে দেয়ার জন্য লয়েডস এর কর্মকর্তা, সাংবাদিক গোফরান ভাইকে ধন্যবাদ। আমার গবেষণা কার্যক্রম শেষ করতে সহায়তার জন্য এদের সবার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। গবেষণামূলক এই নিরানন্দ কাজে উৎসাহ ও সঙ্গ দিয়ে আমার গবেষণা কার্যক্রমকে আনন্দময় করে তুলেছে প্রিয়বন্ধু শাকিল ও নির্জর এবং সকল সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধব। এদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সবশেষে এ.জেড. কম্পিউটার্সের জাকির ভাই এবং কম্পোজিটর আমির হোসেন ভাইকে ধন্যবাদ কষ্ট করে দুই বছর ব্যাপী প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার এই থিসিসটি কম্পোজ ও বহুবার প্রুফ করে চূড়ান্ত ভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করার জন্য।

ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ ও পরিসংখ্যান থেকে বিশ্লেষণ মূলক পদ্ধতি, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে ও সমাজতাত্ত্বিক মনোভঙ্গিতে এই অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে । এই অভিসন্দর্ভে যদি কিছু মৌলিক তথ্যাবলী ও গুনাবলী থাকে তবে সেটা বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ পন্ডিতদের জন্য বিবেচ্য। এর যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কেবলমাত্র আমিই দায়ী।

২৫.১২.০২

তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০০২

মোঃ ইমাম উদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

১.০ ভূমিকা ঃ ১.১ বাংলায় হাজার বছরের ইতিহাসে অনড় কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ ব্যবস্থা বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান চালিকা শক্তি ছিল সামান্ততন্ত্রের প্রতিভু 'জমিদার' শ্রেণী। ঔপনিবেশিক ইংরেজ কোম্পানি শাসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্বে (১৭৬৫-১৭৯৩) আবহমান কালের জমিদারী ব্যবস্থাপনায় যে উলটপালট তথা পরিবর্তন ঘটে, তাতে পুরনো জমিদার সমাজের পরিবর্তে বেনিয়া -মুৎসুদ্দি শ্রেণী থেকে উত্থিত বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন নয়া জমিদার শ্রেণীর উত্থান ঘটে। এর সাথে যুক্ত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ও কর্ণওয়ালিশ কোর্ড (আইন, সংবিধান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা)। নয়া জমিদার শ্রেণীর বিকৃত রুচি ও চেতনা হয়ে ওঠে কোম্পানি শাসনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আশা করা হয়েছিল, ইউরোপীয় ধারায় বাংলার উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প বিপ্লব তথা পুঁজিবাদী বিকাশ সাধিত হবে। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্যের বিপরীতে বিকৃত উৎপাদন পদ্ধতি বিকশিত হয়। যার ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বিতীয় পর্বে (১৮৪০ দশকে এসে) বাংলার জমিদারী ও কৃষি ব্যবস্থাপনায় পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির কিছু মিশ্র বৈশিষ্ট্য (যেমন পণ্য উৎপাদন ও বাজার তৈরী) যুক্ত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূর্যাস্ত আইনের প্রয়োগ ও নিলামি ব্যবস্থা এবং মাত্র এক দশকের মধ্যে চিরস্থায়ী আইনে ব্যাপক সংশোধন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে তার লক্ষ্যের বিপরীতে পরিচালিত করে। আর এর মূল নিয়ামক হচ্ছে বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন নয়া জমিদার শ্রেণী। তারা অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ সামাজিক মর্যাদা সৃষ্টির জন্য ভূমিতে বিনিয়োগ করে,অর্থাৎ নিলামে জমিদারী ক্রয় করে। তাছাড়া উৎপাদনের কষ্টকর ঝুঁকি সরাসরি না নিয়ে 'খাজনা' আদায়ের নামে রায়তের উদ্বৃত্ত ভোগের মাধ্যমে জমিদারীতে কাঁচা অর্থের পাহাড় তৈরীর সুযোগ ছিল। এই নিলামি ব্যবস্থায় ও সরকারের বেশি রাজস্ব আদায়ের শ্যেণ দৃষ্টিতে পড়ে পুরনো, ঐতিহ্যবাহী জমিদারীগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

সাধারণ ভাবে যে কয়জন পুরনো ঐতিহ্যবাহী জমিদার তাদের জমিদারী টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়, তারাও একটি বিকৃত পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে ; আর তা হলো পত্তনী প্রথা। তারা কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন অবৈধ বা বৈধ অর্থের মালিক বিভিন্ন পেশাজীবীর নিকট জমিদারীর মধ্যস্বত্ব বিক্রি করে, তারা আবার লাভে আরেক উপ-মধ্যস্বত্বের নিকট স্বত্ব বিক্রি করে; এভাবে অসংখ্য মধ্যস্বত্ব, উপ-মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণী সৃষ্টি হয়। এরা সকলে কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত রায়ত শ্রেণীর উদ্বৃত্ত অবৈধ ভোগকারী অনুৎপাদক শ্রেণীতে পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এভাবে পুরনো জমিদারীর স্থলে বিকৃত পদ্ধতিতে নয়া জমিদার শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। নয়া জমিদার শ্রেণী কর্তৃক বাংলার ইতিহাসে নয়া আর্থ-সামাজিক পটভূমি রচিত হয়।

এতসব পরিবর্তনের ডামাডোলে হাতে গোনা কয়েকটি জমিদার তাদের পুরনো জমিদারী ব্যাপক হারে মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি ছাড়াই পুরো ঔপনিবেশিক শাসন ব্যাপী টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। তন্মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার ও পুরনো আতিয়া পরগনা, পার্শ্ববর্তী কাগমারী পরগনা তথা দক্ষিণ টাঙ্গাইল অন্যতম ছিল। কিভাবে একই পরগনা দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে টিকে থাকে ? আবার বংশগত ভাবে পাঁচশত বছর ব্যাপী (১৫০০-২০০০) একটি জমিদার পরিবার (দেলদুয়ার ও করটিয়া জমিদার) কিভাবে তার সামাজিক নেতৃত্ব ও অবস্থানসহ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে? এই সবই নিঃসন্দেহে গবেষণার দাবী রাখে।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ঔপনিবেশিক শাসন বাংলায় হাজার বছরের অনড় গ্রাম সমাজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাত হানে। এর প্রধান মাধ্যম হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট নয়া অভিজাত জমিদার সমাজ; আর প্রধান বাহন হয় ধর্ম, সম্প্রদায় ও রাজনীতি। কিন্তু অচিরেই পাশ্চাত্য শিক্ষা নীতির ফলশ্রুতিতে নয়া ধর্মজ সম্পর্ক ও নয়া রাজনীতির নিয়ন্তা হয়ে ওঠে ইংরেজি শিক্ষার ফলে সৃষ্ট নয়া মধ্যবিত্ত ও চাকুরিজীবী শ্রেণী। পুরনো জমিদার সমাজ আর নয়া মধ্যবিত্ত সমাজ যখন মুখোমুখী প্রতিযোগিতায়, বিশেষতঃ মনো সংঘাতে, তখন জমিদার শ্রেণী সংগঠিত হয়। স্বীয় শক্তি পুনরুদ্ধারে যায় সরকারের কাছাকাছি, অনুনয় বিনয়ের রাজনীতিতে আর জনকল্যাণের কার্যক্রমে। আর উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার স্বগোত্রীয়দের সংগঠিত করে অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হওয়ার আহবান জানায়, নিম্ন শ্রেণী বা প্রজা শ্রেণীর নিকটবর্তী হয়। প্রজার পক্ষ হয়ে জমিদারের মুখোমুখী হয়, প্রজার প্রতি সরকারের ভূমিকা পরিবর্তনের দাবী জানাতে থাকে। এ দাবী ক্রমাগত সোচ্চার হতে হতে কোথাও, কখনো কখনো প্রতিবাদী হয় ওঠে। এভাবে বাংলা প্রবেশ করে ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্বের যুগে।

১৮৮৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে প্রজাস্বত্ব নানা ভাবে বিকশিত হয়ে নয়া ভূমি সম্পর্ক সৃষ্টি করে ও ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতি একই থাকে। এখানেও একই ভাবে পরিবর্তন সঠিক পথে না গিয়ে আঁকা বাঁকা হয়ে বিকৃত পথ ধরে। ফলশ্রুতিতে নয়া 'জোতদারী'

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং এর প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক ভাবে গ্রামীন 'টাউট-বাটপার' শ্রেণী চরিত্র।

এক দশকের অধিককাল ব্যাপী বিনাক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলার পর ১৯৫০ সালে ক্ষতিপূরণসহ আইনগত বিলুপ্তি এবং ১৯৫৬ সালে কার্যকর ভাবে জমিদারী ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। অতঃপর ১৯৬১ সালের মধ্যে ক্ষতিপুরণ প্রদানের যাবতীয় কার্য্যক্রমসহ নয়া ভূমি সংস্কার নীতিমালা গৃহীত হয়। এ সময়ে কৃত আদমশুমারী ও পরিসংখ্যান তথ্য থেকে দেখা যায়, নয়া অর্থনীতি ও সমাজনীতির ধারা এ সময় থেকে শুরু হয় কিন্তু পূর্ববর্তী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিকৃত ফলগুলো চলমান অর্থনীতি ও সমাজ সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে যায়।

ফার্মিংগার, ডব্লিউ,কে; ডব্লিউ,অ্যাডাম; জেমসওয়াইজ; এইচ,জে,রেনল্ড; ডব্লিউ, হান্টার; এফ, এ,সাকচী প্রমুখ ইংরেজ কর্মকর্তাদের পরিসংখ্যান, জরিপ রিপোর্ট ও গবেষণা গ্রন্থ এবং এফ,আর সালাহউদ্দিন; এ, আর মল্লিক; সুফিয়া আহমেদ, লতিফা আকন্দ, সিরাজুল ইসলাম, এ,কে,এম মহসিন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, মুনতাসির মামুন, রতন লাল চক্রবর্তী প্রমুখ ঐতিহাসিকের গবেষণা, রচনা ও বিশ্লেষণে সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস চিত্র ফুটে ওঠে। কোম্পানি ও বৃটিশ সরকার সৃষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত সমূহের উপজীব্য বিষয় সমূহকে তারা জাতীয় প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন তথ্য সূত্রকে যাচাই করে নিত্য নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করে বাংলার ইতিহাসে নতুন নতুন নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির প্রধান চরিত্র গুলোর বিশ্লেষণ করে এইসব তথ্য ও তত্ত্বের মালা সাজিয়েছেন, যার বহুলাংশই নির্ভূল। কিন্তু ক্ষুদ্রতর পর্যায়ে (মাইক্রো লেভেল) বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ে এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণী চরিত্রগুলোর উপর তুলনামূলক কম গবেষণা হয়েছে। অধুনা আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণায় দেখা যায়, আঞ্চলিক শ্রেণী, সমাজ, চরিত্র, উপাদান ও কাঠামোর বিশ্লেষণে নতুন নতুন অথচ ব্যতিক্রমী তথ্য ও তত্ত্ব বেরিয়ে আসছে। এর কতেক অংশ জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত মত ও তত্ত্বের পরিপূরক এবং কতেক বিপরীত ও ব্যতিক্রম।

দেলদুয়ারের জমিদার পরিবারের পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন প্রবাহ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে গবেষককে এমনই কতেক ব্যতিক্রমী তথ্য ও তত্ত্বের সম্মুখীন হতে হয়েছে ।

হাইফোথিসিস, এন্টি থিসিস এবং সিনথিসিস বা অবজেকটিভ অব থিসিসের মাধ্যমে নয়া থিসিসে বা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

১.২ দেলদুয়ার জমিদার পরিবার ও দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারী অঞ্চল তথা দক্ষিণ টাঙ্গাইলের ৬টি থানা নিয়ে আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার হাইফোথিসিস হচ্ছে বাংলায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও বৃটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক সামন্তবাদী 'জমিদারী' ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেলদুয়ারের জমিদার ও জমিদারী বাংলার অন্যান্য জমিদার ও জমিদারীর তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। বিশেষ করে দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জমিদার বেগম করিমুন্নেসা ও তদীয় পুত্র গজনবী ভ্রাতৃদ্বয়ের জীবন ও কর্ম এবং জমিদারী ব্যবস্থাপনা । জমিদারী ভূমি ব্যবস্থাপনায়, অভিজাত জীবন ধারায়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মধারায়, শিক্ষা ও সৃজনশীলতায় এই স্বতন্ত্র চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান থিসিসে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানা ও দক্ষিণের ৬টি থানা নিয়ে গঠিত আতিয়া পরগনার সাধারণ জনজীবনের আর্থ-সামজিক ও রাজনৈতিক ধারা বিবর্তনে দেলদুয়ার ও সংশ্লিষ্ট জমিদারীগুলো কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত অঞ্চলের জমিদার ও অভিজাত সমাজ এবং প্রজা ও জনসমাজ কিভাবে বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত কিভাবে, কতটুকু, এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের জাতীয় গঠন ও জনগণ ইতিহাসের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে তা প্রমাণ করা হয়েছে।

জমিদারী বাংলার ইতিহাসে স্বীকৃত অনেক তত্ত্বের ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে দেলদুয়ার জমিদারীতে। যেমন- সাধারণভাবে জমিদারেরা নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ভুঁয়া অভিজাত বংশীয় পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু দেলদুয়ার জমিদারগণ আদি না নয়া জমিদার এবং ভূমিপুত্র না বিদেশাগত বংশজাত, বংশ ধারা ও ভুমিজ বিবর্তন ধারায় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বলা হয়, জমিদাররা চরিত্রহীন, অত্যাচারী, জ্ঞানহীন ও শোষকের প্রতিভূ। এক্ষেত্রে দেলদুয়ার ও সংশ্লিষ্ট জমিদারদের শিক্ষা জীবন ও পারিবারিক জীবন ধারা বিশ্লেষণ করে এতে কোন বৈপরীত্য বা বিশিষ্টতা রয়েছে কিনা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাধারণ ভাবে বলা হয় যে, জমিদাররা ভূমিও প্রজার উন্নয়নে কিছু তো করেইনি বরং কৃষকের উদ্বৃত্তের উপর নানাভাবে হাত বাড়িয়ে তা কেড়ে নিয়েছে, প্রজার উপর শোষণ ও অত্যাচার চালিয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাকে জমি থেকে উৎখাত করেছে। এহেন প্রেক্ষাপটে দেলদুয়ার ও সংশ্লিষ্ট জমিদারদের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, জমিদার -প্রজা সম্পর্ক, উৎপাদন পদ্ধতি ও কৌশল সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে জমিদারী আইন ব্যবস্থাপনা, প্রজাস্বত্বের আইন ব্যবস্থাপনায় কোন কোন বৈপরীত্য ও বিশিষ্টতা রয়েছে তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। দেলদুয়ারের জমিদারবর্গ ও দেলদুয়ার থানার প্রজা সাধারণের মধ্যকার সম্পর্ক, জমিদার-দিওয়ান বা ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা ও প্রজা সম্পর্ক; ভূমি রাজস্বে অতিরিক্ত খাজনা ও আবওয়াব নীতি; আইন বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ সমূহ এবং এতদাঞ্চলের জমিদারীর প্রকৃতি ও স্বরূপ উদঘাটন করা হয়েছে।

সাধারণ ভাবে স্বীকৃত যে, জমিদাররা লোকায়ত জনজীবন মানস থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অভিজাত জীবন যাপন করেছে ফলে লোকায়ত জীবন ও মানস গঠনে জমিদারদের কোন ভূমিকা নেই। তদুপরি মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের সকল জমিদারীর শ্রেণী চরিত্র ও ধর্মীয় সম্পর্ক একই রূপ ছিল এবং সার্বিকভাবে জমিদাররা বৃটিশের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বদা কাজ করেছে।

এক্ষেত্রে দেলদুয়ার থানা ও দক্ষিণ টাঙ্গাইল অঞ্চলের জনমানসের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক তথা লোকায়ত জীবন ধারার উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত উপাদান ও বৈশিষ্টগুলোর গঠনে দেলদুয়ার ও পার্শ্ববর্তী জমিদার তালুকদারদের ভূমিকা ও প্রভাব কতটুকু তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এতদাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সর্বোপরি লোকায়ত জীবন ধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। দেলদুয়ার ও সংশ্লিষ্ট জমিদারী অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি কিভাবে দক্ষিণ টাঙ্গাইলের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও পুর্ববাংলার আঞ্চলিক মুসলিম সমাজ বিকাশে অবদান রেখেছে এবং কতটুকু অবদান রেখেছে তাও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার পূর্ববাংলার সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর বাংলা ও সর্ব ভারতীয় পরিমন্ডলের আর্থ-সামাজিক বিকাশে এতদাঞ্চলের জমিদার ও শ্রেণী সমাজের কোন অবদান রয়েছে কিনা তাও প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সর্বোপরি বাংলার আর্থ-সামাজিক গতিধারা থেকে দেলদুয়ার জমিদারগণ কতটুকু গ্রহণ করে নিজেদের বিকশিত অথবা সংকুচিত করেছে। অপর পক্ষে নিজেদের কৃতকর্ম ও অবদানের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার পরবর্তী আর্থ-সামাজিক বিকাশ ধারায় কতটুকু অবদান রাখতে বা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে তাও প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৩ আলোচ্য গবেষণা পাঁচটি স্তরে, পাঁচটি সময়কালের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান সময়কাল মূলতঃ ১৮৮৫ থেকে ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্বের বিকাশ কাল পর্যন্ত। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, গ্রামীণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালুসহ নানাবিধ ঘটনা ও ভাবদ্যোতনায় এ সময় কাল দেলদুয়ার জমিদারী ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। এ সময় নানাবিধ কারণে জাতীয় প্রবাহের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কাল থেকে নানাবিধ কারণে প্রজার উপর থেকে জমিদারদের অবাধ কর্তৃত্ব ক্রমশ হ্রাস পায়, ভূমিতে প্রজার অধিকার ধীরে ধীরে স্বীকৃত হয়। ইতিহাস গ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস,রূপকথায়, কাহিনী আখ্যাণে আমরা যেসব প্রবল প্রতাপশালী জমিদারী শোষণের চিত্র পাই। এ সময় থেকে ক্রমশ তা হ্রাস পেতে থাকে। শোষণকারী জমিদারদের নব প্রজন্মের শিক্ষিত জমিদাররা নিজেরাই সমাজপতি সেজে, নয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পৃষ্ঠপোষক সেজে প্রজা সমাজের নেতৃত্ব দিতে থাকে, নয়া সমাজ জাগরণেও কেউ কেউ অংশগ্রহণ করে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তা রক্ষনশীল জাগরণের ছদ্মাবরণে গতিশীল জাগরণের রাশ টেনে ধরে রাখে। এ সময়ে জমিদারদের জমিদারী কার্যক্রম পরিচালনার গতি প্রকৃতি, মানস পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম ও বৈশিষ্ট্য সমূহ গবেষণায় উঠে এসেছে।

অতঃপর গবেষণার দ্বিতীয় বৃহত্তর ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে ১৮৫০ সাল থেকে ১৯৩৮ সময়কাল। এপর্বের সূচনা কালকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে, ১৮৪৭ সালের আইনের প্রেক্ষিতে ১৮৪৮ সাল থেকে প্রথম আধুনিক ভূমি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।এর ফলে উক্ত সময় থেকে লোকায়ত সমাজ ও অর্থনীতির একটি চিত্র আমরা এ সময়ের জরিপ রিপোর্ট থেকে পাই। অপর পক্ষে এই দশকে সরকারের নানাবিধ নীতি ও কর্মকান্ড নয়া আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সূচনা করে, যা এ সময়কালের দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। রেভেনিউ সার্ভে বা খাস বন্দোবস্ত, মহকুমা প্রশাসন ব্যবস্থা এবং মধ্যবিত্তের উন্মেষের প্রেক্ষাপটে এ পর্বের গবেষণা হয়েছে।

গবেষণার তৃতীয় বৃহত্তর ক্ষেত্র ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু থেকে ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশের সময় পর্যন্ত। দেলদুয়ার জমিদারী চিরস্থায়ী

Dhaka University Institutional Repository

বন্দোবস্তের ওয়ারিশী আইনে সুষ্ঠু ভাবে বিকশিত বনেদি জমিদারী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব উক্ত জমিদারীতে জমিদারী উচ্ছেদ পর্যন্ত কিভাবে বহাল থাকে ? কি কি অভিঘাত ও নয়া বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে ? গবেষণায় তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট থেকে এ পর্বের সূচনা হয়েছে।

গবেষণার চতুর্থ বৃহত্তম প্রেক্ষাপট হচ্ছে ১৭৬১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। ফার্মিংগারের ফিফ্থ্ রিপোর্টে এ সময় থেকে আমরা প্রথম সরাসরি আতিয়া পরগনা ভিত্তিক বিস্তারিত ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার চিত্র পাই। অপর পক্ষে মীর কাশিমের ক্ষমতারোহন ও বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপটে জমিদারী ইতিহাস ও বাংলার জাতীয় ইতিহাস নয়া ধারার দিকে এগোতে থাকে। ১৯৫০ সালে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হলেও বাস্তবে জমিদারী উচ্ছেদ হয়নি। ১৯৫৬ সালে এসে যুক্তফ্রন্ট সরকার সামারী একুইজিশনের মাধ্যমে সকল জমিদারীগুলো অধিগ্রহণ করে এবং মামলা মোকাদ্দমার বেড়ী ডিঙ্গিয়ে, জমিদারদের ক্ষতিপুরণ প্রদানে কমিশন গঠন করে। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ক্ষতিপুরণ প্রদান সম্পন্ন করা, ভূমিহীনদের মাঝে ভুমি বন্টননীতি এবং সর্বোপরি নয়া ভূমি সংস্কার নীতি ও আদমশুমারি ১৯৬১ এর মাধ্যমে বাংলায় আবার নয়া আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যা গবেষণায় তুলে আনা হয়েছে।

গবেষণার পঞ্চম বৃহত্তম ক্ষেত্র ১৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে অধুনা ২০০০ খৃষ্টাব্দ। এ সময়ের আলোচনা শুধুমাত্র পারিবারিক ইতিহাস আলোচনায় সীমাবদ্ধ। ১৫০০ শতকের সূচনায় আদম শাহ কাশ্মীরিকে কেন্দ্র করে আমরা আতিয়া ও দক্ষিণ টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাসের বিস্তৃত তথ্য পেতে শুরু করি। অপর পক্ষে এই জমিদারী বংশের শিকড় সন্ধান করতে যেয়ে উক্ত সময়কাল থেকে এই বংশের পূর্বপুরুষ সংক্রান্ত পারিবারিক ইতিহাসের তথ্য উদ্ধার করা সম্তব হয়েছে। ১৫৭৫ থেকে ১৬১১ সাল পর্যন্ত মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের যুগে এই বংশের পূর্বপুরুষদের এতদাঞ্চলে আগমন এবং বাংলার বারভূঁইয়ার অন্যতম জমিদার ও শেষ স্বাধীন সংগ্রামী খ্যাত খাজা ওসমান খান লোহানীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মহুতির মধ্য দিয়ে এই পরিবারের সংগ্রামী ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুদীর্ঘ পাঁচশত বছর ব্যাপী ইতিহাসের নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে কিভাবে একটি বংশ টিকে থাকে সমাজ ও অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেয় এবং তিনশত বছর পর একই বংশের বংশধরগণ

Dhaka University Institutional Repository

কিভাবে ঐতিহ্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে, তা গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে পতিত জমিদারদের ভূমিকা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী নয়া আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জমিদার পরিবারগুলোর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৪ এহেন প্রেক্ষাপটে, কালপ্রবাহে, উক্ত গবেষণা যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছে; যে সকল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত তুলে ধরা প্রয়োজনঃ

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম উৎস হলো- আধুনিক কালে প্রকাশিত বইপত্র, গবেষণাগ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী, গেজেটিয়ার সংকলন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উৎস হলো- জমিদার পরিবারের বর্তমান জীবিত সর্বপ্রবীণ সদস্যদের সাক্ষাৎকার, তাদের থেকে প্রাপ্ত লিখিত ডকুমেন্ট, অপ্রকাশিত ডায়েরি, জমিদারী দলিল ও কাগজপত্র, নতুন তথ্যের উৎস সম্পর্কিত ধারণা এবং স্থানীয় প্রবীণদের মুখে প্রচলিত লোককাহিনী, উপকথা ইত্যাদি।

তৃতীয় উৎস হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্লেয়ার সেকশনে রক্ষিত পুরনো সার্ভে রিপোর্ট, সেন্সাস রিপোর্ট এবং দুস্প্রাপ্য সব পান্ডুলিপি ও পত্রিকা এবং মাইক্রোফিল্ম শাখার দুর্লভ সংগ্রহ সমূহ ন্যাশনাল আর্কাইভসে সংরক্ষিত জেলা রেকর্ডস তথা প্রশাসনিক চিঠিপত্র, সেক্রেটারিয়েট রেকর্ড তথা খাত ভিত্তিক প্রসিডিংস, এবং বিভাগীয় কমিশনার লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত সরকারী বহু দলিল ও গ্রন্থ, পার্লামেন্টারী পেপারস ও প্রসিডিংস সমূহ। সর্বোপরি ময়মনসিংহ জেলা সংরক্ষণ ঘর থেকে উদ্ধারকৃত পুরনো কাগজপত্র বিশেষত ১৮৫০ সালের আতিয়া পরগনার সার্ভে রিপোর্টের ভলিউম লাখেরাজ, জায়গীর প্রভৃতি সনদ সহ পাঠোদ্ধার করা যায়নি এমন সব কাগজপত্রের ভলিউম যা এখনো গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি।

চতুর্থ উৎস হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ন্যাশনাল আর্কাইভস ও কলকাতা লাইব্রেরী, যাদুঘর এবং দিল্লীর আর্কাইভস ও যাদুঘরে রক্ষিত দলিলপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল উৎস ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্য থেকে স্থান, কাল ও বিষয়গত সমন্বয় করে ক্ষেত্র নির্বাচন এবং উৎসের যথার্থতা, যৌক্তিকতা ও নির্ভূলতা প্রমাণের মাধ্যমে তথ্যের যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

আবার এ থেকে বিপরীত তথ্যের সূত্র ও উৎসসমূহ যাচাই, বিপরীত তথ্যের যৌগিক সমন্বয় করে তথ্যের অনুঘটিক বা অনুপঠিক সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় তথ্যের সংশ্লেষণ বা সমন্বয় করা হয়েছে।

সর্বশেষ ইতিবৃত্তমূলক, প্রমাণিক ও সমন্বয়মূলক, মনোসমীক্ষণ, পরিসংখ্যান গতভাবে ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর বানানরীতি অনুসরন করা হয়েছে। এভাবে উপরোক্ত শিরোনামে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

২. পারিবারিক জীবনধারায় দেলদুয়ার জমিদারীর উদ্ভব ও বিকাশ (১৫০০-২০০০ খৃঃ)

২.১ ঃ ভূমিকা ঃ টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার[১] বর্তমানে একটি থানা সদর। বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্বে ছিল একটি গ্রাম, শেষ পর্বে একটি ইউনিয়ন হয়েও ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন হলো আতিয়া[২]। পূর্বে ছিল মহকুমা সদর ও মফস্বল শহর, তার পূর্বে থানা সদর ও থানা চৌকি এবং প্রাচীন[৩] পরগনা ও ফৌজদারি কেন্দ্র হিসেবে ঐতিহাসিক গৌরব অর্জন করে আছে।

দেলদুয়ার খ্যাতি লাভ করেছে এতদাঞ্চলের খ্যাতিমান ও কীর্তিমান জমিদারদের জন্য। আর আতিয়া পীর বাবা আদম শাহ কাশ্মীরির ও পন্নী জমিদার পরিবারের স্মৃতির জন্য। দেলদুয়ার গ্রাম ও দেলদুয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা পাঠান বংশীয় চারান[৪] গ্রামের তালুকদার কামাল খান লোহানীর[৫] কন্যা রওশন খাতুন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, পূর্ব বাংলার বারভূঞা আমলের সর্বশেষ স্বাধীন দলপতি ময়মনসিংহ সিলেট অঞ্চলের জমিদার , দৌলম্বাপুর-নওকিজহিলের সর্বশেষ মুঘল- আফগান যুদ্ধে নিহত খাজা ওসমান খান লোহানী[৬] ছিলেন এই কামাল খান লোহানীর সপ্তম উর্ধ্বতন পুরুষ[৭]।

কিন্তু কামাল খান কিভাবে ওসমান খান লোহানীর বংশধর হলেন, কিভাবে চারানে জমিদারী লাভ করেন, কিভাবে পাঁচশত বছরের নানা ঝড়ঝঞ্ঝায় বর্তমান পর্যন্ত টিকে আছে এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় ঘটনা প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা নিঃসন্দেহে গবেষণার দাবী রাখে।

বিশেষত নবাবি আমলের নয়া রাজস্বনীতি এবং ইংরেজ কোম্পানি ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূর্যাস্ত আইনে যেখান প্রায় সব প্রাচীন ও বনেদি জমিদার পরিবার তাদের জমিদারী হারিয়ে ইতিহাস থেকে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, সেখানে দেলদুয়ার আতিয়ার জমিদারগণ শত ঝড়ঝাপটায় শুধু পারিবারিক ঐতিহ্য, বংশধারা ও জমিদারীই টিকে রাখেননি বরং বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং অদ্যাবধি রেখে যাচ্ছে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে এই জমিদারদের বহুমুখী জীবন ধারা বিশ্লেষণের ঐতিহাসিক দাবী রাখে।

২.২ পাঁচশত বছরের (১৫০০-২০০০) পারিবারিক ইতিহাসের শিকড় সন্ধানঃ বারভূঁইয়া নেতা ওসমান খান লোহানীর বংশ ধারার বিকাশ

দেলদুয়ারের জমিদার ও তাদের বর্তমান বংশধরগণ গজনবী ও সৈয়দ প্রধানতঃ এই দুটি বংশধারায় বিভক্ত। ষোড়শ শতকে এতদাঞ্চলের ঘটনা প্রবাহে জড়িয়ে আছে দুজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আতিয়া পরগনার শাহানশাহ বাবা শাহ আদম কাশ্মীরি (রাঃ)[৯], সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওস্তাদ ও মকীমপুর পরগনার শাহ সৈয়দ আদম হিন্দী(রঃ)[১০] এবং তিন জন মুসলিম শাসক যথাক্রমে ঈসা খাঁ মসনদে আলা, সৈয়দ খান পন্নী ও ওসমান খান লোহানী। এদের মধ্যে ঈসা খাঁ রক্তে বংশে বাঙ্গালী ছিলেন[১১]। বাকী দু'জন আফগান পাঠান বংশীয়[১২] হলেও এদেশীয় মাটি ও জাতীয়তায় মিশে গিয়েছেন। বাংলার পাঁচশত বছরের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ধারায় তাদের বংশ ধারা আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও এক সময়ের এতদাঞ্চলের গৌরবময় ধারাটি যোগ্য বংশধরের অভাবে স্মৃতি হয়ে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছে[১৩]। যদিও ক্ষীন বংশধারা আজো বহমান। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় ধারাদ্বয় দুশো বছর বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে শেষ দুশো বছরে আবার যোগ্য বংশধারার সুবাদে বাংলা ও সর্বভারতীয় ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। গৌরবময় এই দুটি ধারা আবার দেলদুয়ারে এসে একটি ধারায় মিলিত হয়েছে। অর্থাৎ রক্তে ও বংশে দেলদুয়ার জমিদারগণ পাঠান ওসমান খান লোহানী ও সৈয়দ আদম হিন্দি(রঃ) এর বংশধারা হলেও এবংশের মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের[১৪] সুবাদে আতিয়া পরগনার চার আনা জমিদারী লাভ করেন। রওশন খাতুন অল্প বয়সে বিধবা হলে আতিয়া পরগনা জমিদারীর ছোট তরফের আট আনা ও মূল পরগনার চার আনা জমিদারী লাভ করে আতিয়া গ্রামেরই পার্শ্ববর্তী গ্রাম দেলদুয়ারে এসে বসতবাটি নির্মাণ করে বিশাল জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন[১৫]। সময়ের বিবর্তনে উক্ত জমিদারী আবার বিভিন্ন সময়ে হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসেবে মামলার সুবাদে বাংলার জমিদারী উচ্ছেদ হওয়ার পরেও এক দশক পর্যন্ত নামে মাত্র (খাজনা ও দখলী স্বত্ববিহীন) টিকে থাকে। অদ্যাবধি দেলদুয়ার জমিদারীর বর্তমান প্রজন্ম বাংলার অন্যান্য জমিদারদের তুলনায় শিক্ষা, পেশা ও সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক ভাল অবস্থানে রয়েছে।

বংশধারা প্রমাণঃ টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থ সমূহ এবং আবদুল করিম গজনবী ও আবদুল হালিম গজনবীর নবাব ও স্যার উপাধি প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সমকালীন বিভিন্ন প্রকাশনা উৎসে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করা হয় কিন্তু কোথাও তাদের বিস্তারিত বংশ পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। টাঙ্গাইলের

ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা খন্দকার আবদুর রহিম কেবলমাত্র প্রদত্ত বংশ তালিকায় তাদের পূর্ব পুরুষ হিসেবে চারানের জমিদার কামাল খান পর্যন্ত বংশধারার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কামাল খান কিভাবে, কোথায় থেকে চারানে জমিদারী বা তালুকদারী লাভ করেন? সে সম্পর্কে কোন তথ্য বা সূত্র উল্লেখ করেন নি। সম্ভবতঃ এই সব গ্রন্থ গবেষণাধর্মী ইতিহাস গ্রন্থ না হয়ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণধর্মী ইতিহাস গ্রন্থ হওয়ায় খোন্দকার আবদুর রহিম এ সংক্রান্ত গবেষণায় আগ্রহী হননি। তবে এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য প্রদান করেন এম আবদুল্লাহ। ইতিহাসের ছাত্র শিক্ষক না হয়েও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উৎসাহে তিনি সমকালীন মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও তাদের অবদানের উপর অসংখ্য গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাতে আবদুল করিম গজনবীর উপর গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করতে যেয়ে তিনি উল্লেখ করেন " গজনবী ভ্রাতৃদ্বয় এই জমিদারী তাদের পূর্ব পুরুষ ফতেহদাদ খান গজনীন লোহানীর নিকট থেকে পর্যায়ক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। ফতেহদাদ খান তদানীন্তন ময়মনসিংহ এলাকার সর্বশেষ স্বাধীন দলপতি ওসমান খান গজনীন লোহানীর ভাই ছিলেন। এই বংশের পুর্ব পুরুষেরা খুব সম্ভব আফগানিস্তানের গজনী থেকে এসেছিলেন, তাই এরা "গজনবী" নামে অভিহিত হন"[১৬]। নরেশ কুমার জৈন সম্পাদিত "মুসলিম ইন ইন্ডিয়া" গ্রন্থে এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়[১৭]। কিন্তু কোথাও পূর্ণ বংশ তালিকা কিংবা ধারাবাহিক তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই তথ্য স্বল্পতা বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই জমিদারী ও জমিদার সংক্রান্ত তথ্যের অভাবের একটি মৌলিক কারণ হচ্ছে আতিয়া পরগনা ও দেলদুয়ার জমিদারীর ভৌগোলিক অবস্থান। এই পরগনার জমিদারী কখনো রাজশাহী কালেক্টরেটের অধীনে, কখনো ভুলুয়া কালেক্টরেটের অধীনে, কখনো ঢাকা জেলা কালেক্টরেটের অধীনে, আবার কখনো ময়মনসিংহ জেলা কালেক্টরেটের অধীনে ছিল। মূল জমিদারী আতিয়া - দেলদুয়ার থেকে সদর মহকুমা বর্তমান টাঙ্গাইল শহরে স্থানান্তরের ফলে ইতিহাসে তথ্যের ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্থ হয়েছে কিংবা তথ্য প্রদানকারীদের নিকট এতদাঞ্চল অবহেলিত থেকেছে। পারিবারিক সংগ্রহে যা কিছু তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে সে সম্ভাবনাও বিনষ্ট হয়ে গেছে।

আলোচ্য নিবন্ধের গবেষক ঔপনিবেশিক আমলের পূর্ববাংলা অঞ্চল ও আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে তিনটি পরিবারের বিশেষ অবদান লক্ষ্য করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম ধারা হচ্ছে ঢাকার নবাব পরিবার, দ্বিতীয়তঃ ধনবাড়ী ও বগুড়ার নবাব পরিবার এবং তৃতীয় ও ব্যতিক্রমী ধারার

অবদান রাখেন দেলদুয়ারের জমিদার ও গজনবী পরিবার। এই ব্যতিক্রমী ধারা লক্ষ্য করে গবেষক এই জমিদার বংশ এবং তাদের জমিদারী অঞ্চল দেলদুয়ার ও দক্ষিণ টাঙ্গাইলের উপর গবেষণায় বিশেষ আগ্রহী হয়েছেন। এই আগ্রহের সূত্র ধরে এই জমিদার বংশের শিকড় সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। জমিদার বংশের প্রধান ধারার প্রধান উত্তরসূরী খোদাদাদ খান গজনবীর সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং জমিদারীতে রক্ষিত সম্পদের একমাত্র ওয়াক্ফ রেজিষ্ট্রি দলিল পাঠ করতে যেয়ে দেলদুয়ার জমিদারীর একটি পূর্ণাঙ্গ বংশ তালিকা পাওয়া যায়। যা ১৯৩৬ সালে স্বয়ং আবদুল করিম গজনবী স্বাক্ষরিত এবং রেজিষ্ট্রি দফতরের সীল মোহরকৃত[১৬]। এতে নরেশ কুমার ও আবদুল্লাহর তথ্যের সমর্থন মেলে এবং সে সাথে পূর্ণ ও ধারাবাহিক বংশ ধারা এবং পারিবারিক জীবন চিত্র পাওয়া যায়।

কিন্তু এই তথ্য কতটুকু ঐতিহাসিক ও বস্তুনিষ্ঠ এবং কতটুকু মিথ্যা তা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। আলোচ্য নিবন্ধে এই বিশ্লেষন করে দেলদুয়ার জমিদারদের সঠিক শিকড় সন্ধান ও বস্তুনিষ্ঠ বংশ বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সমকালীন জমিদারী ইতিহাসে অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম শতকে অনেক বেনিয়া, মুৎসুদ্দির মধ্যে নয়া জমিদারী ক্রয়, নিজেদের কাল্পনিক অভিজাত বংশীয় বলে দাবী ও নয়া উপাধি গ্রহণ করে নিজেদের অভিজাত প্রমাণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আদি ও বনেদি মুসলমান এবং পরগনা ও জায়গীর সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারদের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য প্রযোজ্য নয়। ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বিতীয় শতকে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনায় কৃত আদমশুমারি রিপোর্ট সমূহের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, এ সময়ে প্রচুর পরিবার নিজেদের বংশ পরিবর্তন ও নতুন উপাধি গ্রহণের জন্য আবেদন জানায়; অধিকাংশ আবেদন গৃহীত হয়[১৭]। তাছাড়া জমিদারদের বিশেষতঃ মুসলমান জমিদারদের আফগান-তুর্কী- ইরান -আরবের কোন বংশের কিংবা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বংশের সাথে নিজেদের যোগসূত্র আবিষ্কারের মানসিক প্রবণতার কথা অনেক গবেষক ও লেখক উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উপরোক্ত তথ্য সমূহকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা ও তথ্যসূত্র সমূহ গুরুত্বপূর্ণ। এতে পূর্বোক্তি লেখকদ্বয়ের তথ্যে আংশিক ভ্রান্তিরও অপনোদন হবে। এক্ষেত্রে তিনটি তথ্য সূত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ বারোভুঁঞা ও বাংলায় মোগল-আফগান দ্বন্দ্ব এবং প্রাথমিক মোগল আমলের এতদাঞ্চলের ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কৃত মুঘল সেনাধ্যক্ষ মির্জা নাথান রচিত ' বাহরিস্তান-ই-গায়বী'র ১ম ও ২য় খন্ড। এতে ওসমান খান লোহানী ও ইসলাম খানের মধ্যেকার

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ এবং অন্যান্য বিবরণ রয়েছে। আবদুল করিম গজনবী প্রণীত বংশ তালিকায় নরেশ কুমার ও এম আবদুল্লাহর বিবরণে ফতেহদাদ খান গজনীন লোহানীকে ওসমান খান লোহানীর ভ্রাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাহারীস্তান-ই গায়বীতে মির্জা নাথান খাজা ওসমানের চার ভ্রাতার কথা বলেছেন[২০]। যাদের মধ্যে ফতেহদাদ খান গজনীন লোহানী নামে কোন ভ্রাতার নাম নেই। আবদুল করিম গজনবীর তালিকায় চার ভ্রাতার উল্লেখ থাকলেও দ্বিতীয় ভ্রাতা খাজা মালহি খান গজনীন লোহানীর নাম উল্লেখ নেই। যাকে ওসমান খান লোহানী তার মৃত্যুর পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। উক্ত বিবরণে সমকালে দু'জন ফতেহ খানের নাম পাওয় যায়[২১]। একজন ওসমানের মনসবদার আমলা বা সেনাপতি ছিলেন। আরেকজন রাজা পরীক্ষিতের এক সম্ভ্রান্তের আত্মীয় ও কোচ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। আবার ওসমানের দ্বিতীয় ভ্রাতা, পরবর্তীতে নির্বাচিত দলপতি খাজা মালহী খানের পুত্র ছিলেন ফতেহদাদ খান গজনীন লোহানী[২২]।

ওসমানের নিহত হওয়ার পর তৎকালীন নিয়মানুযায়ী পরাজিত পক্ষের জহরব্রত পালনের নিয়ম অনুযায়ী ওসমানের স্ত্রী ও সন্তানদের আফগান সারহাঙ্গ কর্তৃক হত্যা করা হয়। তবে তার এক কন্যার সাথে ভ্রাতুষ্পুত্র ও অন্যতম সাহসী যোদ্ধা ফতেহদাদ খান লোহানীর বিয়ের পূর্ব প্রস্তাব থাকায় উক্ত কন্যাকে হত্যার পরিবর্তে খোদাদাদ খান লোহানীর সাথে বিয়ে দেয়া হয়[২৩]। বাহরীস্তান-ই-গায়বীর বর্ণনা অনুযায়ী দেলদুয়ারের গজনবীদের পুর্বপুরুষ ফতেহদাদ খান গজনীন লোহানী ওসমানের ভ্রাতা নয় বরং ভ্রাতুষ্পুত্র; যিনি পরবর্তীতে ওসমানের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে জামাতা হন। মির্জা নাথান ফতেহদাদ খানের স্থলে দাউদ খান উল্লেখ করে ভুল করে থাকতে পারেন। আবার আবদুল করিম গজনবী, লেখক, গবেষকগণ দাউদ খান গজনীন লোহানীর স্থলে ভুলক্রমে ফতেহ দাদ খান লোহানী উল্লেখ করে থাকতে পারেন। দ্বিতীয় ভূলটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী কেননা তখনো বাহরিস্তান-ই-গায়বী গ্রন্থ তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়নি। কাজেই গজনবীদের পূর্বপুরুষ ফতেহদাদ খান গজনীন লোহানী বা দাউদ খান গজনীন লোহানী হওয়াই বস্তুনিষ্ঠ বলে আমি মনে করি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে চারানের জমিদার (তালুকদার) কামাল খাঁন যে ফতেহদাদ খান বা দাউদ খান গজনীন লোহানীর বংশধর তার প্রমাণ কি ? বাহরিস্তানের বিবরণ অনুযায়ী ওসমান খান লোহানীর উজির

Dhaka University Institutional Repository

ও সেনাপতি ওয়ালি মেন্দুখেলের সহায়তায় ওসমানের ছোট ও পঞ্চম ভাই খাজা ওয়ালি খান লোহানী কর্তৃক ওসমানের মনোনয়ন (দ্বিতীয় ভ্রাতা খাজা ওয়ালির নেতৃত্ব) অস্বীকার করে নিজে নেতৃত্ব গ্রহণ করে, এতে আফগান সর্দারদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়[১৪]। ফলে ওসমানের ন্যায় মোগল প্রতিরোধ ধারা অব্যাহত রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন উৎসর্গের নীতির পরিবর্তে তারা আন্তঃ বিরোধে লিপ্ত হয় এবং পরিশেষে বাধ্য হয়ে মিত্রগণসহ মুঘল বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে। মির্জা নাথান ও অন্যান্য সমর নায়ক কর্তৃক সকল আফগান সর্দার ও ওসমানের আত্মীয় স্বজনদের প্রথমে জাহাঙ্গীরনগরে সুবাদার ইসলাম খানের দরবারে আনা হয়। কিছুদিন পর চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সম্রাট জাহাঙ্গীরের দিল্লীর শাহী দরবারে প্রেরণ করা হয়[১৫]। অতঃপর সেখানে তাদের বন্দী, হত্যা কিংবা ক্ষমা করে কোন যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে প্রেরণ অথবা ময়মনসিংহ- সিলেট অঞ্চলে জায়গীর বা জমিদারী প্রদান করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া সমূহের ঠিক কোনটি তাদের ক্ষেত্রে করা হয়েছে এসংক্রান্ত কোন তথ্য আঞ্চলিক কিংবা জাতীয় ইতিহাসের কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না।

তবে অধুনা স্বীকৃত সমকালীন সময়ের গতিধারার উপর মনো-সমীক্ষন পদ্ধতি ও নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে আমরা এ সম্পর্কে একটি ধারনা বা সিদ্ধান্তে আসতে পারি। যেহেতু ওসমানের ভ্রাতা ও ভ্রাতুস্পুত্র এবং আফগান সর্দারগণ আত্মসমর্পন করে, সেহেতু সমকালীন সমরনীতি অনুযায়ী এবং সমকালীন অন্যান্য বারোভূঁয়াদের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতি পর্যালোচনা করলে এই ধারণা স্বাভাবিক যে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাদের ক্ষমা করে ময়মনসিংহ -সিলেট অঞ্চলে শর্ত সাপেক্ষে জায়গীর প্রদান করে থাকবেন। যদিও এতদসম্পর্কে সমকালীন ইতিহাস নিরব। তবে ওসমানের আফগান সারহাঙ্গদের অনেকের নাম পাওয়া যায় ইসলাম খান কর্তৃক কোচ-কামতা-কামরুপ ও রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমুহে। এদের মধ্যে তাজ খান, দরিয়া খান, জামাল খান, মেন্দুখান প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য[১৬]।

দ্বিতীয়তঃ ১৮৭০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রণীত গ্রন্থ, সরকারী পরিসংখ্যান, জরিপ রিপোর্ট, সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, আদমশুমারি ও অন্যান্য রিপোর্ট সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ময়মনসিংহ -সিলেট অঞ্চলে আদি পাঠান বংশীয় প্রধানতঃ খান, লোহানী, খাজা, গজনবী উপাধিধারীর সংখ্যা অনেক বেশী। ডব্লিউ, হান্টারের 'ময়মনসিংহ ও অন্যান্য জেলা পরিসংখ্যান রিপোর্ট', খোন্দকার ফজলে রাব্বীর "দ্যা অরিজিন অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল" গ্রন্থ এফ. এ. সাকচীর

পরিসংখ্যান, গেজিটিয়ার ও ময়মনসিংহ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, কেদারনাথ মজুমদারের ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণে সমকালীন সরকারী রিপোর্ট সমূহের সত্যতা প্রমাণ করে। টাঙ্গাইলের ইতিহাসের তথ্য সংগ্রাহক আবদুল করিম মোক্তার তার ''তরফ গোরাঙ্গীর ইতিহাস'' গ্রন্থে টাঙ্গাইলের একটি গ্রামের অসংখ্য পাঠান বংশের পরিবারের বংশ বিবরণ তুলে ধরেছেন [১৭]। টাঙ্গাইল অঞ্চলের অপর একনিষ্ঠ গবেষক মোফাখখারুল ইসলাম বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে জেলা টাঙ্গাইলের যে সকল তথ্য দিয়েছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো- ওসমান খান লোহানীর পরাজয়ে ও তার বংশধরদের আত্মসমর্পনের পর বহু আফগান নায়ক কর্তৃক টাঙ্গাইল অঞ্চলে আতিয়া ও পুখুরিয়া পরগনার পাঠান বংশীয় জমিদারদের অধীনে আশ্রয় গ্রহণ করেন[১৮]। ওসমান খান লোহানীর বংশধর বলে দাবীদার জনৈক হাবিবুর রহমান খান লোহানী প্রণীত ''সুলতান মাহমুদ শাহ বাহার খান ও দুদ বেগম'' গ্রন্থে লোহানী বংশের পরিচয় এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে লোহানী বংশধরদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার তথ্য প্রদান করেছেন[১৯]। কাজেই চারানের কামাল খানের পাঠান ও ওসমান খান লোহানীর বংশধর হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তদুপরি কামাল খান যে সময়ে জমিদারী পরিচালনা করেন তখনো ইংরেজ কোম্পানি শাসন সরাসরি শুরু হয়নি। নয়া উপাধি গ্রহণের যে প্রবণতা তা পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সমকালীন প্রজন্মের ক্ষেত্রে নয়।

তৃতীয়তঃ ঈসা খান ও তার বংশধর এবং সমকালীন অন্যান্য বাঙ্গালী জমিদারদের শারিরীক গড়ন ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে একথা সহজেই প্রমাণিত হবে যে দেলদুয়ারের গজনবীগণ কোনক্রমেই মিশ্র ধারার নয় বরং পাঠান ও অবিমিশ্র নৃতাত্ত্বিক গঠনের অধিকারী।

এসব বিশ্লেষণ কামাল খানের প্রকৃত পাঠান বংশীয় হওয়া ও ওসমান খান লোহানীর বংশধর হওয়ার ধারনাকেই স্বতসিদ্ধ করে।

২.৩ ঃ আতিয়া পরগনা ও পন্নী জমিদারী থেকে দেলদুয়ার জমিদারীর উৎপত্তি ও বিকাশ ধারাঃ

আতিয়া অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্বের কারণে সম্ভবতঃ সুলতানি, মুঘল ও বৃটিশ যুগে আতিয়া অঞ্চল বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রাণ কেন্দ্র ছিল[৩০]। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেন, 'সম্ভবত সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজের (দেহলভী) রাজত্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বর্তমান কালের ময়মনসিংহ জেলায় মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠা'' [৩১]। কাজেই ১৩০১ থেকে ১৩১২ সালে কোন এক সময়ে আতিয়া পরগনা ও টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চল মুসলমান শাসনাধীনে আসে[৩২]। সমগ্র সুলতানী আমলে এতদাঞ্চল প্রথমে ইকতা অতঃপর ইকলিম গিয়াসপুর এবং পরে সোনারগাঁয়ের অধীনে তকসীক বা মুলুক হিসেবে অভিহিত ছিল। হোসেন শাহী আমলে নুতন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে নুসরত শাহী শিকের অধীনে এটি একটি মহাল হিসেবে অভিহিত হয়[৩৩]। মুঘল বন্দোবস্তে নয়া প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির আওতায় কখনো সোনারগাঁও সরকারের অধীনে এবং কখনো বাজুহা সরকারের অধীনে পরগনা বা জমিদারী মহাল হিসেবে পরিচিত হয়[৩৪]। হোসেন শাহী আমলের পূর্বপর্যন্ত আতিয়ার কোন সুনির্দিষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। হোসেন শাহী আমলে পশ্চিম (উত্তর ভারত) থেকে এতদাঞ্চলে আগত বাবা শাহান শাহ উপাধি প্রাপ্ত আদম কাশ্মীরি (রঃ) কে কেন্দ্র করে আতিয়া অঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। যার খুব কম অংশই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃত, অধিকাংশই লোক মুখের মিথ বলে ধারনা করা হয়। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় কিছু বস্তুনিষ্ঠ জীবন ইতিহাস উদঘাটিত হচ্ছে।

খোন্দকার আব্দুর রহিম 'টাঙ্গাইলের ইতিহাস' গ্রন্থে নিজাম উদ্দীন মোক্তার কর্তৃক কেদারনাথ মজুমদারের হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও জনশ্রুতির উদ্ধৃতি দিয়ে আতিয়া-কাগমারী অঞ্চল তথা টাঙ্গাইলের পারিবারিক ইতিহাস উদ্ধার করেন। তার মতে- ''১৫৮০ সনে শাহ আদম কাশ্মীরি বাংলায় আসেন আটাশ বছর বয়সে (অন্যত্র বলেছেন আটান্ন বছর বয়সে)। সাথে ছিল বার বছর বয়সী ভাগ্নে শাহজামান। এই সময় যুমনা ছিল বর্তমানের ন্যায় দশ বারো মাইল বিস্তৃত বিশাল নদী। এই নদী সিকস্তি চরাঞ্চল ছিল আতিয়া। তিনি এখানে একটি বাজার কে কেন্দ্র করে উঠা গ্রামে নতুন বটগাছের ছায়ায় একখানা কুড়ে ঘর নির্মাণ করে আস্থানা বা খানকা স্থাপন করেন। এ সময় রাজমহলে মোগল বিদ্রোহ দেখা দেয়। সুবাদার হোসেন কুলী খানের (১৫৭৬-১৫৭৮) একটি অশ্বারোহী সৈন্যদলের নেতা বায়েজিদ খান পন্নী। নুতন সুবাদার মুজাফফর খান তুরবাতি (১৫৭৮-৮০) বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হলে

সরকারী অনুগত মোগল সৈন্যরা বিভিন্ন দিকে প্রাণ ভয়ে পালায়ন করে। বায়েজিদ খান পন্নী যমুনা পাড়ি দিয়ে এতদাঞ্চলে এসে ঘটনাক্রমে এক বাঙালী গৃহস্ত ঘরে আশ্রয় নেয় এবং গৃহস্তের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করে" [৩৪] ।

খোন্দকার রহিমের মতে, " রাজমহলে বিদ্রোহ দমন ও মোগল কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে বায়েজিদ খান পন্নী এক বছরের শিশু সন্তানকে বাবা আদম শাহ কাশ্মীরির তত্ত্বাবধানে রেখে ভাগ্যান্বেষণে পুনরায় রাজমহলে ফিরে যান। এই শিশু সন্তানকে আদম শাহ কাশ্মীরি পিতৃস্নেহে পালন করেন। এদিকে ১৫৯৮ সালে বাংলার বারোভূঁঞা নেতা ঈসা খান মোগল সেনাপতি মানসিংহের বন্ধুত্বের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে দিল্লী থেকে মসনদে আলা উপাধি ও ২২ পরগনার শাসন কর্তৃত্ব নিয়ে সোনারগাঁয়ে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন পরগনায় নতুন শাসক নিয়োগ করেন। আতিয়া পরগনায় শাসক হিসেবে এতদাঞ্চলের বুজর্গ ও পীর আদম শাহ কাশ্মীরিকে নিয়োগ করেন" । এ তথ্য ঐতিহাসিক ভাবে সঠিক নয়, কেননা আদমশাহ কাশ্মীরির মাজারে প্রাপ্ত শিলালিপি মতে প্রমাণ হয় যে, প্রায় শত বছর পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন[৩৬] ।

খোন্দকার রহিমের মতে, " অতঃপর ১৬০৮ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক ইসলাম খান সুবাদার হয়ে রাজমহল থেকে ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগর নাম করণ করেন) রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং নয়া পরগনা বন্দোবস্তের জন্য জাহাঙ্গীর নগর দরবারে আদম শাহ কাশ্মীরিকে ডেকে পাঠান। আদম কাশ্মীরির বয়স তখন ৮৮ বছর। তিনি আতিয়া পরগনাকে আতিয়া ও কাগমারী দুটো পরগনায় বিভক্ত করে যথাক্রমে তার পালিত পুত্র সাঈদ খান পন্নীকে আতিয়া -পরগনায় ও ভাগ্নে শাহজামানকে কাগমারী পরগনায় শাসক নিযুক্ত করার অনুরোধ করেন। ইসলাম খান তার সুপারিশ অনুমোদন করেন। এভাবে বায়েজিদ খান পন্নীর পুত্র সাঈদ খান পন্নী আতিয়া পরগনার শাসন বা বাংলার জমিদারী লাভ করেন" [৩৭] । এ তথ্যও সঠিক নয়, কেননা সাঈদ খান ততদিনে বড় হয়ে মানসিংহের সহকারী মনসবদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০১ সালেই মানসিংহের কাছ থেকে আতিয়া শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৬০৮ সালে তিনি ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের স্মৃতি রক্ষার্থে ও স্বীয় আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ আতিয়ায় একটি মসজিদ নির্মান করেন[৩৮] । উক্ত পন্নী পরিবার বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়েও সমগ্র মোগল, নবাবী ও ইংরেজ আমলে, এমনকি জমিদারী উচ্ছেদ পর্যন্ত টিকে থাকে। বাংলার জমিদারী ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ীত্বের দিক থেকে এটিই সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম জমিদারী।

উল্লেখ্য কামাল খান লোহানীর চারান গ্রামের জমিদারী উক্ত আতিয়া পরগনার অধীনে একটি ক্ষুদে জমিদারী বা তালুক ছিল। সম্ভবতঃ সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক অন্যান্য আত্মসমর্পণকারী জমিদারদের ন্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ওসমান খান লোহাদীর ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা ফতেহদাদ খান লোহানী বা লোহানী পরিবারকে এতদাঞ্চলে কোন জায়গীর দিয়ে থাকবেন। অথবা স্বয়ং সাঈদ খান পন্নী সুবেদারের অনুমতিক্রমে পাঠান বংশীয় হিসেবে লোহানীদেরকে কোন নিষ্কর বা জায়গীর প্রদান করে থাকবেন[৩৯]। আহমদ হাসান দানি, আবদুল করিম ও আ: ক.ম. জাকারিয়া প্রমুখের বিবরণ মতে, আতিয়ার শাহ বাবা আদম কাশ্মীরির সমাধিতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে তার মৃত্যুর সুস্পষ্ট সন তারিখ হচ্ছে ৯১৩ হিজরী ৭ই জমাদিউস সানি (১৫০৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খন্দকার রহিম আদম কাশ্মীরি সম্পর্কে অপ্রকাশিত রচনা ও জনশ্রুতি থেকে যে সব তথ্য দিয়েছেন তার কিয়দংশ সঠিক হলেও বর্ণিত সময়কাল সঠিক হতে পারে না কেননা একটি ঘটনার সাথে অপর ঘটনার শতবর্ষ ব্যবধান। এই বিবরণ মেনে নিলে ১৬০১ কিংবা ১৬০৮ সালে সাঈদ খান পন্নী আদম কাশ্মীরির পালিত পুত্র হওয়ার কিংবা শাহজামান তার ভাগিনে হওয়ার তথ্য সঠিক হতে পারে না, তদুপরি পরগনা প্রশাসন ব্যবস্থার উৎপত্তি তখনো হয়নি। কাজেই সম্ভবত আদম শাহ কাশ্মীরি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৮) কর্তৃক কাগমারী আতিয়া সমন্বিত মহাল বা অঞ্চলের শাসক ও একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন।

সাঈদ খান পন্নী ও শাহ জামানের সময়কাল (১৬০১/ ১৬০৮) সঠিক বলে ধরে নেয়া হলে তাদের বংশ পরিচয়, এতদাঞ্চলে আগমন কিংবা পরগনা শাসন ক্ষমতা লাভের পটভূমি নতুন তাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। শাহ জামানের পরিচয় সম্পর্কে বিকল্প কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে শাহ জামান বাবা আদম কাশ্মীরির মত পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত ধর্মপ্রচারকারী কোন বুজুর্গ ব্যক্তি, অথবা আদম কাশ্মীরির কোন বংশধর বা আত্মীয়। ইসলাম খান নিজে পীর বংশীয় ধার্মিক মানুষ ছিলেন বলে একজন পীর বুজর্গকে পেয়ে তার উপরই পরগনা শাসনভার অর্পণ করেন।

পক্ষান্তরে সাঈদ খান পন্নীর পিতৃ বা বংশ পরিচয় সম্পর্কে বিকল্প তথ্য পাওয়া যায়। রসিক লাল বসু ও কেদার নাথ মজুমদার কর্তৃক "কোহস্তানে ঢাকা"[৪০] এর ইতিহাস ও প্রবাদ উদ্ধৃত করে দেয়া বিবরণ এই যে, পশ্চিম দিকে মোগল আবির্ভাবের সীমা বাংলার রাজধানী তান্ডার নিকটবর্তী বলে সোলায়মান কররানী দূরবর্তী মধুপুর গড় অরন্য অঞ্চলে বিকল্প রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বায়েজিদ খান কররানীকে এতদাঞ্চলের শাসন ভার অর্পণ করেন। বায়েজিদ কররানী গোবিন্দপুর শহরে বসতবাটি নির্মান করে এখান থেকে পূর্বাঞ্চলে কোচ ও সামন্তরাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শহর গোবিন্দপুরের পাশে বর্তমান 'কররানী চালা' গ্রাম এই তথ্যের যথার্থতা প্রমাণ করে[৪১]। তার পাশের শহর গোবিন্দপুর এককালের সমৃদ্ধ নগর ছিল এবং তারই পাশে কররানীর চালায় বায়েজিদ কররানী বসত বাটি নির্মাণ করেন, তার ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। নিরক্ষর পাহাড়বাসী লোকে উহাকে বাইজখাঁ (বায়েজীদ খাঁ) রাজার বাড়ী বলে ...। বায়েজিদ খাঁ পরে গড়ের আবাস পরিত্যাগ করে 'ভরে' আগমন করেন এবং বর্তমান টাঙ্গাইল মহকুমার অদূরে স্বনামে বায়েজিদপুর গ্রাম স্থাপন করে আবাস বাটি নির্মাণ করেন। লোকে উহাকে বাইজ খাঁ চৌধুরীর বাড়ী বলে[৪২]। কররানীর চালায় বসত বাটি নির্মাণ বা অবস্থান কালে বায়েজিদ খান পন্নী গোবিন্দপুর রায় নারায়ন গড়গড়ির সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই ব্রাহ্মন পত্নীর গর্ভে বায়েজিদের এক পুত্র সাঈদ খাঁ এর জন্ম হয়[৪৩]। বায়েজিদ পিতার নির্দেশে উড়িষ্যা অভিযানের লক্ষ্যে রাজধানী তান্ডায় গমনকালে স্বীয় পুত্র ও মাতাকে বায়েজিদপুরে রেখে যান। পরবর্তীতে গৌড়ে রাষ্ট্র বিপ্লবের ঝঞ্ঝায় বায়েজিদ নিহত হন"।

এতদাঞ্চলের উপর আধুনিক গবেষণাকারী মুফাখখারুল ইসলাম সাঈদ খান পন্নীর পরিচয় সংক্রান্ত উপরোক্ত উভয় তথ্য আংশিক স্বীকার ও কিয়দংশ সন্দেহ প্রকাশ করে নতুন তথ্য প্রদান করেছেন। তার মতে সাঈদ খান পন্নী সুলতান বায়েজিদ খান কররানীর পুত্র হলে তাদের গৌরবজনক কররানী পদবী ব্যবহার না করে পন্নী' পদবী ব্যবহার করলেন কেন[৪৪]? মনোসমীক্ষন বিশ্লেষণে এর উত্তর হতে পারে, সম্ভবত কররানীদের পতনে মুঘল আক্রোশ থেকে রক্ষার জন্য স্বভাবতই নতুন পদবী ব্যবহার করে থাকতে পারেন অথবা সাইদ খান পন্নী এতদাঞ্চলে বায়েজিদ খান পন্নী নামে অপর কোন মুঘল বা আফগান সৈনিকের পুত্র হতে পারে। যে নিজ গুনে মুঘল সুবাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন এবং পরগনা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। মির্জা নাথান সিতাব খাঁ রচিত এ সময়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থ বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে বিক্রমপুর এলাকার মুঘলপক্ষীয় এক সৈনিক বায়েজিদ খাঁ পন্নীর নাম পাওয়া যায়[৪৫]।

মুফাখখারুল ইসলাম আকবরনামা'র উদ্ধৃতি দিয়ে সাঈদ খান পন্নীর শাসন লাভের সময়কাল নিয়েও নতুন একটি তথ্য পেশ করেন। সুবাদার মানসিংহ কর্তৃক ১৬০১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ভাটির ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শেরপুর ও আতিয়ার মধ্যস্থিত যুদ্ধে মানসিংহের সহকারী মনসবদার ছিলেন সাঈদ খান পন্নী[৪৬]। শেরপুর- আতিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করে মানসিংহ সাঈদ খানকে আতিয়া এলাকার শাসক নিযুক্ত করে শেরপুরের দিকে অগ্রসর হন। ইসলাম খানের সময়ে তিনি স্থায়ীভাবে পরগনা শাসক নিযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হলে শতবছর পূর্বের বাবা আদম কাশ্মীরির স্মৃতিধন্য আতিয়ায় তুর্ক-মুঘল মিশ্র পদ্ধতিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মুফাখখারুল ইসলামের উক্ত বিবরণ অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় সাঈদ খান পন্নী ১৬০৮/৯ সন নয়, ১৬০১ সনেই আতিয়া পরগনার শাসক নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য সমসাময়িক কালে বানিয়ারা এবং চারান গ্রামে দুটি পরিবার দুটি ক্ষুদ্র জায়গীর অথবা নিষ্কর ভূমি লাভ করেন। তাদের একজন বিদ্বান ব্যক্তি সৈয়দ খোদা বক্স শাহ[১৮] ও অপরজন ওসমান খান লোহানীর ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা ফতেহদাদ খান লোহানী এবং তার পরিবার বর্গ।

সৈয়দ খান পন্নীর আতিয়া জমিদারী বংশধরদের মধ্যে বহু ভাগে বিভক্ত হয়েও বাংলার ইতিহাসের নানা উত্থান পতনের মাঝে প্রায় চারশত বৎসর টিকে থাকে, এমনকি জমিদারী উচ্ছেদ উত্তর তার বংশধরগণ অদ্যাবধি নয়া সমাজ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ে টিকে আছেন। বাংলার ইতিহাসে সম্ভবত এটি একটি ব্যতিক্রমী জমিদারী ও বংশধারা। উক্ত পরিবার ও সংশ্লিষ্ট জমিদার সমূহের পারিবারিক জীবন ইতিহাসের মূল আলোচ্য সময় বৃটিশ শাসন কাল। কোম্পানি শাসনের সূচনায় দিওয়ানী পর্ব পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই আতিয়া জমিদারী ৬ষ্ঠ পুরুষ পর্যন্ত মাত্র একটি ওয়ারিশে বিভক্তহীন [১৯] ছিল। অতঃপর ৭ম পুরুষ স্তরে এসে প্রথমে বড় তরফ ও ছোট তরফে বিভক্ত হয়[২০]। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী এক বা দু' দশকের মধ্যে পন্নী বংশ ছাড়াও আরো তিনটি বংশ এবং প্রতিটি বংশে ততোধিক এস্টেট উক্ত আতিয়া জমিদারীর অংশ লাভ করে বড় জমিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়[২১]। পন্নীদের ছোট তরফের প্রধান অংশ (চার আনা) লাভ করে চারানের কামাল খান তার জমিদারী বসতবাটি চারান (কাতিহাতি থানাধীন) থেকে দেলদুয়ারে স্থানান্তর করেন। উক্ত কামাল খান লোহানীর বংশধরগণই বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ও সর্ব ভারতীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এবং পূর্ববাংলার সমকালীন ইতিহাসে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার প্রতিষ্ঠা করেন। দেলদুয়ারের 'গজনবী ভ্রাতৃদ্বয়' হিসেবে তারা সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রে খ্যাতি লাভ করেন। দেলদুয়ারের অপর ধারা মকীমপুরের সৈয়দ বংশ থেকে বিস্তৃত হয় এবং খ্যাতি লাভ করে যথাক্রমে বানিয়ারা, পাকুল্লা, শায়েস্তাবাদ, সলিমনগর, ধনবাড়ী ও বগুড়ার নবাবগণ। এদের মধ্যে শায়েস্তাবাদের নবাব, ধনবাড়ীর নবাব ও বগুড়ার নবাব সমকালীন পূর্ববাংলার ইতিহাসে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। সমকালীন ইতিহাসে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে আবির্ভূত হন ঢাকার নয়া জমিদার খাজা

বংশধরগণ। নিজেদের কার্যগুণে এবং বহুলাংশে ইংরেজ সহায়তায় পূর্ববাংলার সমাজে তারা প্রধান নেতার আসনে সমাসীন হন[৫২] ও ঢাকার নবাব হিসেবে খ্যাতিমান হন। আতিয়ার আত্মীয়তা সূত্রের জমিদারদের মধ্যে এটিই ছিল কেবল মাত্র বৃটিশ সৃষ্ট নয়া জমিদারী এবং বাংলার সমকালীন সমাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী জমিদারী। দেলদুয়ারের আত্মীয়তা সূত্রের অন্য সকল জমিদারিই আদি ও বনেদি জমিদারী, তন্মধ্যে গজনবী লোহানী বংশধারা নানা কারণে ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই বাংলার আর্থ-সামাজিক ও আঞ্চলিক ইতিহাসে এদের বহুমাত্রিক কার্যক্রম সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২.৪ ঃ চারানের জমিদার কন্যা রওশন খাতুনের বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারী থেকে দেলদুয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠা ও চারটি ধারায় বিভক্তির মাধ্যমে জমিদারীর বিকাশ ধারা ঃ

পন্নী পরিবারের ৬ষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ খোদা নেওয়াজ খান ও নবী নেওয়াজ খান দুই ভাই। নবী নেওয়াজ খানের একমাত্র পুত্র আলি ইয়ার খান, যিনি আতিয়া ছোট আট আনী নামে পরিচিত, আতিয়া থেকে পাকুল্লায় এসে বসতি স্থাপন করেন[৫৩]। তার এক পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে কন্যা জান খাতুনের বিয়ে হয় সিরাজগঞ্জের বড় বাজুর পরগনার শরীক জমিদার সিরাজ আলী চৌধুরীর সাথে[৫৪]। দ্বিতীয় কন্যা রমজান খাতুনের বিয়ে সংক্রান্ত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে উভয়ের জমিদারী ছোট তরফের অর্ধেক বা মোট আতিয়া পরগনার চার আনা ঋন পরিশোধ সূত্রে ঢাকার খাজা পরিবার লাভ করেন[৫৫]। বাকী চার আনা লাভ করেন একমাত্র পুত্র জাঁহাইয়ার খান পন্নী। জাঁহাইয়ার খান পন্নী বিয়ে করেন চারানের ক্ষুদে জমিদার কামাল খানের এয়োদশ বর্ষী সুন্দরী কন্যা রওশন খাতুনকে। জাঁহাইয়ার খান কিছু কাল পরেই, সম্ভবত অল্প বয়সে মারা যান। তার মৃত্যুর পর চার আনা জমিদারী পুরোটাই লাভ করেন তার অল্প বয়সী বিধবা স্ত্রী রওশন খাতুন [৫৬]।

এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে মুসলিম মিরাসী আইন অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীর পুরো সম্পত্তি পেতে পারে না। সম্ভবত জাঁহাইয়ার খান পন্নী মৃত্যুর পূর্বে সব সম্পত্তি স্ত্রী কে হেবা করে দিয়ে যান[৫৭] অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে যখন তৌজি নম্বর আলাদা করা হয় তখন নিজের নামে জমিদারী গ্রহণ না করে স্ত্রীর নামেই সরাসরি গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য সমকালীন জমিদারী ইতিহাসে প্রায়শই নিঃসন্তান অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর পুরো সম্পত্তি পাওয়ার নজির দেখা যায়। বিশাল জমিদারী পেয়ে রওশন খাতুন হয়ে যান প্রতাপশালী মহিলা জমিদার রওশন খাতুন চৌধুরানী। তার জন্ম, বিয়ে কিংবা জমিদারী প্রাপ্তির সুনির্দিষ্ট সময়কাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। গজনবী পরিবার থেকে প্রাপ্ত এ,কে গজনবী প্রণীত ও রেজিষ্ট্রিকৃত বংশতালিকায় শুধুমাত্র জন্ম (২রা মার্চ ১৮৪৯) ও মৃত্যু (২০শে ফাল্গুন ১২৫৬) তারিখ[৫৮] পাওয়া যায়। কারো মতে, ১৭৯৭ সালে এবং কারো মতে, ১৮০৯ সালের দিকে অল্প বয়সে বিধবা হন ও জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন[৫৯]।

রওশন খাতুন স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর আবাসস্থল পাকুল্লা থেকে দেলদুয়ারে চলে আসেন। দেলদুয়ারে জমিদারী কেন্দ্র ২২৫ বিঘা জমি বেষ্টনীতে চতুর্দিকে দেয়াল ঘেরা, সম্মুখে প্রশস্ত খোলা চত্বর ও পিছনে বাগান বাড়ী সমেত, বাড়ীর সম্মুখে ছিল বিশাল দিঘী, দিঘীতে ছিল শান বাঁধানো ঘাট। মূল প্রবেশ পথে সুদৃশ্য পাকা গেট নির্মাণ করেন মোগল স্থাপত্য রীতিতে অনিন্দ্য সুন্দর একটি মসজিদ[৬৩]। জমিদারী পরিচালনায় সহায়তার জন্য ইস্যুহীন রওশন খাতুন পিতা কামাল খান লোহানীকে চারান থেকে দেলদুয়ারে নিয়ে আসেন। পাকুল্লায় স্বামীর স্মৃতি বিজড়িত বসতবাটির সম্মুখে একই রকম স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি মসজিদ ও চারানের শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ীর সম্মুখে অনুরূপ আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অন্যান্য জমিদারদের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজের জমিদারী যশ বৃদ্ধির জন্য আতিয়া শাহ বাবার মাজার মসজিদের জন্য এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত তিনটি মসজিদ পরিচালনায় জমিদারীর একটি ক্ষুদ্র অংশ ওয়াক্‌ফ করেন[৬৪]।

রওশন খাতুন দেলদুয়ারে অবস্থান কালে সলিমাবাদের জমিদার এবং পন্নী পরিবারের বড় তরফের এক অংশের জামাতা গওহর আলীকে বিয়ে করেন। গওহর আলীর প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান হওয়ায় স্ত্রীর তরফে পন্নী জমিদারী সূত্রে প্রাপ্ত এক আনা জমিদারী গওহর আলী তার আপন ভাগ্নেকে দান করে দেলদুয়ারে এসে বসবাস করেন। পিতা কামাল খানের মৃত্যুর পর রওশন খাতুনের পক্ষে তিনিই জমিদারী পরিচালনা করতে থাকেন[৬৫]। দু' একটি বাদে সমকালীন জমিদারদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, হিন্দু ম্যানেজার বা নায়েব গোমস্তাদের হাতে জমিদারী কার্য পরিচালনা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা অন্দর মহলে বাঈজি নাচ, আর রক্ষিতা নিয়ে সুখ সম্ভোগে ব্যস্ত কিংবা বাড়ীর বাইরে শিকার আর বাগান বাড়ীতে নারী ও মদ নিয়ে ফুর্তিতে মজে থাকত। আর হিন্দু নায়েবদের চক্রান্তে প্রজার উপর নির্যাতন অত্যাচার চালিয়ে ভোগ বিলাসের জন্য খাজনা ও আবওয়াব আদায়ে প্রজার সর্বস্ব কেড়ে নিত। প্রজা থেকে প্রাপ্য কড়াগন্ডায় আদায় করে নিলেও সময় মত সঠিক ভাবে সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করতো না। নায়েবরা সম্ভবতঃ নিলাম গ্রহণে নিজেরা আগ্রহী হয়ে অথবা নব্য ধনী শ্রেণীর যোগসাজশে অবৈধ নগদ অর্থ লাভের বিনিময়ে এই ঘৃন্য কাজ করতো।

ঠিক একই ভাবে গওহর আলী ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার সুবাদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূর্যাস্ত আইনে চার আনা জমিদারী থেকে দেড় আনা বকেয়া রাজস্বের দায়ে নিলামে উঠে[৬৩] । উক্ত নিলামি জমি নাগরপুরের সাহা, মহেড়ার রায় চৌধুরী ও গয়হাট্টা কৃষ্ণপুরের হিন্দু জমিদারগণ ক্রয় করেন[৬৪] । ঢাকার নয়া মুসলমান জমিদার খাজা পরিবার বিভিন্ন স্থানে নিলামে জমিদারী ক্রয় করলেও উক্ত জমিদারী ক্রয় না করার কারণ কি ছিল তা জানা যায়নি। তবে ঋন সূত্র এবং পরে বৈবাহিক সূত্রে তারা করটিয়া পন্নী ও দেলদুয়ার জমিদারীর একটি বৃহৎ অংশ লাভ করেন[৬৫] । জামুর্কীতে প্রধান কাছারী স্থাপন[৬৬] করে আতিয়ায় প্রাপ্ত সকল জমিদারী আলাদা তৌজিতে বিভক্ত করে পরিচালনা করতে থাকেন[৬৭] । রওশন খাতুন সমকালীন জমিদারদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত মহিলা জমিদার ছিলেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে ১৮৪৯ সালে মৃত্যুর অনেক পূর্বেই তিনি তার ও আতিয়া পরগনার অবশিষ্ট ২.৫ আনা জমিদারীর ক্ষুদ্র একটি অংশ তার প্রতিষ্ঠিত ৩টি মসজিদ ও আতিয়া মাজার মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ করেন। অতঃপর বাকী জমিদারী ৪ ভাই বোনের মধ্যে ২ঃ১ অনুপাতে ভাগ করে দেন। এভাবে দেলদুয়ার জমিদারী থেকে ৪টি জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৌনে ১ আনা করে (প্রায় ৪৫ বর্গমাইল সমপরিমান) জমিদারী পেয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সালামত আলী খান দেলদুয়ার বড় বাড়ী জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন[৬৮] । একই পরিমান নিয়ে অপর ভ্রাতা মাজামত আলী খান পাকা বাড়ী সহ মূল জমিদারী তথা দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী লাভ করেন[৬৯] । অপরদিকে আধা আনা থেকে একটু কম অর্থাৎ ৮ গন্ডা, ২ কড়া, ২ ক্রান্তি নিয়ে দুই বোনের বড় বোন দৌলত খাতুন ২২৫ বিঘা বসত বাটির দক্ষিণ প্রান্তে নতুন বাড়ী নির্মাণ করে দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন[৭০] । মানিকগঞ্জের মকীমপুর পরগনা জমিদারদের ৮ম পুরুষ, হযরত আলী থেকে সৈয়দ বংশের ৩১তম প্রজন্মের পুরুষ সে সময়ে ঢাকার বাউকান্দা গ্রাম নিবাসী মীর মোহাব্বত আলীর সাথে দৌলত খাতুনের বিয়ে হয়[৭১] । দৌলত খাতুন প্রথমে বাউকান্দায় অবস্থান করেন, পরবর্তীতে দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী প্রতিষ্ঠা করে দেলদুয়ারে স্থায়ীভাব অবস্থান করেন[৭২] ।

সমপরিমাণ জমিদারী নিয়ে ছোট বোন ঈদুন খাতুন পাকুল্লা বসতবাড়ি ও পাকুল্লা মসজিদের মোতাওয়াল্লীর দায়িত্ব লাভ করেন। ঢাকার জমিদার কাজী বংশের জনৈক কাজী গোলাম মোস্তফার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

তার বিয়ে হয় । স্বামীকে নিয়ে ঈদুন খাতুন দু'দশক পাকুল্লায় অবস্থান করেন। অতঃপর একমাত্র কন্যা এনায়েত খাতুনকে বিয়ে দেন বোন দৌলত খাতুনের শ্বশুর পক্ষীয় ও মকীমপুর বংশের একই প্রজন্মের সৈয়দ আতাহার আলীর সাথে। আতাহার আলী, এনায়েত খাতুন এবং তাদের বংশধরদের জন্য পাকুল্লা জমিদারী দান করে ঈদুন খাতুন ও কাজী গোলাম মোস্তফা (পিতৃ সূত্রে প্রাপ্ত) তাদের সিঙ্গাইর জমিদারীতে চলে যান[১৩]। তাদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এভাবে আতিয়ার পন্নী জমিদারীর চার আনা জমিদারী রওশন খাতুন সূত্রে এবং চারানের কামাল খান লোহানীর বংশে চার চারটি প্রভাবশালী জমিদারী প্রতিষ্ঠা হয়।

সৈয়দ বংশের বিকাশ ঃ দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী, পাকুল্লা, বানিয়ারা, শায়েস্তাবাদ, ধনবাড়ী ও বগুড়ার নবাব বংশ মকীমপুর পরগনার সৈয়দ আদম হিন্দীর বংশধর বলেই বিভিন্ন তথ্যে পাওয়া যায়। দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর দৌলত খাতুন ও পাকুল্লার এনায়েত খাতুনের সন্তানগণ পিতৃসূত্রে মকীমপুর ও সিঙ্গাইর জমিদারী থেকে কোন স্বত্ব পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে মকীমপুর পরগনা ততদিনে নদী ভাঙ্গনে তলিয়ে যায় বলে তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়ে তাদের জমিদারী পরিচালনা কিংবা পারিবারিক জীবন ধারা সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

২.৫ দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী ও পাকুল্লা জমিদারীর সৈয়দ বংশ ধারার বিকাশ ঃ

দৌলত খাতুন ও মীর মোহাব্বত আলীর একমাত্র পুত্র মীর মুছলন্দ আলী চৌধুরী ওরফে মুচি মিয়া দেলদুয়ারের অত্যচারী ও সাহসী জমিদার হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি পাকুল্লা জমিদারীর বিধবা জমিদার ও দুলাই জমিদারীর দুই বোন কে বিবাহ করে স্বীয় জমিদারী আরো এক আনা বৃদ্ধি করেন। পাবনার আমিনপুরের অপর একটি সৈয়দ বংশে বিবাহ করে নিজের সৈয়দ বংশীয় আভিজাত্যকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ফরিদপুরের গির্ধা শরীফ থেকে পাবনা আমিনপুরে এসে বসতি স্থাপন কারী উক্ত সৈয়দ বংশের স্ত্রী নওয়াবুন্নেসার ভাই তথা স্বীয় সৈয়দ শ্যালককে দেলদুয়ারে এনে ৫০ খাদা জমি পীরপল বা নিষ্কর হিসেবে পত্তনী দেন[৭৪]।

মুচি মিয়া পাবনার দুলাই জমিদার পরিবারের পরপর দুই বোন নাসিমুন্নেসা ও সফিকুন্নেসাকে বিয়ে করেন[৭৫]। পরবর্তীতে তাদের বৈমাত্রেয় জাফর আলী খানের পৌত্র চাঁদ চৌধুরীর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন[৭৬]। এভাবে তিনি বিবাহের মাধ্যমে দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদারী কে মুচি মিয়া পূর্বের জমিদারী থেকে দ্বিগুন বড় জমিদারীতে পরিণত করেন। কেননা অধিকাংশ স্ত্রীই তাদের সম্পত্তি মুচি মিয়াকে দান করেন[৭৭]। ১৮৬০ এর দশকে টাঙ্গাইলের চরাঞ্চলে জমিদারী এলাকায় সৃষ্ট দাঙ্গায় এক ব্যক্তি নিহত হলে, এর জন্য তাকে দায়ী করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানাও জারী করা হয়। গ্রেফতার এড়াতে তিনি তার চতুর্থ স্ত্রীকে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই থেকে যান। সেখানে চতুর্থ স্ত্রীর ঔরষে এক সন্তান জন্ম নেয়। আনুমানিক ১৮৭০ সালের দিকে মক্কায় তার মৃত্যু ও কবরস্থ হন। মক্কায় জন্মগ্রহণকারী পুত্র পরে দেশে ফিরে আসলে মক্কী হাজী হিসেবে পরিচিত হন[৭৮]।

এদিকে মক্কা গমন কালে তার সম্পত্তির অধিকাংশ একমাত্র প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী (১৮৪০-১৯১১) ও সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরীর (১৮৪৫-১৯১৫) নামে হস্তান্তর করেন। কিন্তু তার নামে থাকা কিছু সম্পত্তি তাকে না পেয়ে সরকার ক্রোক করে। নিলামে উক্ত সম্পত্তি ঢাকার নবাব স্যার আবদুল গণি ক্রয় করেন[৭৯]। সাধারণ ভাবে অত্যাচারী ও ভোগ বিলাসী জমিদার হলেও তার কৃতজ্ঞতা বোধ ছিল প্রবল। একবার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে আহত হন কিন্তু তাকে উদ্ধারকারী দুই কৃষককে তাদের পত্তনি জমিতে বংশ পরম্পরায় খাজনা মওকুফ করে দেন। জমিদারী

উচ্ছেদ কাল পর্যন্ত প্রায় একশত বছরের অধিককাল (১৯৫৬ সাল অবধি) ঐ ব্যক্তির বংশধরদের খাজনা দিতে হয়নি[৮০]। এছাড়া অপর একটা ঘটনায় জনৈক কবিরাজ তার পেটের পীড়া উপশম করলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাকে রাজস্ববিহীন ভূমি পত্তনী দেন[৮১]।

তার বড় ছেলে সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী ছিলেন পরবর্তী সময়ে একজন সফল জমিদার ও ব্যবসায়ী। তিনি মধুপুর আতিয়া বন বিভাগ থেকে কাঠের ব্যবসা করে বেশ স্বচ্ছলতা অর্জন করেন[৮২]। পিতার মতই তিনিও বিভিন্ন জমিদার পরিবারে বিবাহ করে জমিদারী সীমা বৃদ্ধি করেন[৮৩]। ঢাকা, পাকুল্লা, বগুড়া ও রাজকারায় পরপর চারটি বিয়ে করেন। সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী প্রথম বিয়ে করেন তৎকালীন পাকুল্লার বিখ্যাত জমিদার সৈয়দ আবুল হোসেন চৌধুরীর ফুফু এবং পাকুল্লার প্রতিষ্ঠাতা জমিদার এনায়েত খাতুনের পৌত্রী আখতারুন্নেসা চৌধুরানীকে। অপর বিয়ে করেন বগুড়ার বিহার গ্রামের জমিদার হামেদ আলী চৌধুরীর বিধবা স্ত্রী ও শেলবর্ষ পরগনার কড়া মানিকপুর নিবাসী জমিদার মীর সরওয়ার আলীর বোন যুবায়দাতুন্নেসাকে। আপন ছোট ভাই সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী যুবায়দাতুন্নেসার ছোট বোন তহুরুন্নেসাকে বিয়ে করেন। উভয়ে এই বৈবাহিক সূত্রে বগুড়া ও শেলবর্ষ পরগনা থেকে অঢেল সম্পত্তি লাভ করেন[৮৪]। কেননা মীর সরওয়ার আলী নিঃসন্তান হওয়ায় তার সমুদয় সম্পত্তি বিধবা স্ত্রী ও দুই সহোদর বোন লাভ করেন। কোন এক অজ্ঞাত কারণে, সৈয়দ মারহামাত আলীর মতে, বেশী বয়স্কা হওয়ার কারণে সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী বগুড়ার এই স্ত্রীকে গ্রহণ করেননি। উক্ত স্ত্রী তার সম্পত্তি গ্রহণের অনুরোধ জানালেও জেদ বশতঃ আবদুল জব্বার চৌধুরী তা গ্রহণ করেননি। ফলে ভগ্ন হৃদয়ে যোবায়দাতুন্নেসা মৃত্যুকালে তার সম্পূর্ণ জমিদারী শেয়ার বোন তুহুরুন্নেসার একমাত্র কন্যা আলতাফুন্নেসাকে হেবা করে দিয়ে যান [৮৫]।

তুহুরুন্নেসার মৃত্যুর পর সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী তার একমাত্র শ্যালকের বিধবা স্ত্রী তালে আফরোজ কে বিয়ে করেন। তার মৃত্যুর পর উভয় সূত্র থেকে আবদুস সোবহান চৌধুরী শেলবর্ষ পরগনার বিশাল ও প্রায় সমুদয় জমিদারী লাভ করেন। এছাড়া কলকাতায় ব্যবসা বাণিজ্য করে জমিদারীর পরিসর বৃদ্ধি করেন[৮৬]। কলকাতায় তার একাধিক বাড়ী ও ছিল। বস্তুত উনিশ শতকের আশির দশকেই আবদুস সোবহান চৌধুরী বগুড়া ও কলকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করেন[৮৭]।

সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী সর্বশেষ বিয়ে করেন বলিয়াদির জমিদার কলিমুদ্দীন সিদ্দিকী ও হাফেজা খাতুনের কন্যা হালিমা খাতুনকে। উক্ত স্ত্রীর সন্তান সন্ততিগনই তার পরবর্তী বংশধারা হিসেবে

টিকে থাকে[৮৮]। ইংরেজদের নবাব কিংবা অন্য কোন খেতাব না পেয়েও তিনি টাঙ্গাইল অঞ্চলে "বড় নবাব' বলে পরিচিতি ছিলেন[৮৯]। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না, ইংরেজদের সাথে কোন সখ্যতাও গড়ে তোলেননি, সে সময়ের আবেদন নিবেদনের রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেননি। তবুও উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে তিনি টাঙ্গাইলের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন[৯০]। নিজ বাড়ীর সদর কাছারিতেই তিনি তার অনারারী কোর্ট বসাতেন, আমৃত্যু এখানেই সংশ্লিষ্ট মামলা মোকাদ্দমার বিচার করতেন। কোর্টের মোক্তার ও অন্যান্যরা এখানেই মামলার নথিপত্র নিয়ে আসতেন। এখান থেকেই মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ আদালতে নথি প্রেরণ করতেন। পূর্ব বাংলা জমিদার সমিতির প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করতেন। ১৮৮৮ সালে ঢাকায় লর্ড ডাফরিনের আগমন উপলক্ষ্যে খাজা আহসান উল্যাহর নেতৃত্বে জমিদার সভা কর্তৃক লর্ড ডাফরিন কে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এতে লক্ষীবাজারে প্রস্তাবিত লর্ড ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলের জন্য তিনি এক হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করেন[৯১]। একই সভায় পার্শ্ববর্তী করটিয়ার বড় জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পিতা হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন[৯২]।

সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী সমকালীন জমিদারদের মধ্যে রুচি ও আভিজাত্যের বোধে ছিল একটু বেশী সচেতন ও অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র[৯৩]। সৈয়দ মারহামাত আলীর ভাষায়- "He is a Typical example of the Zemindar in an age when Zemindars as a class were not decadent; but with their tastee for good living, good food and women, they were also active and enterprising. They were not effuminate nor were they enervated by luxury. He was rich and prosperous and enjoyed the good things of this life.[৯৪]

জমিদারীর পতন যুগেও ৩০০ চাকর কর্মচারী তার বাড়ীতে ছিল। সম্ভবতঃ উক্ত কর্মচারী ও চাকরদের বেকারত্বের কথা চিন্তা করে এবং কিছুটা আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য তিনি কর্মচারী ও চাকরদের চাটাই করেননি। তার বাড়ীর সম্মুখ ফটকে ফার্সি কবিতার ইন্‌স্ক্রিপশ্‌ন তার স্বাতন্ত্র্য ও শৈল্পিক বোধের পরিচয় বহন করতো[৯৫]। ছোট জমিদারী হয়েও তার বাড়ীতে ছিল এতদাঞ্চলের বড় জমিদারদের বাড়ীর চাইতে বেশী ঝাড় (২৪ ঝাড়) বিশিষ্ট ঝাড়বাতি। তিনি একাধারে একজন দক্ষ শিকারি, ধার্মিক,

প্রজাবাৎসল্য, পরোপকারী ও শিক্ষানুরাগী জমিদার ছিলেন। সমকালীন জমিদারদের প্রজা শোষন্ ইতিহাসের যে তথ্য পাওয়া যায়, তার জমিদারীতে, তার সময়ে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি; বরং বিপরীত তথ্যই পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি তার অন্যান্য শরীকদের সাথে নিয়ে একটি অর্ধ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন[২৬]। বর্তমানে উক্ত স্কুল সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নামে আজো দেলদুয়ারে সগৌরবে টিকে আছে। ছোট ভাই সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী ও জ্ঞাতি ভ্রাতা গজনবীদের ন্যায় ইংরেজ থেকে বড় কোন খেতাব না পেলেও তিনি প্রজাদের সাথে সু আচরণ, সুসম্পর্ক রক্ষা এবং জমিদারী অঞ্চলে শান্তি, শৃংখলা, উন্নয়ন ও জনকল্যাণ কর্মকান্ডের জন্য ইংরেজ কর্তৃক 'সার্টিফিকেট অব অনার' পেয়েছিলেন[২৭]। স্থানীয় ও প্রথাগত জমিদার হিসেবে গৌরব নিয়ে তিনি ১৯১১ সালে দেলদুয়ারে মৃত্যুবরণ করেন।

তার তিন সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান খান বাহাদুর সৈয়দ আহমদ হোসেন চৌধুরী (১৮৮০-১৯৪৪) পিতার মৃত্যুর পর জমিদারী লাভ করেন। স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান মনোনীত হন। অনানারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা বোর্ডের মাধ্যমে সরকার ও দেশ সেবার জন্য খানবাহাদুর উপাধি লাভ করেন[২৮]। তিনি রাজকারা জমিদার পরিবারে বিয়ে করেন। একই পরিবারে বিয়ে করা সৈয়দ বংশের তিনি তৃতীয় প্রজন্মের পুরুষ[২৯]। তিনি সৌখিন, বিলাসী, আমুদে প্রকৃতির অথচ সাহসী জমিদার ছিলেন। তিনি তার বাড়ীর সম্মুখস্থ লনে সুদৃশ্য ফুল ও ফলের বাগান করেন। সমগ্র ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ তার সংগ্রহে ছিল এবং তার লনটিই ছিল এতদাঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ[৩০]। তিনি একাধারে সাহসী, সাহায্যকারী ও শক্তিশালী জমিদার ছিলেন। বেগম রোকেয়ার কলকাতাস্থ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে তিনি অর্থ-সাহায্য করেছিলেন[৩১]। ধনবাড়ীর নবাব কর্তৃক আপন মামা নাটোরের জমিদারের বিরুদ্ধে প্রেরিত রাজশাহীর নাজিরপুরের কাছারি দখল অভিযানে নৌকা ও লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে ধনবাড়ীর নবাবকে সাহায্য করেছিলেন[৩২]।

১৯৪৪ সালে তার বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান ঘটলে একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাব্বত আলী চৌধুরী জমিদারী লাভ করেন। তিনি নাটোরের খ্যাতনামা জমিদার খান বাহাদুর ইরশাদ আলী খান চৌধুরীর পৌত্রি ও ব্যারিষ্টার আশরাফ আলী চৌধুরীর কন্যা সাফিয়া বেগমকে বিয়ে করেন। প্রথম জীবনে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতার বিভিন্ন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে জেলা বোর্ডের সদস্য এবং মহকুমা মুসলিম লীগের আহবায়ক মনোনীত হন। ১৯৬০ সালে তিনি বিভাগীয় পরিষদে মনোনীত হন। তিনি স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর সর্বশেষ জমিদার।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ দেলুয়ার উত্তর, মধ্য, ও বড় বাড়ীর লোহানী গজনবী বংশ ধারার বিকাশ ঃ

দেলদুয়ারের প্রথম চার শরীক জমিদার তাদের পিতৃ জমিদারী চারান থেকে কি সম্পত্তি পেয়েছিলেন, আদৌ কিছু পেয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অতএব ধরে নেয়া যায় আতিয়া পরগনার শাসক পন্নী পরিবারে সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের সুবাদে প্রাপ্ত ৪ আনার বিশাল সম্পত্তিই দেলদুয়ার জমিদারীর মূল ভিত্তি। রওশন খাতুন ও পিতা কামাল খান লোহানীর মৃত্যুর পর দেলদুয়ার জমিদারী দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে চার শরীকানায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। মেয়ের পক্ষ দুটি সৈয়দ বংশ ধারা হিসেবে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ছেলের পক্ষ দুটি লোহানী গজনবী বংশ ধারা হিসেবে পরিচিত। তন্মধ্যে ছোট ছেলে সালামত আলী খানের বংশধারা বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে বিলুপ্ত হয়ে যায় [১০০]। ফলে বড় ছেলের বংশ ধারাই বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকে আছে। বৃটিশ শাসনের শেষ অর্ধ শতাব্দী কালে এই পরিবারের দু' সদস্য আবদুল করিম গজনবী ও আবদুল হালিম গজনবী বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হন।

রওশন খাতুন প্রতিষ্ঠিত ২২৫ বিঘার দেলদুয়ার জমিদারীর মূল বাড়ী যা উত্তর বাড়ী নামে পরিচিত। তার কিছুটা দক্ষিনে গিয়ে কামাল খানের ছোট ছেলে সালামত আলী খান তার অংশ নিয়ে নতুন বাড়ী করেন যা পরবর্তীতে দেলদুয়ার মধ্যবাড়ী নামে পরিচিত হয়[১০১]। একেবারে দক্ষিন প্রান্তে দৌলত খাতুন তার অংশ নিয়ে আরেকটি বাড়ী তৈরী করেন যা দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী নামে পরিচিত।

সালামত আলী খান খুব বেশী দিন জমিদারী পরিচালনা করতে পারেননি। বাংলার জমিদারী ইতিহাসের স্বর্ণযুগে জমিদারী পরিচালনা করে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের কিছু কাল পূর্বে সম্ভবত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন[১০২]। তার জমিদারী পরিচালনা কিংবা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তার প্রথম স্ত্রী ছালেহান্নেসার ঔরসে দুই পুত্র ও ২য় স্ত্রী লক্ষী বিবির ঔরসে দুই কন্যা ছিল। দ্বিতীয় পুত্র অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। প্রথম পুত্র লাইস উদ্দীন আলী খান আপন চাচাত বোন নাজমুন্নেসা খানমকে বিয়ে করেন[১০৩]। খোন্দকার আবদুর রহিম টাঙ্গাইলের ইতিহাস গ্রন্থে ভুলক্রমে তাকে নহেছ আলী খাঁ এবং পাকুল্লার জমিদার বলে অভিহিত করেন[১০৪]। প্রকৃত পক্ষে তারা দেলদুয়ার বড়বাড়ীর জমিদার। লাইস উদ্দিন খানের স্ত্রী নাজমুন্নেসা কে সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

তার জমিদারী উপাখ্যান 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে মনি বিবি চরিত্রে রূপায়িত করেন। লাইস উদ্দিন খানের দুই সৎ বোন খোরশেদুন্নেসাকে এবং পরে রাহাতুন্নেসাকে বিয়ে করেন আপন চাচাত ভাই আবদুল আজিজ খান[১০৫]। এতে সমকালীন জমিদার পরিবারে আন্তঃ বিবাহের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

লাইস উদ্দিন খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। নাজমুন্নেসা ওরফ মনি বিবির গর্ভে তার এগার সন্তানের কথা মীর মশাররফ হোসেন গাজী মিয়ার বস্তানীতে উল্লেখ করেছেন[১০৬]। তন্মধ্যে মাত্র ৪ জনের বিবাহ হয়েছিল বলে জানা যায়। বাকীরা সকলেই ছিলেন আমৃত্যু অবিবাহিত । তম্মেধ্যে ছোট কন্যা সুরাইয়া খাতুনের বিয়ে হয় তারই চাচাত ভাই আবরার রহমান আবু মোহাম্মদ খান গজনবী ওরফে নয়া মিয়ার সাথে। 'গাজী মিয়ার বস্তানী ' বিবরণে এর সত্যতা মিলে[১০৭]। তবে এ,কে গজনবী প্রদত্ত বংশতালিকায় কেবল মাত্র ৮ কন্যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে[১০৮]। গাজী মিয়ার বস্তানীর চার মহিলা জমিদার ও তিন কেন্দ্রিয় চরিত্রের প্রথম দুটি মুখ্য চরিত্র এই নজমুন্নেসা ওরফে মনি বিবি এবং রাহাতুন্নেসা ওরফে সোনা বিবি। তারা আত্মীয়সূত্রে একে অপরের চাচাত বোন, পরে পরস্পর ননদ-ভাবী, আরো পরে বেয়াইন। উভয়ের আন্তঃ জমিদারী, আন্তঃ ব্যক্তিত্ব সংঘাত ও প্রতিযোগিতার এক নিপুণ কল্পচিত্র 'গাজী মিয়ার বস্তানী'তে ফুটে উঠেছে।

রাহাতুন্নেসা ওরফে সোনা বিবি তার চির শত্রু নজমুন্নেসা ওরফে মনি বিবিকে জব্দ করার জন্য স্বীয় পুত্র নয়া মিয়ার সাথে মনি বিবির ছোট মেয়ে ও আপন ছোট ভাইঝি সুরাইয়া খাতুনের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মনি বিবি এ বিয়েতে রাজী হন সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে[১০৯]। সুন্দরী কন্যাকে দিয়ে জামাইকে নিজের নিয়ন্ত্রনে নেন। ব্যক্তিত্বহীন এবং বস্তানীর ভাষায় সম্ভবতঃ পুরুষত্বহীন নয়া মিয়াকে কব্জা করে রাহাতুন্নেসা ওরফে সোনা বিবিকে জব্দ করাই ছিল তার উদ্দেশ্য[১১০]। এহেন নিতান্ত গ্রামীণ জমিদারী ও পারিবারিক রাজনীতিতে মনি বিবি জয়ী হন। আপন পুত্রকে আপন মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে সমর্থ হন[১১১] সুন্দরী বধু সুরাইয়া খাতুন। কুচক্রী মায়ের পরামর্শে সুরাইয়া খাতুন স্বামীকে মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করেন। অবশেষে পুত্রের আচরণে হতাশ হয়ে এবং মনি বিবির কাছে পরাজিত হয়ে রাহাতুন্নেসা ওরফে সোনাবিবি দেলদুয়ারকে যমদ্বার জ্ঞানে ত্যাগ করে অরাজকপুর তথা টাঙ্গাইল সদর কাছারি বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন[১১২]। কিন্তু পুত্রের হস্তক্ষেপ , বাড়ীতে পুলিশের আগমন এবং লাঠিয়াল কর্তৃক সোনা বিবির জিনিস পত্র লুণ্ঠন ইত্যাদি নানা নাটক ঘটে যাত্রা পূর্বে। কোন মতেই মাতাকে পুত্র দেলদুয়ার ত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

করতে দেবেন না। তার নানাবিধ কারণ, মীর মশাররফ হোসেন গাজী মিয়ার বস্তানীতে উল্লেখ করেছেন[১১৩]। অবশেষে দেলদুয়ার থেকে সোনা বিবি টাঙ্গাইলে এসে মনি বিবির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা মোকাদ্দমা পরিচালনা করতে থাকেন।

গাজী মিয়ার বস্তানীর প্রধান কাহিনী প্রধান চরিত্র জমিদার করিমুন্নেসা খানম কে ঘিরে। করিমুন্নেসা ওরফে বেগম পায়জারুন্নেসা বা বেগম ঠাকরুন এবং এর সাথে মীর মশাররফ ওরফে ভেড়াকান্ত ওরফে গাজী মিয়ার মামলা, মোকাদ্দমা এবং উভয়ের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অনেক কাহিনী এতে বিধৃত হয়েছে। গাজী মিয়ার বস্তানী থেকে দেলদুয়ার মধ্যবাড়ী ও বড় বাড়ী তথা সোনাবিবি ও মতিবিবি এই দুই পরিবারের মধ্যকার আরো অনেক সঠিক তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ মীর মশাররফ হোসেন এর 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপাখ্যান ও 'কুলসুম জীবনী থেকে দেলদুয়ার জমিদারদের পারিবারিক চিত্র উদ্ধার ঃ

কামাল খান লোহানীর বড় ছেলে মাজামত আলী খান লোহানী থেকে উক্ত ধারায় একটি স্ত্রী গ্রহণের ধারা লক্ষ্য করা যায়। তিনি পিতার মৃত্যুর পর অল্প কাল নিজ অংশের জমিদারী পরিচালনা করে ১৮৫৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে জমিদারী চারটি শরীকে বিভক্ত হয়। বড় ছেলে আবদুল আজিজ খান মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৮৭৪ সালের ১৫ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন[১১৪]। অনেকের মতে সম্ভবত ঃ স্ত্রী রাহাতুন্নেসার প্রবল কর্তৃত্বে অতিষ্ঠ হয়ে অল্পবয়সে মৃত্যুবরণ করেন[১১৫]। তার একমাত্র পুত্র আবু মোহাম্মদ খান ওরফে নয়া মিয়া আরো অল্প বয়সে অর্থাৎ ৩৪ বছর বয়সে ১৯০৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন[১১৬]। চাচাত বোন ও স্ত্রী সুরাইয়া খাতুন এর পর কিছু কাল বেঁচে ছিলেন। গাজী মিয়ার বস্তানীতে মনি বিবির এগার কন্যা সন্তানের এই ছোট কন্যার নাম দেয়া হয়েছে ছিঁড়িয়া খাতুন। খোন্দকার আবদুর রহিম তার গ্রন্থে এই নয়া মিয়াকে গেন্দা মিয়া হিসেবে অভিহিত করেন[১১৭]। সুরাইয়া খাতুনের মৃত্যুর পর বড় বাড়ীর এই এস্টেট চাচাত ও মামাত ভাই গজনবী খ্যাত ভ্রাতৃদ্বয় লাভ করেন[১১৮]। একই সময় দেলদুয়ার মধ্যবাড়ীর প্রথম ১১ মেয়ের ১১টি এস্টেট এবং আরো পরে মাত্র ৫ কন্যার বিবাহের সুবাদে ৫টি এস্টেটে বিভক্ত হয়। এরা কিছুকাল পরে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। ফলে দেলদুয়ার মধ্যবাড়ী ইস্যুহীন হয়ে বিলুপ্ত হয়[১১৯]। উক্ত সকল ধারা এস্টেটগুলো একইভাবে উত্তর বাড়ীর গজনবী ভ্রাতৃদ্বয় লাভ করেন[১২০]।

অপর দিকে মাজামত আলী খানের বড় মেয়ে নুরুন্নেসা খানম অবিবাহিত ছিলেন। ফলে তার ও অপর বোন নজমুন্নেসা ওরফে সোনাবিবি এস্টেট দ্বয় বংশধারার অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র গজনবী ভ্রাতৃদ্বয় লাভ করেন। এভাবে নিজেদের এস্টেটের বাইরে অতিরিক্ত মোট আটটি এস্টেট গজনবী ভ্রাতৃদ্বয় লাভ করেন[১২১]। সালামত আলী খানের বড় ছেলে আবদুল হাকিম খান ১৮৪১ সালে ৩রা জুন জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিশ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৭১ সালের ২৬শে জানুয়ারী রংপুর পায়রাবন্দের জমিদার সাবের পরিবারের প্রতিভাময়ী কন্যা করিমুন্নেসাকে বিয়ে করেন[১২২]। এই প্রথম পুরো বংশের ইতিহাসে একটি মাত্র বিয়ে যা বংশের বাইরে সম্পন্ন হয়। এই বিয়ে দেলদুয়ার ও গজনবী বংশের জন্য এমনকি বাংলার পরবর্তী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়। বংশের অন্যান্য পুরুষদের ন্যায়

আবদুল হাকিম খান গজনবী বিয়ের পর খুব বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। দুই পুত্র আবদুল করিম ও আবদুল হালিমের জন্মের অনতিকাল পরেই ১৮৭৮ সালের ১৬ নভেম্বর মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ষোল বছর বয়সে বিবাহ হয়ে থাকলে সুন্দরী ও বিধবা করিমুন্নেসা খানমের বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর মাত্র। গাজী মিয়ার বস্তানীর চরিত্রে যাকে কখনো পায়জারুন্নেসা, কখনো বেগম ঠাকরুন বলে অভিহিত করা হয়েছে[১২৩]। উল্লেখ্য স্বামীর মৃত্যুর পর করিমুন্নেসা ছোট দুই সন্তানকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। বড় ছেলে আবদুল করিমের বয়স ৬ বছর ও ছোট ছেলে আবদুল হালিমের বয়স মাত্র চার বছর। বড় ছেলে আবদুল করিম গজনবী কলকাতা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইটালী থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে[১২৪]। ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে এসে মাত্র বাইশ বছর বয়সে জমিদারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত করিমুন্নেসা স্বহস্তে এবং দৃঢ়তা ও যোগ্যতার সাথে জমিদারী পরিচালনা করেন। একই সাথে উচ্চ শিক্ষিত ভাইদের সহায়তায় কলকাতায় বাড়ী কিনেন, অতঃপর দেলদুয়ার ছেড়ে কলকাতায় অবস্থান করে দুই পুত্রকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেন[১২৫]। উল্লেখ্য উক্ত সময়ে দেলদুয়ার জমিদারীতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই।

প্রথমতঃ ১৮৭৪ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত এই বিশ বছরে আমরা দেলদুয়ার জমিদারীতে ও গজনবী বংশে চার জন প্রতিপত্তিশালী মহিলা জমিদার এবং তাদের কৌতুকাবহ কর্মতৎপরতা দেখতে পাই। সুসাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন এক দশক পর্যন্ত দেলদুয়ার জমিদারীর দুটি এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন[১২৬]। শেষ দিকে জমিদারদের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল না এবং মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ও জেল খেটে অবশেষে তাকে দেলদুয়ার ত্যাগ করতে হয়[১২৭]। কিন্তু দেলদুয়ারে জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার হিসেবে তিনি চার মহিলা জমিদারের কর্মকান্ড, আন্তঃ জমিদারী সংঘাত, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের অন্দর মহল ও পারিবারিক চিত্র, জীবন যাপন পদ্ধতি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। শুধু তাই নয় তিনি নিজেও ছিলেন পতিত জমিদার পুত্র[১২৮]। সুতরাং তার চেয়ে আর বেশী নিপুণ ভাবে মুসলমান জমিদারী চিত্র আর কে তুলে ধরতে পারেন। তাই তো দেলদুয়ার জমিদারীর পারিবারিক বিবিধ জীবন চিত্র আমরা দেখত পাই 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপাখ্যান এবং বিবি কুলসুম জীবনী' গ্রন্থে[১২৯]। এছাড়া দেলদুয়ার জমিদারীর অপর দু তরফের জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন টাঙ্গাইলের চারানের জমিদার পুত্র এবং সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই[১৩০]। কথিত যে, উক্ত ম্যানেজার, কবি, সাহিত্যিকের সাথে জমিদার কন্যা নুরুন্নেসা ও নজমুন্নেসার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

নুরুন্নেসা নাকি শেষ পর্যন্ত বিয়েই করেননি। আবদুল হামিদ খানের 'উদাসী' কবিতা এই প্রেমেরই ফসল বলে পন্ডিত ও গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন[১৩৫]। আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই দেলদুয়ারের প্রধান ও প্রতিভাশালী মহিলা জমিদার করিমুন্নেসা খানমের অর্থায়নে ও মালিকানায় টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত 'আহমদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

আধুনিক গবেষকদের মধ্যে ওয়াকিল আহমেদ এদের কর্মকান্ডের উপর সংক্ষিপ্ত অপ্রতুল তথ্যের উল্লেখ করেছেন। উক্ত নিবন্ধে উপরোক্ত গ্রন্থ সমূহ এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই সময়কালে দেলদুয়ারের মুসলমান জমিদার চতুষ্টয়ের পারিবারিক ও জমিদারী সমাজ চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া সমকালীন পত্র পত্রিকা যথাক্রমে আহমদী, আখবারে ইসলামিয়া, ঢাকা প্রকাশ, দি মোসলেম ক্রনিকাল, মিহির ও সুধাকর ইত্যাদি থেকে দেলদুয়ারের পারিবারিক ইতিহাস পুনঃ গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তানীতে মীর মশাররফ হোসেন নিজের চেয়ে দেলদুয়ারের জমিদারদের জীবনের পরিবেশ এবং পরিমন্ডলকেই চিত্রিত করেছেন। তবে নিজেকে 'ভেড়াকান্ত', 'ভেড়াকান্তের বউ' পরিচয়ে স্বীয় স্ত্রীর জীবনের যে সংশ্লিষ্টতা দেলদুয়ার জমিদারদের সাথে হয়েছিল তা বিবি কুলসুম গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

বস্তানীতে জমিদারী এস্টেটে কাজ করার সময়ে গ্রাম্য জমিদারদের বিবাদ ও রেষারেষীর মধ্যে মশাররফ হোসেন নিজে জড়িয়ে পড়েছেন। সেখানে প্রধান জমিদার করিমুন্নেসা খানমের এস্টেট ম্যানেজার হয়ে লাহিনী পাড়া থেকে দুর্দিনে দেলদুয়ারে আসেন। তার নিজের ভাষায় করিমুন্নেসা খানম তাকে পুত্র স্নেহ করতেন। তারই উৎসাহে সমকালীন মহরম উৎসবকে কেন্দ্র করে শোক উৎসবের পটভূমিতে দেলদুয়ার জমিদারী লনে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বসে বসে তিনি তার অমর গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' রচনা করেন[১৩৬]। উৎসর্গ পত্রে করিমুন্নেসাকে মাতা বলে সম্বোধন করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। পরবর্তী কালে অন্যান্য জমিদার ও আমলাদের ষড়যন্ত্রে করিমুন্নেসা খানমের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সে জন্য বিষাদ সিন্ধুর ২য় সংস্করনে আর উক্ত উৎসর্গ পত্র দেখা যায় না। শেষ দিকে আর তিনি করিমুন্নেসা খানমের এস্টেট ম্যানেজার ছিলেন না। সম্ভবতঃ শেষ দিকে তিনি অপর শরিক এস্টেটের ম্যানেজার হিসেবে বহাল ছিলেন অথবা বিকল্প কোথাও যাওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। যদিও এবিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এরপরেও ১৮৯৪ পর্যন্ত দেলদুয়ারে তিনি অবস্থান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তানীর চরিত্র কে অনেকে কুষ্টিয়ার ঘটনা, অনেকে আবার রংপুরের কোন মুসলমান জমিদারের কাহিনী অবলম্বনে রচিত বলে মনে করেন[১৩৬]। কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন এটি দেলদুয়ারের জমিদারদেরই রঙ্গ কাহিনী[১৩৭]। বস্তানীর জমিদারদের অনুজ্জ্বল চরিত্র এবং একমাত্র পুরুষ জমিদার ও চক্রান্তকারী হিসেবে সাবলুট চৌধুরীর[১৩৮] কথা বলা হয়েছে। সন্দেহাতীত ভাবেই উক্ত সাবলুট চৌধুরী হচ্ছেন দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদার সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী ওরফে নবাব মিয়া। প্রধান চরিত্র পায়জারুন্নেসা[১৩৯] বা বেগম ঠাকরুন হচ্ছেন প্রধান জমিদার বেগম করিমুন্নেসা খানম। দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র মনি বিবি হচ্ছেন মধ্যবাড়ীর মহিলা জমিদার ও বড়বাড়ীর কন্যা বেগম নজমুন্নেসা খানম আর তৃতীয় প্রধান চরিত্র সোনা বিবি হচ্ছেন বড়বাড়ীর কন্যা ও মধ্যবাড়ীর বউ রাহাতুন্নেসা খানম। আর অনুজ্জ্বল অপর মহিলা জমিদার মতিবিবির চরিত্র হচ্ছে সম্ভবতঃ অবিবাহিত জমিদার কন্যা নুরুন্নেসা । যার সাথে 'উদাসী ' খ্যাত কবি ও সাহিত্যিক সাংবাদিক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাইর প্রেম ছিল। কারো মতে- দু বোনের সাথেই তার প্রেম ছিল।

ইউসুফজাই সম্ভবতঃ রাহাতুন্নেসা এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। এবং সোনা বিবির প্রধান নায়েব দাগাদারির চরিত্রের বর্ণনার সাথে আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাইর অনেক মিল পাওয়া যায়[১৪০]। ভোলানাথ হাকিম সম্ভবত তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দেলদুয়ার জমিদারী সংশ্লিষ্টতায় মীর মশাররফ যতটুকু জড়িয়ে ছিলেন তা বস্তানীতে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নিজের ও নিজের বউর বিবরণ তাতে খুব একটা দেননি। তবে শেষ চারটি পর্বে যা বিবি কুলসুম জীবনীতে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন তাতে আমরা দেলদুয়ার জমিদারী ও মীর মানস সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই।

মীরের ভাষায়, "বাংলা ১২৯১ সালে আমি দেলদুয়ার শ্রীমতি করিমুন্নেসা সাহেবের এস্টেটে ম্যানেজারী স্বীকার করিয়া দেলদুয়ার চলিলাম। বাধ্য হইয়া কুলসুম বিবির সহিত কিছুদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিল। আষাঢ় মাসের প্রথম তারিখে দেলদুয়ার যাইয়া কার্ত্তিক মাসে বাড়ি আসিলাম। অগ্রহায়ন মাসেই দেলদুয়ার যাইয়া কুলসুম বিবিকে দেলদুয়ার আনাইলাম । .. পালকী হস্তী লোকজন দ্বারা বিশেষ সম্মানের সহিত লইয়া অন্দর মহলে রাখা হইল। শ্রীমতি করিমুন্নেসা সাহেবা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিজ কক্ষে কুলসুম বিবিকে থাকিবার জন্য কলিকাতা হইতে আদেশ পত্র পাঠাইলেন। এবং ১৫ জন ছুকরি তাহার বাড়ীতে ছিল, সকলকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা ম্যানেজার সাহেবের স্ত্রীর প্রতি যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে ক্রটি করিবেনা। আমাকে যে প্রকার মান্য করিতে আদেশ প্রতিপালন করিতে সেরূপ তাহার আদেশ

Dhaka University Institutional Repository

পালন করিবে। কোন অংশ ত্রুটি যেন না হয়[১৪০ক] ।.... দুই তিন জন গুপ্ত শত্রু আমারই আত্মীয়স্বজনগণ শ্রীমতি করিমুন্নেসার মনভাব কুলসুম প্রতি যাহাতে পূর্বরূপ না থাকে তাহার জন্য বার বার পত্র লিখিয়া নিন্দা ও কুৎসা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। বরং দিন দিন কুলসুম বিবির মান মর্যাদা দেলদুয়ারে বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। এমনকি করিমুন্নেসার শত্রুপক্ষ জমিদার বিবি সাহেবরাও কুলসুম বিবিকে বিশেষ সমাদারে আপন আপন বাটিত লইয়া গিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। রেশমী বসন, নগদ টাকা দিয়া তাহার প্রতি স্নেহ ভালবাসার নিদর্শন দেখাইলেন। .... আশ্বিন মাস পরেই কার্ত্তিক মাসে মধ্য টাঙ্গাইলের নতুন বাসায় আসিলেন[১৪০খ] । .... ইশ্বরের কৃপায় কুলসুম বিবি ঐ টাঙ্গাইলের বাসা বাড়ীতে ১২৯৭ সালে ১৮ই অগ্রহায়ন একটা পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন[১৪১] । এখন আমার কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কথা ও কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করব যাহা ১৩০৬ সালে গাজী মিয়ার বস্তানীতে প্রকাশ হইয়াছে তাহাই প্রকাশ করিব। .... দুঃখ ভারে, অবনত মস্তকে থাকিলেও ভেড়াকান্তের স্ত্রীর এমনই বাক্য কৌশল কথার বাধুনি যে না হাসিয়া থাকা যায় না। তাহাতেই সোনা বিবি সময়ে সময়ে ভেড়াকান্তের স্ত্রীর নিকট আসিতেন। দিনে হউক রাত্রিতে হউক পালকী করিয়া আসিতেন..। .. দাগাদারীর সঙ্গে যাহারা জেল খানায় খাবার লইয়া গিয়েছিলাম তাহারা ফিরিয়া আসিল। সেলামী পাইয়া দাগাদারিকে আবার জেলের মধ্যে নিয়ে গেল, এ খাবার নিল না[১৪১ক] । টাকা পঁচিশটা হাতে করে নিয়ে শেষে বল্লো যে, এত জেল সালামী এত দিতেই হইবে। জেলে আমরা বলবো না, মারধর করবো না, সেই জন্যে দেওয়ার কথা ছিল। খাবার টাকা কৈ ? সে আলাহিদা আলাহিদা দিতে হবে, না, আর এ পঁচিশে কি হবে, জান না হাকিমের হুকুম কেমন ? ... ভেড়াকান্তের স্ত্রী কান্দিয়া কপালে আঘাত করিয়া বলিলেন," হায়রে টাকা ! হায় হায় ! টাকার জন্য খেতে দিল না। আমি টাকা দিচ্ছি ! সোনা বিবি বলে গিয়েছিলেন বলে আমি টাকার কথা মনে করি নাই। ... হা কপাল ! টাকা খরচ করেও কিছু খাওয়াতে পাল্লেম না। দিদি ! দেখলে আমার সময় দেখলে ? বেগম তোর কি মন্দ আমরা করেছিলাম। তোর কি ক্ষতি করেছিলাম যে তুই এমন করে জিয়ন্ত মানুষ কৌশলে মেরে ফেলার জোগাড় করছিস[১৪২] । তোর জন্য পথে বেরিয়েছি। শীত বর্ষা বৃষ্টির জল, ঝড় মাথায় সয়েছিল, তোর জন্য কিনা করেছি, তোর জাতি ধর্ম্ম মান, সে রক্ষা করেছে। তোর যথা স্বর্বস্ব যেত, জ্ঞাতিরা লুটে নিত, আপন প্রাণকে তুচ্ছ করে তা রক্ষা করেছে। তোর জন্যে কতজনে তার মাথা কাটতে চেয়েছে। তোর উপকারের জন্য আজ দশটি বৎসর বাড়ী ঘর ছেড়েছে। তোকে বাঁচাবার জন্যে আমরা পথে পথে তোর সঙ্গী হয়ে বেরিয়েছি। হায় ! হায়! তুই এই করলি! .... তুই আপন মা বাপকে গ্রাহ্য করিস না, তাদের সম্মুখে তুই যা যা করেছিস, তা মানুষে কর্ত্তে পারে না। তোর স্বামীকে যে চক্ষে দেখেছিস, মৃতস্বামীর নাম ধরে ডেকে আমার সম্মুখে যে নিন্দা করছিস তা তুই পারিস।... তোকে যেদিন সোনা বিবির লাঠিয়ালেরা ঘিরে নিয়েছিল, তোর লম্বা দাড়ীওয়ালা বাবুকে যেদিন মেরে সটান করেছিল তোর সঙ্গের পাঞ্জাবী শেওয়ারীকে মাথা ভেঙ্গে রক্তের স্রোত বইয়াছিল, সেদিন কে তোকে রক্ষা করেছিল ? শত্রু সম্মুখে বুক পেতে কে দাঁড়াইয়াছিল ? সমুদয় কার্যকারক দল, প্রতিবাসী দল, তোর বাড়ী ঘর সম্পত্তি হতে বেদখল করে , ঝাঁটা মেরে গ্রাম থেকে দূর করে দিয়েছিল, কে পরিশ্রম করে, কে যত্ন করে, চেষ্টা করে সম্পত্তি ফিরিয়েছিল ? কে তোকে বাঁচাইয়াছিল ? তুই কারো নয়, বাপের নয়, ভায়ের নয়, স্বামীর নয়, খোদা তায়ালার নয়, যার পরকালের ভয় নাই, ধর্মে যার ভক্তি নাই, সৎ ইচ্ছা যার মনে নাই, ঠকান কথা ছাড়া যে ভাল কথা জানে না, মন্দ পথ মন্দ ছাড়া যে ভুলে ও ভাল পথে পা ফেলে না,

Dhaka University Institutional Repository

ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে যে পর্দার ধার ধারে না, হাটবাজার ঘাট বাগান যে মানে না, তার আবার নারী ধর্ম কি ? তার অন্তরে মায়ামমতা কি [১৬২]?

.. ভেড়াকান্ত বাবু চল্লিশ হাজার টাকা জামিনে আপীলের বিচার পর্যন্ত খালাসের হুকুম জেলার জজ সাহেব দিয়েছেন। সেই সকল এয়ার বন্ধুবান্ধব নিকট ভেড়াকান্তর স্ত্রী লোক পাঠাইলেন ? .. সোনা বিবি জামিনীর জন্য খুব ব্যস্ত হইয়াছেন ...। ভেড়াকান্তর বন্ধু মহশায়রা একেবারে অদৃশ্য, সোনা বিবি ও হয়রান। কেহই জামিন হইতে চাহে না, চুপি চুপি বলে ' চল্লিশ হাজার টাকা, কম কথা। ভেড়াকান্ত জেল হতে বাহির হয়েই যদি সটকে পড়েন তখন ? তখন জামিনদারের ঘাড়েই চাপ। বাপরে বাপ, চল্লিশ হাজার'। ভেড়াকান্ত বাবুর দুইটি নিঃস্বার্থ বন্ধু উকিল যাহারা গ্লাসের এয়ার নহেন তাহারাই চল্লিশ হাজার টাকার জামিন হইয়া ছিলেন [১৬৩]। ... ১৩১৫ সালে বৈশাখ মাসে গোরাচাঁদ রোডে বাটীতে থাকিতে টাঙ্গাইল দেলদুয়ারের জমিদার শ্রীমতি রাহাতন্নেসা চৌধুরানী চাকর চাকরানী সহ আসিয়া ৪/৫ ঘন্টা ছিলেন, কুলসুম বিবিকে তিনি ভালবাসিতেন। দেলদুয়ার থাকার সময় পুত্রবধুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপন বাটিতে লইয়া ৩/৪ দিন রাখিতেন, রেশমী বানারসী শাড়ী নগদ টাকা দিয়া মর্যাদা রক্ষা করিতেন। কলিকাতায় কুলসুম বিবি সহ রাহাতন্নেসার দেখা হইলে বলিয়াছিলেন, বউ মা' টাঙ্গাইলে থাকার সময় তোমার বাড়ী গিয়া কতদিন দেখিয়াছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, বিশেষ রান্না ঘর পরিষ্কার রাখিতে তোমার মত কেহই পারিবে না। আমার ৫০ জন দাসী সে সময় ছিল, আমি পারি নাই। তোমার নিকট হার মানিয়াছি। দেখি এই খানে কলিকাতায় কি অবস্থায় থাক তাই দেখতে যাইব[১৬৪]। তাহাতেই আসিয়াছিলেন। আসিয়া এক সন্ধ্যা আহার করিয়া যাইবার সময় কুলসুম বিবি হাতে ২০ টাকা নোট দিয়া বলিলেন মা ! - বৌ মা! আমার বাবা যেন এ টাকার কথা শুনে না। বিশ টাকার কথা শুনিলে বাবা আমার মনে মনে বিরক্ত হইবে। আমি তাহাকে যখনই টাকা দিয়াছি হাজার, পাঁচশত টাকার কম টাকা তাহার হাতে দিতে আমার সাহস হয় নাই [১৬৫]।... তোমার মুখের কথা ইশ্বর ইচ্ছায় অন্যথা হয় না। অনেক কথা আমার মনে আছে। দেলদুয়ারের নজমন নেসার মধ্যম কন্যা যাহাকে মেজবিবি বলে, তুমি বাঙালা ১২৯২ সালে বলিয়া রাখিয়াছ- চিঠি লিখে বলিয়া রাখিযাছ ' তোমার বিবাহ হইবে না। যদি হয় তবে আমার সঙ্গেই হইবে। নাতীন সম্পর্কে সকলেই হাসিয়া অস্থির। সেই যে বেদবাক্য ন্যায় বলিয়া রাখিয়াছ আজ পর্যন্ত ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ন মাস, দুই যুগেরও উপর গত হইয়া গেল বিবাহ হইল না। এখনত বৃদ্ধা আর বিবাহ কি ? সেই সময় ৩৫/৩৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল [১৬৬ক]" ।

খোন্দকার আবদুর রহিমের মতে, মীর মশাররফ হোসেনের দেলদুয়ার আগমন, ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন, বস্তানীর বিবরণ উপাখ্যণিক অতিয়াজন সত্ত্বেও বহুলাংশেই সত্য। দেলদুয়ার জমিদারির চার তরফের মহিলা জমিদারদের ইর্ষা, বিদ্বেষ, সংঘাত ও মামলা মোকাদ্দমার বহু তথ্যই সঠিক[১৬৬খ]। তার মতে- " মীর মোশাররফ হোসেনের পৈতৃক জমিদারীর বিভিন্ন মহল নিলামে বিক্রি হয়ে এমন পর্যায়ে এসেছে যে, জমিদারী আয়ের উপর ইজ্জতের সাথে বাস করা দায় হয়ে পড়েছে। মীর সাহেব তাই এমন একটা চাকুরীর সন্ধান করছিলেন যাতে জমিদারদের শরাফতি বজায়

থাকে। আবার বেগম করিমুন্নেসাও এমন একজন ম্যানেজার সন্ধান করছিলেন, যিনি শরাফতির মাপকাঠিতে কম না হন। ... জমিদারদের ম্যানেজার হিসেবে সে আমলে সমাজে যে কদর পাওয়া যেতো, সেটা অনেক সময় জমিদারকেও ছাড়িয়ে যেত। বেগম করিমুন্নেসা এস্টেটের ম্যানেজার হিসেবে, তদপুরি তার কালজয়ী প্রতিভার বলে মীর সাহেব অল্প কালের মধ্যেই টানআইল মহকুমায় বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হলেন। মহিলা জমিদারকে প্রজাগন দেখতে পেতো না, দেখতো তার ম্যানেজার মীর সাহেবকে। প্রজাগণ তাই ইজ্জত দিতে হলে মীর সাহেবকেই দিতো[১৫৭]।

সে সময়ে দেলদুয়ারের বিভিন্ন তরফের মধ্যে রেষারেষি, ইর্ষাপরায়নতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। জমিদারীর চারটা তরফেই মহিলা কর্মকর্তা। 'স্ত্রী লোক ইর্ষার বশবর্তী হলে শয়তানকেও ছাড়িয়ে যায়' এবং 'স্ত্রীলোকের ঘাট গোলমালের হাট ' - এই প্রবাদ সকলের জানা। দেলদুয়ারের চারটি তরফে ইর্ষার এমন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যার ফলে মীর মশাররফ হোসেনকে দেলদুয়ার এস্টেট থেকে মানে মানে সরে পড়তে হয়েছিল[১৫৮]। দেলদুয়ার জমিদারী এ মহল সে মহলে যে সব মামলা মোকাদ্দমা লেগেই ছিল তার মধ্যে চারটি তরফই কম বেশী জড়িত থাকতেন। সেই সব মোকদ্দমার দিন তারিখ এসে গেলেই চারটি তরফের একটি মিলিত শলাপরামর্শ দরকার হতো, কিন্তু কে করে সেই শলাপরামর্শ ? চারটি তরফের মধ্যে একরূপ মুখ দেখাদেখি বন্ধ। মীর সাহেব নিজ প্রচেষ্টায় এই অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার কোশেশ করতে লাগলেন[১৫৯]। তিনি জমিদারীর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন বেগম করিমুন্নেসার সংগে শলাপরামর্শ করতেন, তার হুকুম হাকাম তামিল করার চেষ্টা করতেন, তেমনি অপর তিনটি অর্থাৎ বেগম রাহাতুন্নেসা, বেগম নুরুন্নেসা ও বেগম নজমুন্নেসার সাথেও প্রয়োজন মাফিক দেখা সাক্ষাৎ করে শলা পরামর্শ করতেন। কিন্তু মীর সাহেবের এই ধরনের অবাধ মেলামেশার ফল ভাল হওয়ার পরিবর্তে কালক্রমে সেটা খুব খারাপের দিকেই মোড় নিলো।

মীর সাহেব কোন তরফে, কোন দিন গিয়ে অনেক সময় নিরিবিলিতে কাটিয়েছেন, কার সাথে শলা পরামর্শ করতে গিয়ে একটু বেশী ঘন হয়ে মিশেছেন ইত্যাদি কানাঘুষা দিন দিন বেড়েই চলতে লাগলো। পরে সেই কানাঘুষার চারটি তরফের মধ্যে ঈর্ষার আগুন দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিল। বেগম করিমুন্নেসার সাথে মীর সাহেবের মন কষাকষি প্রথম প্রথম ছিল কিছুটা অভিমানের পর্যায়ে ; কিন্তু শেষে সেটা দাঁড়ালো শক্রতায়। ফলে একদিন নীরবে লোক চক্ষুর আড়ালে দিয়ে মীর সাহেবকে টানআইল থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়তে হলো রংপুরের উদ্দেশ্য। রংপুরে অবস্থান কালে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করে

দেলদুয়ার এস্টেটের স্মৃতি কথাই লিখেছেন 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপাখ্যানে[১৫০]। এতে অতিশয়োক্তি যাই থাকুক না কেন, এ কথা কারো অবিদিত নেই যে, দেলদুয়ারে সে সময়ে বিভিন্ন তরফে জমিদারী করেছেন চারজন পরমা সুন্দরী গুনবতী মহিলা। উল্লেখ্য সেই একই সময়ে পার্শ্ববর্তী সন্তোষের ছয় আনি ও পাঁচ আনি তরফের হিন্দু মহিলা জমিদার ত্রয় যথাক্রমে জাহ্নবী চৌধুরানী, দিন মনি চৌধুরানী ও বিন্দু বাসিনী চৌধুরানী। রেষারেষি করে ক্ষমতার বাহার দেখিয়েছেন ; তাই নয়, প্রজাদের জানমাল নিয়ে কত রকমের হোলি খেলা যায় তার প্রতিযোগিতাও করেছেন অনেক সময়। উঠানে দেয়াল দিয়ে স্বত্ব আলাদা করেছেন, প্রজাপত্তন আলাদা করেছেন। হাট বাজার আলাদা করেছেন[১২৩৪]। শুধু দেলদুয়ার ও সন্তোষেই নয় সমকালীন টাঙ্গাইলে এই সময় অধিকাংশ জমিদারীতে মহিলা নেতৃত্বের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল"।

Dhaka University Institutional Repository

২.৮ দেলদুয়ারের জমিদারদের বহুমুখী প্রতিভা ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ঃ

গজনবী বংশধারা ও দেলদুয়ার জমিদারীর পারিবারিক ইতিহাসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো- আন্তঃ জমিদারী গন্ডি পেরিয়ে একটি প্রতিভাশালী জমিদার পরিবারে জমিদার আবদুল হাকিম খান গজনবীর বিয়ে। এই বিয়ের গুরুত্ব এই যে, গজনবী বংশের অন্য ধারা গুলো প্রধানত আন্তঃ পারিবারিক বিয়ের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়, কেবল একটি মাত্র ধারাই টিকে থাকে[৭৩]। অপর দিকে শিক্ষিতা ও প্রতিভাশালী মাতা করিমুন্নেসার প্রভাবে, খালা বেগম রোকেয়া এবং মামা সাবের ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাবে দেলদুয়ার জমিদারীতে দু'কীর্তিমান পুরুষের আর্বিভাব হয়েছিল। বস্তুত করিমুন্নেসা না হলে, স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর দুই শিশু সন্তানকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া ও এক সন্তানকে বিলেতে পাঠিয়ে উচ্চ শিক্ষা দান সম্ভব ছিলনা। একই সাথে দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল, কলকাতায় ছুটাছুটি করে একজন মহিলার পক্ষে জমিদারী পরিচালনা করা তৎকালীন পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মোটেই সম্ভব ছিল না। যদি তা সম্ভব না হতো তবে আবদুল করিম ও আবদুল হালিম দেলদুয়ার-টাঙ্গাইলের আট দশজন সাধারণ জমিদার ও নিজ বংশের অন্য সাধারণ জমিদারদের মতোই একজন অর্ধশিক্ষিত, অখ্যাত জমিদারই থেকে যেতেন। নবাব স্যার আবদুল করিম গজনবী ও স্যার আবদুল হালিম গজনবী হতে পারতেন না। খেলাফত আন্দোলন খ্যাত মাওলানা আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় নাম, যশ,খ্যাতিতে বাংলার সীমা ছাড়িয়ে সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে ব্যাপ্ত হতে পারতো না।

উনিশ শতকের শেষ লগ্নে যখন বাংলা ও ভারতীয় মুসলমানদের তিন নেতা যথাক্রমে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও স্যার সৈয়দ আহমেদ খান নেতৃত্বের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেয় তখন মুসলমান সমাজ হয়ে পড়ে নেতৃত্ব হারা। দীর্ঘ এক দশকের (১৮৯৫-১৯০৫) নেতৃত্ব শূন্যতার পর বাংলায় বহু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নেতার পাশাপাশি তিনজন অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্বের আর্বিভাব হয়। তারা তিনজনই ছিলেন অবহেলিত পূর্ববাংলার তথা আজকের বাংলাদেশের। তারা হলেন যথাক্রমে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও নবাব স্যার আবদুল করিম গজনবী। এদের পাশাপাশি কিংবা পরবর্তী সারিতে ভূমিকা পালনকারী আর তিন জনের নাম করতে হলে চলে আসবে যথাক্রমে শায়স্তাবাদের নবাব মীর মোয়াজ্জেম হোসেন, বগুড়ার নবাব সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী ও দেলদুয়ারের স্যার আবদুল হালিম গজনবীর নাম। অবদান ও কৃতকর্মে প্রথম সারিতে আসতে পারেন

Dhaka University Institutional Repository

এমন কোন মধ্যবিত্ত নেতা দু'দশক পর্যন্ত আর্বিভূত হননি। দ্বিতীয় সারিতে আসার মতো ছিলেন কেবল স্যার আবদুর রহিম, ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল ও শেরে বাংলা একে ফজলুল হক । তন্মধ্যে শেরে বাংলাকে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের (১৯৩০-৬০) ত্রিশ দশকের প্রথম সারির প্রধান নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এ প্রজন্মের অপর দু নেতা হতে পারেন শহীদ সোহরাওর্য়াদী ও খাজা নাজিমুদ্দীন। বস্তুতঃ বিশ শতকের তিন দশকের (১৯০০-১৯৩৭) বাংলার মুসলমানদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও ব্যতিক্রমী ধারার প্রবক্তা হিসেবে আর্বিভূত হন নবাব স্যার আবদুল করিম গজনবী। শিক্ষিত মাতা করিমুন্নেসা খানমের তত্ত্বাবধানে কলকাতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে আবদুল করিম গজনবী ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন।

অতঃপর ইংল্যান্ডের ডেভেন শায়ার অন্তর্গত এক্সমাউথের সেন্ট পিন্টার্স স্কুল, লন্ডনের মেসার্স রেন এ্যান্ড গ্যাটে ইনষ্টিটিশন ও লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর জার্মানীর জেনা ইউনিভার্সিটি এবং ফ্রান্স ও ইটালী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করে ইংরেজির পাশাপাশি জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইটালী প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ১৮৯০ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে আই,সি,এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সরকারী চাকুরীতে যোগদান না করে, আরো তিন বছর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমন ও বহু ভাষা শিক্ষা লাভ করে অবশেষে ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে এসে নিজ হাতে জমিদারী পরিচালনা করেন[১২৫]। মিহির ও সুধাকর গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান পিতৃবংশীয় চারান নিবাসী পন্ডিত রিয়াজ উদ্দীন মাশহাদীকে কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপনার চাকুরী ছাড়িয়ে দেলদুয়ার জমিদারীর এস্টেট ম্যানেজার নিযুক্ত করেন[১২৬]।

ইউরোপীয় উচ্চ শিক্ষা ও প্রাগ্রসর চেতনায় উজ্জীবিত আবদুল করিম গজনবী নিজেদের জমিদারীর ক্ষুদ্রতা এবং কৃষকদের মধ্যে প্রথাগত উৎপাদনমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করলেন। তিনি সীমিত সম্পদকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে জমিদারীর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করলেন অর্থাৎ জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে লাগলেন। মধুপুর বনাঞ্চলে সাগর দীঘি কাছারি[১২৭] সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শরীকদের সম্পত্তি এবং টাঙ্গাইলের অথচ অন্য জেলাবাসী জমিদারদের জমি লিজ নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে লাগলেন। চাষে প্রথম আধুনিক ট্রাকটর প্রযুক্তি ব্যবহার করলেন। বনায়ন করে তার বাণিজ্যিক উপযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে অল্প দিনের মধ্যেই জমিদারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনলেন। এভাবে জমিদারী আয় কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেললেন। জমিদারদের আন্তঃ পারিবারিক বিরোধ তার

উপস্থিতিতে তিরোহিত হলো। তার শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের কাছে অন্যান্য শরীকগণ উদারচিত্তে আত্মসমর্পণ করলো। অচিরেই অন্যান্য শরীকদের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর ফলে একে একে সকল এস্টেট (প্রায় ১৩টি) তার অধীনে চলে এসে বিশাল জমিদারীতে পরিণত হলো[১৫৭]। যদিও তখন জমিদারী যুগের পরিবর্তে প্রজা যুগের উত্থান পর্ব চলছিল[১৫৮]। বাংলায় বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করে জমিদাররা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে প্রজাদের অতি কাছাকাছি চলে আসে। উচ্চ প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবহুল বর্ণাঢ্য জীবনে[১৫৯] বহুমুখী অবদান রেখে ১৯৩৮ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তার মৃত্যুর পর নাম মাত্র জমিদারীর দায়িত্ব পালন করেন ছোট ভাই ব্যবসায়ী স্যার আবদুল হালিম গজনবী। প্রকৃত পক্ষে স্থানীয় ভাবে একমাত্র পুত্র ইস্কান্দার সাঈদ খান আবু আহমেদ গজনবী[১৬০] দেলদুয়ার-টাঙ্গাইলে থেকে জমিদারী পরিচালনা করেন।

স্যার আবদুল হালিম গজনবী কলকাতার সিটি কলেজ স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন [১৬১]। তিনি বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অধিকারী এবং সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জমিদারী দায়িত্বও পালন করেন। উভয় ভ্রাতার রাজনৈতিক চিন্তা এবং কর্মজগত স্বতন্ত্র হলেও পারিবারিক সুসম্পর্কে উভয়ে যৌথ পরিবারের অধীনে ছিলেন। যদিও কলকাতায় উভয়ের স্বতন্ত্র বাড়ী ছিল। দেশ বিভাগ পূর্বে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং দেশ ভাগের পর টাঙ্গাইলে এসে বসবাস করেন[১৬২]। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ১৯৫৩ সালে টাঙ্গাইল শহরে শান্তিকুঞ্জে মৃত্যুবরণ করেন[১৬৩] ও দেলদুয়ারে শায়িত হন। তার জীবদ্দশায় পূর্ব বাংলা জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ ও তার মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালে জমিদারী উচ্ছেদের সময় এবং ১৯৬০ সালে ক্ষতিপুরণ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত আবদুল হালিম গজনবীর অংশসহ সকল অংশের জমিদারী দায়িত্ব পালন করেন আবদুল করিম গজনবীর একমাত্র পুত্র ইস্কান্দার সাঈদ আবু আহমেদ খান গজনবী[১৬৪]। জমিদারী উচ্ছেদ হলেও ১৯৭১ এর পূর্ব পর্যন্ত টাঙ্গাইলের রাজনীতিতে ও সমাজে দেলদুয়ার জমিদার পরিবার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে[১৬৫]।

আবদুল করিম গজনবী ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে আপন ফুফাত বোন সাইয়্যেদুন্নেসা খানমকে বিয়ে করেন। সাইয়্যেদুন্নেসা খানমের ঔরষে একপুত্র ও চার কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। চার কন্যার তিন জন জমিদার বাড়ীতে, একজন উচ্চ শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত পরিবারে বিয়ে হয়। বড় মেয়ে দিল

সুলতানার সাথে বিয়ে হয় কুমিল্লার রতনপুরের জমিদার নবাব স্যার কে,জি,এম ফারুকীর সাথে[১৬২]। নবাব ফারুকী সমসাময়িক কালে বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জমিদার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একই বংশে ভ্রাতা, শ্বশুর,জামাতা তিনজনে নবাব ও স্যার উপাধি প্রাপ্তি সমকালীন ইতিহাসে বিরল। যা এই পরিবারের বিশেষত্বেরই ইঙ্গিত করে। সম্ভবতঃ এই দিক থেকে কেবল ঢাকার নবাব পরিবারের সাথেই তাদের তুলনা হতে পারে। তবে ঢাকার নবাবদের উপাধি ছিল বংশগত ও অনেকটা ভূরাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে। কিন্তু দেলদুয়ার সংশ্লিষ্ট এই তিন ব্যক্তিত্বকে স্ব স্ব যোগ্যতা প্রদর্শন, দেশসেবা ও একই সাথে ইংরেজ প্রশাসনে সেবার কৃতিত্ব অর্জন করেই পেতে হয়েছে। মেঝ মেয়ে জাহেরা সুলতানার বিয়ে হয় কুমিল্লার লাকসামের জমিদার আহমেদ নওয়াব খানের সাথে। মেঝ মেয়ে সোফিয়া সুলতানার বিয়ে হয় ঢাকার খানবাহাদুর রেজাউর রহমান খানের সাথে[১৬৩]। ছোট মেয়ে আবেদা সুলতানার বিয়ে হয় করটিয়া জমিদার মাসউদ আলী খান পন্নীর সাথে[১৬৪]। একই পরিবারে বিয়ে করেন আবদুল হালিম খান গজনবী। তিনি মাসউদ আলী খান পন্নীর ফুফু মরিয়াম খাতুনকে বিয়ে করেন।

২.৯ ঃ দেলদুয়ার জমিদারদের আত্মীয়তা সূত্রে অন্যান্য জমিদার বংশের বৈশিষ্টের তুলনামূলক আলোচনাঃ

দেলদুয়ার জমিদারীর মূল উৎস আতিয়া পরগনা জমিদারী[১৭২]। মূল জমিদারের বংশ ধারা বাংলার জমিদারী ব্যবস্থার শেষ পর্বে এসে করটিয়া ও গোড়াই জমিদারী নামে পরিচিত হয়। এই জমিদার বংশ পাঠান বংশীয় পন্নী জমিদার নামে পরিচিত। যার প্রতিষ্ঠাতা সাঈদ খান পন্নী ১৬০১ সালে মতান্তরে ১৬০৮ সালে আতিয়া পরগনা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং বংশ পরম্পরায় জমিদারী স্বত্ব ভোগ অধিকার লাভ করেন। বাংলার বৈচিত্র্যময় জমিদারী ইতিহাসের নানা উথান পতনে কোন মুসলমান শাসকের অধীন কোন পরগনাই চারশত বছর ব্যাপী টিকে থাকে নি। আতিয়াই সম্ভবত একমাত্র পরগনা যেখানে আদি মুসলমান জমিদার বংশ ধারা অসংখ্য উত্তরাধিকারী স্বত্বে বিভক্ত হয়েও টিকে থাকে। কিয়দংশ নয়া হিন্দু জমিদারদের নিকট হারালে ও শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর অংশ নিয়ে নিজেদের জমিদারী ধরে রাখতে সমর্থ হয়। সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত না হলেও গবেষক ঐতিহাসিকগণ এই পন্নীদেরকে বাংলার স্বাধীন আফগান শাসক কররানী পরিবারের সুলতান বায়েজিদ খান কররানীর বংশধর বলে অভিহিত করেন। সুতরাং এই পরিবার এবং শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ওসমান খান লোহানীর বংশধর গজনবী পরিবারকে বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসের ধারাবাহিকতার একটি প্রতীক বলা যেতে পারে। গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দেলদুয়ারের এই গজনবী পরিবার।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, বাংলার অনেক জমিদার পরিবার ১৯৫০-৬০ দশকের জমিদারী উচ্ছেদের পর এবং সর্বশেষ ১৯৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে বাংলার ইতিহাস থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু গজনবী, পন্নী ও সৈয়দ বংশের টাঙ্গাইলের জমিদার পুত্ররা আজো জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন থেকে বাংলার আর্থ-সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

সাঈদ খান পন্নী থেকে ৫ম পুরুষ স্তরে এসে মোনায়েম খান ও মোহাম্মদ খান[১৭৩] এবং মতান্তরে ৬ষ্ঠ স্তরে এসে খোদা নেওয়াজ খান ও নবী নেওয়াজ খান[১৭৪] এর মধ্যে প্রথম বার জমিদারী বড় আট আনা ও ছোট আট আনা এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। অতঃপর ৮ম স্তরে এসে ১৭৯৭ মতান্তরে ১৮০৯ সালে উভয় তরফ আবার মোট ৭টি শরীকে বিভক্ত হয়[১৭৫]। ৯ম স্তরে এসে ১৮৫০ সালের দিকে উভয় তরফ

যথাক্রমে সাত ও চারটি মোট ১১টি শরীকে বিভক্ত হয়[১৭৭]। ১০ম স্তরে এসে ১৮৮০ সালের দিকে ১৬টির অধিক শরীকে বিভক্ত হয়[১৭৮]। ১১শ স্তরে এসে ৩০টির অধিক শরীকানায় বিভক্ত হয়[১৭৯]। দ্বাদশ স্তরে এসে কিছুটা. হ্রাস পেয়ে ২৮ টির অধিক শরীকে বিভক্ত হয়[১৮০]। ত্রয়োদশ স্তরে এসেও প্রায় সম সংখ্যক শরীকে বিভক্ত হয়[১৮১]। এস্তরে এসেই মূলতঃ জমিদারী উচ্ছেদ হয় এবং জমিদারী ক্ষতিপুরণের পর প্রাপ্ত ভূমি নিয়ে শরীকদের মধ্যে মনোমালিন্য এবং অধিকাংশ শরীকদের মধ্যে মামলা মোকাদ্দমা ইত্যাদি ব্যাপকতা লাভ করে।[১৮২] অবশ্য এটা দক্ষিণ বাড়ীর সৈয়দ জমিদারী ও পন্নী জমিদারীতে বেশী দেখা যায়।

২.১০ জমিদারী উচ্ছেদ পরবর্তী জমিদার বংশধরদের বর্তমান পারিবারিক অবস্থা ঃ

চর্তুদশ স্তরে বাংলাদেশ পর্বে এসে দেখা যায় বর্তমান প্রজন্ম যারা অধিকাংশই শেষ জমিদারের পুত্র কেউ কেউ পৌত্র বিশেষ। বর্তমানে ১০টি অপ্রধান ধারা নিয়ে প্রতিটি ধারায় গড়ে ৫ থেকে ৬ জন করে শতাধিক বয়স্ক শরীকে বিভক্ত[১৮৩]। পঞ্চদশ স্তরে বর্তমান পরিবার প্রধানদের পুত্র কন্যাদের সংখ্যা গড়ে ৩ জন করে তিন শতাধিক হবে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা তাদের আত্মীয় জমিদার পরিবার যথাক্রমে বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, শায়েস্তাবাদ, কুমিল্লা ও ঢাকার বিভিন্ন মৌল জমিদারীতে[১৮৪] সম সংখ্যায় রয়েছে আনুমানিক হিসেব মতে (৩ × ৬ × ১০ = ১৮০০) প্রায় দু হাজার জমিদার বংশীয় বর্তমান প্রজন্মের সদস্য সদস্যা বিদ্যমান। যারা দেশ, বিদেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন পেশায় জালের মত ছড়িয়ে আছে।

দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুরুষ খোদাদাদ খান গজনবী আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির উচ্চ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে ব্যবসা করছেন, গুলশানে নিজস্ব দ্বিতল বাড়ী। দেলদুয়ারের বাড়ীতে নিয়মিত আসা যাওয়া করেন। তার স্বনামধন্য স্ত্রী সৈয়দা রুবী গজনবী একজন প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব। তাদের দু সন্তান রয়েছে।

দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মারহামাত আলী একজন আইনজীবী। বর্তমানে উত্তরা ৪নং সেক্টরে দ্বিতল বাড়ীতে অবসর জীবন যাপন করছেন। তার তিন সন্তান রয়েছে। দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর অন্যান্য জমিদার পুত্র ও কন্যাগণ উত্তরা, গুলশান ইত্যাদি অভিজাত এলাকায় উচ্চ মধ্যবিত্তের জীবন যাপন করছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ বাড়ীর জামাতা সাবেক সেনা প্রধান লেঃ জেঃ আতিকুর রহমান উত্তরা ৩নং সেক্টরে নিজ তিনতলা বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বসবাস করছেন।

করটিয়ার পন্নী পরিবারের তিনটি ধারাই ঢাকা ও টাঙ্গাইলে সচ্ছল এবং কর্মময় জীবন যাপন করছেন। করটিয়ার জমিদার বংশধর হুমায়ুন খান পন্নী ১৯৯১-৯৫ মেয়াদে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ছিলেন। তার অন্যান্য ভ্রাতা ও ভ্রাতুষপুত্রগণ টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তার ভ্রাতুষপুত্র ওয়াজেদআলী খান পন্নী একই মেয়াদে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। স্বনামধন্য কুটনৈতিক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাকুল্লা জমিদারদের দুটি ধারা ঢাকা ও পাকুল্লায় সচ্ছল জীবন যাপন করছেন। তবে একটি ধারা তুলনামূলক অসচ্ছল। ধনবাড়ীর জমিদার বংশধরগণ তুলনামূলক ভাবে স্বচ্ছল ও অভিজাত জীবন যাপন করছে। পাবনার দুলাই জমিদারগণ পাবনা শহরে ও ফরিদপুর শহরে মধ্যবিত্তের জীবন যাপন করছে। বগুড়ার সৈয়দ নবাববংশধরগণ বগুড়া শহরে, পাকিস্তানে, আমেরিকায় অভিজাত জীবন যাপন করছে।

তথ্যসূত্র

১। দেলদুয়ার ফার্সী শব্দ, উর্দুতেও প্রচলিত, কিভাবে এটি দেলদুয়ার নাম হয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮৫০ সালের প্রথম রেভেনিউ সার্ভেতে দেখা যায় এটি একটি গ্রাম ও জমিদারী মহল। ১৮৮৫ সালে বিভিন্ন স্থানে ৮,০০০ জন সংখ্যা ও ১০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হলেও দেলদুয়ার ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের সময়কাল ১৯২৪ বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়(মোহামদ বাকের সম্পাদিত, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ , ১৯৯৭- পৃ- ১৮৯ (অধ্যায়- টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ প্রশাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থার ইতিহাস)

২। আতিয়া আরবী শব্দ, যার অর্থ 'দান'। বাজুহা ও সোনার গাঁও সরকারের শাসক, জমিদার ও বারভূইয়া নেতা, পরবর্তীকালে মোগল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত উভয় সরকারে মোট ২২ পরগনার শাসক ঈসাখাঁ কর্তৃক ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে যমুনা থেকে জেগে ওঠা নতুন চরাভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুটি নতুন পরগনা পত্তন করেন যথাক্রমে আতিয়া ও কাগমারী। আতিয়ার শাহবাবা আদম কাশ্মীরির মাজার পরিচালনা ও জনকল্যানে এই নয়া পরগনা তার শাসককে দান করা হয় বলে এটিকে 'আতিয়া' বা দান খয়রাতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত পরগনা বলে স্বয়ং ঈসা খাঁন উল্লেখ করেন। (খোন্দকার আবদুর রহিম, টাঙ্গাইলের ইতিহাস, পাটুয়াটুলী-ঢাকা থেকে মুদ্রিত-১৯৭৭, ১৯৮১ ও ১৯৮৬ পৃ- ১৪) উল্লেখ্য ১৭৯০ সালে কর্ণওয়ালিশ কোড প্রতিষ্ঠার পর প্রাচীন আতিয়া গ্রাম ও ফৌজদারী কেন্দ্রে নয়া থানা চৌকি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আতিয়া বা তার অংশ বিশেষকে ঢাকা জেলার অধীনে নেয়া হয়। ১৮৪৫ সালে পুনরায় জামালপুর মহকুমার অধীনে নেয়া হয়। ১৮৬৬ সালে পুনরায় ময়মনসিংহের অধীনে নেয়া হয়। ততদিনে মফস্বল শহর হিসেবে এটি গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ১৮৬৭ সালে একে ময়মনসিংহ জেলার অধীনে মহকুমা সদরে উন্নীত করা হয়। ইংরেজ কর্মকর্তা ও সন্তোষের হিন্দু জমিদারদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে ১৮৬৯ সালে আতিয়া থেকে 'মহকুমা' প্রশাসনিক সদর দপ্তর সন্তোষের নিকটবর্তী নতুন একটি বাজার 'টানআইল' নামক গ্রামে স্থানান্তর করা হয়। ১৮৭০ সাল থেকে 'আতিয়া' 'টাঙ্গাইল' পরিচয়ে পরিচিত হয়। ফলে শহর আতিয়া বা কসবা আতিয়া তার শহুরে

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিতি হারিয়ে ধীরে ধীরে গ্রাম আতিয়া'র পুরনো ইতিহাসে ফিরে যায়। এভাবে একটি গ্রামের শহরে পরিণত হওয়া এবং আবার শহর থেকে গ্রামে পরিণত হওয়ার চমকপ্রদ লোকিক ইতিহাস গবেষণার উপজীব্য বিষয়। এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে ইতিহাসের আরো অজানা তথ্য। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালে এসে এই 'আতিয়া' গ্রাম পুনরায় একটি ইউনিয়ন পরিষদে উন্নীত হয়। যে পন্নী জমিদার পরিবারের জন্য 'আতিয়া' সমগ্র মুঘল ও নবাবি আমলে খ্যাত ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সেই পন্নী পরিবার গোড়াইতে তাদের জমিদারী সদর স্থানান্তর করে। অতঃপর ১৮৬৯ সালে মহকুমা সদর প্রশাসন স্থানান্তর হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে শহর 'আতিয়া'র অপমৃত্যু ঘটে। প্রজাস্বত্ব যুগে তাই আমরা 'আতিয়া' এর পরিবর্তে নিকটবর্তী দেলদুয়ার,করটিয়া ও টাঙ্গাইল এই তিনটি স্থানের বিকাশ দেখতে পাই। নিঃসন্দেহে তিনটি জমিদার পরিবারের বদৌলতেই তা হয়েছে।।

৩। 'পরগনা' শব্দটি ফার্সী। সুলতানী আমলে 'অরসাহ' (এর শাসক কে 'জমাদারই গাহির মুহুল্লী' বলা হতো) বা 'মহাল' শেরশাহের আমলে এসে সর্বনিম্ন রাজস্ব ও প্রশাসনিক ইউনিট 'পরগনা' নামে পরিবর্তিত হয়। এর নিম্নে স্থানীয় ইউনিট ছিল 'মহল' বা 'গ্রাম' নামে। সে সময় থেকে কয়েকটি ছোট পরগনা নিয়ে অথবা একটি বড় পরগনা নিয়ে একটি ফৌজদারী বা পুলিশি কেন্দ্র ছিল অনেকটা দুর্গ কেন্দ্রিক সেনা ছাউনির মত। মুঘল আমলে প্রশাসনিক ভাষায় 'পরগনাদার' এবং কথিত ভাষায় পরগনা শাসকদের 'জমিদার' বলা হতো। অবশ্য পরগনাদার ছাড়াও আরো দুই ধরনের 'জমিদার' মুঘল ও নবাবি আমলে বিদ্যমান ছিল। ইংরেজ বন্দোবস্তে অনেক 'তালুকদার' শ্রেণী ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়। (নজরুল ইসলাম, মুসলমান শাসনাধীনে আটিয়ার ইতিহাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, সপ্তদশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯ পৌষ, ১৪০৬; আবদুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১ম ও ২য় খন্ড দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ বাকের, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (সম্পাদিত) দ্রষ্টব্য; Sirin Akhter, *'The Role of the Zamindars in Bengal, 1707-1772*, Asiatic Society of Bangladesh 1982, Dhaka; W.K. Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of The Fifth Report 1812*, Indian Studies, 1962, Neeraj Publishing house, New Delhi, Vol. II; F. A. Sachse, *Final Report*

on the Survey and Settlement Operation in the District of Mymensingh 1908-1919, National Archives, Dhaka; W.W. Hunter, *A Statistical Accounts of Bengal, Vol. V.I, Moymensingh Dist.*, Government of India, 1872, Calcutta; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (তিন খন্ড) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩, নতুন সংস্করণ, ২০০০।

৪। 'চারান' বর্তমান টাঙ্গাইলের একটি অখ্যাত গ্রাম। কিন্তু মধ্যযুগে ও বৃটিশ যুগে এটি ছিল বিখ্যাত গ্রাম। টাঙ্গাহল জেলা গেজিটয়ারের বিবরণ অনুযায়ী, এটি ছিল দেলদুয়ারের গজনবী জমিদারদের আদি বাড়ী। আল্লামা জামাল উদ্দিন আফগানীর অনুসারী, প্রভাবশালী, খ্যাতিমান লেখক ও পন্ডিত রিয়াজ উদ্দিন মাশহাদীর জন্ম স্থান। যিনি 'অগ্নি কুক্কুট' ও সমাজ ও সংস্কার' গ্রন্থদ্বয়ের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এছাড়া ' উদাসী' লেখক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই এর জন্ম স্থান ও বটে। Major General M.A. Latif Ed., *Bangladesh District Gazetters Tangail*, Bangladesh Government Press- 1983, Chapter-XV, The Historical and Importent Places with Architecture, p-282.

৫। কামাল খান লোহানী সম্পর্কে প্রথম তথ্য পাওয়া যায়, কেদার নাথ মজুমদারের 'ময়মনসিংহের বিবরণ' গ্রন্থে অতঃপর এফ. এ. সাকচীর 'সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট' এবং সর্বশেষ খোন্দকার আবদুর রহিমের 'টাঙ্গাইলের ইতিহাস' গ্রন্থে। এছাড়া পাঠান বংশীয় এতদাঞ্চলের পরিবার সমূহের বিবরণ পাওয়া যায়, আবদুল করিম মোক্তারের 'তরফ গোরাঙ্গীর ইতিহাস', নেত্রকোণার হাবিবুর রহমান লোহানী রচিত 'সুলতান মাহমুদ শাহ বাহার খান ও দুদু বেগম', প্রভৃতি গ্রন্থে লোহানী পরিবারের কিছু পরিচিতি পাওয়া যায়। এম. আবদুল্লাহ এর 'বাংলাদেশের দশ দিশারী' গ্রন্থে দেলদুয়ারের গজনবীদেরকে ফতেহদাদ খান লোহানীর বংশধর বলে পরিচয় তুলে ধরা হয়। *Indian year book of 'Whose, who'* এবং *'Night Bachelor'* গ্রন্থে একই তথ্য পাওয়া যায়। অধুনা গবেষক কর্তৃক 'আবদুল করিম গজনবী' স্বাক্ষরিত ১৯৩৬ সালের টাঙ্গাইল রেজিষ্ট্রি অফিসে সিল মোহরকৃত ওয়াকফ দলিল থেকে একটি বংশ তালিকা উদ্ধার করা হয়েছে এতে তাদের পূর্ব পুরুষ ষোড়শ শতকের শেষ বারোভুঁয়া ওসমান খান লোহানীর তথ্য পাওয়া যায়। এ তালিকার সাথে বারোভূঁয়া-মুঘল দ্বন্দ্ব ও সমসাময়িক কালের এতদাঞ্চলের ইতিহাসের সবচেয়ে

Dhaka University Institutional Repository
নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ মির্জা নাথানের "বাহারিস্তান-ই-গায়বী" (বাংলা অনুবাদ) এর তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করে আলোচ্য গবেষনায় লোহানী গজনবী বংশধারার নির্ভুল বংশ তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৬। ওসমান খান লোহানী ছিলেন বাংলার পাঠান কররানী বংশের শেষ সুলতান দাউদ খান কররানীর অন্যতম সেনাপতি, পরবর্তীতে উড়িষ্যার শাসক কুতলু খান লোহানীর ভ্রাতুষ্পুত্র। পিতার নাম ছিল ইসাখান লোহানী (জন্ম ১৫৫২)। দাদা মালিক খানজী লোহানী (১৫২৯-১৫৯৯) শের শাহের অধীনে উত্তর ভারতের ইলোর ও পাহলওয়ানপুরের প্রিন্স ছিলেন। মুঘল সুবাদার সৈয়দ খান (১৫৮৭-১৫৯৪) কর্তৃক উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে কুতলু লোহানী পরিবার কুতলু লোহানীর ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান খান লোহানীর নেতৃত্বে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ভাওয়ালে আশ্রয় নেন। অন্য মতে, সাতগাঁও হয়ে ভুষনায় হাজির হন এবং বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের ভুষণা দুর্গ দখল করেন। শেষে বারভূঁইয়া নেতা ঈসা খানের কুট কৌশলে ভুষনার দুর্গ চাঁদ রায়কে হস্তান্তর করেন এবং ঈসা খাঁ থেকে ময়মনসিংহের বোকাইনগরে স্বাধীন জমিদারী লাভ করেন। বর্তমানে এটি কিশোরগঞ্জ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার অধীনে একটি ইউনিয়ন, সেখানে কেল্লা তাজপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজো বাংলার শেষ স্বাধীন বারভূঁইয়া ওসমান খান লোহানীর স্মৃতি বহন করছে।

(লোহানী গজনবী বংশ তালিকা, ওয়াকফ আল আওলাদ সার্টিফিকেট, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭, মুন্সেফ কোর্ট ও সাব রেজিষ্টার অফিস, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ; মির্জা নাথান, বাহারীস্তান-ই-গায়বী (অনুবাদ), ১ম খন্ড, পৃ-২৫৫-৫৭; হাবিবা খাতুন, ঈসা খাঁ ও সমকালীন ইতিহাস, বংশাই প্রেস, ঢাকা, ২০০০ পৃ- ৪৫; হাবিবুর রহমান খান লোহানী, সুলতান মাহমুদশাহ বাহার খান ও দুদু বেগম, ন্যাশনাল আর্কাইভস লাইব্রেরী, পৃ-২০।

৭। লোহানী বংশ তালিকা, ওয়াকফ সার্টিফিকেট , পূর্বোক্ত; খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত- ১৮৩; পরিশিষ্ট,বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

৮। ১৫০০ সাল থেকে ২০০০ ইং, একটি বংশের উত্থান ও বিকাশ। প্রায় ১৫০০ খৃষ্টাব্দে মালিক খানজী লোহানী গজনী থেকে এসে ইলোরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭৬ সালে পৌত্র কুতলু লোহানী উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৫৯৪ সালের পর ওসমান খান লোহানী ঈসা খানের সাহায্যে বোকাইনগরে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১২ সালে দৌলম্বাপুর যুদ্ধে তাকে হত্যার পর তার

Dhaka University Institutional Repository

বংশধরগণ মুঘল অধীনতা স্বীকার করে এতদাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। লাখেরাজ কিংবা জায়গীর লাভ অথবা সৈনিক বৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। পাঁচ পুরুষ পরে কামাল খান লোহানী কে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানি শাসনের সূচনায় চারানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দেখা যায়। তিনি সম্ভবত উত্তরাধিকার সূত্রেই চারানের তালুকদারী লাভ করেন। (পরিশিষ্ট, বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৯। বাবা শাহ আদম কাশ্মীরি (মৃত্যু-১৫০৮) বাংলায় আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এর শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই কাশ্মীর থেকে গৌড় এবং গৌড় থেকে রাষ্ট্র বিপ্লবের ঝঞ্জা কালে যমুনা নদী (তৎকালে ছোট নদী পুরনো ব্রহ্মপুত্র) পার হয়ে নতুন চরাভূমি আতিয়ায় (তখনো নাম হয়নি) এসে আস্তানা গাড়েন। জীবন সায়াহ্নে তার সাথে এসে যোগ দেন বার বছর বয়সী ভাগ্নে পীর শাহজামান। পরবর্তীকালে কাগমারী পরগনার কথিত শাসক ও পরগনাদার তথা সন্তোষের আদি জমিদার শাহজামান এতদাঞ্চলে ধর্ম ও দ্বীনি শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি আতিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন ও সমাহিত হন। তার সমাধির মাঝার গাত্রের শিলালিপিতে মৃত্যসন লেখা রয়েছে ৭ জমাদিউস সানি ৯১৩ হিজরী(১৪ অক্টোবর ১৫০৭ খৃঃ) কথিত যে তার মাঝারের পাশেই তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ একটি মসজিদ নির্মান করেন। বর্তমানে এটি ধ্বংসপ্রায় এবং এখানে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। (খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত- পৃ- ২৬; বাকের, পূর্বোক্ত পৃ- ৭৯-৮০)।

১০। শাহ সৈয়দ আদম হিন্দী সম্রাট আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিমের সাথে (পরে সম্রাট ১৬০৫-১৬২৭) তার ওস্তাদ হিসেবে ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকা জেলার মকীমপুর পরগনার (বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলায়, নদীভাঙ্গনে প্লাবিত) বিশাল জায়গীর সম্পত্তি লাভ করে এখানে থেকে যান। পদ্মার ভাঙ্গনে তার বংশধররা বৈবাহিক সম্পর্ক সহ বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন দিকে যথাক্রমে শায়েস্তাবাদ, বগুড়া, দেলদুয়ার, পাকুল্লা, বানিয়ারা, ধনবাড়ী প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ মোহাব্বত আলী আদম হিন্দির ৮ম অধঃস্তন বংশধর। আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের দশ দিশারী, পুর্বোক্ত, পৃ-১, অধ্যায়-সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী; Syad Marhamat Ali, *Memories of Delduar Zamindary, 1961*, Tangail

Dhaka University Institutional Repository

(Unpublished Article) p-1 ; মারহামাত আলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত বংশ তালিকা, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১১। ঈসা খাঁর পিতার নাম কালিদাস গজদানী, ধর্মান্তরিত হয়ে সোলায়মান খাঁন নাম ধারণ করেন। (আবদুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড দ্রষ্টব্য, কিন্তু আইন-ই আকবরীতে 'ঈসা আফগান' বলা হয়েছে, এই সূত্রে আবদুল করিম , হাবিবা খাতুন প্রমুখ ঈসা খাঁর পিতা সোলায়মান খানকে আফগান বংশের ইতিহাসে প্রাপ্ত সোলায়মান খাঁ বলে অভিহিত করেন। (হাবিবা খাতুন, ঈসা খাঁ ও সমকালীন ইতিহাস, ঢাকা-২০০০,পৃ-২৮-২৯) কেউ কেউ দুষ্প্রাপ্য 'সালাতে আফগানী' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ঈসা খাঁ, ওসমান লোহানী, সাঈদ খান পন্নীকে আফগান বংশীয় বলে প্রমাণ করেন।

১২। সৈয়দ খান পন্নী, কোথাও 'সাঈদ খান পন্নী' বলে উল্লেখ করা হয়। তার পিতার নাম বায়েজিদ খান কররানী। কারো মতে বাংলার আফগান সুলতান বায়েজিদ খান কররানী কর্তৃক কোচ অভিযানে এসে ' আতিয়া'য় কিছু দিন অবস্থান করেন। এ সময় স্থানীয় কৃষক নারায়ন গড়গড়ির সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করেন। তার ঔরষে সাঈদ খানের জন্ম হয়। আফগান সুলতানদের ক্ষমতা চলে গেলে তাদের আর গৌড়ে যাওয়া হয়নি। মধুপুরে 'কররানীর চালা' নামক স্থানে তিনি রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানা যায়। বায়েজিদ খানের এতদাঞ্চলের অবস্থানের প্রমাণ হচ্ছে, এখনো লোকে ঐ স্থানকে বাইজ খাঁ রাজার বাড়ি হিসাবে চিহ্নিত করে। অপর বর্ণনা মতে, বায়েজিদ খান কররানী একই বংশের মুঘল সৈনিক মাসুম খান কাবুলীর বিদ্রোহী দলে যোগদিয়ে পরাজিত হলে এতদাঞ্চলে পলায়ন করেন এবং স্থানীয় গৃহস্থ মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করেন। তার ঔরষে সৈয়দ খান জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু স্ত্রী কন্যাকে রেখে অচিরেই তিনি মুঘল বাহিনীতে ফিরে যান। আর ফিরে আসার সুযোগ হয়নি। (খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৫-৪১; বাকের, পূর্বোক্ত পৃ-৩৮; মোফাখখারুল ইসলাম, টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ ইতিহাস প্রসঙ্গ, ইতিহাস পত্রিকায় প্রকাশিত; রসিক চন্দ্র বসু, আতিয়ার চাঁদ স্বরনিকা দ্রষ্টব্য, করটিয়া থেকে প্রকাশিত; কেদার নাথ মজুমদার ও খান সাহেব আবদুল্লাহর ময়মনসিংহের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

১৩। ঈসা খাঁনের বংশের কোন কোন ধারা এখনো টিকে থাকলেও বংশধররা কোন গৌরবময় কৃতিত্ব রাখতে ব্যর্থ হয়। যেমন গৌরবময় অবদান রেখেছেন পন্নী,গজনবী ও সৈয়দ জমিদারগণ। F.A.

Sachse এর *Final Report of the Survey and Settlement Operation in the District Mymensingh 1908- 1919* এর পরিশিষ্টে ঈসা খাঁ পরিবারের বংশতালিকা দ্রষ্টব্য।

১৪। চারানের কামাল খান লোহানীর বড় মেয়ে রৌশন খাতুনের সাথে পন্নী পরিবারের পাকুল্লা নিবাসী ছোট তরফ আলিয়ার খাঁন পন্নীর একমাত্র ছেলে জাহাইয়ার খান পন্নীর সাথে বিবাহ হয়। বিয়ের অল্পকাল পরেই জাঁহাইয়ার খান পন্নী নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর রৌশন খাতুন পাকুল্লা থকে দেলদুয়ারে নতুন বাড়ী নির্মাণ করে ৯ নং তৌজিতে দেলদুয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫। Syad Marhamat Ali, *Memories of Delduar Zamindary* (Unpublished); p-1-2)

১৬। আবদুল্লাহ, পুর্বোক্ত, পৃ- ৯৭

১৭। Naresh Kumar, Zain (ed) , *Muslims in India* vol-1, NewDelhi, 1976 p-179.

১৮। খোদাদাদ খান গজনবীর সৌজন্য প্রাপ্ত ওয়াক্ফ আল আওলাদ রেজিষ্ট্রি দলিল, ১৯৩৭, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

১৯। *Census Report, 1901,* দ্রষ্টব্য; কেদার নাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের বিবরণ, ১৯০৬, পৃ- ৪৯, ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, দ্রষ্টব্য।

২০। মির্জা নাথান, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৫৬

২১। ঐ, - পৃ- ২২৪-২২৬

২২। ঐ, - পৃ-২৫৬

২৩। ঐ, পৃ- ২৫৭

২৫। ঐ, - ১৯৭, ১৪৮-৯৬,

২৬। ঐ, - ২৮৫

২৭। আবদুল করিম মোক্তার, তরফ গোরাঙ্গীর ইতিহাস দ্রষ্টব্য

২৮। বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৫, ২৭

২৯। হাবিবুর রহমান খান লোহানী, সুলতান মাহমুদ শাহ বাহার খান ও দুদু বেগম, পূর্বোক্ত, পৃ- ২২-২৫।

৩০। নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত পৃ- ১০৯

৩১। J.N. Sarkar, *History of Bengal Vol 11* Dhaka-1972 p-79

৩২। নজরুল ইসলাম- পূর্বোক্ত পৃ- ১০৯, জেলা গেজেটিয়ার দ্রষ্টব্য

৩৩। ঐ, পৃ- ১১১

৩৪। ঐ, পৃ- ১১২।

৩৫। খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৬-৪১

৩৬। রসিক চন্দ্র বসুর মতে, নারায়ন গড়গড়ি নামের এক ব্রাহ্মন কন্যাকে বিয়ে করেন।

৩৭। বাকের, পূর্বোক্ত পৃ- ৩৩; সম্ভবত আতিয়া- শেরপুর যুদ্ধের কৃতিত্ব স্বরূপ তাকে এটি দান করা হয়। খোন্দকার রহিমের এ সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। তিনি সম্ভবত ধর্মাবেগে ঐতিহাসিক ভিত্তি ছাড়াই একশত বছরের আগের ঘটনার সাথে একশত বছরের পরের ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। কেননা আদম শাহ কাশ্মীরির মাঝার গাত্রের শিলালিপিতে তার মৃত্যুর সন বলা হয়েছে ১৫০৭ সাল। এসময় ঈসা খার জন্মও হয়নি। বাকের পূর্বোক্ত পৃ-৩১

৩৮। মোফাখখারুল ইসলামের মতে ইসলাম শাহের ঢাকায় আগমনের স্মৃতি উপলক্ষ্যে ১৬০৮ সালে আতিয়ায় মসজিদ নির্মাণ করেন।

৩৯। যুগের অবস্থা ও সমকালীন পরিবেশের স্বাভাবিক দাবী। বাহারীস্তান-ই-গায়বী দ্রষ্টব্য।

৪০। মধ্যযুগে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের মধুপুর হয়ে সিলেটের কড়ইবাড়ী পর্যন্ত অঞ্চল 'কোহস্তানে ঢাকা' বলে পরিচিত ছিল। বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৮

৪১। ঐ, পৃ- ৩৮

৪২। ঐ, পৃ- ৩৮

৪৩। ঐ, পৃ- ৩৮

৪৪। ঐ, পৃ-৩৯, লোক কাহিনী ভিত্তিক এই তথ্য যার ঐতিহাসিক সারবত্তা খুবই কম।

৪৫। এই সম্পর্কে বিশদ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মির্জা নাথান, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৭।

৪৬। বাকের, পূর্বোক্ত , পৃ-৩৩।

৪৭। ঐ, পৃ-৭৬-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের শিলা লিপিতে বর্ণিত ১০১৯ হিজরী সনে মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখ রয়েছে। আ. ক. ম. জাকারিয়া ইহার বাংলা সন একস্থানে ১৬১০-১১ করেছেন, অন্যত্র আবার ১৬০৮-৯ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আহমদ হাসান দানী, আবদুল করিম ও আ.ক.ম. জাকরিয়া এবং সাম্প্রতিক কালে আয়েশা বেগম উক্ত স্থাপত্য ও শিলালিপির উপর গবেষণা করেছেন।

৪৮। ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর পূর্বপুরুষ।

৪৯। পরিশিষ্ট, বংশতালিকা দ্রষ্টব্য

৫০। F.A Sachse, *S.S. Report* P 88-92, 242-250; জেলা গেজেটিয়ার দ্রষ্টব্য।

৫১। ঐ; বাকের , পূর্বোক্ত, পৃ- ২১০-১১।

৫২। মোঃ আলমগীর, বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান, অপ্রকাশিত পি,এইচ,ডি থিসিস, ১৯৯৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্রষ্টব্য।

৫৩। কেদার নাথ মজুমদার,পূর্বোক্ত, পৃ- ২২

৫৪। ঐ, পৃ- ২৩, বাকের পূর্বোক্ত -২০৫-২০৬।

৫৫। ঐ; আলমগীর, পূর্বোক্ত, পৃ-২০; আবদুর রহিম;পৃ-৩০-৩১; জেলা গেজেটিয়ার ময়মনসিংহ পৃ-১৮৯।

৫৬। কেদার নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৪; Marhamat Ali, Op.Cit, P-3

৫৭। ঐ, পৃ- ২৪।

৫৮। ওয়াকফ সার্টিফিকেট, ১৯৩৭, দ্রষ্টব্য

৫৯। কেদার নাথ, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য; বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১১

৬০। মারহামাত আলী, সাক্ষাৎকার-২০০০

৬১। Marhamat Ali, Op. Cit. p-3

৫২। ওয়াক্ফ দলিল ১৯৩৭ খোদাদাদ খান গজনবী সৌজন্যে প্রাপ্ত

৬৩। Marhmat Ali, Op.Cit. p-4

৬৪। ঐ

৬৫। F.A.Sachse, Op.Cit p-88; কেদার নাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ-২০-২৬

৬৬। আলমগীর, পুর্বোক্ত, পৃ-৩০-৬০

৬৭। F.A. Sachse, Op.Cit p-88-89.

৬৮। মারহামাত আলী, সাক্ষাৎকার-২০০০

৬৯। ঐ

৭০। ঐ

৭১। Marhamat Ali, Op.Cit. p-1

৭২। ঐ

৭৩। ঐ

৭৪। ঐ, পৃ-২

৭৫। ঐ

৭৬। ঐ ,খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮০

৭৭। ঐ

৭৮। মারহামাত আলী, সাক্ষাৎকার

৭৯। আলমগীর, পূর্বোক্তা, দ্রষ্টব্য

৮০। মারহামাত আলী,সাক্ষাৎকার

৮১। ঐ

৮২। Marhmat Ali, Op.Cit. p-2

৮৩। ঐ

৮৪। ঐ; আবদল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-২

৮৫। ঐ ,ঐ

৮৬। ঐ , ঐ

৮৭। ঐ , ঐ

৮৮। ঐ

৮৯। ঐ

৯০। ঐ; কেদার নাথ, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

৯১। ঐ: ঐ

৯২। ঐ: আবদুল্লাহ,পূর্বোক্ত, পৃ-৩

৯৩। ঐ

৯৪। ঐ

৯৫। ঐ, পরিশিষ্ট, দ্রষ্টব্য

৯৬। ঐ, পৃঃ ৪ পরিশিষ্ট্য দ্রষ্টব্য

৯৭। ঐ

৯৮। ঐ

৯৯ক। ঐ

৯৯খ। ঐ

৯৯গ। ঐ

৯৯ঘ। ঐ

৯৯ঙ। ঐ, খোন্দকার রহিম, পুর্বোক্ত ,পৃ- ৪৭৩-৭৫

১০০।খোদা দাদ খান গজনবী; সাক্ষাৎকার পরিশিষ্ট, বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য

১০১।ঐ

১০২। ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট, ১৯৩, পরিশিষ্ট, বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য

১০৩।ঐ

১০৪।খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮০

১০৫।ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট, পূর্বোক্ত

১০৬।মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী, ৫ম খন্ড, আবদুল মান্নান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, গাজী মিয়ার বস্তানী দ্রষ্টব্য

১০৭। ঐ

১০৮। পরিশিষ্ট, বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য

১০৯। ঐ

১১০।ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১১২। ঐ

১১৩। ঐ

১১৪। পরিশিষ্ট বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য

১১৫। মীর মশাররফ হোসেন, গাজী মিয়ার বস্তানী দ্রষ্টব্য

১১৬। পরিশিষ্ট ,বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য

১১৭। খোন্দকার রহিম, পুর্বোক্ত, পৃ-১৮১

১১৮। খোদা দাদ খান গজনবী, সাক্ষাৎকার

১১৯। ঐ, পরিশিষ্ট, বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য

১২০। ঐ

১২১। ঐ

১২২। Marhamat Ali, Op.Cit p-5; আবদুল্লাহ পূর্বোক্ত, পৃ-৯৬; ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

১২৩। মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য।

১২৪। Sir Stanely Red and Francies low, *Indian year book, 1936-37*, volume XXIII, Twenty thrid year of issue, Bengal Colmeneed co. ltd. 1938 London, p-1066; General Wallastan; *Knight Bachelor : whoes who- Indian princes, chiefs and Nobles*, Ninteenth Edition, Geo-Gibbon Ulces 1939, London, p-129.

১২৫। ঐ

১২৬।খন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত; বাকের, পূর্বোক্ত; মশাররফ রচনাবলী, ৫ম খন্ড, কুলসুম জীবনী দ্রষ্টব্য।

১২৭।মশাররফ রচনাবলী, পূর্বোক্ত পৃ-৭৬, 'বিবি কুলসুম জীবনী দ্রষ্টব্য; আখবারে ইসলামীয়া, ১৯৯১; ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য; খোন্দকার রহিম,পৃ- ১৪৬-১৪৭।

১২৮। মশাররফ রচনাবলী. ৫ম খন্ড 'আমার জীবনী' ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' দ্রষ্টব্য।

১২৯। ঐ

১৩০। ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৩১। ঐ

১৩২। ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৩২-৩৩৭,৪৪২; বাকের, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য।

১৩৩। আশরাফ সিদ্দিকী, সাক্ষাৎকার।

১৩৪।দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী স্থানীয় কেয়ার টেকারের সাক্ষাৎকার।

১৩৫।ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত পৃ-৯৭

১৩৬। দেলদুয়ার থেকে প্রথমে রংপুর যান বলে এই ধারণা করা হয়। নিজেই একস্থানে বস্তানীকে রঙ্গপুর কাহিনী বলে উল্লেখ করেন। গবেষকরা একে রংপুর বলে অভিহিত করেন।

১৩৭।মুনীর চৌধুরী, মীর মানস দ্রষ্টব্য ; মশাররফ রচনাবলী, পূর্বোক্ত; মারহামাত আলী ও আশরাফ সিদ্দিকী, সাক্ষাৎকার।

১৩৮। মশাররফ রচনাবলী দ্রষ্টব্য; মারহামাত আলী সাক্ষাৎকার।

১৩৯। ঐ , ৫ম খন্ড দ্রষ্টব্য ।

১৪০ক।ঐ: মারহামাত আলী ও আশরাফ সিদ্দিকী,সাক্ষাৎকার।

১৪০খ। ঐ, ৫ম খন্ড, পৃ- ৪১৪, (কুলসুম জীবনী)।

১৪০গ। ঐ

১৪০ঘ। ঐ, পৃ-৪০৫

১৪১ক। ঐ, পৃ-৪১৬

১৪১খ। ঐ, পৃ- ৪১৮

১৪২ক। ঐ, পৃ-৪৩৬

১৪২খ। ঐ, পৃ- ৪৩৭

১৪৩। ঐ, পৃ- ৪৩৮

১৪৪। ঐ, পৃ- ৪৩৯

১৪৪খ। ঐ.পৃ-৪৫৩

১৪৫। ঐ, পৃ-৪৫৩

১৪৬। ঐ, পৃ- ৪৬৬

১৪৬খ। খোন্দকার আবদুর রহিম , পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

১৪৭। ঐ, পৃ- ১৪৭

১৪৮। ঐ, পৃ- ১৪৭

১৪৯। ঐ, পৃ- ১৪৮

১৫০ক। ঐ, পৃ-১৪৮

১৫০খ। ঐ, পৃ-১৪৯

১৫১। পরিশিষ্ট, বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

১৫২। জমিদারী পরিচালনা, সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে তাকে দেলদুয়ার,কলকাতা ও টাঙ্গাইলে প্রায়ই আসা যাওয়ার মধ্যে থাকতে হতো।

১৫৩। *The Indian year book*, Op.Cit; p-1066 ; *Night Bachelor*.Op.Cit p.129

১৫৪। ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৯৭-৩০২

১৫৬। Marhamat, Op.Cit. p-6

১৫৬। দুলাই জমিদারী ওয়াক্‌ফ দলিল ও পুরনো কাগজপত্র পৃ-৪; Marhamat, Op.Cit, p-4

১৫৭। পরিশিষ্ট বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

১৫৮। বিশেষ করে ১৮৮৫ বঙ্গীয় প্রজাতস্বত্ব আইন এবং ১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশের পর।

১৫৯। *The Indian year book*, Op.Cit, p-1066; *Night Batchelor*, Op.Cit, p-139 ; ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত; আবদুল্লাহ, পুর্বোক্ত; খন্দকার রহিম; পুর্রোক্ত দ্রষ্টব্য।

১. ময়মনসিংহ আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সহসভাপতি ছিলেন।

২. বঙ্গীয় জমিদার সভার সদস্য ছিলেন।

৩. ১৯০৫ সালে প্রথমে বঙ্গ ভঙ্গ রদ ও পরে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

৪. ১৯০৯ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমান এলাকা থেকে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সদস্য ছিলেন।

৫. ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর মুসলমান এলাকা থেকে ভাইসরয় কাউন্সিলে সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সৌদি আরব, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, সুদান , ইরাক সফর ও হজ্জ্ব মিশনে ১৯০৮ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সরকারী প্রতিনিধিত্ব করেন।

৭. ১৯১৩ সালে দিল্লীতে গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলে মুসলিম সদস্যদের কনফারেন্স আয়োজন, মোহামেডান এডুকেশন এডভাইজরী কমিটি ও হর্নেল কমিটি গঠন, সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৮. ১৯২৪ ও ১৯২৭ সালে দু'বার বাংলা প্রদেশের মন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রথমবার কৃষি, শিল্প ও স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী এবং দ্বিতীয়বার হজ্জ, বন ও সেচ মন্ত্রী হয়েছিলেন। বস্তুত বাংলা প্রদেশের ডায়ার্কী শাসনে স্বল্প সময়ের জন্য মন্ত্রী হয়েছিলেন।

৯. ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় সাইমন কমিটির সভাপতি এবং ১৯২৯ সালে সর্বভারতীয় প্রাদেশিক কমিটির নির্বাহী সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

১০. ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বাংলা সরকারের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এবং হজ্জ, ভিসা ইত্যদি সংক্রান্ত দায়িত্বে ছিলেন।

১১. ১৯২৩ ও ১৯২৬ সালে দু' বার ময়মনসিংহ দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা থেকে (মুসলিম)বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

১২. আমীর আলীর পর তিনি আমৃত্যু 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' পরিচালনার দায়িত্ব পালন।

আবদুল করিম গজনবী ও আব্দুল হালিম গজনবীর বরেন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবন কর্মের উপর গবেষণা সমকালীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকাশের ইতিহাসে পুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করতে পারে। খন্দকার রহিমের মতে- বিশ শতকের শুরু থেকে ৩৪/৩৬ বছর টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ ও পাক ভারত উপমহাদেশ ব্যাপী একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সারা বাংলাদেশে তখন হাতেগোনা গুটিকয়েক নেতা, তন্মধ্যে টাংঙ্গাইলেরই পাঁচজন। তাদের মধ্য চার জন ছিলেন ইংরেজ সরকারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী, আরেকজন ছিলেন জনগনের মধ্যে প্রভাবশালী। সেই চারজন হচ্ছেন সন্তোষের মহারাজা মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী, ধনবাড়ীর নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, দেলদুয়ারের নবাব স্যার

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল করিম গজনবী এবং স্যার আবদুল হালিম গজনবী। এবং পঞ্চমজন ছিলেন আতিয়ার চাঁদ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চাঁদ মিয়া। (পৃ-৪৩৫)

১৬০। শিক্ষা জীবন- বি,এস,সি ডিগ্রী লাভ করেন এবং সার্বক্ষনিক পিতার সহযোগিতা ও জমিদারী পরিচালনা করেন। পরিশিষ্ট, বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

১৬১। *Indian year book; Night Batchelo*r- Op.Cit.

১৬২। ঐ

১৬৩। ঐ

১. ১৯০০ সাল থেকে ব্যবসার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু এবং টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের সদস্য, জেলা বোর্ডের সদস্য এবং অনারারী ম্যজিষ্ট্রেট ছিলেন।

২. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান।

৩. ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত কংগ্রেসের সকল অধিবেশনে নিয়মিত যোগদান ও ভাষণ প্রদান।

৪. ১৯১২ থেকে অলইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯২৭ সাল থেকে মুসলিম লীগ শফি গ্রুপে নেতৃত্ব দেন, ১৯৩৩ সালে আজিজ গ্রুপে নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৩৯ সালে লীগ থেকে পদত্যাগ করেন, পরে বহিস্কার হন।

৫. ১৯২৬ সালে গঠিত রয়াল কমিটির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য হন ।

৬. ১৯২৬ সালে প্রথম ঢাকা বিভাগ (মুসলমান রুরাল) এলাকা থেকে এবং ১৯৩৫ সালে ঢাকা - ময়মনসিংহ (মুসলমান রুর‌্যাল) এলাকা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৫ সালে একই এলাকা থেকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এভাবে ১৯২৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত একটানা এ পদে বহাল ছিলেন।

৭. ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে ঢাকা-ময়মনসিংহ এলাকা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচন করে পরাজিত হলে রাজনীতি থেকে অনেকটাই অবসর গ্রহণ করেন।

৮. ১৯৩৫ সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

৯. ১৯৩০-৩২ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১০. ১৯৩৪-১৯৩৫ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের শেরিফ ছিলেন।

১১. সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশানের সভাপতি ও বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়শনের সহ-সভাপতি ছিলেন।

১২. সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কমিটিতে ছিলেন যথাক্রমে।

ক. বার্মা সেপারেশন কমিটি-১৯৩০

খ. ফ্রান্সসাইজ কমিটি, ১৯৩০

গ. ফেডারেল ফাইন্যান্স কমিটি, ১৯৩২

ঘ. কনসালটেটিভ কমিটি, ১৯৩৩

ঙ. মাইনরিটিজ কমিটি, ১৯৩০-৩২

চ. রেলওয়ে অ্যাডভাইজরী কমিটি, ১৯২৭-৩২

ছ. রেলওয়ে ষ্টান্ডিং ফাইন্যান্স কমিটি, ১৯২৭-৩২

জ. পাবলিক একাউন্টস কমিটি , ১৯৩৩

ঝ. জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি, ১৯৩৩

ঞ. রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কমিটি,

ঠ. ১৯৩৩ সালে ওয়ার্ল্ড ইসলামিক কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের এডভাইজারী বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৩. ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্থা দুটোর সভাপতি ছিলেন ঃ মুসলিম চেম্বার অব কমার্স, ১৯৩৯-৪০, ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, ১৯৪৫-৪৬ এবং কয়েক বছর ইন্ডিয়া ষ্টীমার কোম্পানীর চেয়ারম্যান, কলকাতায় এক্সপোর্ট অ্যাডভাইজারি কমিটি এবং ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়া অনেক কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন।

১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য

(খ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো

(গ) বেঙ্গল রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য

(ঘ) কলকাতা সিটি কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

১৫. কর্মজীবনে অসংখ্য সভা, সম্মেলনের সভাপতি, সেক্রেটারী ও উদ্যোক্তা হিসেব কাজ করেন।

১৬. ব্যারিষ্টার আবদুর রসুলের সাথে 'দি মুসলমান' এবং খাজা নাজিমদুদ্দিনের সাথে 'দি ইন্ডিয়া' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৭. ১৯৪৮ সালে কলকাতার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ট্রাস্টডীড করে শিক্ষার উন্নয়নে সিটি কলেজকে দান করেন। এক কথায় আবদুল হালিম গজনবী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তার জীবনে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটেছে সাফল্যজনক ভাবে। তিনি ছিলেন একাধারে জমিদার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বিশিষ্ট রাজনীতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক সর্বোপরি স্বাধীন চিন্তা চেতনা সম্পন্ন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী । তার মধ্যে গঠনমূলক পরিচালিকা শক্তি ছিল অপূর্ব। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক। তিনি দলে থেকেই দলের উর্ধ্বে ওঠে স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করতেন এবং দেশের স্বার্থেই রাজনীতি করতেন। এই স্বাধীন চেতার ফলেই বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সদস্য হতে পেরেছিলেন। তার বৈশিষ্ট্য হলো- তিনি বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত থেকেও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে যথারীতি অংশগ্রহণ করতেন। ভারত বিভক্তির পর তার মাতৃভূমি টাঙ্গাইল পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়ে। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে সহায়তা না করে থাকলেও মুসলিম জাতির স্বার্থে যে সব কাজ করেছেন, তাতে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন নিশ্চয়ই পুষ্টি লাভ করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে মুসলিম প্রধান স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। কেননা স্বাধীন হওয়ার পর কলকাতার হিন্দু পরিবেশ বোধ হয় তার কাছে আর ভাল লাগেনি বা সেখানে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল চলেনি। তাই তিনি আমৃত্যু (১৯৫৩) দেলদুয়ারেই কাটালেন। (আবদুল্লাহ,পৃ-১৬৫-১৭৪) তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সহ বিভিন্ন মুখী কর্মধারার উপর ব্যাপক ও পুর্ণাঙ্গ গবেষণা করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষা সংস্কৃতির নয়া দিক উন্মোচিত হতে পারে।

১৬৪। পরিশিষ্ট, বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য, বিশেষ কোন কৃতিত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না।

১৬৫। বিশেষ করে উত্তর বাড়ীর এ.কে. গজনবীর জামাতা, টাঙ্গাইল শান্তিকুঞ্জে অবস্থানকারী ফরিদপুরের সন্তান শাহেদ আল জালালী ওরফে বিজু মিয়া এবং দক্ষিণ বাড়ীর শেষ জমিদার সৈয়দ মোহাব্বত আলী চৌধুরী(বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৯৩)

১৬৬। *Night Bachelor*, p-128; পুরো নাম খান বাহাদুর নবাব স্যার কাজী মহিউদ্দিন ফারুকী , কুমিল্লার রতনপুর পরগনার জমিদার। ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২৪ সালে খান বাহাদুর এবং ১৯৩২ সালে নবাব উপাধি লাভ করেন। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান, কুমিল্লা মিউনিসিপ্যলটির কমিশনার, কুমিল্লা কলেজ গভর্ণিং বডির সদস্য, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে এডভাইজারী বোর্ডের সদস্য। সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট। বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সদস্য, পরে দলনেতা নির্বাচিত হন। ১৯২৯ থেকে কৃষি, শিল্প ও গণপূর্ত বিষয়ক প্রাদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। নয়া শিল্প আইন তৈরী ও কৃষি ঋণের জন্য কো-অপারেটিভ ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম কৃতিত্ব। প্রাদেশিক সায়মন কমিটির সদস্য ছিলেন। কলিকাতা ৮ নং রিপন রোডে নিজের বাড়ি ছিল। তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও জমিদারী জীবন ধারা গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র। একটি জমিদার পরিবারে নবাব ও নাইট কেবলমাত্র ঢাকার নবাব পরিবারের পরেই সম্ভবত পূর্ববাংলা ও দু'বাংলায় এটিই দ্বিতীয় উদাহরণ। কাজেই দেলদুয়ার জমিদার পরিবারের এই তিন নবাব ও নাইটের বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের উপর ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন।

১৬৭। লাকসামের জমিদার আহমেদ নওয়াব খানের জমিদার বাড়ী আজো ঐতিহ্যের স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে লাকসাম শহরে প্রবেশ পথে ভগ্নদশায় দাড়িয়ে আছে।

১৬৮। ঢাকার খানবাহাদুর রেজাউর রহমান খান জামাতাদের মধ্যে একমাত্র মধ্যবিত্ত এবং উদীয়মান শিক্ষিত পরিবারের সদস্য।

১৬৯।ছোট জামাতা করটিয়ার জমিদার মসউদ আলী খান পন্নী পুরো পাকিস্তান পর্বে এতদাঞ্চলের রাজনীতি বিশেষ করে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেন।

১৭০। ভূমিগত উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

১৭১। করটিয়া, পন্নী পরিবারের জমিদারী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮৫০ এর পরে এই বংশের সাদাত আলী খান পন্নী গোড়াই থেকে করটিয়ায় জমিদারী কেন্দ্র ও বাড়ী স্থানান্তর করেন।

১৭২। ১৭৮৭ মতান্তরে ১৭৯৬ সালে আতিয়া জমিদারী দু'তরফে ও দু'তোজিতে বিভক্ত হলে বড় তরফ আলেপ খার নেতৃত্বে আতিয়া থেকে গোড়াই গিয়ে বসতি স্থাপন করে গোড়াই জমিদারীর পত্তন করেন।

১৭৩। Firmenger, Fifth Report; Hunter Statistics Report; F.A. Sachse Survey Report এবং District Gazetter.

দ্রষ্টব্য কেদারনাথ, খোন্দকার আবদুর রহিম ও বাকের সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

১৭৪। ঐ

১৭৫। ঐ

১৭৬। ঐ

১৭৭। পরিশিষ্ট, বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য।

১৭৮। ঐ

১৭৯। ঐ

১৮০। ঐ

১৮১। ঐ

১৮২। ঐ

১৮৩। ঐ: সৈয়দ মারহামাত আলী, খোদাদাদ খান গজনবী, বায়েজীদ খান পন্নী, সৈয়দ আল মামুন চৌধুরী প্রমুখ জমিদার বংশধরদের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য।

১৮৪। ঐ: বিভিন্ন জেলার ইতিহাস গ্রন্থ ও গেজেটিয়ারে তথ্য বিশ্লেষণ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩.০ ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে দেলদুয়ার জমিদারীর প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা (১৭৯৩-১৯৫০)

৩.১ ভূমিকা ঃ জমিদারী ব্যবস্থা এবং সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতি একই সূত্রে গ্রথিত। যে কোন সমাজের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় তার ভূমি ব্যবস্থা থেকে, বিশেষ করে উৎপাদনের প্রধান উৎস যদি হয় কৃষি। ইউরোপের ন্যায় বাংলা ও ভারতে এমনকি এশিয়ায় উৎপাদন পদ্ধতি হাজার বছরে ও কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ একই, অনড়, প্রথাগত কৃষি নির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি ও ভূমি নির্ভর প্রাকৃতিক অর্থনীতি এবং ভোগ সর্বস্ব সামন্ত ব্যবস্থা হাজার বছর ধরে একই ভাবে চলে এসেছে।[১] ইউরোপ যখন সামন্ত অর্থনীতির গন্ডি পেরিয়ে বণিকতন্ত্রের বিকাশের মাধ্যমে ভূমিতে পুঁজির বিনিয়োগ হয়ে শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে, তখন বাংলায় নবাবী আমলের ক্ষীনকায় উদীয়মান বণিকতন্ত্রের বিকাশ হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।[২] কিন্তু ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে এসে এই প্রক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে পড়ে অথচ বাংলায় এ সময় সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ও কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সুযোগ ছিল।

কিন্তু কোম্পানির নেতৃত্বের সামন্তবাদী মানসিকতা ও ঔপনিবেশিক নীতির ভ্রান্তির জন্য জমিদারী ব্যবস্থায় গুনগত পরিবর্তন হয়েও মৌলিক ভাবে অনড় সামন্ত উৎপাদন পদ্ধতিই বহাল থাকে।[৩] অর্থাৎ সংস্কার সত্ত্বেও নয়া সামন্তবাদই আবার জেঁকে বসে, তবে ইউরোপীয় নয়া চেতনার সাথে তাল মেলাতে না পেরে বাংলায় এই সামন্তবাদ ও উৎপাদন পদ্ধতি বিকৃত হয়ে ঔপনিবেশিক সামন্তবাদে পর্যবশিত হয়।[৪] কর্নওয়ালিশ কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাই কৃষিতে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের পরিবর্তে ঔপনিবেশিক সামন্তবাদী ব্যবস্থার সূত্রপাত করে। কয়েকটি বন্দোবস্তের দুই দশক ব্যাপী পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পর লর্ড কর্নওয়ালিশ অবশেষে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষনা করেন।

আলোচ্য গবেষনায় দেলদুয়ার জমিদারীর প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনায় প্রথমত: প্রাক-চিরস্থায়ী জমিদারী প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা। দ্বিতীয়ত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী জমিদারীর প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা এবং তৃতীয়ত: ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রজাস্বত্ব বিকাশের প্রেক্ষিতে জমিদারী ব্যবস্থায় নয়া স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হবে। দেলদুয়ার জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমলের জমিদারী হলেও এটি কোম্পানির

Dhaka University Institutional Repository

নিলামী আইনে সৃষ্ট নয়া জমিদারী নহে বরং আদি মোগল পরগনা জমিদারীর অন্যতম বিখ্যাত আতিয়া জমিদারীর ওয়ারিশী বাটোয়ারায় সৃষ্ট বনেদি জমিদারী।

দেলদুয়ার- আতিয়ার মূল মোগল জমিদারীর প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পাশা পাশি জমিদারী অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক গঠন প্রকৃতি; ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার বিকাশ; কৃষি সম্প্রসারণ, বনায়ন ও পণ্য উৎপাদন এবং বানিজ্য অর্থনীতির বিকাশ ধারা বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ দেলদুয়ার আতিয়া (দক্ষিণ টাঙ্গাইল) অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক গঠন ঃ

দেলদুয়ারের আদি জমিদারী আতিয়া পরগনার আয়তন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে ডব্লিউ ফার্মিংগারের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৮৭ বর্গ মাইল ছিল।[৫] ১৮৫০ সালের রেভেনিউ সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী ৬৮৯.৫৮ বর্গমাইল।[৬ক] ১৮৭২ সালের ডব্লিউ হান্টারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৭৭৯.৬৭ বর্গমাইল[৬খ]। ১৯১৯ সালের ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী ৬৩৫ বর্গমাইল।[৭] এই রিপোর্ট কে ভিত্তি করে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের সরকারী বেসরকারী সকল রিপোর্ট ও লেখা সমূহে শেষোক্ত মতামতকে গ্রহন করা হয়েছে। সম্ভবত: বুকানন হ্যামিল্টনের জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী যমুনা নদী তার পুরাতন খাত পরিবর্তন করে নতুন খাতে প্রবাহিত হলে নদী ভাঙ্গনে জলমগ্ন হয়ে এবং পরগনার এক অংশ যমুনার পশ্চিম তীরে পড়লে পরবর্তীকালে আতিয়া পরগনার আয়তন কিছুটা হ্রাস পায়। কিছু অংশ ঢাকা বা পার্শ্ববর্তী জেলা কালেক্টরেটের অধীনে কেটে দেয়া হয়।[৮] যদিও এ সম্পর্কে বিস্তৃত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

আবহমান কাল থেকেই বাংলা ও এতদাঞ্চলের অর্থনীতি বলতে জালের মত বিস্তৃত নদী আর তার মাঝে পলি গঠিত সমতল ভূমিকেই বোঝাত। প্রাকৃতিক নির্ভর এই নদী আর কৃষি বাংলার অর্থনীতির মৌল উৎস। এর মাঝে কোথাও হয়ত ক্ষুদ্র বনভূমি, গড়ভূমি এবং ব্যক্তিগত বাগান ভূমি আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। নদী, ঘাট সমূহের শুল্কভূমি রাজস্ব জাতীয় আয়ের পাশাপশি জমিদারের আয়ের উৎস হিসেবেও হাজার বছর ধরে চলে এসেছে। একই অনড় উৎপাদন পদ্ধতি বাংলায় জমিদারী উচ্ছেদ পূর্ব সময় পর্যন্ত চলে এসেছে। এই দীর্ঘ কাল ব্যাপী ভূ-প্রাকৃতিক ও ভূতাত্ত্বিক গঠনে যেমন পালাবদল ঘটেছে। তেমনি পালাবদল ঘটেছে এতদ নির্ভর জন অর্থনীতি[৯], জমিদারী আঞ্চলিক অর্থনীতি[১০] ও জাতীয় অর্থনীতিতে।[১১]

টাঙ্গাইল জেলার বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি ও ভূতাত্ত্বিক গঠন এ অঞ্চলের মৃত্তিকাকে দুভাগে ভাগ করেছে। (১) প্রাচীন মধুপুর গড় অঞ্চলের লাল মৃত্তিকার উচ্চ ভূমি। (২) যমুনার প্লাবন সমভূমি।[১২]

ভূতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক মতে প্রাচীন পুরা ভূমি দ্বারা গঠিত মধুপুর ভাওয়াল গড় অঞ্চল কয়েক লক্ষ বছর আগে Neotectonic Activity এর কারনে Uplifted হয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ওপরে ওঠে আসে। আতিয়া পরগনার বর্তমান ঘাটাইল, সখিপুর ও মির্জাপুর থানার লালমাটির উঁচু স্থলভাগ এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হয় যা মধুপুর বেল্ট নামে পরিচিত। সম সাময়িক কালে বগুড়ার মহাস্থান গড়, কুমিল্লার ময়নামতি ও চট্টগ্রামের লুসাই অঞ্চল গড়ে উঠে। বাংলায় তার চেয়েও প্রাচীন ভূভাগ সম্ভবত একমাত্র সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, প্রায় ১ কোটি বৎসর আগে টারশিয়ারী যুগে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ওপরে ওঠে আসে। আর আজকের হিমালয় ও ভারত পাঁচ কোটি বৎসর আগে গান্ডোয়ানাল্যান্ডের এশিয় বেইজমেন্ট থেকে সৃষ্টি হয়।[১৩]

একই ধারাবাহিকতায় সম্ভবত দুই থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে হিমালয়ের জলরাশি পলি বাহিত হয়ে বেইজমেন্ট রক ভরাট হয়ে পশ্চিম টাঙ্গাইল তথা বড় বাজু ও কাগমারী পরগনাস্থ বর্তমান গোপালপুর, ভুয়াপুর ও কালিহাতি থানা এবং দক্ষিণ টাঙ্গাইল তথা আতিয়া পরগনাস্থ বর্তমান টাঙ্গাইল সদর, বাসাইল দেলদুয়ার ও নাগরপুর থানা অঞ্চলের ভূত্বক গঠিত হয়। উল্লেখ্য এই পলি গঠন ও রক বেইজমেন্ট দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হতে হতে দু হাজার মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে শ্রীলংকাকেও ছাড়িয়ে গেছে।[১৪] এবং এই প্রসারণ আজো অব্যাহত আছে। সর্বশেষ দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ তার প্রমান্।

সুতরাং টাঙ্গাইলের ভর অঞ্চলে তথা আতিয়ায় স্থায়ী জনপদ গড়ে উঠার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। টলেমী কর্তৃক খৃ: পূর্ব ১৫০ সালে গঙ্গারিডই বা গঙ্গার পাঁচটি ধারার উল্লেখ করেছেন।[১৫] ৬৩৫ খৃ: হিউয়েন সাং যখন এই অঞ্চল সফর করতে আসেন তখন আলাপসিং অঞ্চলের দক্ষিনাঞ্চল সারা বৎসর জলমগ্ন দেখেছেন।[১৫] ১২৫২ সালে প্রকাশিত ফরাসী দেশীয় এক মানচিত্রে গঙ্গার দুটো ধারা দেখানো হয়েছে।[১৭] আবার ফা হি য়েন, হুয়াং সেন, আলবেরুনী, ইবনে বতুতা, কৃত্তিবাস প্রমুখের বিবরণে ছোট গঙ্গা ও বড় গঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রাচীন কালে গঙ্গার মূলধারা মধুপুর গড়কে পূর্ব পাশে রেখে সমগ্র টাঙ্গাইল ও পাবনা অঞ্চল ব্যাপী পূর্ব ও দক্ষিণ মুখী হয়েছিল।[১৮] বস্তুত ৭ম শতাব্দীতেও সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল অঞ্চলগুলো বৎসরের আট নয়মাস জলের নীচে ডুবে থাকত বিধায় তখনো স্থায়ী লোক বসতি গড়ে উঠেনি। শুকনা মৌসুমে তিন চার মাস উঁচু ভূমি থেকে লোকজন এসে বসতি করতো, আবার চলে যেতো। সেই জন্য নবম শতাব্দীর আগের কোন জনপদের স্মৃতি চিহ্ন এ অঞ্চলে আজো খুঁজে পাওয়া যায়নি।[১৯] যদিও মধুপুর ও উঁচু অঞ্চলের তিনহাজার বছর পূর্বের অরন্য জনপদের প্রমাণ পাওয়া যায়।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা সন্দেহাতীত ভাবে ভূতাত্বিকরা প্রমান্ করেছেন যে, মধুপুর গড় অঞ্চল ব্যতীত টাঙ্গাইল ও আতিয়া অঞ্চলের মৃত্তিকা ব্রক্ষ্মপুত্র ও যমুনার পলি আবেক্ষন দ্বারা সৃষ্টি। টাঙ্গাইলের মধুপুর গড় সংলগ্ন এই মৃত্তিকাকে ভূতাত্বিকগন আবার তিন ভাগে ভাগ করেছেন। (১) মধুপুর গড় সংলগ্ন পুরাতন পলিজ আবেক্ষনে সৃষ্ট একটু লাল ও কমলা রং মিশ্রিত মাঝে বাদামী রং এর কুচিযুক্ত আন্ত: উচ্চ ভূমি। (২) উক্ত অঞ্চলের কোল ঘেষে কিছু এলাকার মৃত্তিকায় বালি, পলি, এটেল ও কাকরের মিশ্রিত সমতল ভূমি, যাকে আন্ত: নদী অববাহিকা অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। (২) ভর অঞ্চল বা নিম্নাঞ্চল বা সমতল চর ভূমি; মুসলিম যুগে এই আতিয়া ও কাগমারী পরগনা অঞ্চলকে নদী আবেক্ষন অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২১]

গঙ্গা ও ব্রক্ষ্মপুত্র ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে দিয়েই প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে বিকশিত হয়েছে এ অঞ্চলের প্রকৃতি নির্ভর সেকেলে কৃষি অর্থনীতি। বস্তুত এই বৃহৎ নদী দ্বয়ের গতি প্রকৃতি বদলের সাথে সৃষ্ট ব্রক্ষ্মপুত্র, যমুনা, ধলেশ্বরী, বংশী, এলংজানী, লৌহজং, ঝিনাই নদী বিধৌত উর্বর মৃত্তিকার এই অঞ্চল; এই সব নদনদীর খাত পরিবর্তন আর নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। ১৫৫০ খৃ: তৈরী জোয়াও-ডি-বারোসের মানচিত্রে গঙ্গানদীর দুটি ধারার মাঝা মাঝি স্থানের দ্বীপগুলিতে অবস্থিত অনেক উল্লেখ যোগ্য জায়গার নাম পাওয়া যায়, যা বর্তমান যমুনার দুই তীরে অবস্থিত।[২২]

ব্রক্ষ্মপুত্র স্বয়ং এতদাঞ্চলের দুপাশ দিয়ে তিন বার তার খাত বদল করেছে। ফলে কোন শাখা নদী প্রবাহিত হয়েছে, আবার কোন শাখা নদী সরে গেছে। আবার নদীর পাশের শহর বন্দরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রোগ ব্যাধিতে জনস্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। পরিবেশ দুষনে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, অনেক শহর বন্দর বিলুপ্ত হয়েছে এবং নতুন শহর ও বন্দর গড়ে উঠেছে।[২৩]

400914

১ম বার ব্রক্ষ্মপুত্র বাহাদুরাবাদের পূর্বে দেওয়ানগঞ্জ নেত্রকোনা থেকে মধুপুর গড়ের উত্তরে ময়মনসিংহ জেলাকে দ্বিখন্ডিত করে ঢাকা জেলার পূর্ব ভাগ ছেদ করে সোনারগাঁয়ের দক্ষিণ পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দের পাশ দিয়ে ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হয়ে আবার মেঘনায় পড়েছে।[২৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

২য় বার বাহাদুরাবাদ পূর্ব দেওয়ান গঞ্জ নেত্রকোনা থেকে ময়মনসিংহের উত্তর পাশ দিয়ে গফর গাঁও উত্তর হয়ে পাকুন্দিয়ার দক্ষিণ দিয়ে কটিয়াদি হয়ে ভৈরব বন্দরের কাছে মেঘনায় মিলিত হয়ে সন্ধীপের উত্তরে সমুদ্রে মিশেছে।[২৫]

৩য় ধারা-উনিশ শতকে বাহাদুরাবাদ থেকে বর্তমান যমুনার পথে টাঙ্গাইল-জামালপুরের পাশ দিয়ে দক্ষিণ বাহী হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে।[২৬]

অনেক গবেষকের মতে, আদিতে ষোড়শ শতকের পূর্বেও ব্রহ্মপুত্র যমুনার বর্তমান খাতে প্রবাহিত ছিল। পরবর্তীতে দ্বীপ ও চর জেগে এটি মজে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের উপরে বর্নিত ১ম ধারায় প্রবাহিত হয়। সে জন্য ১৬৫৬ সালের বার্নিয়ার ম্যাপে এবং ১৭৭৮ সালের মেজর রেনেলের ম্যাপে বর্তমান যমুনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।[২৭] সর্বশেষ মির্জা নাথানের বিবরণে কেবল এই ধারার ক্ষীনকায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুফাখখারুল ইসলাম, মুঘল-বারভূঁইয়া ও মুঘল আফগান যুদ্ধের গতিপথ ও দীর্ঘ কালব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায় দশ মাইল প্রশস্ত যমুনার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। পরবর্তীতে এর প্রশস্ততা আরো হ্রাস পায়।[২৮] তাই রেনেলের মানচিত্রে যমুনা ক্ষুদ্রকায় একটি ধারা হিসেবে দেখা যায়। ঠিক একই কারনে আতিয়া পরগনা জমিদারীর একটি অংশ পাবনা জেলায় এবং কাগমারী, বড় বাজু পরগনার বড় অংশ জমিদারী পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় পড়ে যায়।[২৯]

আধুনিক ইতিহাসে ১৮০৯ সালে বুকানন হ্যমিলটনের জরিপে প্রথম যমুনার কথা পাওয়া যায়। কেদারনাথ, খান সাহেব আবদুল্লাহ ও অন্যান্য লেখক গবেষকদের মতে ১৭৭৮ থেকে ১৮০৯ সালের মধ্যবর্তী ত্রিশ বৎসরের কোন সময়ে ব্রহ্মপুত্র তার দ্বিতীয় খাত পরিবর্তন করে এই খাতে পুন: প্রবাহিত হয়। খান সাহেব আব্দুল্লাহর মতে- "নেত্রকোনার দাওকোবা নামকস্থানে খুব ঘন বালি পড়ে ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোত অপরিসর জনাই খালে প্রবাহিত হয়।[৩০] কোন কোন গবেষকের মতে, ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র ধারায় অকস্মাৎ মৃত্তিকাস্তূপ জেগে ওঠে এবং জনাই খালে ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়। আবার এরই মধ্যে যমুনা কখনো পূর্বে ৫ থেকে ৬ মাইল সরে এসেছে, কখনো ৫ থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে সরে গেছে।[৩১] মুফাখখারুল ইসলামের মতে, শত বর্ষ পূর্বে যে স্থান দিয়ে যমুনা প্রবাহিত হতো, সে স্থানে এখনো

Dhaka University Institutional Repository

জনাই বাড়ী এবং তার পশ্চিমে কোনাই বাড়ী নামে দুটো মৌজার নাম পাওয়া যায়।[৩২] সম্ভবত এই মৌজা দুটোই জোনাই ও কোনাই খালের পরিচয় বহন করে।

আতিয়া ও টাঙ্গাইলের পুরনো উপনদী খাত গুলো প্রায়ই মৃত ও বিলুপ্ত যেমন ফুলদহ, রানা, কোশি, কুলি, মরা আত্রাই, লৌহজং ইত্যাদি। রেনেল, বুকানন ও ব্লখম্যানের বিবরণে এই সব নদী সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। আধুনিক গবেষকগণ এই সব নদীর স্মৃতি বিজড়িত চিহ্ন সমূহ প্রমান করেছেন। অদ্য বহমান নদীগুলির মধ্যে ধলেশ্বরী, এলংজানী, ঝিনাই, লৌহজং ও বংশী অন্যতম।

দেলদুয়ার আতিয়া অঞ্চলের টাঙ্গাইল শহরের দু' পাশ দিয়ে দুটি নদী ধারা বর্তমানেও প্রবাহিত হয়। টাঙ্গাইল শহরের উপর দিয়ে পূর্বে একটি খাত প্রবাহিত ছিল বর্তমানে যা মৃতপ্রায়, যাকে বলে মরা আত্রাই। একটি ধারা বর্তমান ধলেশ্বরী, উনিশ শতকের কিছু পূর্বে বড় বাজু পরগনার পূর্ব পাড়ের পশ্চিম অংশ, বর্তমান গোপালপুরের পাশ দিয়ে দক্ষিণমূখী নলছি হয়ে এলেঙ্গা কে পাশে রেখে আরো দক্ষিণ মুখী হয়েছে। এই অংশে এলংজানী নদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে অত:পর ধলেশ্বরী হয়ে, নাগরপুর ও মানিকগঞ্জের মধ্যে দিয়ে পুনরায় যমুনায় গিয়ে পড়েছে।

অপর একটি ধারা লৌহজং, যা জামালপুর জেলার সন্যাসীগঞ্জ থেকে ব্রহ্মপুত্রের শাখা হিসেবে উৎপন্ন হয়ে ঝিনাই নামে অভিহিত হয়। ভূয়াপুরের গাবমারা হয়ে পাঁচ টিকরী থেকে দক্ষিণ মূখী হয়ে লৌহজং নামে পরিচিত হয়। দেলদুয়ার, আতিয়া ও টাঙ্গাইল শহরের পূর্ব পাশ দিয়ে করটিয়া, জামুর্কী প্রভৃতি স্থান দিয়ে ঢাকার সীমানায় গিয়ে বংশী হয়ে মেঘনায় পড়েছে।[৩৩] এধারা বর্তমানে অনেকটা মৃত।

তবে অপর একটি ধারা মধুপুর গড়ের নিকট দিয়ে বাসাইল থানার কাজলখানী থেকে মির্জাপুর হয়ে ঢাকার কালিয়াকৈরে দু'ভাগ হয়ে মুলধারা তুরাগ ও অপর ক্ষুদ্র ধারা দক্ষিণমুখী হয়ে নাগরপুর, মানিকগঞ্জের পাশ দিয়ে ধলেশ্বরীতে পড়েছে।[৩৪] কাজেই দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ টাঙ্গাইল তথা টাঙ্গাইল শহর এবং আতিয়া ও দেলদুয়ারের পূর্ব পাশ দিয়ে দক্ষিণ মুখী দুটি প্রবাহিত ধারা, যার একটি মৃত প্রায়। একই ভাবে পশ্চিম পাশ দিয়ে দুটি নদী দক্ষিণমুখী প্রবাহিত, যার একটি বর্তমানে মৃত প্রায়। একটি ক্ষুদ্র পরগনা

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে চারটি নদী অসংখ্য খাল, উপখালের প্রবাহ এটাই প্রমান করে যে, সমগ্র বাংলার সমতলভূমি জালের ন্যায় বিস্তৃত এবং পলি গঠিত উর্বর ভূমি।

বাংলার মুসলমান যুগের সূচনা কালেও এতদাঞ্চলে এই ক্ষুদ্র নদী ও যমুনা ব্রহ্মপুত্র বিধৌত নিম্ন চর ভূমি বিদ্যমান ছিল। যার ফলে উত্তর টাঙ্গাইল ও মধুপুরে নবম শতক থেকে কিছু স্মৃতি চিহ্ন ও ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক বিবিধ তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ টাঙ্গাইল তথা দেলদুয়ার আতিয়া কাগমারীর সমভূমির ইতিহাস চতুর্দশ শতকের সূচনায় সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলভীর (১৩০০-১৩২২) সময়কাল থেকেই কেবল পাওয়া যায়। হোসেন শাহী আমলে আতিয়ার শাহ বাবা কাশ্মীরিকে কেন্দ্র করে এতদাঞ্চলের পূর্ন বিকাশ ঘটে এবং ছিটে ফোঁটা জন ইতিহাস তথ্য পাওয়া যায়। ১৬০১ সালে সাঈদ খান পন্নী কর্তৃক আতিয়া পরগনা শাসন ও জমিদারী লাভকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী কালে আমরা এতদাঞ্চলের জমিদারী ইতিহাস তথা এতদাঞ্চলের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক জীবন চিত্র খুঁজে পাই।

সুতরাং যুগ যুগ ধরে নদী, তার পলি এবং কৃষি এতদাঞ্চলের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক ধারা প্রবাহকে প্রাকৃতিক নিয়মই নিয়ন্ত্রণ করেছে। জমিদারী ও ভূমি রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা এই প্রাকৃতিক অর্থনীতির উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুখী অভিঘাত হেনেছে। কিন্তু মূল উৎপাদন পদ্ধতি অনড় ও একই থেকেছে। ফলে আবহমান কৃষি অর্থনীতি গতি প্রাপ্ত হয়নি। ইংরেজ শাসন উৎপাদন পদ্ধতির নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি ও বিকৃত পন্থার বিকাশ ঘটালেও সমকালীন ইউরোপের ন্যায় কাংখিত কৃষি ও শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়নি।[৩৫] তবে শেষ পর্যায়ে ইউরোপে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন কয়েকজন জমিদার তাদের জমিদারীতে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ও বিকাশে সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু ব্যাপক, সমন্বিত ও জাতীয় উদ্যোগের অভাবে উক্ত প্রচেষ্টা কাংখিত সাফল্য পায়নি। অর্থাৎ ভূমিতে 'সামন্ত ব্যবস্থার' মূলোৎপাটন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ প্রাক-কোম্পানি ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আতিয়া পরগনার জমিদারী ও জন অর্থনীতির বিকাশ ঃ

বাংলায় জমিদারী ও বর্গাপ্রথা একই সময়ে উৎপত্তি লাভ করে। আর দুহাজার বছর ধরে তা বিকশিত হয়। অবশেষে ঔপনিবেশিক আমলের দুশো বছরে তা বিকৃতি লাভ করে। জীবনী শক্তিহীন অবস্থায় বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হয় কিন্তু জমিদারী প্রভাবজাত জোতদারী ও বর্গাদারী ব্যবস্থা আজো অব্যাহত রয়েছে। ভূমিহীন শ্রেণী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাচীন কালে রাজা জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল প্রধানত: রাজনৈতিক কারনে। তবে ঠিক কখন থেকে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না। আবার এই জমিদারী ঠিক ইউরোপের সামন্তবাদের মত নয়, এই জন্য অনেকে বাংলার জমিদারীকে সামন্তবাদ না বলে Asiatic mode of production এবং কেউ Tributary form of feodalism বলে অভিহিত করেন।[৩৬]

বাংলার আদিম 'কৌম' সমাজ থেকে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজে' উত্তরণের কোন এক পর্যায়ে সামন্তবাদ বা জমিদারী কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরন ঘটে। কারো মতে, বৌদ্ধ সংঘ গুলির অর্থনৈতিক চরিত্রের ফলে বর্গা প্রথা বিস্তার লাভ করে এবং একই সময়ে জমিদারী প্রথাও উৎপত্তি লাভ করে।[৩৭] এর পরে বাংলায় আগমন ঘটে আরব বনিকদের। এ সময় বৌদ্ধ বনিক ও আরব বনিকদের এক বিত্তবান শ্রেনী বিকাশের ফলে বাংলার দুর্বল দাস সমাজ কিংবা মিশ্র সমাজ ভেঙ্গে নিজস্ব সামন্তবাদী বৈশিষ্ট্য সম্বলিত উৎপাদন প্রসার ঘটে।[৩৮] সম্ভবত: নবম শতকের পাল আমল থেকে এর সূচনা হয়।

অবশ্য মুসলমানদের আগমনের সময় ইউরোপীয় আদলের কোন শক্তিশালী সামন্ত সম্রাট ছিলনা এবং সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতা বিরাজ করছিল। তবে মুসলমানরা সামন্ততন্ত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। সমগ্র সুলতানী আমলে উৎপাদন পদ্ধতি ও সমাজ কাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি।[৩৯] এসময় প্রশাসন ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংস্কার সাধিত হয়। স্বাধীন সুলতানী আমলে নিম্ন প্রশাসন অরসাহর শাসন কর্তার উপাধি ছিল জমাদার-ই-গাহির মুহুল্লী। এই 'জমাদার' শব্দটিই পরবর্তীতে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন অর্থে 'জমিদারী' নামে অভিহিত হয়।[৪০]

হুসেন শাহীআমল ও শের শাহের আমলে বাংলার প্রশাসন, ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের ফলে, এই সময়ের ভূমি ব্যবস্থা ও জমিদারী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[৪০] সুস্পষ্ট তথ্য না পেলেও ধারনা করা হয় যে, পরবর্তী কালের বার ভূঁঞা খ্যাত বাংলার স্বাধীনতাকামী জমিদারগন এই সময়েরই সৃষ্টি।

স্বাধীনতাকামী আঞ্চলিক সামন্ত জমিদারদের সাথে উত্তর ভারতীয় মুঘল রাজশক্তির দ্বন্দ্ব-সমন্বয় প্রক্রিয়ায় এবং শেষে মুঘল অধীনতায় বাংলার সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থা এক বিরাট পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যায়। বি.আর গ্রোভারের মতে, প্রাক মুঘল যুগের বাংলায় যে জমিদারী প্রথা চালু ছিল, মোগল শাসকগন্ তাই ক্ষেত্র বিশেষে গ্রহন করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা পরিবর্তিত হয়। মূলত: মোগলদের অধীনে এ প্রথা ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন ব্যবস্থায় একটি নিয়মিত ছকের আকারে বিকাশ লাভ করে। [৪১] আইন-ই-আকবরীতে মহল বা পরগনা ভিত্তিক জমিদারদের বিবরণ দেয়া হয়েছে।[৪২] মোগলদের ভূমি ব্যবস্থার তিনটি শ্রেণী ছিল যথাক্রমে খালিশা, জায়গীর ও জমিদারী। তন্মধ্যে বাংলায় বিভিন্ন প্রকার ভূমি নির্ভর ব্যক্তিগণকে জমিদার বলে বুঝাত। সতের শতকের প্রথম দিকে মির্জা নাথানের 'বাহারিস্তান-ই-গায়বী' জমিদার শব্দটি দ্বারা রাজকীয় সামন্ত ও অন্যান্য ভূমি নির্ভর শ্রেণীর মধ্যস্বত্ব ভোগীকেও বুঝিয়েছে।[৪৩] মহলের সাথে সাথে 'তালুক' শব্দের উল্লেখ জমিদারদের অধিকার ও সীমারেখার ঈঙ্গিত বহন করে। 'আইন-ই-আকবরী'তে বাংলার ২৪টি সরকারের ৪৮৭ মহলের মাপ জোকের ছকের উপস্থিতি থেকে বুঝতে পারা যায় যে এ সব সরকারের জমিদাররা ছিলেন 'গায়রে আমলি' শ্রেণীর। পরবর্তী কালে শাসন ক্ষমতা সু-সংহত করে মোগলরা 'গায়ের আমলি' জমিদারদের 'আমলি' জমিদারে পরিনত করার ব্যবস্থা শুরু করে।[৪৪] সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকে অনেক জায়গীরদার জমিদারদের ন্যায় বংশীয় ভাবে ভূমিস্বত্ব লাভ করে এক শ্রেণীর জমিদারে পরিনত হয়।[৪৫]

তবে এ সময় জমিতে ইউরোপীয় আদলের কোনরূপ ব্যক্তিমালিকানা ছিল না। জমির উপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল রাষ্ট্রের। মুঘল শাসনের অন্তিম পর্যায়ে সামন্তবাদের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করেছেন। মুঘল সামন্ত্রতন্ত্র কেন ইউরোপীয় আদলে ধনতন্ত্রে উন্নত হতে পারেনি তারও বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত কেন্দ্রীকরন বৃদ্ধি ও অস্থায়ী রাজস্ব কর্মচারী নীতির ফলে অধিক হারে রাজস্ব সংগ্রহ ও রায়ত শোষন প্রক্রিয়া শুরু হয়।[৪৬] আফসান চৌধুরীর মতে, সামন্ততন্ত্রে নতুন স্তরের শক্তিগুলো পুরনো রাজনৈতিক অধিকাঠামোর সাথে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়।[৪৭] শিরিন আখতারে মতে, মোগল কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে জমিদারেরা আঠারো শতকের প্রথমার্ধে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়।[৪৮]

বি.আর গ্রোভারের মতে, আওরঙ্গজেবের আমলেই কোন কোন জমিদার পূর্ন Revenew firmer এ পরিনত হয়। বাংলায় মুর্শিদকুলী খান মোগল জমিদারী ব্যবস্থাকে নতুন রূপে বিন্যাস করেন। মুর্শিদকুলী জমিদারী গুলির আঞ্চলিক আওতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের আয়তন বাড়ান এবং সংখ্যা কমান।[৪৯] এমনি করে তিনি বড় বড় জমিদারী সৃষ্টির নীতি গ্রহণ করে। এতে রাজস্ব আদায়ের সুবিধা হয় কিন্তু নতুন জমিদারীর ভিতরে ভূমি নির্ভর মধ্যস্বত্বভোগীর এক স্তর বিন্যাস দেখা দেয়, এরা হলো তালুকদার ও অন্যান্য শ্রেণী।[৫০] তা ছাড়া মুর্শিদকুলি জমিদারদের সামরিক শক্তিতেও আঘাত হানেন। এতদসত্ত্বেও মুর্শিদকুলি সৃষ্ট বড় বড় জমিদার সম্পর্কে শিরীন আখতার বলেন, "বড় বড় জমিদাররা তখন নবাবি রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিনত হয়। বিভিন্ন সুবিধা ও পদ লাভের রাজনীতিতে প্রতিযোগীগণ জমিদারদের সমর্থন কামনা করে এবং সেই রাজনীতির ধারা মতেই তারা ব্যাঙ্কার ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যোগসাজশে সরকার পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়। এমনি ছিল তাদের ক্ষমতা।[৫১] তাদের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা যাই থাকুক না কেন সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা এলাকার একমাত্র প্রভুতে পরিনত হয়। বড় বড় জমিদাররা প্রতিবেশী ক্ষুদ্র জমিদারদের এলাকা বল প্রয়োগে নিজেদের দখলে এনে জমিদারির সীমানা আরো সম্প্রসারিত করে। রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি দিয়ে তাদের আধিপত্যবাদের স্বীকৃতি দেয় সরকার। এমনকি সরকার তাদেরকে সামাজিক বিচার ক্ষমতা পর্যন্ত প্রদান করে। মাঝারী ও ছোট জমিদারদের ছিল প্রজাকুলের উপর প্রভূত ক্ষমতা।[৫২] সিরাজুল ইসলামের মতে, 'এক কথায় তাত্ত্বিকভাবে জমির মালিক হোন আর নাই হোন নবাবি আমলে জমিদার ছিলেন ভূমির স্থায়ী দখলকার এবং এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি।[৫৩]

আলোচ্য দেলদুয়ার ও আতিয়া জমিদারী আদি মুঘল জমিদারীর ধারা বহন করছে। এতদাঞ্চলের অধিকাংশ জমিদারীর প্রকৃতি ছিল জায়গীর জমিদারী। কিছু কিছু ছিল পরগনা শাসন জমিদারী। প্রথম দিকে জায়গীর জমিদারীগুলোর বংশীয় অধিকার স্বীকৃত না হলেও পরবর্তীকালে বিশেষত জাহাঙ্গীরের আমলের অধিকাংশ জায়গীর জমিদারী বংশ পরম্পরায় ভোগের স্বীকৃতি লাভ করে।[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

বি.আর. গ্রোভার আইন-ই-আকবরী ও বাহরিস্তান-ই-গায়বী এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'এতদাঞ্চলের প্রাক মোগল যুগে সৃষ্ট ভৌমিক ও জমিদারগন মোগলদের চরম পত্র পাবার পর স্বেচ্ছায় আত্নসমর্পন্ করলে তার জমিদারী তাকে জায়গীর হিসেবে ফেরত দেয়া হত। কেউ সশস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত হলে তার জমিদারী মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করে একটি অংশ তাকে জায়গীর হিসেবে দিয়ে দেয়ার নীতি প্রচলিত ছিল। এরূপ জায়গীর 'গায়ের আমিল' রূপে অভিহিত হত এবং তারা অভ্যন্তরীন রাজস্ব সংক্রান্ত শাসনের ক্ষেত্রে স্বাধিকার ভোগ করতো। শান্তি শৃংখলা স্থাপন এবং বিচার ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা তাদের থাকলেও কর নির্ধারণ ক্ষমতা থাকত মোগল শাসকদের হাতে।[৫৪খ]

আলোচ্য দেলদুয়ার জমিদারদের একটি ধারা আতিয়া পরগনার কালিহাতি অঞ্চলে সম্রাট জাহাঙ্গীর থেকে জায়গীর হিসেবে জমিদারী লাভ করেন। দেলদুয়ারের অপর ধারা, পূর্বপুরুষ মানিকগঞ্জের মকীমপুর পরগনায় জায়গীর লাভ করেন। উভয় ধারার জমিদারীই আবার আতিয়া পরগনা জমিদারী থেকে ভূমিস্বত্ব লাভ করে। ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে উত্তরাধিকার সূত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করে ঔপনিবেশিক জমিদার হিসেবে আবির্ভূত হয়।

চারান ও মকীমপুর ছিল জায়গীর শ্রেণীর জমিদারী। কিন্তু আতিয়া ছিল বৃহৎ পরগনা শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহকারী প্রত্যক্ষ জমিদারী। আদি নিম্ন প্রশাসনিক বিভাগ 'অরসাহ' পাঠান সম্রাট শের শাহের আমলে 'শিক' ও মুঘল আমলে 'সরকার' এ পরিনৃত হয়। আর আদি 'মুল্লুক বা তকসিক' শের শাহের আমলে 'মহল' ও মুঘল আমলে 'পরগনায়' পরিনৃত হয়।[৫৫] প্রাক ঔপনিবেশিক আতিয়া পরগনার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং জন অর্থনীতির ধারা পর্যালোচনায় মুঘল আমলের দুটি রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং নবাবি আমলের তিনটি রাজস্ব বন্দোবস্ত বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমলের আসল জমা তুমার বন্দোবস্তে ও ৬৮২ টি পরগনার তালিকায় আতিয়া কাগমারী পরগনার উল্লেখ পাওয়া যায়না।[৫৬] সম্ভবত: এটি বাজুহা সরকারের বত্রিশ পরগনার সবচেয়ে বড় পরগনা, বড় বাজু পরগনার অধীনে সদ্য জেগে ওঠা নতুন বসতি স্থাপনকারী যমুনা বিধৌত চরাঞ্চল ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ফিফথ রিপোর্টের বিবরণ অনুযায়ী টোডরমল বন্দোবস্তে বাজুহা সরকারের ৩২টি পরগনার মোট রাজস্ব ছিল বার্ষিক ৯,৮৭,৯২১ টাকা এবং ১০টি হাতি, ১৭০০ অশ্বারোহী ও ৪৩৫০০ পদাতিক সৈনিক সরবরাহ।[৫৭] উক্ত সরকার বাজুহার বৃহদাংশ বর্তমান বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা এবং কিছু অংশ ঢাকা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, কুমিল্লা ও সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলার ভাটি অঞ্চলের মুঘল প্রতিরোধকারী বারভূঁঞা নেতা ঈসা খানের সাথে মানসিংহ-এর সমঝোতার প্রেক্ষিতে ঈসাখান সম্রাট আকবর থেকে জঙ্গল বাড়ী কে কেন্দ্র করে ২২ পরগনার জমিদারী সনদ এবং মসনদে আলা উপাধি লাভ করেন।[৫৮] ২২টি পরগনায় তিনি শাসক নিযুক্ত করে মোগল অধীনতায় প্রায় স্বাধীন ভাবে অভ্যন্তরীন শাসন পরিচালনা করেন।[৫৯] ঈসাখানের ২২ পরগনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়ে যে তালিকা পাওয়া যায়, তাতে কোথাও আতিয়া-কাগমারী পরগনার নাম পাওয়া যায়, কোথাও পাওয়া যায়না।[৬০]

এই সময়ের রাজস্ব তালিকা ও পরবর্তীকালে আতিয়া পরগনার শাসক ও জমিদার হিসেবে সাঈদ খান পন্নী সংক্রান্ত তথ্য ব্যতীত এ সময়ের আতিয়া পরগনা ও পাশ্ববর্তী পরগনার রাজস্ব ও জন অর্থনীতি সংক্রান্ত কোন তথ্য খুব একটা পাওয়া যায় না।

শাহ সুজার বন্দোবস্তে সরকার ও পরগনার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।[৬১] উক্ত সময়ের মধ্যে আতিয়া ও কাগমারী পরগনা নিশ্চিত ভাবে সৃষ্টি হলেও উক্ত বন্দোবস্তের সুনির্দিষ্ট কোন তালিকা ও রাজস্ব বিবরণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন খাতে মোট রাজস্ব হ্রাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। একই চিত্র মুর্শিদ কুলি খানের বন্দোবস্তে। তিনি সমগ্র বাংলাকে ২৪টি সরকারের পরিবর্তে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০ টি পরগনায় বিভক্ত করে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। এই সময় বাজুহা সরকারের পরগনাগুলো চার চাকলায় বিভক্ত হয়।[৬২] আতিয়া পরগনার কিছু অংশ চাকলে জাহাঙ্গীর নগর ও ঢাকা নিযাবত অঞ্চলের অধীনে নীত হয়। যার রাজস্ব ধার্য্য ছিল ২,০২,৭০৫ টাকা। আতিয়ার বাকী অংশ সহ কাগমারী, বড় বাজু, পুখুরিয়া পরগনা তথা বর্তমান টাঙ্গাইল জেলা ঘোড়াঘাট চাকলের অধীনে নীত হয়, যার রাজস্ব ছিল ৯,২৬,২৬৬ টাকা।[৬৩] শাহ সুজার বন্দোবস্তে প্রথম আতিয়া ও কাগমারী পরগনার নাম পাওয়া যায়।

সুজাউদ্দীন খানের সংশোধিত বন্দোবস্তে ১৩টি চাকলাকে আবার ২৫টি ইহতিমামে বিভক্ত করা হয়। চাকলে জাহাঙ্গীর নগরের রাজস্ব আবওয়াব সহ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২,৫০,২৫১ টাকা। আর ঢাকা-জালালপুর ইহতিমামের রাজস্ব ছিল ৮,৯৯,৭৯০ টাকা। তবে ২৫ তম মজকুরী ইহতিমামের অধীনে ২১টি ক্ষুদ্র জমিদারী তালিকায় ১৩৬টি পরগনার মোট রাজস্ব ছিল ৭,৮৫,২০১ টাকা।[৬৫] তন্মধ্যে ৭নং খাতে আতিয়া, কাগমারী, বড় বাজু, হোসেনশাহী পরগনা সহ ১০টি ক্ষুদ্র পরগনা ও মহলের রাজস্ব ছিল ৬৭,৮৮৩ টাকা।[৬৬]

১৭৬৩ সালে মীর কাশিমের বন্দোবস্তে চাকলে জাহাঙ্গীর নগর ও চাকলে ঘোড়াঘাটের অধীন অঞ্চল সমুহ কে জমিদারী রাজশাহী, আতিয়াদিগড় ও জালালপুর-ঢাকা এই তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়। এতে জালালপুর-ঢাকা এর রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১২,০১,৩১৫ টাকা। আতিয়া, কাগমারী ও বড়বাজু নিয়ে ছিল আতিয়া দিগড় বিভাগ।[৬৭]

এই তিনটি সন্নিকটবর্তী পরগনা বহুক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত হয়ে ও মীর কাশিমের বন্দোবস্ত পর্যন্ত প্রধানত: ৪ জন মুসলমান জমিদারের অধীনে ছিল।[৬৮] ১৬২৯ বর্গমাইল বিশিষ্ট এই রাজস্ব বিভাগের রাজস্ব ছিল খালসা জমা ৪৪৮৭৯ টাকা, জায়গীর ৭৫২৬ টাকা, আবওয়াব ৩৪, ৩৪২ টাকা, তৌফির ২৪২ টাকা, বাদ খরচা ৩৯৪ টাকা, সর্বমোট ১,১০,৬৪৭ টাকা।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ কোম্পানির অন্তবর্তীকালীন (১৭৬৫-১৭৯৩) ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেলদুয়ার, পাকুল্লা ও আতিয়া জমিদারীর বিকাশ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৯৩ সালে মোগল সুবাদার আজিমুশ্বানের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম ক্রয় করে মুঘল সরকারের অধীনে বাংলার একজন তালুকদার ও জমিদার হিসেবে আবির্ভূত হয়। অত:পর মীর জাফর ও মীর কাশিম থেকে যথাক্রমে চব্বিশ পরগনা, চট্টগ্রাম ও মেদেনীপুরের জমিদারী ও ভূমিস্বত্ব লাভ করেন। বাংলায় রাষ্ট্র বিপ্লবের তৃতীয় পর্যায়ে মুঘল সম্রাট শাহ আলম থেকে সমগ্র বাংলার দিওয়ানী তথা পুরো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে।

দিওয়ানী লাভ করে রাজস্ব কর্মকর্তা রেজা খান কে নায়েবে দিওয়ান এবং একই সাথে নায়েব সুবাদার নিযুক্ত করতে বাধ্য করে কার্য্যত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে। ইতিহাসে এই সময়কাল দ্বৈত শাসন কাল নামে অভিহিত।

নায়েবে দিওয়ান হিসেবে দিওয়ানী কর্তৃত্ব লাভ করে রেজা খান ১৭৬৫ সালে নতুন করে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন।[৭০] বন্দোবস্তে কোনরূপ জরিপ ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব আদায় নীতি গৃহীত হয়। যার ফলশ্রুতি কৃষকের সর্বস্ব লুন্ঠন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তার মোকাবেলায় ব্যর্থতা। এতে বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোকের প্রাণহানী ঘটে এবং এক তৃতীয়াংশ ভূমি অনাবাদী হয়ে জঙ্গলে পরিণত হয়।

দিওয়ানী বন্দোবস্তে বিভিন্ন রাজস্ব ইউনিটের নামকরনের মধ্যেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বানিজ্যিক মনোবৃত্তির চাপ সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। যেমন কোম্পানির ১৮ নং রাজস্ব ইউনিটের নাম দেয়া হয়েছে 'শিলবর্ষা এন্ড কোং'[৭১]। ২১০৩ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট এই শিলবর্ষা কালেক্টরেটের অধীনে ছিল ৬টি পরগনা যথাক্রমে বাজুহা সরকারের অধীন শিলবর্ষা, আতিয়া, কাগমারী, বড় রাজু পরগনা চতুষ্টয় এবং বরবাকবাদ সরকারের অধীনস্থ বারবাকপুর পরগনা, ঘোড়াঘাট সরকারের অধীন পুখুরিয়া পরগনা।[৭২] ১৭৮৩ সালের বন্দোবস্ত পর্যন্ত এই রাজস্ব বিভাগ টিকে ছিল।

ডব্লিউ কে. ফার্মিংগার প্রণীত ফিফথ রিপোর্টে সমকালীন পরগনা রাজস্ব ও অর্থনীতির সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়। এতে আতিয়া পরগনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যায়, "বাজুহা সরকারের অধীন

Dhaka University Institutional Repository

ও ঢাকার নিকটবর্তী আতিয়া পরগনা তখন তিন জন মুসলমান ফকিরের যথাক্রমে খোদা নেওয়াজ খান, নবী নেওয়াজ খান এবং শাহ নেওয়াজ খানের অধীনে সম পরিমান অংশে বিভক্ত ছিল।"

সমগ্র পরগনার আয়তন ছিল ৭৮৭ বর্গমাইল । দেওয়ানী পূর্ব পর্যন্ত যার আসল জমা রাজস্ব ১৬০৪১ টাকা ধার্য্য ছিল এবং বিভিন্ন আবওয়াব সহ মোট জমা ৪৭৪০৪ টাকা ছিল।[৭৩] দেওয়ানী লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশ অনুযায়ী রেজা খান আবওয়াব আরো বৃদ্ধি করে মোট রাজস্ব ধার্য্য করেন ৪৮,৫০০ টাকা।[৭৪] এতে দিওয়ানী লাভ করেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি নীতির সত্যতা প্রমাণিত হয়। অবশ্য অচিরেই এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্বহস্তে দিওয়ানী ও নিজামত ক্ষমতা গ্রহন করে। নতুন গৃহীত পাঁচশালা বন্দোবস্তে ব্যাপক রাজস্ব বকেয়া পড়ার ফলে বাধ্য হয়ে পরবর্তী বন্দোবস্তে রাজস্ব কিছুটা হ্রাস করেন।[৭৫] ১৭৭৭ সালের বন্দোবস্তে মাঝারী আকারে হ্রাসকৃত হার ৩৮,১৩০ টাকায় রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন।[৭৬] তবে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত এই হার হ্রাস বৃদ্ধি হয়নি এবং কঠোর ভাবে যথাযথ রাজস্ব আদায় করার নীতি গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য একইভাবে ২১০৩ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট শিলবর্ষা এন্ড কোং এর ১৭৮৩ সালে মোট রাজস্ব ২,৬১,৪৭১ টাকা করা হয়। যেখানে ১৭৭২ সালে ২,৭০,৯৪১ টাকা এবং ১৭২৮ সালে ১,৩৬,০৪৬ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল।[৭৭] সুতরাং এ থেকে প্রাক কোম্পানি ও কোম্পানি আমলের প্রাথমিক পর্যায়ের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার গতি প্রকৃতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

মীর কাশিমের বন্দোবস্ত কালে আতিয়া জমিদারী তিনটি শেয়ারে বিভক্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নবী নেওয়াজ খান উত্তরাধীকার বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করলে আপন ভাই শাহ নেওয়াজ খান উক্ত অংশের মালিক হন। এ সময় আতিয়ার মূল জমিদারী খোদা নেওয়াজ খান আতিয়া থেকে এনে গোড়াইতে বসতি স্থাপন করেন ও গোড়াই জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই আতিয়া বড় তরফ বা বড় আটানি হিসেবে পরিচিতি হয়।[৭৮] শাহ নেওয়াজ খান পাকুল্লায় বসতি স্থাপন করে পাকুল্লা জমিদার বা আতিয়া ছোট তরফ নামে পরিচিত হয়।[৭৯] এরা আতিয়া জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা সাইদখান পন্নীর (১৬০১/১৬০৮ খৃ:) ৬ষ্ঠ অধঃস্তন বংশ ধর ছিল।[৮০] ধারনা করা হয় রেজা খানের বন্দোবস্তে এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের পাঁচ শালা বন্দোবস্তে আতিয়া জমিদারী উক্ত দু তরফে বিভক্ত ছিল। ১৭৮৭ সালে ময়মনসিংহ

Dhaka University Institutional Repository

জেলা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে নতুন করে এতদাঞ্চলের জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। ১৭৮৮ সালে ইংরেজ সরকার সর্ব প্রথম সমগ্র দেশের ভূমি জরিপ করেছিলেন। এবং উক্ত রিপোর্টের উপরই দশশালা বন্দোবস্ত করা হয়।[৮১]

ফিফথ রিপোর্টে দেওয়ানী লাভের পর থেকে আতিয়া পরগনা শিলবর্ষা এন্ড কোং কালেক্টরেটের অধীন থাকার তথ্য পাওয়া যায়। অপর দিকে কেদার নাথ মজুমদারের বিবরণে জানা যায় দিওয়ানী থেকে ময়মনসিংহ কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়ে আতিয়া পরগনা ও বাজুহা সরকারের ময়মনসিংহ অঞ্চলের জমিদারগণ ঢাকায় ডেপুটি গভর্নর বা নায়েবে নাজিমের দপ্তরে খাজনা পরিশোধ করতো।[৮২]

১৭৬৯ সাল থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত কোম্পানির রাজস্ব বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষন করে পাঁচশালা, তিনশালা, একশালা ও দশশালা মেয়াদী বিভিন্ন বন্দোবস্ত করে। ১৭৭২ সালে হেষ্টিংস এর পাঁচশালা বন্দোবস্তের সর্বোচ্চ নিলামী বন্দোবস্তে অনেক বৃহৎ ও বনেদি জমিদারই ইজারা গ্রহনে অসমর্থ হয়।[৮৩] সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে অনেকেই অসম্ভব হার সত্ত্বেও খাজনা বৃদ্ধি স্বীকার করে জমিদারী রক্ষা করলেন। সংখ্যায় এরা অল্প কয়েকজনই ছিল। নিলাম অনুযায়ী গৃহীত রাজস্বের কিস্তি প্রথম বৎসরেই পূর্বের তুলনায় অনেক কম আদায় হল। শত অত্যাচার নির্যাতনেও কাজ হলনা। পরবর্তী বন্দোবস্ত সমূহে পুরনো জমিদারদের অনেকেই আর জমিদারী রক্ষা করতে ব্যর্থ হল।[৮৩ক] ইংরেজ কোম্পানির দেশীয় বেনিয়া, মুৎসুদ্দিরা আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা আর বিনা ঝুঁকিতে অধিক লাভের আশায় উচ্চ নিলামে এই সব জমিদারী ক্রয় করতে লাগলেন। অর্থাৎ বনিক পুঁজি শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগ না হয়ে পুন: ভূমিতেই অনুৎপাদক খাতে লগ্নী হয়। কৃষকের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে কৃষকের শেষ সঞ্চয় ও কপর্দক টুকু কেড়ে নিয়ে তারা সরকারের রাজস্ব পরিশোধ করে জমিদারী টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কেউ কেউ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে পওনী প্রথার মাধ্যমে কিছুকাল জমিদারী টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়।[৮৪] এতদসত্ত্বেও প্রচুর কিস্তি বকেয়া পড়তে থাকে। কাজেই কোম্পানির কাউন্সিল ও বোর্ড অব ডিরেক্টরস কে স্থায়ী রাজস্ব নীতি প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন, সংস্থা গঠন, বিবিধ নীতি ও কার্যক্রম গ্রহন করতে হয়। জন শোরের সাথে কর্ণওয়ালিশের অনেক বিতর্কের পর নয়া চিন্তা থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতি গ্রহন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এহেন প্রেক্ষাপটে দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত ব্যতিক্রম হিসেবে যে কয়টি প্রাচীন জমিদারী বিশেষত মুসলমান জমিদারী টিকে থাকে তন্মধ্যে আতিয়া জমিদারী অন্যতম। আশ্চার্যজনক ভাবে এটিই একমাত্র মুসলমান জমিদারী যার পুরো অংশই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে জমিদারী উচ্ছেদ পর্যন্ত প্রায় দু'শত বৎসর একই বংশ পরস্পরায় পূর্নভাবে টিকে থাকে।[৮৫] শত ঝড় ঝঞ্ঝায় কিভাবে এই জমিদারী নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয় তা বিশেষ ভাবে গবেষণার দাবী রাখে।

১৭৬৫ সালে রেজা খানের বন্দোবস্ত, ১৭৬৭ সালে মাইফান সাহেবের বন্দোবস্ত, ১৭৭২ সালের হোষ্টিংস বন্দোবস্ত এবং ১৭৭৭ সালের বন্দোবস্ত একই হারে করেন। অত:পর ১৭৮৭ সালে জেলা কালেক্টর রওন সাহেব নতুন করে বন্দোবস্ত করেন। ময়মনসিংহ কালেক্টরেটের অধীনে জেলার অন্যান্য পরগনার ন্যায় আতিয়া পরগনার জমিদারী বিভিন্ন ওয়ারিশে নিম্নোক্ত বন্দোবস্ত দেয়া হয়। কেদার নাথের বিবরণ-

বন্দোবস্ত নং- ৩৫ ঃ পরগনা আতিয়া হিস্যা ।০ আনা রাজস্ব ১২০১ টাকা এই অংশের মালিক আলেপ খাঁ চৌধুরী।[৮৬]

বন্দোবস্ত নং- ৩৬ ঃ পরগনা আতিয়া হিস্যা ।০ আনা রাজস্ব ১২০১ টাকা, এই অংশের মালিক ইমাম বক্স খাঁ।[৮৭]

বন্দোবস্ত নং- ৩৭ ঃ পরগনা আতিয়া হিস্যা ।।০ আনা, রাজস্ব ২৭৬৩৫ এই অংশের মালিক আলিয়ার খাঁ। এই সময় আলিয়ার খাঁ ফৌজদারী জেলে আবদ্ধ আছেন।[৮৮]

বন্দোবস্ত নং- ৩৮ ঃ তালুক প্রানকৃষ্ণ ঘোষ- রাজস্ব ৬৪ টাকা আতিয়ার অধীন একটি ক্ষুদ্র মহাল, ইহার মালিক রাজ কিশোর।[৮৯]

কালেক্টর সাহেবের বন্দোবস্তে মোট ৪৭ টি মহাল ও হিস্যার উল্লেখ আছে যা শেষ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলায় ছিল এবং এরূপ ১২৮টি মহাল ও হিস্যা ছিল যা পরবর্তীতে অন্য জিলায় চলে গেছে।[৯০] এর মধ্যে ১২৬ নং তরফে বয়রা বাড়ী ১১৭ টাকা, ১২৭ নং তরফে দুর্গাপুর ১৬৩ টাকা, ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

নং তরফে পাঙাসিয়া ৭১৭ টাকা বড় রাজু হতে বহির্গত পৃথক মহল পৃথক বন্দোবস্তে শেলবর্ষ কালেক্টরের অধীন ছিল। এতে আটিয়ার আট আনি মালিকগনের স্বত্ব ছিল।[৯১]

রওন সাহেবের বন্দোবস্তের পূর্বে আতিয়া, কাগমারী ও বড়বাজু ঢাকা শেলবর্ষের অধীন শাসিত হতো। এই রিপোর্ট প্রদান করার সময় মাত্র এই মহাল গুলি এই জেলা ভুক্ত করা হয়েছে। সে কারণে এই পরগনা ত্রয়ের পূর্ব ইতিহাস রওন সাহেব প্রদান করতে পারেন নাই।

মিঃ রওন জেলার কালেক্টর, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট তিনটি ক্ষমতাই পেয়েছিলেন।[৯২] তখনো নির্দিষ্ট বেতন ছিলনা। রাজস্ব থেকে হাজারে ১০ টাকা কমিশন। দিওয়ান ছাড়া কোন সহকারী পাইক পেয়াদা ছিলনা। জমিদাররা প্রয়োজনে তা সরবরাহ করতো বিনিময়ে জমিদারদের নানকার জমি ছিল।[৯৩] ব্যাপক জল প্লাবনে অনেক জমিদারের রাজস্ব অনাদায়ী হলে রেহাই প্রার্থনা করলে মিঃ রওন রেহাই দিয়ে অনেক জমিদারকে নিলামের হাত থেকে রক্ষা করেন।[৯৪] প্রথম দিককার ন্যায় এসময় বকেয়ার সাথে সাথে নিলাম ঘোষনা করা হতো না। বরং সময় দেয়া হতো, তাতে ব্যর্থ হলে পরে নিলাম দেয়া হতো। তবে মিঃ রওনের সদাশয় আচরনের সুযোগ গ্রহন করে জমিদাররা প্রজাদের উপর অত্যাচার বাড়িয়ে দিয়েছিল।[৯৫] তবে এ অত্যাচার আতিয়া জমিদারীতে খুব কমই হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়। যার ফলে আশে পাশের অন্যান্য জমিদারীতে ব্যাপক বিদ্রোহ হলেও আতিয়া জমিদারী সমুহে খুব একটা বিদ্রোহ দেখা যায় না। তবে জল প্লাবনের পরের বৎসর এতদাঞ্চলে ভয়ানক দুভির্ক্ষ দেখা দেয়, যাতে চাউলের মন ২টাকা হতে ২.৫০ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। অন্নাভাবে খেতে না পেরে বহু লোক ১ টাকা থেকে ৪ টাকায় পুত্র সন্তান বা স্ত্রীকে বিক্রি করার নজির পাওয়া যায়।[৯৬]

১৭৮৯ সালে স্টিফেন বেয়ার্ড কালেক্টর হয়ে আসেন এবং পূর্ব বন্দোবস্তই অল্পাধিক পরিবর্তন করে দশশালা বন্দোবস্ত করেন। সে সময় জমিদারীর অধীন সিকিমী তালুকগুলির পৃথক বন্দোবস্ত করার পরামর্শ হয়েছিল। নানা কারণে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। এতদসত্বেও হুজুরী তালুকগুলি জমিদারী হতে খারিজ হয়ে পৃথক হলে, জেলা কালেক্টরেট আমলা সংখ্যা বাড়াতে হয়। তদানুসারে মাসিক ৭০ টাকা বেতনে ১ জন ইংরেজি শিক্ষিত তৌজি নবিশ, ১৫ টাকা বেতনে ১ জন পার্শী নবিশ ও ১ টাকা বেতনে ৪ জন বাংলা নবিশ নিযুক্ত হয়।[৯৭]

এ সময় আতিয়ায় থানা ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আতিয়া পরগনা প্রশাসনিকভাবে ঢাকা জেলার সাথে যুক্ত হয়। অবশ্য জমিদাররা তাদের ভূমি রাজস্ব ময়মনসিংহ কালেক্টরেট তৌজিতেই পরিশোধ করতো। তবে পার্শ্ববর্তী কাগমারী, বড় বাজু ও পুখুরিয়া পরগনা প্রশাসনিকভাবে ময়মনসিংহের অধীনে থাকে। কাগমারীতে তহশিল কাছারি ও জগন্নাথগঞ্জ থানা ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৮]

কোদারনাথের বিবরণে জানা যায়, এই সময় "আটিয়ার বার আনার জমিদারগন নাবালক বিধায় এই মহালের শাসন সংরক্ষণের ভার তাহাদিগের সরকার গোবিন্দ চাকী, পাচু বসু এবং রাজচন্দ্র মুখার্জির হাতে ন্যাস্ত আছে। ইহাদের অত্যাচার অপরিসীম। ইহারা প্রজার খাজনা একবার আদায় করিয়া কাগজপত্র গোপন করেছে এবং পুনরায় প্রজার নিকট খাজনার দাবী করিয়াছে। প্রজা দ্বিতীয়বার খাজনা দিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং সরকারী রাজস্ব বন্ধ করে ফেলেছে। এদিকে উৎপীড়িত প্রজা পলায়ন করে প্রান রক্ষা করিতেছে।[৯৯] এই সময়ের কালেক্টর চিঠিতে জানা যায় যে, মহালের ১৪০০ মৌজার মধ্যে ৫০০ মৌজার প্রজা আছে তারাই কৃষি কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে।"[১০০]

এতে স্বাভাবিক ভাবে রাজস্ব পরিশোধ করতে পারার কথা ছিলনা। কিন্তু যেহেতু রাজস্ব আদায়ে জমিদারী নিলামে উঠার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সেহেতু ধারনা করা যায় মাত্র ৫০০ মৌজার প্রজা থেকে আদায় করা হতো সমস্ত মৌজার ধার্য্য রাজস্ব, আবওয়াব ও অন্যান্য কর। সুতরাং প্রজার অবস্থা এবং জমিদারী শোষণের মাত্রা কতটুকু পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। আতিয়ার জমিদারগণ আদি জমিদার, মুসলমান ও ধর্মভীরু জমিদার হওয়ায় তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে শোষণ মানসিকতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানে শোষণের যে তথ্য পাওয়া যায় প্রথমত: তা হিন্দু সরকার, নায়েব ও গোমস্তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত: ময়মনসিংহ এবং বাংলার অন্য যে কোন জমিদারীর তুলনায় এখানে শোষণের মাত্রা কম ছিল বলে অনুমান করা যায়। পাশ্ববর্তী ময়মনসিংহ, আলেপসিংহ জমিদারী ছিল প্রজা শোষণের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এমনকি ধনবাড়ী ও সন্তোষের জমিদারদের অত্যাচার, সামন্ত চরিত্রের যে তথ্য পাওয়া যায়, দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারদের ক্ষেত্রে সেরকম কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কালেক্টর বেয়ার্ড সাহেবের আমিন প্রদত্ত রিপোর্টে এই চিত্র পাওয়া যায়।[১০১] ময়মনসিংহ জমিদারীর রাজস্ব বকেয়া পড়ায়, বেয়ার্ড সাহেব ময়মনসিংহ জমিদারদের কারারুদ্ধ করেন। জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও খাজনা উসুল তহবিলের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। আতিয়া পরগনার জমিদারদের ক্ষেত্রে এরূপ কোন অবস্থার সৃষ্টি না হওয়ার কারন অজ্ঞাত। সম্ভবত: হিন্দু নায়েব সরকারগণ

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন এবং নিজেদের চাকুরী টিকে রাখা ও নির্বিঘ্নে শোষণের স্বার্থেই রাজস্ব বকেয়া পড়া থেকে এবং নিলাম থেকে জমিদারী রক্ষা করেন।

১৭৯০ সাল থেকে জমিদারের বিচার ক্ষমতা আইনত: বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু এরপরেও বাস্তবে জমিদাররা নিজ এলাকায় বিচার করতেন। সমগ্র ঔপনিবেশিক আমলে বিচার ব্যবস্থা ধাপে ধাপে প্রদেশ, জেলা থেকে মহকুমা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছলেও ন্যায় বিচার প্রাপ্তির বাস্তব অবস্থা ছিল ভিন্ন। প্রজায় প্রজায় মোকাদ্দমা হলে ন্যায় অন্যায় পরিমাপ হতো। কিন্তু প্রজা-জমিদারে হলে ন্যায় অন্যায় পরিমাপের বাস্তব ক্ষেত্রে সুযোগ খুব কমই ছিল। জমিদারদের রাজস্ব বকেয়া না পড়লে এবং সে সময় গ্রামে তদন্তে না গেলে সুদুর পল্লীর জমিদারী সমুহে জমিদার-প্রজার অভ্যন্তরীন বাস্তব অবস্থা জানা সম্ভব ছিল না। কিছু ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপায়হীন প্রজা নিরবে সব সহ্য করতো।

মোহাম্মদ বাকেরের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিভিন্ন বিভক্তি ও ওয়ারিশদের সাথে স্বতন্ত্র ভাবে বন্দোবস্ত সত্ত্বেও ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আতিয়া পরগনা একই তৌজিভুক্ত ছিল।[১০৩] এই বক্তব্যের পক্ষে তিনি কোন তথ্য সূত্র উল্লেখ করেননি। ১৭৯৬ সালে যদি তৌজি আলাদা হয়ে থাকে তবে কত নম্বর তৌজিতে কার নামে বন্দোবস্ত হয় এ সম্পর্কে তিনি কোন কিছু উল্লেখ করেন নি। কেদার নাথ ও মোহাম্মদ বাকেরের বিবরণ, ফিফ্‌থ রিপোর্ট এবং এফ.এ. সাকচীর ময়মনসিংহ জেলা সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট থেকে যে পরস্পর বিরোধী তথ্য পাওয়া তাকে পুন:র্গঠন করলে দেখা যায় ১৭২২ ও ১৭২৮ সালে আতিয়া পরগনা প্রথম দুভাগে বিভক্ত হয়ে বন্দোবস্ত হয় যথাক্রমে মঈন খান পন্নীর দুই পুত্র মোনয়েম খান ও মুহাম্মদ খানের নামে। ১৭৬৩, ১৭৬৫ এবং ১৭৭২ সালে একই ভাবে মোনয়েম খানের একমাত্র পুত্র খোদা নেওয়াজ খানের নামে বড় আটানা এবং মুহাম্মদ খানের দুই পুত্রের মধ্যে নবী নেওয়াজ খানের নামে ছোট আট আনা বন্দোবস্ত হয়। ১৭৮৩ ও ১৭৮৭ সালে একই ভাবে বড় আট আনা আলেপ খাঁর নামে এবং ছোট আট আনা আলী ইয়ার খাঁর নামে বন্দোবস্ত হয়। ১৭৯০ সালের দশশালা বন্দোবস্ত এবং যা পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে গৃহীত হয়, তা কোন কোন পক্ষে বন্দোবস্ত হয় এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়না। পরবর্তী পরিচ্ছদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৩.৫ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম ভাগে ঔপনিবেশিক জমিদারী শোষণের স্বর্ণযুগে (১৭৯৩-১৮৮৫) দেলদুয়ার, গোড়াই, পাকুল্লা সহ আতিয়া জমিদারী ও জন অর্থনীতির স্বরূপ ঃ

কেদার নাথের বিবরণে জানা যায় যে, ১৭৮৭ সালে আলেপ খাঁ চৌধুরী ও তদীয় নি:সন্তান ভ্রাতা ইমাম বক্স খাঁ আতিয়া পরগনার ।।০ আনা বন্দোবস্ত লাভ করে বড় আট আনা নামে পরিচিত হয়। পরগনার অপর ।। ০ আনা আলিয়ার খাঁর নামে বন্দোবস্ত হয় যা ছোট আট আনা নামে পরিচিত হয়।[১০৪] সম্ভবত ১৭৭৭ সাল থেকেই এদের নামে বন্দোবস্ত হয় এবং যথার্থই ধারনা করা হয় যে, ১৭৯০ সালের দশশালা বন্দোবস্ত এদের নামেই হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদের নামেই হয়ে থাকবে। মুহাম্মদ বাকেরের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত আতিয়া পরগনা একই তৌজি ভুক্ত হয়। তাহলে ১৭৯৭ সালে নতুন নামে তৌজি বন্দোবস্ত হয় এবং সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই বড় আট আনা আলেপ খাঁর দুই পুত্র ফয়েজ আলী খাঁ ও কোঁচালী খাঁর[১০৫] নামে ১০ নং তৌজিতে[১০৬] বিভক্ত হয় এবং ছোট আট আনা আলেয়ার খাঁর একমাত্র পুত্র জাঁহাইয়ার খান পন্নী[১০৭] এবং দুই কন্যা রমজান খাতুন ও জান খাতুনের নামে ৯নং তৌজিতে আলাদা হয়। দেলদুয়ারের জমিদার হিসেবে পরিচিত পরবর্তী কালের খ্যাতনামা গজনবীরাই জমিদারী উচ্ছেদ পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ৯নং তৌজির প্রধান শরীক বা মূল জমিদার ছিলেন। অপর পক্ষে করটিয়ার জমিদার নামে পরিচিত খ্যাতিমান পন্নী পরিবার ১০নং তৌজির প্রধান জমিদার ছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পূর্ববর্তী শতবর্ষে আতিয়া ও দেলদুয়ার জমিদারী নিম্নোক্ত হারে ওয়ারিশদের মধ্যে বিভক্ত হয়। আলেপখাঁর অংশ বড় আট আনার ৵০ আনা তার পুত্রদের মধ্যে কোচালী খাঁ প্রাপ্ত হয়; তিনি সম্ভবত পাকুল্লায় বসতি স্থাপন করেন। ঐ ৵০ আনার ১০ আনা তার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র জাফর আলী খাঁ, ১৮।। কড়া নিকাহিতা স্ত্রীর পুত্র বিরাম আলী খাঁ, ১৮।। কড়া কন্যা রন খাতুন প্রাপ্ত হন।[১০৯] রন খাতুন কে ধনবাড়ীর রেজআলী চৌধুরী বিবাহ করলে ঐ অংশ ধনবাড়ীর জমিদার প্রাপ্ত হয়। বিরাম আলীর ১৮।। গন্ডা নীলাম হয়ে গেলে বলিয়াটির সাহা জমিদারগণ ১১।। গন্ডা ও ষষ্ঠী মজুমদার ৭ গন্ডা ক্রয় করেন।[১১০] বিরাম আলীর পুত্র রহিম উদ্দীন চৌধুরী[১১১] সম্ভবত: নাটোর কালেক্টরেটের সেরেস্তাদার বা মুন্সী পদে চাকুরীরত ছিলেন।

পরবর্তীকালে পাবনার দুলাই মৌজায় তালুক ও জমিদারী ক্রয় করে দুলাইর[১১২] জমিদার বংশের পত্তন করেন।

কোচালী খাঁর অপর পুত্র জাফর আলী খাঁর অংশ তার একমাত্র পুত্র রহিছ উদ্দীন চৌধুরী লাভ করেন এবং পাকুল্লায় বসতি স্থাপন করেন। রহিছ উদ্দিন চৌধুরী মৃত্যুর পর পুত্র সদরুদ্দীন চৌধুরী এবং তার মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র চাঁদ চৌধুরী এই এক আনা প্রাপ্ত হন।[১১৩] তার অল্প বয়সে নি:সন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী উক্ত এক আনা প্রাপ্ত হন। দেলদুয়ারের দক্ষিণ বাড়ীর জমিদার সৈয়দ মুছলন্দ আলী চৌধুরী ওরফে মুচি মিয়া উক্ত চাঁদ চৌধুরীর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করে উক্ত এক আনা প্রাপ্ত হন।[১১৪] মুচি মিয়া একই সময় পাবনা দুলাইর জমিদার আজিম উদ্দিন চৌধুরীর দুই বোন আশরাফুন্নেসা ও সফিকুন্নেসা কে বিয়ে করে সেখান থেকেও জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন।[১১৫] পরবর্তী কালে মুচি মিয়া ও আজিম উদ্দিন চৌধুরী দুজনেই সাহসী জমিদার হিসাবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং উভয়ে খুনের আসামী হয়ে ফেরারি হন।[১১৬] উভয়ের সম্পত্তির একাংশ সরকার ক্রোক করে ও নিলাম দেয়। মুছি মিয়া ফেরার হয়ে মক্কা যাওয়ার সময় নিজ জমিদারী অংশের ।√১০ আনা স্ত্রী কে হেবা করে দিয়ে যান।[১১৭] ফলে স্ত্রী দাবীদার মূলে উক্ত অংশ নিলাম থেকে রক্ষা করেন। নিলাম অংশ ক্রয় করেন ঢাকার নবাব আব্দুল গনি।[১১৮] স্ত্রীর ঐ অংশ সহ দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদারীর মোট দেড় আনা জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন তার দুই পুত্র যথাক্রমে দেলদুয়ারের বড় নবাব মিঞা খ্যাত সৈয়দ আব্দুল জব্বার চৌধুরী[১১৯] এবং তদীয় ভ্রাতা, পরবর্তী কালের বগুড়ার নবাব সৈয়দ আব্দুস সোবহান চৌধুরী।

বড় আট আনার বাকী ।√০ অংশ অর্থাৎ ছয় আনা আলেপ খাঁ চৌধুরীর বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র ফয়েজ আলী খাঁ লাভ করেন। তার অংশের ১৮। ।// অংশ করে দুই কন্যা লাভ করেন। এক কন্যা সলিম নগরের গওহর আলীর সাথে বিবাহিত। অপর কন্যা ঢাকার নবাব পরিবারে বিবাহিত।[১২০ক]

সলিম নগরের উক্ত গওহর আলী পরবর্তীতে দেলদুয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা অল্প বয়সে বিধবা রওশন খাতুন কে বিয়ে করে দেলদুয়ারে চলে যান। ছোট আট আনীর বাকী চার আনা অংশ লাভ করেন পন্নী বংশের মূল ধারার প্রতিনিধিত্বকারী সাদাত আলী খান পন্নী।[১২০খ] কিন্তু বিমাতার সাথে সম্পত্তি নিয়ে মামলার জন্য তিনি ঢাকার নবাবের সাথে ঋন ও অন্যান্য সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। নবাব আব্দুল

গনির সহায়তায় মামলায় জেতে সাদাত আলী খান চুক্তি ভঙ্গ করেন। নবাব আবদুল গনি ১৮৩৮ সালে পাল্টা মামলা করে চুক্তি মোতাবেক জমিদারীর ষোল ভাগের সাত ভাগ ষোল আনা রূপে ।।০ আনা লাভ করেন।[১২১] সাদাত আলী খানের নয় আনা তার একমাত্র পুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী লাভ করেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব কালে উক্ত মাহমুদ আলী খান এতদাঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর আলিয়ার খাঁর মৃত্যু হলে ১৭৯৭ সালে তার বিবাহিত (১ম) স্ত্রী মতি বিবির পুত্র জাঁহাইয়ার খান পন্নী চারি আনা ও কন্যা জাহান খাতুন ।১৫ গন্ডা প্রাপ্ত হন। রমজান খাতুনের √৫ ও জান খাতুনের /১৫ গণ্ডা হিস্যা কোন অজ্ঞাত কারনে ঢাকার নবাব সাহেবের নিকট চল্লিশ হাজার টাকার জন্য ঋনে আবদ্ধ থাকে। অবশেষে এই ।০ চারি আনা অংশ ঢাকার নবাব সাহেব গ্রহণ করেন।[১২২] অবশিষ্ট ।০ চারি আনা অংশ জাঁহাইয়ার খাঁন নি:সন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর, পূর্বের হেবা দান সূত্রে তার বিধবা স্ত্রী রওশন খাতুন লাভ করেন।[১২৩]

চারানের জমিদার কামাল খাঁর কন্যা রওশন খাতুন স্বামীর মৃত্যুর পর পাকুল্লায় বসতবাটি ছেড়ে দেলদুয়ারে চলে আসেন। এইভাবে ১৮০৯ সালের পরবর্তী কোন এক সময়ে রওশন খাতুন আতিয়া পরগনা প্রতিষ্ঠার দু'শত বছর পর ষোল আনা জমিদারীর মাত্র চার আনা নিয়ে দেলদুয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন।[১২৪] রওশন খাতুনের পক্ষে এই জমিদারী দেখাশুনা করতেন তার দ্বিতীয় স্বামী সলিম নগরের গওহর আলী কিন্তু সমকালীন অন্যান্য ঔপনিবেশিক জমিদারদের ন্যায় গওহর আলী নারী, মদ আর শিকার নিয়ে মত্ত থাকার সুবাদে রাজস্ব বকেয়া পড়ে, দেড় আনার বিশাল জমিদারী অংশ নিলাম হয়ে যায়।[১২৫] নিলাম অংশ গুলো ক্রয় করেন কৃষ্ণপুরের রাধা মনি দেবী, গয়হাটার শ্রীকান্ত সেন এবং উলার মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[১২৬] **মোহাম্মদ বাকেরের বর্ণনা** মতে, রওশন খাতুনের অংশগুলো তাদের নিকট পত্তন দেয়া হয়।[১২৭] গওহর আলী অল্প দিন পরেই নি:সন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অত:পর এই √ হিস্যা জমিদারী লাভ করেন পিতা চারানের জমিদার কামাল খান।[১২৮]

কামাল খানের মৃত্যু পূর্বেই নি:সন্তান রওশন খাতুন উক্ত জমিদারী দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে বন্টন করে দেন। সালামত আলী ও মাজামত আলী খান ভ্রাতৃদ্বয় যথাক্রমে রওশন খাতুনের দেলদুয়ারের বসতবাটি সহ (১৬।।√), (১৬ গন্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্তি) প্রায় পৌনে এক আনা করে এবং দু'বোন দৌলত

Dhaka University Institutional Repository

খাতুন ও ঈদুন খাতুন ৮ গন্ডা ১ কড়া ১ ক্রান্তি করে মোট এক আনার কিছু বেশী জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন।[১২৯] রওশন খাতুন ১৮৪৯ সালে বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘায়ু পেয়ে ইন্তেকাল করেন। ১৮৫৭ সালে অল্পবয়সে সালামত আলী খানের মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র লাইস উদ্দিন আলী খান এবং দুই কন্যা খোরশেদুন্নেসা ও রাহাতুন্নেসার মধ্যে জমিদারী বিভক্ত হয়। এরা দেলদুয়ার বড়বাড়ী জমিদার নামে পরিচিত হয়।[১৩০ক] ১৮৫৫ সালে মাজামত আলী খানের মৃত্যুর পর তার অংশ দুই পুত্র আবদুল আজিজ খান ও আবদুল হাকিম খান এবং দুই কন্যা নজমুন্নেসা ও নুরুন্নেসার নামে জমিদারী স্বত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে। আব্দুল হাকিম দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী ও মূলধারা জমিদার হিসেবে পরিচিত।[১৩০] এদের মধ্যে আবদুল হাকিম খান গজনবীর বংশধারা জমিদারী ব্যাপ্তি, শিক্ষা, যশ খ্যাতি নিয়ে জমিদারী উচ্ছেদ পর্যন্ত খ্যাতিমান জমিদার হিসেবে বহাল ছিলেন এবং অদ্যবধি জমিদারের বংশধররা এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করছে। বাকী এস্টেট গুলো আরো বিভক্তির পর ইস্যুহীন হয়ে মূলধারায় চলে আসে।[১৩১]

রওশন খাতুনের দুই বোনের মধ্যে দৌলত খাতুনের বিয়ে হয় মকীমপুরের জমিদার বংশধর সৈয়দ মোহাব্বত আলীর সাথে এবং তার বংশ ধারাই দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন। অপর বোন ঈদুন খাতুনের বিয়ে হয় ঢাকার কাজী পরিবারে, তাদের বংশধররা রওশন খাতুনের ছেড়ে আসা পাকুল্লা বসতবাটিতে থেকে পাকুল্লায় সৈয়দ জমিদারীর অপর একটি ধারা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩২]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দুই দশকের মধ্যে আতিয়া পরগনা ও দেলদুয়ার জমিদারী বহু বিভক্তির ফলে খাজনা আদায়ে জটিলতা দেখা দেয়। এমনি অবস্থায় বিরোধ নিরসনে অংশীদারগন ১৮১৪ সালে ময়মনসিংহ কালেক্টরেটের নিকট আবেদন করেন। কালেক্টর জনৈক আবদুল আলী মুনশিকে আমিন নিযুক্ত করে আতিয়ায় প্রেরন করেন। আব্দুল আলী মুনশি বত্রিশটি ছাহামের ভিত্তিতে অংশীদারগণের স্ব স্ব অংশ বন্টন করেন।[১৩৩]

কিন্তু আতিয়া পরগনার মধুপুর গড়ের পাহাড়ী ও জঙ্গলাধীন দুর্গম অঞ্চল এই সময় সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করা হয়নি। যা এ সময় সাধারণ্যে গড়ারণ্য নামে পরিচিত হয়। এবং থাকবস্ত সার্ভের সময় এই গড়ারণ্য আড়াই পাড়া চক্র নামে পরিগনিত হয়।[১৩৪] তাই সংশ্লিষ্ট জমিদারগণ আড়াইপাড়া চক্রকে অবিভক্ত রেখে স্ব স্ব অংশানুযায়ী উপস্বত্ব ভোগ দখল করেছেন। এই প্রেক্ষিতে তারা নিজেদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

একটা অঙ্গীকারপত্রেও সম্পাদনা করে নিয়েছিলেন। অঙ্গীকারপত্রের বিধানমতে আড়াইপাড়া চক্রের শাসন সংরক্ষণের জন্য মালিকদের পক্ষ থেকে একজন সভাপতি ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে পরিচালিত হতে থাকে।[১৩৫] জমিদারীর কাগজপত্রে আড়াইপাড়া চক্রের গ্রামের সংখ্যা চারশত একানব্বই, সেটেলমেন্ট জরিপে গ্রামের সংখ্যা সাতাশ।[১৩৬]

১০৯ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট মধুপুর গড়ের ১৩ বর্গমাইল বনাঞ্চল থাক সার্ভে থেকে শুরু করে জমিদারী আমলের সকল সার্ভেতে আড়াই পাড়া চক্র নামে আতিয়ার সকল তৌজির ও শেয়ারের অধীনে রেকর্ড হয়।[১৩৭] যদিও কিছু নির্দিষ্ট টিলাভূমির অবস্থান ছিল অস্পষ্ট। অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুযায়ী এ সম্পত্তির আয় বার্ষিক ৪০,০০০ টাকা।[১৩৮] কিন্তু বাস্তবে এর আয় দ্বিগুনের বেশী হওয়ার কথা। কেননা যেখানে একটি শাল গাছ ২ থেকে ৮ রুপী, সেখানে প্রতি পাখী চালা ভূমির মূল্য ধরা হয়েছে মাত্র ৮ আনা। আবাদকারীদের অনেকেই সমতল নিচু ভূমি ছেড়ে এখানে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করে ও শস্য উৎপাদন করে। তবে ম্যালেরিয়ার ভয়ে তারা সর্বক্ষন তটস্থ থাকতো। এখানের উচ্চ ভূমিতে পাট, তুলা, পিপার, উৎপাদিত হতো। ঢালু জমিতে কখনো আমন ধান উৎপাদিত হতো।

আতিয়া পরগনায় আড়াই পাড়া চক্র ছাড়াও ১০নং তৌজিতে তিরছা পাকুল্লা, পাঠানদহ, বেতরাইল, এলাসিন প্রভৃতি গ্রামগুলো অভিভক্ত ছিল।[১৩৯] কতগুলি খারিজা তালুক ছিল যেমন কাবিন মহল, খামার ছাতা ভূমি প্রভৃতি। কাবিনমহলটি করটিয়ার জমিদার সাদাত আলী খান তার স্ত্রী জমরদুন্নেসা কে যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন।[১৪০] ১৮৩৮ সালে সাদাত আলীর সাথে মামলায় জিতে ঢাকার নবাব বিভিন্ন মৌজায় ছড়ানো কাবিন মহলের 'ষোলআনা' এবং গোরাই খামারছাতার 'সাত আনা' লাভ করে ১০ নং তৌজির অংশীদার হন।[১৪১] ঢাকার নওয়াব তখন বিভিন্ন মৌজা থেকে ভোগ দখল করেন এবং কালেক্টরেটে আবেদনের মাধ্যমে তার অংশকে ৫০৩২ তৌজিনম্বরে ১০ নং তৌজি থেকে আলাদা করে নেন।[১৪২] জামুর্কিতে প্রধান ও সদর কাছারি[১৪৩] এবং কালিহাতি সহ বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কাছারি স্থাপন করে জমিদারী পরিচালনা ও রাজস্ব সংগ্রহ করেন।

আতিয়া পরগনায় এতদাঞ্চলের ও সারাদেশের জনগনের যাতায়াতের জন্য রাজস্ববিহিন সারাকামি ভূমি ছিল।[১৪৪] কেননা আতিয়া পরগনার মধ্যে দিয়েই চলে গিয়েছে সোনারগাঁও-ঢাকা-মির্জাপুর-পাকুল্লা-

Dhaka University Institutional Repository

দেলদুয়ার-আতিয়া-সন্তোষ-পাবনা-পাটনা-বিহার হয়ে গ্রান্ড ট্রাংক রোড। মুঘল যুগে এই সড়ক পথ ধরে সেনাবাহিনী এতদাঞ্চলে অভিযানে আসত এবং শস্যাদি নষ্ট করে ফেলত।[১৪৫] এরই ফলশ্রুতিতে এখানে পথের দুপাশের জমি রাজস্ব মুক্ত হয় বা রাজস্ববিহীন ভূমি পত্তনী দান প্রথা শুরু হয় যাকে বলে সারাকামি ভূমি।[১৪৬] পরগনার এক চতুর্থাংশ ভূমিই ছিল প্রায় রাজস্ববিহিন ভূমি। এবং প্রত্যেকের জমিজমার এক পঞ্চমাংশ নিষ্কর ছিল।[১৪৭] এফ.এ. সাকচীর মতে, এই কারনে এতদাঞ্চলের ও আতিয়া পরগনার রায়তি রাজস্ব হার পাশ্ববর্তী অন্যান্য পরগনা বা জেলার তুলনায় কম ছিল। পরগনায় দখলি প্রজার সাধারণ ভূমি রাজস্ব একর প্রতি (৩ বিঘার বেশী) ২ টাকা ৪ আনা ৬ পয়সা হারে ছিল। এত কম, এই নিম্ন হারের রাজস্ব প্রথা সেই সাঈদ খান পন্নীর সময় থেকে চলে এসেছে।[১৪৮] ভূমির হস্তান্তর প্রক্রিয়ার ফলে নতুন বন্দোবস্তে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই প্রথা তুলনামূলক ভাবে অব্যাহত ছিল।

যদিও অনেক জমিদারীর ন্যায় দেলদুয়ার, করটিয়া প্রভৃতি আতিয়ার জমিদারী সমূহে জমিদারদের প্রত্যক্ষ ভাবে জমিদারী পরিচালনায় উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। প্রজার উপর মূল রাজস্ব হার কম থাকলেও বিভিন্ন আবওয়াব ব্যাপক ভাবে ধার্য্য করা হয় জমিদারের নায়েব ও গোমস্তা কর্তৃক।[১৪৯] কেননা ১৮৫৯ এর খাজনা বিধি ও ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পূর্বে জমিদারী Estate সমুহে রাজস্বের হার নির্ধারনে কোন সাধারণ নীতিমালা ছিলনা। জমিদাররা নিজেরাও তাদের জমিদারী Estate এর জন্য কোন নীতিমালা তৈরী করেনি। এমনিতে ৪টি হস্তান্তরের পরে একটি হোল্ডিং এর রাজস্ব দ্বিগুন বেড়ে যায়। আর এর সাথে অতিরিক্ত আবওয়াব যথাক্রমে নজর, সেলামি ইত্যাদি উৎস থেকে অনেকেই রাজস্ব বাড়িয়েছেন ক্রমান্বয়ে ৫০% থেকে ৭৫% করে।[১৫০] পাখী প্রতি (সাড়ে ৩ একর) ১১ টাকা হারে নজর একাধিকবার রায়তকে দিতে হতো। রায়তী ক্রেতা থেকে ক্রেতাকে, এক কবলা দাতা থেকে উপরের শেষ কবলা দাতা পর্যন্ত এভাবে দিতে হতো। ফলে এইরূপে ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বিপুল রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৫১]

প্রজার উপর একজন জমিদারের এবং জমিদার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের জন্য উত্তরাধিকারী ধারায় সেলামী প্রদান প্রথা এই পরগনায় বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল।[১৫২] আর সম্ভবত মুঘল আমল থেকেই এটা অন্য পরগনা থেকে এখানে বেশী মাত্রায় ছিল। নয়া জমিদারীর চাইতে সকল আদি জমিদারীতেই এই প্রথা তুলনামূলক বেশী ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অর্ধশতক শেষে এহেন নজর সালামির চিত্র নিম্নোক্ত তথ্যে পাওয়া যায়[১৫৩]

		টাকা – আনা – পয়সা
১।	একজন সন্তান-	১ – ৪ – ০
২।	অপ্রধান ভ্রাতৃবর্গ -	১২ – ০ – ০
৩।	প্রধান ভ্রাতৃবর্গ (যৌথ) -	২৪ – ০ – ০
৪।	অন্যদের ক্ষেত্রে -	২০ – ০ – ০

একটি নতুন বন্দোবস্তে এভাবে পূর্ণ সালামি বিভিন্ন সময়ে ২০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত[১৫৪] উঠেছে। একটি রায়ত দম্পতির জন্য সাধারণত: ৮ পাখীর বেশী জমি অনুমোদিত ছিল না।[১৫৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে আতিয়া থানা চৌকিকে প্রশাসনিক ভাবে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা জেলার অধীনে নেয়া হয়। কিন্তু রাজস্ব জমা হতো ময়মনসিংহ কালেক্টর তৌজির অধীনে। ১৮৬৬ সাল থেকে প্রশাসনিক ভাবেও ময়মনসিংহের অধীনে আনা হয়। ঢাকা থেকে স্থানান্তরে সময় আতিয়া থানার আয়তন উল্লেখ করা হয়েছে ২২১ বর্গমাইল।[১৫৬] পরবর্তীতে এই আয়তন অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৭৭৮ সালের রেনেলের জরিপে এবং রাজস্ব বন্দোবস্ত সমূহে আতিয়া পরগনার আয়তন ছিল ৭৮৭ বর্গমাইল। যমুনার খাত পরিবর্তনে ও ভূমির পরিবর্তনের ফলে ১৮৫০ সালের সার্ভে রির্পোটে পরগনার আয়তন এসে দাঁড়ায় ৬৮৯ বর্গমাইল এবং ১৮৬৬ সালে ও পরবর্তীতে অন্য জেলায় ভূমি স্থানান্তরে প্রেক্ষিতে ১৯১৯ সালের সেটেলমেন্ট ও সার্ভে রিপোর্টে পরগনার আয়তন ৬৩৫ বর্গমাইলে এসে পৌঁছে।

জমিদারী রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনায় প্রথম দিকে মুঘল আমালের পাটওয়ারী, মন্ডল, কানুনগো অব্যাহত থাকে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কানুনগো তহশিল কাছারি উঠে যায়। জমিদাররা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রতি কাছারিতে একজন নায়েব এবং সদর ও মূল জমিদারীতে একজন ম্যানেজার অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত করে রাজস্ব সংগ্রহ করে।[১৫৭] সংগৃহীত রাজস্ব থেকে সরকারী অংশ নিজ দায়িত্বে জেলা কালেক্টর তৌজিতে জমা দেয়া হত। অনেক সময় সরকারী কালেক্টর অফিসের কর্মকর্তাগণ পরগনা ও মহলের জমিদারীতে এসে রাজস্ব সংগ্রহ করে নিয়ে যেত।

Dhaka University Institutional Repository

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কানুনগোর স্থলে কালেক্টর রেজিস্ট্রার পদ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে এ পদ তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে এবং তা বিচার বিভাগের অধীনে নেয়া হয়। ১৮১৯ সালে কিছু কালের জন্য কানুনগো কার্যালয় পূন:স্থাপন করা হয় কিন্তু ১৮২৩ সালের পর তাও আবার ওঠে যায়।[১৫৮] ১৮৩৪ সালে মহকুমা বিভাগ ও সাব ডেপুটি কালেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হলে স্থায়ী ভাবে উক্ত সমস্যার সমাধান হয়।

১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে প্রথম জমিদারী এস্টেট সার্ভে করা হয়। যাকে 'থাক' সার্ভে[১৫৯] বলা হয়। এই সার্ভের মাধ্যমে জমিদারী এস্টেট সমূহের সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করা হয়। ইতিপূর্বে ১৭৭৮ সালে ইংরেজ কর্তৃক প্রথম ভূমি জরিপ হলেও ভূমি মালিকানার কোন সীমানা নির্ধারণ করা হয় নাই। 'থাকবস্ত' ম্যাপে শুধুমাত্র জমিদারী এস্টেট সমূহের সীমানাই নির্ধারণ করা হয়। সামগ্রিক ভাবে এস্টেটের অভ্যন্তরীন ভূমি জরিপ করা হয়নি। তাই ১৮৪৭ সালের আইনের ফলে ১৮৪৮ সাল থেকে শুরু হয় সার্ভে কার্যক্রম।[১৬০] আতিয়া পরগনার সার্ভে সম্পন্ন হয় ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে।[১৬১] এই সার্ভে সাধারণ ভাবে রেভেনিউ সার্ভে ও ১৮৫০ সালের সার্ভে নামে পরিচিত। রেভেনিউ সার্ভেতে সামগ্রিক ভূমি জরিপ ও খাসরা ম্যাপ[১৬২] প্রণয়ন করা হয়। এতে মৌজা বা গ্রাম সীমানা সুনির্দিষ্ট করা হয় কিন্তু কোন প্লট ভাগ বা পরবর্তীকালের জেএল বা দাগ নম্বর বসানো হয়নি। তবে মৌজার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তার কিছু পরিসংখ্যান নিয়ে আসা হয়েছে।[১৬৩]

একই সময় নদী ও উপকূলীয় চরাঞ্চলে দিয়ারা সার্ভে[১৬৪] সম্পন্ন করা হয়। কোম্পানির জমিদারী সম্পর্কিত পরগনা ভিত্তিক ও জমিদারী এস্টেট ভিত্তিক বিস্তৃত তথ্যের ন্যায় ১৮২৫ সালের থাক সার্ভে একটি গুরুত্ব পূর্ণ উপাদান হতে পারে। আতিয়া পরগনার এই থাক ম্যাপ বর্তমানে পাওয়া যায় না। এটি পাওয়া গেলে লোকায়ত ইতিহাসের এক বিস্তৃত দ্বার খুলে যেতে পারতো।

১৮৫০ সালের জরিপ রিপোর্ট ও সার্ভে নকশা থেকে জমিদারী ও পরগনার জন ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। সার্ভে নকশায় আতিয়া পরগনার পরিমাণ ফল ময়মনসিংহ ও পার্শ্ববর্তী জিলায় অবস্থিত মৌজা সহ ৬৮৯.৫৮ বর্গমাইল ছিল। এতে ভূমির পরিমাণ ৪৪১৩৩০ একর, ৩ রোড, ৩৪ পোল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এর রাজস্ব ছিল ৫৪১৩৬ টাকা। লোকসংখ্যা ছিল কৃষিজীবি মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

১৪৭৭৬ জন, কৃষিজীবি হিন্দু ১২৮৮৮ জন, অকৃষিজীবি মুসলমান ২৩২৮ জন, অকৃষিজীবি হিন্দু ২৭১ জন, গ্রামের সংখ্যা ৮২০ টি ও মৌজা সংখ্যা ২৬৩।[১৬৬]

দেলদুয়ার গ্রাম ও মৌজা ছিল অনেক বড়। সার্ভে নকশার বিবরণে ২৯১ নং দেলদুয়ার মৌজার ভূমির পরিমাণ ১৪৮৫ একর, ২ রোড, ৮ পোল স্থানীয় হিসেবে ৪৪৯০ বিঘা।[১৬৭] পাকা বাড়ী মাত্র ২টি, মুসলমান বাড়ী সম্ভবত জমিদারীর উত্তর ও দক্ষিণ বাড়ী, ১৫১ টি কাঁচাবাড়ী। লোকসংখ্যা হিন্দু কৃষিজীবি ৫৫০ ও মুসলমান ২২৫ জন, অকৃষিজীবি হিন্দু ৪৬ ও মুসলমান ৩৬ জন। মোট হিন্দু ৫৯৬ জন ও মুসলমান ২৬১ জন।[১৬৮]

পার্শ্ববর্তী ৩৭২ নং মৌজাও গ্রাম আতিয়া যা কসবা আতিয়া নামে পরিচিত।[১৬৯] কেননা ১৫ নভেম্বর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আতিয়া থেকে কয়েক মাইল দুরে কাগমারী পরগনার অধীন 'টান আইল' নামক স্থানে বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলা সদরে তাৎকালীন মহকুমা সদর স্থানান্তর করা হয়। তার পূর্বে এই কসবা আতিয়াই একটি বড় পরগনা সদর, থানা সদর এবং মহকুমা সদর ছিল। ঐতিহাসিক ভাবে ইহা এতদাঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর ও আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার প্রাণ কেন্দ্র ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে প্রায় ৭৮৭ বর্গমাইল আয়তনের বৃহত্তর আতিয়া পরগনার নির্ধারিত রাজস্ব ছিল তুলনামূলক কম। আয়ও ছিল তুলনামূলক কম, সম্ভবত: প্রায় ৯,০০,০০০ টাকা।[১৭০] এই হিসেবে পরগনার ৪ আনা নিয়ে রওশন খাতুন প্রতিষ্ঠিত দেলদুয়ার জমিদারীর আয়তন ছিল প্রায় ১৯৯ বর্গমাইল। ভূমি পরিমাণ ছিল প্রায় ১,১০,৩৩২ একর, ভূমি রাজস্ব ছিল ৯ নং তৌজির অধীনে ১৩,২৮৪ টাকা।[১৭১] পরবর্তীকালে নিলাম ও বিক্রয়ের ফলে জমিদারী অবশিষ্ট থাকে মাত্র ২.৫ আনা আয়তনে প্রায় ১২৫ বর্গমাইল, ভূমির পরিমাণ ৮১,৭০৯.৯৪ একর, ভূমি রাজস্ব ৯,৪৬১.২৫ টাকা।[১৭২] এ সময়ে জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল ১,৩৫,৫৩৯ টাকা।[১৭৩] ঔপনিবেশিক ও চিরস্থায়ী জমিদারীর স্বর্ণযুগের শেষলগ্নে, ১৮৮৫ সালের রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ব বিকাশ পূর্বে প্রধান ৪টি ধারায় এবং ততোধিক এস্টেটে উক্ত দেলদুয়ার জমিদারীর বার্ষিক আয় ২,০০,০০০ টাকার উপরে ছিল।[১৭৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৪৯ সালে রওশন খাতুনের মৃত্যুর পূর্বেই দেলদুয়ারে ২.৫ আনা জমিদারী ৪টি জমিদারীতে বিভক্ত হয়। দুই বোনের বড় দৌলত খাতুন ২.৫ আনা থেকে ৮ গন্ডা ১ কড়া ১ ক্রান্তি জমিদারী প্রাপ্ত হন। মকীমপুরের সৈয়দ বংশের সৈয়দ মোহাব্বত আলীকে বিয়ে করে অত:পর দেলদুয়ার জমিদারীর ২২৫ বিঘা ঘেরা বসতবাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে আলাদা বাড়ী নির্মাণ করে দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত জমিদারীর আয়তন ছিল প্রায় ২২ বর্গমাইল, ভূমির পরিমাণ প্রায় ১৩,৬৩৬ একর, এর ভূমি রাজস্ব প্রায় ১৫৭৭ টাকা, বার্ষিক আয় তৎকালীন ২২৫৮৯ টাকা।[১৭৫]

অপর বোন ঈদুন খাতুন সমপরিমাণ ও সমআয়ের জমিদারী লাভ করে পাকুল্লায় রওশন খাতুনের ছেড়ে আসা বসত বাটিতে পাকুল্লা জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে একমাত্র কন্যা এনায়েত খাতুন কে মকীমপুরের জমিদার বংশীয় আরেক পুরুষ সৈয়দ আতাহার আলীর[১৭৬] সাথে বিয়ে দেন। কন্যা ও জামাতাকে পাকুল্লায় প্রতিষ্ঠিত করে সিঙ্গাইরে কাজী জমিদারীতে চলে যান। পাকুল্লার পরবর্তী সৈয়দ বংশীয় জমিদারের তিনটি ধারা[১৭৭] এদেরই বংশ ধর।

রওশন খাতুনের দুই ভাই, মাজামত আলী খান গজনবী ও সালামত আলী খান গজনবী যথাক্রমে ২.৫ আনা জমিদারী থেকে ১৬ গণ্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্তি করে লাভ করেন। সালামত আলী খান রওশন খাতুনের নির্মিত ২২৫ বিঘা ঘেরা মসজিদ সংলগ্ন মূল বসত বাড়ি লাভ করেন। যা দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী নামে পরিচিত। অপর ভাই মাজামত আলী ২২৫ বিঘা ঘেরা উত্তর বাড়ীর ও দক্ষিণ বাড়ীর মধ্যখানে আলাদা বাড়ী নির্মাণ করেন যা দেলদুয়ার বড় বাড়ী হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে বড় বাড়ী জমিদারীর স্মৃতি চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত। শুধুমাত্র ইটের ভগ্ন দেয়াল একমাত্র কালের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ বাড়ীর স্মৃতিচিহ্ন পারিবারিক বিরোধ ও অব্যবস্থাপনা এবং সংস্কারের খরচের অভাবে ওয়ারিশগণ কর্তৃক সাম্প্রতিককালে ভেঙ্গে ফেলেন। শুধুমাত্র কালের স্মৃতি নিয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী জমিদার ভবন যা রওশন খাতুন প্রতিষ্ঠিত। পাকুল্লার জমিদার বাড়ী যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব কালে শাহনেওয়াজ অথবা আলীয়ার খাঁ কর্তৃক নির্মিত বলে ধারনা করা হয়।

দেলদুয়ার উত্তর ও বড়বাড়ী জমিদারীর আয়তন প্রায় ৪৫ বর্গমাইল করে, ভূমির পরিমান প্রায় ২৭,২৭৪ একর, ভূমি রাজস্ব প্রায় ৩১৫৬ টাকা, বার্ষিক আয় প্রায় ৪৫,১৮০ টাকা করে।[১৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদারীর পরবর্তী জমিদারগন যথাক্রমে সৈয়দ মুছলন্দ আলী চৌধুরী ওরফে মুচি মিয়া এবং তৎপুত্র সৈয়দ আব্দুল জব্বার চৌধুরী উভয়ে বৈবাহিক সূত্রে ১ আনা করে জমিদারী বৃদ্ধি করেন।[১৭৯] অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল নাগাদ দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারী ১.৫ আনায় বৃদ্ধি পায়। দেলদুয়ার বড়বাড়ী জমিদারী এবং উত্তর বাড়ীর বিবিধ এস্টেট ইস্যুহীন অবস্থায় একটি এস্টেটের অধীনে চলে আসে। ফলে প্রজাস্বত্বের যুগে উত্তর বাড়ী জমিদারীও ১.৫ আনা জমিদারী হিসেবে বিদ্যমান থাকে। জমিদারী উচ্ছেদ পর্যন্ত দেলদুয়ার জমিদারী এতদাঞ্চলে বিশাল ও বিকাশমান এবং প্রভাবশালী জমিদার হিসেবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জমিদারী ইতিহাসের ক্রান্তিকাল ও বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তের উন্মেষকাল উনিশ শতকের সত্তরের দশক। এ সময় আতিয়া, দেলদুয়ার তথা টাঙ্গাইল থানা ও মহকুমার জমিদারী এবং জনগণ বিষয়ক বিভিন্ন রিপোর্ট, পরিসংখ্যান ও বিবরণে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায়।

১৮৭২ সালের আদমশুমারি এবং সমকালীন আতিয়া পরগনা সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায় আতিয়া, মধুপুর ও পিংনা এই তিনটি থানা সমবায়ে এই সময় টাঙ্গাইল বা আতিয়া মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। মোট ১০৪১ বর্গমাইল আয়তনের আতিয়া মহকুমার মধ্যে আতিয়া থানার আয়তনই ছিল দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৫৭১ বর্গমাইল। গ্রাম সংখ্যা প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৯২১ টি, যেখানে পুরো মহকুমায় ১৯৭১ টি ছিল।[১৮০] জনসংখ্যা একই ভাবে আতিয়া থানায় ছিল মোট ৩,০৯,৮৮৮ জন, মহকুমায় মোট জনসংখ্যা ৫,৩৬,২০১ জন, বাড়ী সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩,৩৯২ ও ৭৩,৩৩৮ টি; আতিয়ায় প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যা ছিল ৫৪৩ জন অথচ পুরো মহকুমায় গড়ে ৫১৫ জন; তন্মধ্যে শহরে সংখ্যা ১.৬১ জন, পুরো মহকুমায় ১.৮৪ জন; প্রতি গ্রামে গড় সংখ্যা আতিয়ায় ৩৩৫ জন এবং মহকুমায় গড়ে ২৪০ জন; প্রতি বর্গমাইলে বাড়ী সংখ্যা গড়ে আতিয়ায় ৭৬ জন এবং মহকুমায় ৭০ জন; প্রতি বাড়ীতে জনসংখ্যা গড়ে ৭.১ জন কিন্তু মহকুমায় গড়ে ৭.৩ জন।[১৮১] আতিয়া, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহে গড়ে মুসলিম জনসংখ্যা ৬৪.৭%, হিন্দু ৩৪.৮, হিন্দু জনসংখ্যার মৌলিক হিন্দু সংখ্যা ২৫.০২%, আধা হিন্দু উপজাতি ৮.৭৫% ছিল, অহিন্দু উপজাতি ১.৫৫%।[১৮২] উক্ত জনসংখ্যার মধ্যে পশুপালন সহ কৃষিতে নিয়োজিত সংখ্যা পুরো ময়মনসিংহের সংখ্যা গড় ৫০%, সে অনুপাতে আতিয়ায় ১,৫৪,৯৪৯ জন এবং মহকুমায় ২৬৮০১০ জন।[১৮৩] তন্মধ্যে রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার, ইজারাদার, লাখেরাজদার, তালুকদার, পাটওয়ারী, পাইক, মন্ডল, জমিদারের চাকর, সাধারণ কৃষক বা প্রজা প্রমুখ। **ডব্লিউ হান্টারের বিবরণে**, জেলার ৫টি শহরের তালিকায় আতিয়া বা টাঙ্গাইলের নাম আসেনি। সম্ভবত সে সময় আতিয়া থেকে মহকুমা সদর টাঙ্গাইল স্থানান্তরিত হওয়ায় আতিয়া তার গুরুত্ব হারায় এবং শহর দ্বিধাবিভক্ত হয় কিন্তু তখনো টাঙ্গাইল শহর হিসেবে গড়ে উঠেনি।

তাই দ্বিধাবিভক্ত শহর হিসেবে জেলা ভিত্তিক বিবরণে এটি গুরুত্ব পায়নি। টাঙ্গাইল মহকুমা সদর স্থাপিত হলে এখানে প্রায় সকল জমিদারের একটি করে সদর কাছারি স্থাপিত হয়। সে জন্যই সম্ভবত হান্টার সাহেব বলেছেন আতিয়া মহকুমার প্রধান গ্রাম কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নয়।[১৮৫] বস্তুত এটি তার ইংরেজ শাসন দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্য হতে পারে, সঠিক অর্থে যথার্থ বক্তব্য নয়। কেননা ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সব দিক থেকেই আতিয়া ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। একই বক্তব্য ছিল পুর্ববর্তী আঞ্চলিক বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রণেতা রেনল্ডের বিবরনে।[১৮৬] হতে পারে রেনল্ডের বিবরণকে তিনি হুবহু তুলে ধরেছেন।

টাঙ্গাইলের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত আতিয়া থানা ও পরগনার প্রায় ৬০ বর্গমাইল ছিল বনাঞ্চল এবং আরো ১০০ বর্গমাইল অকৃষিযোগ্য এলাকা বাদ[১৮৭] দিলে বাকী এলাকা সবটাই কৃষি আবাদ যোগ্য ভূমি। কর্ষনযোগ্য একটি বৃহৎ হোল্ডিং ছিল প্রায় ৬০ বিঘা বা ২০ একর বিশিষ্ট এবং সাধারণ একটি হোল্ডিং ছিল ১৫ থেকে ২০ বিঘা বা ৫ থেকে ৭ একর বিশিষ্ট।[১৮৮] অধিকাংশ ভূমিতে আউশ, আমন, বরো; ধান, পাট, ডাল, বাদাম, নীল, তামাক, শাক-সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন হতো। পরগনার অধিকাংশ প্রজাই কৃষির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। প্রজাদের প্রায় তিন অষ্টমাংশ ছিল ১৮৫৯ সালের দশম আইনের অধীনে স্থিতিবান রায়ত।[১৮৯]

ওজন এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে সকল পন্যের একক ছিল সের ও মন। ৮২ তোলা ১০ আনায় ছিল ১ সের, ২.৫ সেরে ছিল ১ কোন, এরূপ ১২ কোনে ১ মন।[১৯০] স্থানীয় ভূমি পরিমাপ ছিল খাদা ভিত্তিক। ১ খাদা= ৫ একর ১ রোড, ৩ পোল, স্থানীয় ক্ষুদ্র পরিমাপ একক ছিল যথাক্রমে ১ খাদা = ১৬ পাখি, ১ পাখি = ৭.৫ গন্ডা, ১ গণ্ডা = ৪ কড়া[১৯১]। ২৯ আগস্ট ১৮৭৩ সালে সাব ডেপুটি কালেক্টর প্রনীত রিপোর্টে ভূমি ভিত্তিক ৪ শ্রেণীর দাতার বিবরণ পাওয়া যায়।[১৯২] (১) সরকারকে সরাসরি খাজনা দাতা এ শ্রেণীর

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশই জমিদার ও তালুকদার। ১৭৯০ সালের দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১টি জমিদারী ও ২টি শেয়ার বৃদ্ধি পেয়ে এ সময়ে প্রায় ১৫ থেকে ২০টি জমিদারী ও ৬০ থেকে ৮০টি শেয়ারে বিভক্তি বৃদ্ধি পায়।[১৯৩] জমিদারীর প্রধান ধারা পিতৃ এস্টেট জমিদারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে ভূমির পরিমাণগত দিক থেকে ক্রয় সূত্রে ও বৈবাহিক সূত্রে ঢাকার নবাবগণ এই সময়ের আতিয়ার প্রধান জমিদার হিসেবে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পিতৃ জমিদারী করটিয়ার পন্নী পরিবার, তৃতীয়তঃ দেলদুয়ার জমিদার পরিবার চতুর্থতঃ পাকুল্লার জমিদার পরিবার, পঞ্চমতঃ নাগরপুরের জমিদার, ৬ষ্ঠত : মহেড়ার জমিদার পরিবার, সপ্তমতঃ কৃষ্ণপুর, গয়হাট্টা, গোড়াই ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জমিদার এবং স্বাধীন তালুকদারগণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমি ছিল সরকারী এস্টেট, তন্মধ্যে বার্ষিক খাস জমি ও জলমহাল অন্তর্ভূক্ত ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর ভূম্যাধিকারী ছিল বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী। ময়মনসিংহ জেলায় প্রায় ৯৯ শ্রেণীর অধিক মধ্যস্বত্বভোগী[১৯৪] থাকলেও আতিয়ায় ১৯টির বেশী শ্রেণী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়না। যথাক্রমে পত্তনী তালুক, সিকিমি তালুক, মৌরসী, নাগজমা, ইজাহারী তালুক, ধিকলী তালুক, মিস্তাক, মিরাস, মৌরুসী ইজারা, ইজারা, দায়সুদী ইজারা, দার ইজারা, কট কবলা, চক, জোত জমি, নিজ জোত, বর্গা জমি ইত্যাদি। এদের মধ্যে জোত জমি, নিজ জোত ও বর্গা এই তিন শ্রেনীই উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কৃষক শ্রেণী।[১৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ শ্রেণীর ভূমি খাজনাবিহিন এস্টেট। এতদাঞ্চলে বিশেষত আতিয়ার বিপুল পরিমাণ লাখেরাজ এস্টেট বিদ্যমান ছিল।[১৯৬] ১৫ আগস্ট ১৮৭২ এর কালেক্টর রিপোর্ট অনুযায়ী পরগনা খাজনা হার ছিল দু ধরনের। সাধারণ গ্রাম ভূমির হার ও চর ভূমির হার।[১৯৭] যেমন আতিয়ায় নিম্নোক্ত রাজস্ব হার ছিল-

ক্রমিক নং	ভূমির বিবরণ	বিঘা প্রতি টাকা-আনা থেকে টাকা-আনা	একর প্রতি টাকা-আনা থেকে টাকা-আনা
১	আউস ধানের উচ্চ ভূমি কিন্তু শীত মৌসুমে শস্য উৎপন্ন হয়	০ - ১২ থেকে ১ - ৮	৪ - ৬ থেকে ৯ - ০
২	একই প্রকার চর ভূমি	০ - ৮ থেকে ১ - ২	৩ - ০ থেকে ৬ - ৯
৩	উচ্চ ভূমি কিন্তু দ্বিতীয় শস্য উৎপন্ন হয় না	০ - ৮ থেকে ১ - ০	৩ - ০ থেকে ৬ - ০
৪	আমন ধানের উপযোগী নিচু ভূমি	০ - ১২ থেকে ১ - ৮	৪ - ৬ থেকে ৯ - ০
৫	আমন ধানের উপযোগী চরভূমি	০ - ৭ থেকে ১ - ৪	২ - ৭.৫ থেকে ৫ - ৩
৬	শীত মওসুমে তৈলবীজ বা গম শস্য উৎপাদন উপযোগী উচুঁ ভূমি	০ - ৪ থেকে ১ - ২	১ - ৬ থেকে ৪ - ৬
৭	একই ধরনের চর ভূমি	০ - ২ থেকে ১ - ৬	০ - ৯ থেকে ২-৩
৮	পাট উৎপন্নের গ্রাম ভূমি	০ - ১২ থেকে ১ - ৮	৪ - ৬ থেকে ৯ - ০
৯	পাট উপযোগী চর ভূমি	০ - ৭ থেকে ১ - ৪	২ - ৭.৫ থেকে ৫ - ৩
১০	ইক্ষু উৎপন্ন ভূমি	০ - ১২ থেকে ৩ - ৮	১০ - ৬ থেকে ২১ - ০
১১	শাক সবজি উপযোগী গ্রাম ভূমি	০ - ১০ থেকে ১ - ২	৩ - ৯ থেকে ৬ - ৯
১২	ঘাস উৎপাদন উপযোগী চর ভূমি	০ - ৭ থেকে ১ - ৪	২ - ৭.৫ থেকে ৫ - ৩
১৩	শাক সবজি উপযোগী সাধারন ভূমি	০ - ১২ থেকে ১ - ৮	৪ - ৬ থেকে ৯ - ০
১৪	শাক সবজি বাগান উপযোগী চর ভূমি	০ - ৯ থেকে ১ - ২	৩ - ৪.৫ থেকে ৬ - ৯
১৫	পান বাগান	৩ - ০ থেকে ৫ - ০	১৮ - ০ থেকে ৩০ - ০

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে ১৮৭২ সালে এসে প্রজা থেকে খাজনা বৃদ্ধির পরিমান ৩০% থেকে ৫০% পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি পায়।[১৯৮] ১৮৬৬ থেকে ১৮৬৭ সালে দ্রব্য মূল্যের মধ্যে ধানের মন ছিল ২ টাকা এবং চাউলের মূল্য ছিল ৪ টাকা মন।[১৯৯] এ থেকে সমকালের ভূমি ও কৃষি অর্থনীতির স্বরূপ এবং সাধারণ অর্থনেতিক অবস্থা কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

এ সময় বৃহৎশিল্প বলতে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। তবে কুটির শিল্প, ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরী ছিল যেমন নীল ফ্যাক্টরী, তাঁত ফ্যাক্টরী, জামদানী ও সিল্ক কাপড় কারখানা ইত্যাদি।[২০০] অগ্রিম দাদনের ব্যবহার এখানে খুব একটা ছিলনা। মোট পুরুষ জন সংখ্যার প্রায় ৫% এই কাজে নিয়োজিত ছিল।

রপ্তানি জাত উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছিল ধান, পাট, নীল, মসলিন, ঘি, তামাক ইত্যাদি। মাথা পিছু বার্ষিক আয় ছিল ৫০ পাউন্ডের উপরে। এবং আতিয়ার বার্ষিক সরকারী আয় ছিল ৪০,০০০ পাউন্ডের উপরে।[২০১] বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত হারে মোট ভূমি রাজস্ব আয় ব্যয় বৃদ্ধিপায় যথাক্রমে-

সন	আয়	ব্যয়
১৭৯৫-৯৬	৭০০০ পাউন্ডের ওপরে	৬০০ পাউন্ডের ওপরে
১৮২১-২২	৭০০০ পাউন্ডের ওপরে	৬৮০ পাউন্ডের ওপরে
১৮৬০-৬১	৮৪০০ পাউন্ডের ওপরে	৬০০ পাউন্ডের ওপরে
১৮৭০-৭১	৮৭০০ পাউন্ডের ওপরে	৭০০ পাউন্ডের ওপরে

১৮৫৯ সালের দশম আইনের অধীনে মামলা ও কার্যক্রমের সংখ্যা এবং ব্যয় যথাক্রমেঃ-

১৮৬০-৬১ বিবিধ প্রায় ১০০ এবং ৩০০ পাউন্ডের ওপরে

১৮৬১-৬২ বিবিধ প্রায় ৩০০ এবং ৩০০ পাউন্ডের ওপরে

১৮৬৮-৬৯ বিবিধ প্রায় ২৫০ এবং ২০০ পাউন্ডের ওপরে

১৮৭১ সালে আতিয়া রাজস্ব ইউনিটে সর্বমোট ৭৭৯.৬৭ বর্গমাইল আয়তনে এবং ৪,৯৮,৯৮৮ একর পরিমাণ ভূমিতে সর্বমোট ১৪৭ টি রেজিস্টারকৃত রাজস্ব এস্টেট এবং প্রায় ৪ গুন শেয়ার, যার ভূমি

রাজস্ব ছিল ৬০৯০.১২ পাউন্ড।[২০২] উল্লেখ্য এ সময় অধিকাংশ জমিদার উপস্থিত জমিদার শ্রেণীর হলেও অনুপস্থিত জমিদার ও বিদেশী ভূম্যাধিকারী সংখ্যা ছিল অনেক।[২০৩] ধান চাষের আবাদি জমি জন প্রতি গড়ে ষোল কাঠা থেকে এক বিঘা করে। উল্লেখ্য ৭৭৯ বর্গমাইলের আতিয়া পরগনায় যেখানে মাত্র-১৪৭টি এস্টেট, সেখানে মাত্র ৩৪৪ বর্গমাইলের পাশ্ববর্তী কাগমারী পরগনায় ৪৫২টি এস্টেট ছিল। ৫১৫ বর্গমাইলের পুখুরিয়া পরগনায় ৬০৪টি এস্টেট এবং ২৯৬ বর্গমাইলের বড় বাজু পরগনায় ৯৫২ টি এস্টেট ছিল।[২০৪ক] এতে প্রমাণিত হয় যে, আতিয়া পরগনার জমিদার ও তালুকদারগণ ছিল তুলনামুলক বড় জমিদার ও তালুকদার। বর্তমানেও আতিয়ায় বড় জমিদারীর প্রাচীন নিদর্শন সমূহ তুলনামূলক বেশী।[২০৪খ]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ প্রজাস্বত্ব বিকাশ যুগে (১৮৮৫-১৯৩৮) দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারী ও দক্ষিণ টাঙ্গাইলের জন অর্থনীতির বিকাশ ধারা ঃ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী ধারায় জমির ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হলো। কিন্তু স্বাধীন কৃষকের পরিবর্তে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন নয়া জমিদার শ্রেণী এই মালিকানা লাভ করলো। ফলে ইউরোপীয় ধারার বিপরীতে এদেশে পুরানো সামন্তবাদই নতুন আদলে আরও মারাত্মক রূপে আর্বিভুত হলো। এদেশের কৃষক সাধারণ হয়ে পড়ে জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায়, রাষ্ট্র বা সরকারের নয়। ফলে মুঘল যুগের রায়ত প্রথাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। যদিও আদালত কখনো কখনো ভূমিতে রায়তের প্রথা ভিত্তিক অধিকার থাকার কথা ব্যাখ্যা করেছে।[২০৫] বাস্তবে রায়তের অধিকার সংক্রান্ত মামলায় আদালত জমিদারের পক্ষেই অধিকাংশ রায় দিয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে প্রথমে প্রজার কিছু অধিকার স্বীকৃত ছিল কিন্তু অচিরেই জমিদারদের চাপে চিরস্থায়ী আইনের সংশোধন করে প্রজার সে অধিকারগুলো কেড়ে নেয়া হয়েছে।[২০৬] প্রজাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে জমিদারের লাগামহীন ইচ্চা, অনিচ্ছার উপর। জমিদার-প্রজা সম্পর্কের অবশিষ্ট একমাত্র আইনগত ভিত্তি ছিলো পাট্টা ও কবুলিয়ত ব্যবস্থা। কিন্তু জমিদাররা ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি, আবওয়াব আদায়, প্রয়োজনে জমি থেকে রায়তকে উচ্ছেদ করতে পারে সে জন্য অনেক জমিদারই পাট্টা দেয়া থেকে বিরত থাকতো। ফলে খাজনা অনাদায়ে রায়তের উপর অত্যাচার, সর্বস্ব লুণ্ঠন ও ভিটে মাটি ছাড়া করা ইত্যাদি সীমাহীন শোষণ চলতেই থাকে তথাকথিত জমিদারীর স্বর্ণযুগে।

এতদসত্ত্বেও আইনে রায়তের কিছু প্রথা ভিত্তিক অধিকার স্বীকৃত হয়, কিন্তু তা সংজ্ঞায়িত হয়নি। ফলে এ সময় সকল প্রকার রায়তের দায়-অধিকারের ভিত্তি ছিল শুধুমাত্র পরগনা নিরিখ। জমিদার ভূসম্পত্তির মালিকানা বলে পরগনা নিরিখ পদদলিত করে রায়তের খাজনার হার বৃদ্ধি করেছে।[২০৭] অনেক সময় বন্যা, খরা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও খাজনা হ্রাস বা মওকুফ করা হতো না। অনাদায়ে চলতো অত্যাচার কিংবা উচ্ছেদ। এমতাবস্থায় প্রজার আইনের আশ্রয় নেয়ার যে ভিত্তি হতে পারতো জমিদার প্রদত্ত পাট্টা কিন্তু সে পাট্টা তাকে দেয়া হতো না। অনেক সময় প্রজাও দায় অধিকারে পড়ার ভয়ে পাট্টা নিত না।[২০৮] ফলে এ সুযোগে জমিদার চালাত অত্যাচার, প্রজা আইনের সুযোগ থেকে হতো বঞ্চিত। এভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে জমিদার-রায়ত সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি ঘটে। মধ্যস্বত্বের পত্তনী

প্রথা[২০৯] জমিদার-রায়ত সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। ফলে অধিকার আদায়ের জন্য রায়তেরা বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ করেছে জমিদারের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কৃষক-আন্দোলন[২১০] বেড়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে আইন শৃংখলার চরম অবনতি ঘটে। ফলে আইন শৃংখলা রক্ষায় এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সরকারী মহলে এই ধারনা জন্মায় যে, জমিদারী অধিকার ক্ষুন্ন না করে যতটুকু সম্ভব রায়তের পূর্ব অধিকার পূন:প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।[২১১] এদিকে সিপাহী বিদ্রোহ দমনে জমিদাররা সহযোগিতা করে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের সহায়ক স্থানীয় সামাজিক শক্তি হিসেবে যথার্থ ভূমিকা রাখে। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের যে আশা ও লক্ষ্য[২১২] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে করা হয়েছিল তা পূরণে জমিদারদের চরম ব্যর্থতা ইংরেজদের দৃষ্টি গোচর হয়। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহাল রেখেও তারা গোটা কৃষি ব্যবস্থাকে পূনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন মনে করে। এই নয়া চিন্তার প্রথম ফসল ১৮৫৯ সালের দশম আইন।

দশম আইনে পূর্বের দুই শ্রেণীর স্থলে তিন শ্রেনীর রায়তের অধিকার সংজ্ঞায়িত হয়।[২১৩] যেমন-

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে যারা অপরিবর্তিত হারে খাজনা দিয়ে আসছে, তাদের খাজনা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা যাবে না (ধারা-২) এবং জমি থেকে তাদের উৎখাত করা যাবে না। এরা চিরস্থায়ী রায়ত।

(২) যারা এক নাগাড়ে কম পক্ষে বারো বছর জমি ভোগ দখল করে আসছে, তারা স্থিতিবান রায়ত। তাদের খাজনা বাড়ানো যাবে, তবে জমির সম্পদ বৃদ্ধি না পেলে বা মুদ্রাস্ফীতি না ঘটলে খাজনা বাড়ানো যাবে না। নিয়মিত খাজনা প্রদান করলে তাদেরকে উৎখাত করাও যাবে না। (ধারা-৬)

(৩) যারা বারো বছরের কম জমির ভোগ দখলে আছে বা যারা খুবই অস্থায়ী, তারা অস্থিতিবান রায়ত। তারা জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজা, তাদের খাজনা কারন দর্শানো ছাড়াই বাড়ানো যাবে এবং নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে তাদের উৎখাত করা যাবে। (ধারা-৮)

পূন:র্বিন্যাসিত কৃষি ব্যবস্থার এই খাজনা আইন পাশ কালে সরকার আশা করে, এই আইনে জমিদারগণ আর যথেচ্ছ হারে খাজনার হার বৃদ্ধি করতে পারবে না। ফলে রায়তের হাতে উদ্বৃত্ত থাকবে, তা পুঁজি প্রবাহে এবং শিল্পোদ্যোগ ও বাণিজ্যিক বিনিয়োগে সহায়ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত খাজনা আইনে বাস্তবে সকল রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এতে কেবল প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী রায়তের[২১৪] প্রথা ভিত্তিক অধিকার আইনগত বৈধতা লাভ করে। ফলে চিরস্থায়ী রায়ত প্রকৃত অর্থে জমির মালিক হলো এবং জমিদারের মত এদের খাজনা চিরস্থায়ী ভাবে ধার্য্য হলো। কিন্তু মিরাসী ও মুকাররারী রায়ত[২১৫] এ আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এই আইনের সুবিধাভোগী শ্রেনী কারা ? এক, ধনী জোতদার শ্রেণী, অন্য কথায় মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী। প্রজা হিসেবে এরা জমিদারকে আর বাড়তি খাজনা দিতে প্রস্তুত নয়। গ্রামীণ প্রধান হিসেবে খাজনা বাড়াবার জমিদারী প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে এরা সাধারণ শ্রেনীর প্রজাদেরকে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এহেন প্রেক্ষাপটে এদেরকে জমিদার বিরোধী আন্দোলন ও বিদ্রোহের নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুত করা এবং জমিদারদের সুবিধাভোগী শ্রেণীতে উন্নীত করে ঔপনিবেশিক স্বীকৃতি দেয়ার রাজনৈতিক প্রয়োজনেই খাজনা আইন প্রণীত হয়।

খাজনা আইনে অধিকারের দিক দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থিতিবান রায়তের অধিকার কিছুটা ক্ষুন্ন হলো। বর্ধিত খাজনা বৃদ্ধির যে বিধিগত অধিকার জমিদার লাভ করলো তার অপব্যবহার করা জমিদারের জন্য খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। তাই বাস্তবে দেখা যায় জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধি ও বলপূর্বক খাজনা আদায় প্রবণতা রোধ করতে উক্ত আইন ব্যর্থ হয়েছে।

খাজনা আইনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলো তৃতীয় শ্রেণীর অস্থিতিবান রায়ত। অতীতে যেখানে স্থিতিবান রায়ত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে দর কষাকষির সুবিধা না থাকায় বেশী হারে খাজনার ভার বহন করতো। অস্থিতিবান রায়তের এ সুযোগ থাকায় কম খাজনায় জমি চাষ করতো। জমির উপর চাপ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাস্তব কারণে খাজনা বৃদ্ধি পায় কিন্তু এই বর্ধিত খাজনার ভার নতুন আইনে স্থিতিবান রায়তের স্থলে অস্থিতিবান রায়তকেই বেশী বহন করতে হয়। অচিরেই এই আইনের অপব্যবহার শুরু হয়। স্থিতিবান রায়তের খাজনা বৃদ্ধি কঠিন বলে অস্থিতিবান রায়ত যেন স্থিতিবান হতে না পারে সে জন্য ভোগ দখলের বার বছর অতিক্রম করার আগেই জমিদার কর্তৃক তাকে উৎখাত করার প্রবণতা বেড়ে যায়।[২১৬]

এভাবে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হয়। জোতদার শ্রেনী বিদ্রোহের পথ পরিহার করে জমিদারদের সাথে সমঝোতা করে।[২১৭] নেতৃত্বহীন সাধারণ রায়ত শ্রেণী আগের মতই জমিদারের শোষণ উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হয়। অবশ্য জোতদার শ্রেণী নেতৃত্ব হারালেও অচিরেই রায়ত শ্রেণীর মধ্যে থেকে নতুন

নেতৃত্ব গড়ে উঠে[২১৮] এবং পুনরায় সম্পর্কের অবনতি ঘটে। খাজনা বিধির অপব্যবহারকে কেন্দ্র করে তারা বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করে। তন্মধ্যে পাবনা বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পাবনা বিদ্রোহ হিন্দু জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মুসলিম ও হিন্দু প্রজার বিদ্রোহ। প্রজাদের মধ্য থেকে স্বচ্ছল কৃষক এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় এবং তাতে সহায়তা করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মুসলমান জোতদার। দেলদুয়ার ও করটিয়া জমিদারদের বংশগত ও আত্মীয়তা সুত্রের পাবনার একমাত্র মুসলমান জমিদার দুলাইর জমিদারগণ।[২১৯] পাবনা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে পুনরায় জমিদার প্রজা সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সরকার অবশেষে বাধ্য হয় কৃষকের অধিকার সম্পর্কে একটি অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। এরই প্রেক্ষিতে ১৮৭৯ সালে গঠিত হয় একটি রেন্ট কমিশন। কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই ১৮৮৫ সালে প্রণীত হয় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।

প্রজাস্বত্ব আইনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জমিদারী শোষণ বন্ধ করা এবং কৃষকের হাতে উদ্বৃত্ত থেকে তা যেন পুঁজিতে পরিণত হয় সে পরিবেশ সৃষ্টি করা।[২২০] কিন্তু বাস্তবে প্রজাস্বত্ব আইন পাশের পরও প্রজা অর্থনীতি জমিদারী অর্থনীতির নাগপাশে আবদ্ধ থাকে। যেমন প্রজারা বৃক্ষ কর্তন করতে পারে না, যদিও রোপণ করতে পারে, জমিদারের অনুমতি ব্যতিরেকে জমি বন্ধক বা হস্তান্তর করতে পারেনা; পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে পারে না; পুকুর দিঘি খনন করতে পারেনা। এই সব সীমাবদ্ধতা কৃষি অর্থনীতিকে আড়ষ্ট করে রেখেছে গন্য করে ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনে জমিদারের অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই প্রজা জমি হস্তান্তরের অধিকার লাভ করে।[২২১] বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে আরেকদফা সংশোধনী আনা হয় ১৯৩৮ সালে, যখন জমি হস্তান্তরের জন্য জমিদারকে সেলামি প্রদানের নিয়ম বিলুপ্ত করা হয়। এর ফলে প্রজা জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করলো।[২২২] এইসব আইনের ফলে জমিদারী ব্যবস্থা চুড়ান্তভাবে তার কার্যকারিতা হারালো। যদিও আইনগত ভাবে ১৯৫০ সালে এবং কার্যকর ভাবে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হয়।[২২৩]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমি নিয়ন্ত্রণে জমিদারের ভূমিকার আমুল পরিবর্তন হয় মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী সৃষ্টির ফলে। প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে মধ্যস্বত্বাধিকারী সমাজও পরিনত হয় একটি অনর্জিত আয় নির্ভর উপজীবী শ্রেণীতে। ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের পর এই মধ্যস্বত্বভোগী ও জমিদার উভয়

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীই খোলস সর্বস্ব সত্ত্বায় পরিনত হয়। কাজেই ১৮৫৯ থেকে ১৯৩৮ সময়কাল জমিদারী সংকোচন ও প্রজাস্বত্বের বিকাশকাল বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্বের বিকাশ পর্বে দেলদুয়ার-আতিয়ার বিভিন্ন জমিদারী এস্টেটের ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায়।

এ সময় দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী ও মুলধারার জমিদারী ৯নং তৌজির অধীনে মাজামত আলী খান এস্টেট তার মৃত্যুর পর দুই পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে ৪টি এস্টেট, ৪ জন মহিলা জমিদারের অধীনে বিভক্ত হয়। যথাক্রমে করিমুন্নেসা এস্টেট, রাহাতুন্নেসা এস্টেট, নজমুন্নেসা এস্টেট ও নুরুন্নেসা এস্টেট। এর মধ্যে পুত্র আব্দুল আজিজ খান ও আবদুল হাকিম খানের মৃত্যুর পর তাদের প্রায় সোয়া ৫ গন্ডা জমিদারী তাদের স্ত্রীগণ মালিক হন। তাদের কন্যাদ্বয় বাকী পৌনে ৩ গন্ডা করে পান।[২১৪]

দেলদুয়ার বড়বাড়ী জমিদারী সালামত আলী খানের ১ পুত্র লাইস উদ্দিন আলী খান ও ২ কন্যা খোরশেদুন্নেসা ও রাহাতুন্নেসার মধ্যে ৩টি এস্টেটে বিভক্ত হয়। যথাক্রমে পুত্র ৮ গন্ডা ১ কড়া ১ ক্রান্তি এবং কন্যাদ্বয় ৪ গন্ডা, আধাকড়া, আধাক্রান্তি করে লাভ করেন। খোরশেদুন্নেসার সন্তান অল্প বয়সে মারা গেলে উক্ত অংশ রাহাতুন্নেসা লাভ করেন।[২২৫] লাইস উদ্দীনের মৃত্যুর পর তার অংশ লাভ করেন তার স্ত্রী নজমুন্নেসা। ফলে বড় ও মধ্য বাড়ীর ৮ গন্ডা, ১ কড়া, ১ ক্রান্তি করে লাভ করে রাহাতুন্নেসা ও নজমুন্নেসার জমিদারী উত্তর বাড়ীর অপর দুই মহিলা জমিদারের চেয়ে বড় জমিদারীতে পরিনত হয়। আয়তনে বড় নাহলেও প্রভাব প্রতিপত্তি, বিদ্যা বুদ্ধিতে এবং জমিদারী পরিচালনায় অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দেন রংপুর পায়রাবন্দের সাবের পরিবারের কন্যা, পরবর্তীকালের খ্যাতনামা গজনবী ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা করিমুন্নেসা খানম। করিমুন্নেসা টাঙ্গাইল মহকুমা সদর কাছারিতে ম্যানেজার মীর মশাররফ হোসেনের পরামর্শে 'শান্তিকুঞ্জ'[২২৬] নামের সদর কাছারি ও বসতবাটি নির্মাণ করেন। কিন্তু পূর্বথেকেই কলকাতায় বাড়ী ভাড়া[২২৭] করে দু পুত্রকে নিয়ে তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন। তবে মাঝে মধ্যে টাঙ্গাইল শান্তিকুঞ্জে এসে জমিদারী পরিচালনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

করিমুন্নেসার জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল করিম খান গজনবী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালী থেকে উচ্চশিক্ষা ও আইন শিক্ষা লাভ করে ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে আসেন। এসময় দেলদুয়ারের বিভিন্ন তরফের মধ্যে জমিদারী স্বত্ব নিয়ে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা ও বিবাদ বিসংবাদ চলছিল।[২২৮] আবদুল করিম গজনবী এ সময় নিজ জমিদারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জমিদারী পরিচালনায় তার যোগ্যতা ও দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে ৯নং তৌজির উত্তর, মধ্য ও বড় বাড়ীর বিভিন্ন জমিদারগণ তাদের এস্টেট সমুহের জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেন।[২২৯] পরবর্তীতে মধ্য বাড়ীর এস্টেট সমুহের সর্বশেষ ওয়ারিশ আবরার রহমান আবু আহমেদ খান ওরফে নয়া মিয়ার মৃত্যুর পর মধ্য বাড়ী ও বড় বাড়ী সহ সর্বমোট ১৩টি এস্টেট[২৩০] তথা আতিয়া পরগনার প্রায় দেড় আনা জমিদারী মালিকানা লাভ করেন যথাক্রমে আবদুল করিম খান গজনবী ও আবদুল হালিম খান গজনবী ভ্রাতৃদ্বয়। আব্দুল করিম খান গজনবীর জীবদ্দশায় (১৮৭২--১৯৩৮) উভয় জমিদারী তার পরিচালনায় থাকে। ১৯৩৮ সালে তার মৃত্যুর পর জমিদারী পরিচালনা করেন তার একমাত্র পুত্র ইস্কান্দার সাঈদ আবু আহমেদ খান গজনবী। আবদুল হালিম গজনবী ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কলকাতায় থেকে বিশাল ব্যবসা পরিচালনা ও রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।[২৩১] দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলকাতার ব্যবসা বানিজ্য ফেলে ভগ্ন হৃদয়ে টাঙ্গাইলে চলে আসেন। অসুস্থ হয়ে পড়ে নি:সন্তান অবস্থায় ১৯৫৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে জমিদারী উচ্ছেদ কালে দেড় আনা জমিদারীর ১৩টি এস্টেটের মুতওলি ছিলেন ইস্কান্দার সাঈদ খান আবু আহমেদ খান গজনবী।[২৩২] পরগনার আয়তন অনুযায়ী দেড় আনা হিসেবে জমিদারীর পরিসীমা প্রায় ৬৬ বর্গমাইল এবং পরিমাণ ফল প্রায় ৪১,৩৭৬ একর।[২৩৩]

১৮৮৫ থেকে ১৯৩৮ সময় কালে প্রজাস্বত্বের বিকাশ পর্বে দুর্বল জমিদারী ব্যবস্থাপনা ও জন অর্থনীতি সংক্রান্ত তথ্যের অন্যতম উৎস হলো ১৯০১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রণীত পুরনো জেলা গেজেটিয়ার ও ১৯০৮ থেকে ১৯১৯ সালের ডিস্ট্রিক সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট।

এই সময়ে সম পরিমান অর্থাৎ দেড় আনা জমিদারীর একাধিক এস্টেট নিয়ে ছিল দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদারী। উক্ত জমিদারীর খ্যাতিমান জমিদার, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, বড় নবাব খ্যাত সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরীর মৃত্যুর পর তার জমিদারী দুই পুত্রের মধ্যে সমান হারে বিভক্ত হয়।[২৩১ক] বড়পুত্র খান বাহাদুর সৈয়দ আহমদ হোসেন চৌধুরীর (খৃঃ ১৯৪৪) মৃত্যুর পর তিন পুত্রের মধ্যে জমিদারী সমান

Dhaka University Institutional Repository

হারে ভাগ হয়। বড় পুত্র সৈয়দ মোহাব্বত আলীর মৃত্যুর পর তার পুত্র কন্যাদের মধ্যে জমিদারী সম্পত্তি বহু ভাগে বিভক্ত হয়।

আতিয়ার বড় আট আনার নয় আনা ও মোট পরগনার ৩ আনা নিয়ে বিদ্যমান করটিয়ার জমিদারী সাদাত আলী খান পন্নী থেকে একমাত্র পুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী লাভ করেন। পরবর্তীতে উক্ত জমিদারী দুটি প্রধান ধারায় ৪ পুত্রের মধ্যে ৪টি এস্টেটে বিভক্ত হয়। প্রধান ধারা ও জ্যেষ্ঠপুত্র আতিয়ার চাঁদ খ্যাত দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ২.৫ আনা জমিদারী লাভ করেন।[২৩৪] এবং দ্বিতীয় প্রধান অংশসহ হায়দার আলী খান পন্নী ও মুজাফফর খান পন্নী মোট ১ আনা জমিদারী লাভ করেন। জমিদারি নিয়ে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ও হায়দার আলী খান পন্নীর মধ্যে দীর্ঘকাল বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমা চলে।[২৩৫]

হায়দর আলী খানের অংশ এক সময় মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতার ভিত্তিতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর অধীনে নেয়া হয়।[২৩৬] কিছু কাল পর অবশ্য প্রত্যাহার করে নিজ হাতে জমিদারি নেয়া হয়। ওয়াজেদ আলী খান পন্নী একবার জমিদারী ওয়াক্ফ লিল্লাহ করেন পরে তা প্রত্যাহার করে মুতওলিশীপ এর অধীনে ওয়াক্ফ আল আওলাদ বা পারিবারিক ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে পরিণত করেন।[২৩৭]

এই সময়ে আতিয়া জমিদারীর বড় অংশ নিলাম ও ক্রয় সূত্রে একাধিক জমিদারীর প্রতিষ্ঠা হয়। সবচেয়ে বড় অংশ নিয়ে নয়া জমিদারী পত্তন করেন ঢাকার নবাবগণ। প্রথমে ছোট আট আনার ৪ আনা জমিদারী রমজান খাতুন ও জান খাতুন থেকে ঋনাবদ্ধ সূত্রে ক্রয় করেন।[২৩৮] অত:পর নবাব আব্দুল গনি কর্তৃক সাদাত আলী খানের ষোল আনার সাত আনা বা পরগনার ২.৫ আনা, পরে বৈবাহিক সূত্রে আরও .৫ আনা জমিদারী লাভ করেন।[২৩৯] এবং নিলামে দেলদুয়ার জমিদারদের আরো কিছু জমিদারী ক্রয় করেন। এভাবে পরগনার প্রায় ৭.৫ আনা নিয়ে আতিয়ার সবচেয়ে বড় ও অনুপস্থিত জমিদারীতে পরিণত হন। পরগনার ২.৫ থেকে ৩ আনা হিন্দু ও অন্যান্য জমিদারগণ ক্রয় করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ পর্যন্ত শেষ দিকে এসে দেলদুয়ার, করটিয়া, পাকুল্লার আদি জমিদারদের অধীনে মোট পরগনার মাত্র ৫ থেকে ৬ আনা জমিদারী টিকে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার নবাবদের মধ্যে খাজা হাফিজুল্লাহর পুত্র খাজা আব্দুল গফুর ১৮২২ সালে মৃত্যুর পূর্বে নিজ নামে আতিয়ার ২ আনা ৫ গন্ডা জমিদারীর শেয়ার ক্রয় করেন। এর বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৬০৫৬ টাকা ৩ আনা ৬ পাই।[২৪০] যা ময়মনসিংহ কালেক্টর অফিসে জমা দিতে হতো। ইতিপূর্বে ১৮০৬ সালে ঢাকার খাজা পরিবার তথা খাজা হাফিজ উল্লাহ আলিয়ার খান পন্নীর দুই কন্যার ৪ আনা অংশ ক্রয় করেন। অত:পর আলিমুল্লাহ আতিয়া জমিদারীর কিছু সম্পত্তি ক্রয় করেন। বিশেষ করে আতিয়া পরগনার জমিদার মীর নওয়াব বিলিয়াটি এবং বিভিন্ন স্থানের পতনোন্মুখ মুসলিম জমিদারী তিনি ক্রয় করেন।[২৪১] আতিয়ার বড় তরফে জমিদার সাদত আলী খান পন্নী বিমাতার অত্যাচারে গৃহত্যাগে বাধ্য হলে নওয়াব আবদুল গনির শরণাপন্ন হন। সম্পত্তি উদ্ধারে খরচাদির বিনিময়ে সাদত আলী খান জমিদারীর ৭ আনা খাজা আলিমুল্লাহ কে হস্তান্তরে চুক্তিবদ্ধ হন।কিন্তু সম্পত্তি উদ্ধারের পর সাদাত আলী চুক্তি ভঙ্গ করে ফলে খাজা আলিমুল্লাহ মোকদ্দমা করে সাদাত আলী থেকে ৭ আনা অংশ অর্থাৎ পরগনার প্রায় ২ আনা আদায় করেন। অবশ্য এই রাগে পরবর্তী কালে নবাব আবদুল গনির অংশীদারগণ যখন ১৮৮০ সালে তার বিরুদ্ধে অংশীদারিত্ব নিয়ে মামলা করে তখন সাদাত আলী খান নবাব আবদুল গনির বিরুদ্ধে তার বিরোধীদের সাহায্য করেন।[২৪২]

আরো অনেক পরে ১৯০৩ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ করটিয়ার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর এক সৎ বোন রওশন আরাকে বিয়ে করে আতিয়া জমিদারীর আরো কিছু অংশ পেয়েছিলেন। যার বার্ষিক নীট পাওনা ছিল ৬০০০ টাকা।[২৪৩] খাজা আলিমুল্লাহ মামলায় জয়লাভ করে আতিয়া জমিদারীর অংশ আইনত প্রাপ্ত হলেও ভাগ বাটোয়ারা প্রভৃতি ঝামেলার কারণে উক্ত সম্পত্তি তার মৃত্যুর পর পুত্র আব্দুল গনির সময়ে ১৮৫৫-৫৬ সালে খাজা পরিবারের নিয়ন্ত্রণে আসে। মোকাদ্দমার খরচ কৃত বাকী পাওনা থেকে আবদুল গনি সাদত আলী খানকে প্রায় ২ লক্ষ টাকা দাবী মাফ করে মাত্র ৮০ হাজার টাকা কিস্তিবন্দী করে দেন।[২৪৪] আতিয়া পরগনা থেকে প্রাপ্ত উক্ত ৭ আনা অংশ খাজা আলিমুল্লাহ আল্লাহর নামে ওয়াক্‌ফ করে পুত্র আব্দুল গনিকে মুতওলি নিযুক্ত করেন। এই ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় দ্বারা অসংখ্য দরিদ্র দুঃস্থ মানুষ লালিত পালিত হয়। এই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আওতায় ঢাকা শহরে নবাবদের শাহবাগ বাগান বাড়ী গড়ে উঠেছিল।[২৪৫]

আবদুল গনি ১৮৬৮ খ্রী: সমুদয় জমিদারীর দায়িত্ব তার পুত্র খাজা আহসান উল্যাহর অনুকূলে ছেড়ে দিলেও অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত এই ধর্মীয় ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মুতওলি পদটি নিজের হাতেই

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছিলেন। অবশেষে বার্ধক্য জনিত মৃত্যুর তিন বছর আগে ২৮ শে মহররম ১৩১১ হিঃ মোতাবেক ১২ আগষ্ট ১৮৯৩ খৃঃ পুত্র নবাব খাজা আহসান উল্ল্যাহকে উক্ত ধর্মীয় ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মুতওলি নিযুক্ত করেন।[২৪৬] ধর্মীয় ওয়াক্‌ফের কারণে উল্লেখিত সম্পত্তি কখনোই কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিয়ন্ত্রণে যায়নি। পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারী নবাবগণ উক্ত ওয়াকফ্‌কৃত এস্টেটের মুতওলি নিযুক্ত হতেন। আতিয়া পরগনার জমিদারী পরিচালনায় প্রধান কাছারি ছিল জামুর্কীতে। এখানে একটি হাসপাতাল ও একটি স্কুল স্থাপন করা হয় ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আওতায়। এছাড়া অন্যান্য কাছারি ছিল যথাক্রমে ঘাটাইল, রঘুনাথপুর ও কাদিম হাতিলে।[২৪৭] এতে নায়েব, পেশকার, তহশিলদার ও পাইক পেয়াদাগণ কর্মরত ছিলেন। আঞ্চলিক রাজনীতি, জনকল্যাণ ও মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে নবাব সলিমুল্লাহ হিন্দু মহাজনদের ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এ থেকে মুক্তি পেতে ইংরেজ সরকারের কোর্ট অব ওয়ার্ডস এ জমিদারী পরিচালনার ভার দিয়ে এই ঋণজাল মুক্ত হন। তবে নিজে মুতওলি রূপে আতিয়া ওয়াক্‌ফ এস্টেটের আয় ছিল একমাত্র নিজ সম্বল।[২৪৮] তারও একটি বিরাট অংশ তিনি ব্যয় করতেন জনকল্যাণে। আতিয়া অঞ্চলের প্রজাদের কল্যাণে নবাব একবার ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন।[২৪৯]

এ সময়ে বাংলার অপর বৃহত্তম জমিদারী বগুড়ার নবাব পরিবারে আতিয়ার জমিদারী ছিল। দেলদুয়ারের দক্ষিণ বাড়ী জমিদার সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী বৈবাহিক সুত্রে বগুড়ার বিশাল জমিদারীর মালিক হলেও দেলদুয়ার জমিদারী ওয়ারিশী সুত্রে আতিয়ার একাংশের মালিক হন। আতিয়ার মধুপুর জঙ্গলে, সকল জমিদারের এজমালি সম্পত্তি 'আড়াই পাড়া চক্র বা বত্রিশ সাহামে' তারও শেয়ার অনুপাতে মালিকানা ছিল।[২৫০]

১৮৯৭ সালে করটিয়া জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী এই আড়াই পাড়া চক্রের একক নাম জারির জন্য সেটেলমেন্ট অফিসে দরখাস্ত দাখিল করেন। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, অত্র মহালের সামিল যে সকল গড়ারণ্য লিখিত হইল; ঐ সকল মহাল 'থাকবস্ত' হওয়াকালীন গড়ারণ্য বিধায় কোন গ্রামে, কোন স্থানে, তাহা ঠিক না করিতে পারা হেতু আড়াই পাড়া নামে এক চক্রে থাক হয়েছে। ঐ সকল মহাল কোন ষ্টেশন চৌকী ও মহকুমায় সামিল তা প্রথমে নির্ণয় করা গেল না, কিন্তু পরে সাভার, টাঙ্গাইল ময়মনসিংহের অধীনে চিহ্নিত করা হয়। ঐ সকল ভূমির খাজনা, ছন, বন, গজারি কাঠ ইত্যাদির উপস্বত্ব পরগনার অংশ মতে তার দখলে থাকার কথা বলা হয়।[২৫১] জমিদারী কাগজ পত্রে আড়াই পাড়া চক্রে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের সংখ্যা ৪৯১ টি, তবে সেটেলমেন্ট জরিপে গ্রামের সংখ্যা ২১টি পাওয়া যায়। গ্রামগুলি হলো- মহিষমারা, মুরাইদের বাইদ, পাগারিয়া, ফুলমালীর চালা, ঘোড়দীঘি, কুতুবপুর, কালিয়া, মুচারিয়া পাথার কানমেঘা, বিয়ার নগর, কীর্তন খোলা, গজারিয়া, কালিদাস, বোয়ালি, সোলা, প্রতিমা, বহুরিয়া, চতলবাদি, কাউটেঙ্গর, তক্তারচালা, বংশীনগর, হওয়া, বড় চালা ও বাজাইল। আতিয়া পরগনায় আড়াইপাড়া চক্র ছাড়াও পন্নী পরিবারের জমিদারীতে তিরছা, পাকুল্লা, পাঠানদহ, বেতরাইল, এলাসিন প্রভৃতি গ্রামগুলোও অবিভক্ত ছিল।[২৫২]

দেলদুয়ারের জমিদার আব্দুল করিম গজনবী বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা শেষে দেশে ফেরে নিজ হাতে জমিদারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জমিদারীর স্বল্প আয় লক্ষ্য করে তিনি জমিদারী আয় বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন শরীকদের পক্ষ থেকেও তার যোগ্যতার জন্য তাকে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। আবদুল করিম গজনবী তাদেরই স্ববংশীয় চারানের অধিবাসী ও কলকাতা জেভিয়ার্স কলেজের আরবী-ফার্সীর অধ্যাপক পন্ডিত রিয়াজুদ্দীন মাশহাদীকে জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। সকল শরীকের অংশ নিয়ে ১.৫ আনা জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হিসেবে যার বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৫৬৭৬.৭৫ টাকা এবং জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল ৭১৩২৩.৪ টাকা এবং ৭৫ বর্গমাইল আয়তনে ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৮ হাজার ৪২৫ একর ছিল।[২৫৩]

জমিদারীতে আবদুল করিম গজনবীর নিজ অংশ .৫ আনার বার্ষিক রাজস্ব ১৮৯২.২৫ টাকা ও বার্ষিক আয় ২৭১০৭.৮ টাকা এবং ২৫ বর্গ মাইল আয়তন বিশিষ্ট ভূমির পরিমাণ ফল ছিল ১৬,১৪১ একর।[২৫৪] আবদুল করিম গজনবী জমিদারীর স্বল্প আয় লক্ষ্য করে জমিদারীর খাসজমিতে ভূমির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করেন। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জমিদারদের খাস ভূমি লিজ নেন, এই প্রথম ট্রাক্টর প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এভাবে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনে স্বীয় ইউরোপীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন।

পরগনার ইজমালি সম্পত্তি মধুপুর জঙ্গলে স্বীয় শেয়ার অংশ সাঘরদীঘিতে একিটি কাছারি ও অনিন্দ্যসুন্দর বাংলো নির্মাণ করেন।[২৫৫] ঘাটাইল থানা থেকে ২০ মাইল ভেতরে গুপ্ত বৃন্দাবন নামে বৈষ্ণব হিন্দুদের যে তীর্থস্থান আছে উহা হতে ক্রোশখানেক পশ্চিমে বিরাট এই সাগরদীঘি বর্তমানে লোহানী

Dhaka University Institutional Repository

বংশের নামে 'লোহানী সাগরদীঘি' বলে পরিচিত। এতদাঞ্চলের অন্যতম সনেট শিল্পী সিরাজুদ্দীন চৌধুরীর ভাষায় "ধলাপাড়া হইতে দশমাইল পূর্বে সাগর দীঘি মৌজাটি অবস্থিত । দীঘিটি ৪১ একর জমির উপর অবস্থিত। আর এই দীঘির দক্ষিণ পশ্চিম দিকের সান বাঁধান ঘাটলার ধ্বংসাবশেষ এখনো দৃষ্ট হয়। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে (বিংশ শতকের প্রথম দশকে) স্যার এ.কে. গজনবী সাহেব এই সাগর দীঘিতে বাড়ি নির্মাণ করেন। গজনবী সাহেবের এইটাই ছিল সবচেয়ে প্রিয় স্থান। সময় পেলেই তিনি এখানে এসে আরামের নি:শ্বাস ফেলতেন। তাই খানিক স্থান লোহার খাম গেড়ে তারের বেড়া দিয়ে চতুর্দিক ঘুরিয়ে মাঝ খানে তুলেছিলেন কাচারি বাংলোটি। পাকা রাস্তা নানা ফল ফুলের বাগান, দারচিনি, এলাচি, কর্পুর, তেজপাতা, পান, ঝাউ, পাম্থ গাছ গাছালীর সারি; এর ভেতর প্রবেশ করলেই মন আপনিই আনন্দে নেচে উঠত। অধুনা গজনবী সাহেবের জামাতা কাচারি বাড়ির এরিয়ার ভেতরকার অনেক স্থানই পত্তন দিয়ে ফেলেছেন। প্রজারা সেটাকে আকদি জমিতে পরিনত করেছে। পুরনো সাব রেজিষ্ট্রারী অফিস আর পোষ্ট অফিস আছে, কিন্তু তার টেলিগ্রাফ অফিসটি উঠে গেছে। সাগরদিঘী এলাকাটিতে বহুস্থান জুড়িয়া সেরূপ নানা কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে তাহাতে এলাকাটি কোনো কালে কোনো রাজার রাজধানী হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়; এমনকি নানা সময়ে নানা রাজার কীর্তির ওখানে সমাবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে।"[২৫৬]

আবদুল করিম গজনবী শুধু কাছারিই স্থাপন করেননি বরং পার্শ্ববর্তী জমিদারদের অরণ্য অংশের শেয়ার বিশেষ করে দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী ও বগুড়ার নবাব সৈয়দ আবদুল সোবহান চৌধুরীর অংশ বার বছরের জন্য লিজ নেন।[২৫৭] বনের উন্নয়ন সাধন করে বন থেকে অনেক বেশী আয় করেন এবং রাতারাতি অনেক অর্থের মালিক হয়ে যান। বার বৎসর শেষে উক্ত লিজ ফেরত দিতে অস্বীকার করলে উভয় পক্ষে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদ মেটাবার জন্য পূর্ববাংলার কমনওয়েলথ খ্যাত নবাব সলিমুল্লাহ দেলদুয়ারে এসে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।[২৫৮] অবশেষে বগুড়ার নবাব শক্তি প্রয়োগ করেন। নিজের ৫০টি হাতি পাঠালেন, মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য্যের নিকট থেকে ১০০ হাতির বাহিনী, দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদার সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরীর ৩টি সহ লাঠিয়াল বরকন্দাজদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে লালঘিরী নামক ৮৪ বিঘা জমি বেষ্টিত স্বীয় কাছারি উদ্ধার করেন।[২৫৯] কাছারিটি ছিল সুন্দর কাঠের বাংলো বাড়ি। ঘাটাইল হতে দশ থেকে বারো মাইল পূর্ব দক্ষিণে এবং সাগরদীঘি থেকে দু'তিন মাইল দূরে।

পাবনার দুলাই জমিদারদের আতিয়া পরগনার সম্পত্তির অংশ আবদুল করিম গজনবী পত্তন নেন।[২৬০] দুলাইর জমিদার শামছুন্নেসা চৌধুরানী কৃত ২৪/৪/১৯৪৫ সালে প্রদত্ত ওয়াক্ফ নামায় ১৬ নং তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, জেলা ময়মনসিংহের কালেক্টরী তৌজির ৯, ১১ ও

৫১৩০ নং জমিদারী ও কয়েক নম্বর তালুক যাহা পরগনে আতিয়ার অন্তর্গত এবং যাহা অনারেবল স্যার এ.কে. গজনবী সাহেবের নিকট সদর রাজস্ব পথকর এবং অন্যান্য পাবলিক ডিমান্ড বরাত বাদ জমা পত্তন দেওয়া আছে। বার্ষিক ৪৯৯ টাকার রাজস্ব বাবদ নিজ ।০ আনা অংশ ১২৪.৭৫ আনা জমায় পত্তনী বন্দোবস্ত আছে থানা ও সাব রেজিষ্ট্রি টাঙ্গাইল ও আতিয়ায়।[২৬১]

আবদুল করিম গজনবীর এহেন উদ্যোগ সমকালীন জমিদার সমাজে এক ধরনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ এবং ভূমির উন্নয়নে বিনিয়োগের এই চিন্তা তার মাথায় এসেছে সম্ভবত দুটি কারনে। প্রথমত: ইউরোপের বিকাশমান ৩টি প্রধান দেশে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে বাংলার কৃষি সংক্রান্ত নয়া ধারণা তার মধ্যে এসেছে। দ্বিতীয়ত: জমিদারীর স্বল্প আয় তাকে আরও আয় বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছে। যদিও পরবর্তীতে কলকাতা কেন্দ্রিক রাজনীতি, ইংরেজদের সাথে সখ্যতা ও উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়লে তার এই উদ্যোগ ব্যাহত হয়। তার অগ্রসর চিন্তা চেতনাকে পরবর্তীতে এগিয়ে নেন ছোট ভাই শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও সমাজসেবক স্যার আবদুল হালিম খান গজনবী।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ কৃষি পণ্য, ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগ(১৯০০-১৯৪৫) বিকাশের নয়া প্রেক্ষিতে দেলদুয়ারের জমিদারদের ভূমিকা ঃ

দেলদুয়ারের জমিদার গজনবী ভ্রাতৃদ্বয় ভূমির উন্নয়ন ও ভূমিতে পূঁজি নিয়োগের মাধ্যমে জমিদারী আয় বৃদ্ধি করে প্রভুত অর্থের মালিক হন। প্রাগ্রসর জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুসারি ও উচ্চ শিক্ষিত আবদুল হালিম গজনবী জমিদারী উদ্বৃত্ত পূঁজি কে শিল্পে বিনিয়োগে সচেষ্ট হন। আবদুল হালিম গজনবী স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের বহুপূর্বেই বউবাজারে সমকালীন সুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান[২৬২] ইউনাইটেড বেঙ্গল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬৩] স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে আধুনিক ধারায় শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী, পূর্ববাংলার ব্যবসায়ী, জমিদার শ্রেণীর অন্যান্যদের সাথে তিনিও অংশ নেন।[২৬৪] আবদুল হালিম গজনবী এবং দেলদুয়ারের সৈয়দ বংশীয় অপর জমিদার বগুড়ার নবাবখ্যাত সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরীর যৌথ উদ্যোগে দু'লাখ টাকা মূলধন নিয়ে ১৯০৮ সালে বেঙ্গল হোসিয়ারী কোম্পানি স্থাপন করেন।[২৬৫] বাঙ্গালী ও পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান মালিকানাধীন এটিই সম্ভবত প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠান। আবদুস সোবহান চৌধুরী ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গ লক্ষী কটন মিল' এর অন্যতম উদ্যোক্তা পরিচালক ছিলেন।[২৬৬] দেলদুয়ারের জমিদারগণের বাইরে পূর্ববাংলায় একমাত্র চট্টগ্রামে মুসলিম ব্যবসায়ী ও জমিদারগণ এক লাখ টাকা পুঁজি দিয়ে বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি স্থাপন করেন।[২৬৭] আবদুল হালিম গজনবী পূর্ববঙ্গীয় জমিদার হয়েও ব্যতিক্রম হিসেবে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের পশ্চাতে অনেক গবেষকই তার জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসী রাজনৈতিক চেতনা ছাড়াও বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক স্বদেশী চেতনার বহিঃ প্রকাশ বলে অভিহিত করেন।

একই সময়ে বড় ভাই আবদুল করিম গজনবী সমকালীন প্রভাবশালী অপর দুই জমিদার নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর মত চলমান রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েননি। বরং বিদেশের উচ্চ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে তিনি দেশ সেবা ও প্রশাসনিক ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী আয় বৃদ্ধিতে অপর দিকে ইংরেজ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেছেন।

উল্লেখ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় লর্ড কর্ণওয়ালিশ এহেন লক্ষ্য স্থির করেছিলেন যে, জমির মালিকানা পেয়ে এবং রাজস্ব চিরস্থায়ী হওয়ার সুবাদে জমিদারগণ তাদের উদ্বৃত্ত পূঁজি ইউরোপীয় ধারায়

Dhaka University Institutional Repository

জমিতে বিনিয়োগ করবে এবং কৃষি বিপ্লবের সূচনা করবে। কৃষি বিপ্লব অন্তিমে পুঁজিবাদী বাজার ও শিল্প বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করবে।[২৬৮] নানাবিধ কারনে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, তবে যে জটিল ব্যবস্থা তিনি করেছেন তাতে তা সম্ভবও ছিল না। বরং উল্টো উদ্ভট এক ঔপনিবেশিক সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই বিকশিত হয়, যেখানে জমিদার শ্রেণী কিংবা কৃষক শ্রেণী কারোরই অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। স্বাভাবিক ভাবে কোন শ্রেণীর হাতেই খাজনা উদ্বৃত্ত ও কৃষি উদ্বৃত্ত থাকেনি। অনেকের মতে, জমিদারের হাতে ঠিকই অবৈধভাবে উদ্বৃত্ত খাজনা জমা হয় কিন্তু তা বিনিয়োগ না হয়ে ভোগ বিলাস, নর্তন কূর্দন আর বড় বড় প্রাসাদ, মসজিদ, মন্দির নির্মাণে ব্যয় হয়। যাহোক শেষ পর্যন্ত অর্থ সংকটেই আতিয়া পরগনার মত হাতে গোনা কয়েকটি জমিদার ব্যতীত অধিকাংশ জমিদার পরিবার জমিদারী হারিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।[২৬৯] যারা টিকে থাকে কেবল কৃষকের উপর শোষণ, অবৈধ আবওয়াব, নজর, সেলামি ইত্যাদি আদায় করে, কেউ কেউ কৃষির সাথে সম্পর্কহীন মধ্যস্বত্বের পত্তনী সৃষ্টি করে টিকে থাকতে চেষ্টা করে।[২৭০] তাও পুরো জমিদারী হয়তো রক্ষা করতে পারেনি। যেমন পারেনি আতিয়া ও দেলদুয়ারের বনেদি জমিদারগণ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়িত না হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণায় বিবিধ কারন চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে **সিরাজুল ইসলামের মতে,** চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক দশকের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের সংশোধন করে চিরস্থায়ী আইনের মৌল পরিবর্তন বা আইনগত ভাবে লক্ষ্যচ্যুতি ঘটানো হয়। ইংরেজদের ঔপনিবেশিক স্বার্থনীতি বিশেষত একচেটিয়া বাণিজ্যনীতি, মুৎসূদ্দি বেনিয়াদের জমি ক্রয় করে আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার মূল্যবোধ, মহাজনি ও জমিদারী ক্রয়ের ঝুঁকিহীন মুনাফার সুবিধা, বাণিজ্যে মুনাফার অনিশ্চয়তা এবং কৃষি প্রযুক্তি ও শিল্প বিনিয়োগে জমিদার ও দেশীয় শ্রেণীর অজ্ঞানতা এর জন্য দায়ী। জমিদারদের মূল্যবোধ জনিত বিলাসিতা, প্রমোদ, বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ, বিদেশী পণ্যে বাড়ী সাজানো এবং জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিলাসি ও অনুৎপাদিত খাতে অর্থ ব্যয় করে। যদিও উদ্বৃত্তের তুলনায় এই ব্যয় খুবই স্বল্প, তবুও এই সকল কারণে নতুন জমি ক্রয়েই উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করে। নানা কারণে কৃষি উন্নয়ন ও বাণিজ্যে তা বিনিয়োগ করার অবস্থা হয়নি।[২৭১]

অপর দিকে জমিদারের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে কৃষকের উদ্বৃত্তকে পুঁজিতে পরিনত করার লক্ষ্যে ১৮৫৯ সালে খাজনা বিধি এবং ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন করে জমিদারের হাত থেকে মধ্য

স্বত্বাধিকারীদের রক্ষা করা হয়।[২৭২] কিন্তু বাস্তবে ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীর পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ প্রজা শ্রেণীর অধিকার খুব কমই প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭৩] বরং এতে জমিদারদের সমপর্যায়ে জোতদার শ্রেণীর কর্তৃত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আসল উৎপাদক শ্রেণী কৃষকের মুক্তি অর্জিত হয়নি।[২৭৪]

পক্ষান্তরে পুঁজি ও শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশে অনগ্রসরতার কারণ সম্পর্কে প্রচলিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করে **বিনায়ক সেন বলেন** যে, একটি ব্যাখ্যা মতে বাঙ্গালী শিল্পোদ্যোক্তা বিকাশে ব্যর্থতার কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের বৈষম্যমূলক নীতি এবং সামগ্রিক ভাবে দেশীয় পুঁজি ও শিল্প বিকাশে পরিবেশগত ও আইনগত বাধা ছিল। অপর ব্যাখ্যা মতে, ভারতীয় মূল্যবোধ এবং সমাজ কাঠামো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। যেমন ১৮৫০ সালের পর বাংলায় ভদ্রলোক কালচার এর উত্থানের ফলে বাংলায় শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল। উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালী পুঁজি ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে স্থানান্তরিত হয়ে জমি ও ব্যবসা বহির্ভূত পেশার প্রতি ঝুঁকতে থাকে। অন্যদিকে বাংলার অভ্যন্তরীন বাণিজ্যে যাদের বিচরণ ছিল, তারা মূলত নিম্ন বর্ণের ব্যবসায়ী ও কারিগর সম্প্রদায়। শেষোক্তদের মধ্যে সাহা, বণিক, পাল, তেলী, পোদ্দার, শীল, কর্মকার, সুত্রধর প্রভৃতি সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য, যাদের সামাজিক মর্যাদা ছিল নিম্নে, আর পুঁজিও ছিল কম। যাহোক এটি ছিল মুল্যবোধের নেতিবাচক প্রভাব কিন্তু মূল্যবোধের ইতিবাচক প্রভাবও ছিল যেমন- স্বদেশী যুগ অর্থাৎ ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সালে স্বদেশী ভাবাদর্শের প্রভাব বাংলায় তাঁতশিল্পের বিকাশে খুবই সহায়ক হয়েছিল।[২৭৫]

বিনায়ক সেন প্রচলিত এই দুই ব্যাখ্যার অস্বীকার না করেও ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন পর্বে বাঙালী পুঁজির পথ পরিক্রমার ঐতিহাসিক যুক্তি পরস্পরাকে ব্যাপক অর্থে বিশ্লেষণ করে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এতে দেখা যায়, ১৭৫০ সালের পূর্বে বাংলায় ঐতিহ্যগত ভাবে ব্যবসা বানিজ্য বিকাশ হয়। এতে বাঙালী বণিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল যেমন সুবর্ণবণিক ও সওদাগর।[২৭৬] কিন্তু ১৭৫০ পরবর্তীকালে বৃটিশ ও ইউরোপীয়দের প্রভাবাধীন হয়ে বাঙালী বণিকরা পিছিয়ে পড়ে এবং স্বাধীন বণিকদের ক্রমপতন ঘটে। ইংরেজদের ছত্রছায়ায় উত্তর ভারতীয় মাড়োয়ারিরা বাংলা বাণিজ্যে এগিয়ে যায়। কলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাবেকি বাঙ্গালি বণিক ও উত্তর ভারতীয় মাড়োয়ারি উভয়কে হটিয়ে বাংলা বাণিজ্যে ইউরোপীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। এদেশীয় পূর্ব দু'শ্রেণীর স্থলে বৃটিশ বানিয়াদের সহকারী ও এজেন্ট রূপে কলকাতা কেন্দ্রিক গড়ে ওঠে নয়া ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম ব্রাহ্মন ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণ থেকে বাণিজ্যে আগমন ঘটে। যদিও কোম্পানির বিনিয়োগ-এজেন্টদের মধ্যে শেঠ, বসাক, বণিক প্রভৃতি নিম্নবর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার বড় ব্যবসায়ীদের তালিকায় যাদের দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই ছিল উচ্চ বর্ণের। এতে বোঝা যায় যে, কোম্পানির মধ্য স্বত্বভোগী ও বৃটিশ বেসরকারী বাণিজ্যের এজেন্ট হিসেবে ব্রাহ্মন ও কায়স্থ পেশাজীবী ও প্রশাসনিক কর্মচারীরা আঠারো শতকের শেষভাগে বাংলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে উঠে।

এই নতুন ধনাঢ্য বণিক শ্রেনী ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদার প্রথা প্রবর্তনের পরে তাদের ধনসম্পদের একটা অংশ ভূসম্পত্তিতে নিয়োজিত করে। যাকে পুঁজির কৃষিকরণের ঢেউ হিসেবে কেউ কেউ অভিহিত করেন। অনেকের মতে, এর ফলে আধুনিক শিল্পোদ্যোগের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। লক্ষ্যণীয় যে বাঙ্গালী জমিদার ও ব্যবসায়ী পুঁজি কৃষি উন্নয়ন, আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত না হয়ে প্রথাগত মন্দির, ঘাট, মসজিদ ও নতুন বিলাসবহুল বাড়ী নির্মাণ করে আমদানিকৃত পশ্চিমা পণ্যে তা সাজিয়েছে; ভারতের উত্তরাঞ্চলের জমিদার ও বানিয়ারা কিন্তু তা করেনি। এতদসত্ত্বেও আইনানুগ যৌথ কারবারে দেশীয়দের সাফল্য তখন ইউরোপীয় মানের তুলনায় কম ছিল না। তবে এই বাঙ্গালী বণিকদের প্রকৃত বিকাশ শুরু হয় ১৮১৩ সালের মুক্ত বাণিজ্য সনদ গৃহীত হওয়ার পরে। এতে বাণিজ্যের চাইতে এজেন্সি হাউস বা ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয় অধিকাংশ পুঁজি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বণিক থেকে সৃষ্ট জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এ পর্বের পথিকৃত। দ্বারকানাথ ও অন্যান্যদের প্রায় সব কোম্পানিই স্থানীয় ইউরোপীয় পুঁজির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের অবস্থান ছিল সাবেকি সামন্ত অভিজাত শ্রেণী ও কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের মাঝামাঝি। এদেরই ভূমিকায় কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত ও ভদ্রলোক শ্রেণীর বিকাশ ঘটে।

ব্লেয়ার বি কিং এর মতে, ১৮৪০ সালে কলকাতা একটা ছোট আকারের শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে ছিল।[২৭৭] কিন্তু অচিরেই ১৮৪৭ সালের একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংকটের ধাক্কায় যৌথ কারবারী এই সব রপ্তানি প্রতিষ্ঠান ও ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলো ধ্বসে পড়ে। বাঙ্গালী বণিক শ্রেণীর 'বাণিজ্যিক উদ্যমে' ভাটা পড়ে এবং স্থানীয় বাণিজ্য পুঁজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গোটা বঙ্গীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্লেয়ার ক্লিং এর মতে, এরপর কলকাতা হয়ে দাঁড়ালো বিশুদ্ধ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় একটি পরগাছা নগরী, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রজনন ভূমির পরিবর্তে ঔপনিবেশিক শোষনের স্নায়ু কেন্দ্র।[২৭৮]

এর ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর পুঁজি প্রধানত: জমি ও অবাণিজ্যিক খাতে বিনিয়োজিত হয়। বিনিয়োগ চরিত্রের পরিবর্তন শিল্প-বাণিজ্য উদ্যোগের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৫০ পরবর্তী তিন দশকে বাংলায় একদিকে ছোট জমিদার, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষিত (যার ক্ষুদ্র অংশ মুসলিম) মধ্যবিত্তের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। ফলে ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে বিরাট এক খাজনাভোগী শ্রেণী স্বার্থের কাঠামো গড়ে উঠে। চাকুরিতে প্রবেশের একমাত্র উপায় ইংরেজি শিক্ষা ঐ একই গোষ্ঠীর হাতে করায়ত্ব থাকে। ফলে একই ব্যক্তিকে খাজনাভোগী জমিদার ও চাকুরিজীবী উভয় ভূমিকায় দেখা যায়। মুদ্রা অর্থনীতি দুঃখজনকভাবে শিল্পের কদর না বাড়িয়ে বরং জমির দাম বাড়িয়ে দিয়ে জমিতে বিনিয়োগ খুবই আকর্ষনীয় করে তুলেছিল। বাঙ্গালী পেশাজীবী ও কর্মচারীদের বেতনের উদ্বৃত্ত ও ঘুষের টাকা প্রধানত জমিতে বিনিয়োগ হতে থাকে। এতদসত্ত্বেও কয়লা, চা বাগান ও বিজ্ঞান শিল্প কেন্দ্রিক বাঙ্গালী শিল্পোদ্যোগ বিকশিত হতে থাকে।[২৭৯] কিন্তু রেল ও পাট শিল্পে দেশীয় উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়না। পাট শিল্পে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয় দেশীয়দের মধ্যে বাঙ্গালীর পরিবর্তে মাড়োয়ারিরা এবং ১৮৮০ সাল নাগাদ তারা সফল হয়।[২৮০] বৃহৎবাঙ্গালী পুঁজি বর্ণগত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নিম্নবর্ণের উদীয়মান ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করেনি, আবার নিজেরা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করেনি। একই ভাবে বাঙ্গালী মুসলিম ব্যবসায়ীরা দেশীয় বর্ণ পুঁজিপতিদের সাহায্য পায়নি। পক্ষান্তরে মাড়োয়ারিরা তাদের সমাজে বিদ্যমান বানিয়া নেটওয়ার্কের ঘনিষ্ঠ সমর্থন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে পেয়েছিল। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলিম কেউ তা পায়নি। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ভদ্রলোক ও অভিজাত হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে জমি ক্রয় এবং অন্যান্য অবাণিজ্যিক পেশায় মন দেয়।

পুনরায় বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনে আধুনিক ধারায় বাঙ্গালীদের শিল্প উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।[২৮১] অবশ্য স্বদেশী চেতনার শেকড় ১৮৭০ এর দশকে খুঁজে পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিক স্বদেশী'র ভাবনা সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করে বিশ শতকের প্রথম দশকে। পুরোপুরি বাঙালী মালিকানায় এবং জোরালো স্বদেশী চেতনায় ফ্যাক্টরীর মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঘটনা উনিশ শতকের শেষার্ধে

Dhaka University Institutional Repository

গুটিকয়েক মাত্র চোখে পড়ে। বঙ্গ ভঙ্গ রদ ও স্বদেশী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন একের পর এক বাঙ্গালী শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এর মধ্যে প্রাধান্য ছিল বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ শিল্পের। পাট ও বস্ত্র শিল্পের মত প্রধান খাতে স্বদেশী উদ্যোগ ছিল নগণ্য। হস্তচালিত তাঁত কেন্দ্রিক কুটির শিল্প ব্যাপক হারে প্রতিষ্ঠিত হলেও তা হয় অস্থায়ী। কেননা ইউরোপীয় আধুনিক টেক্সটাইল শিল্পের কাছে তা মার খেয়ে যায়। ব্যাঙ্ক ও বীমা খাতের স্বদেশী উদ্যোগ তেমন সফল হয়নি। কেননা ব্যবসায়ীদের এসব ব্যবসা সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তদুপরি তাদেরকে ঔপনিবেশিক শাসনের বৈষম্যমূলক বিধি-বিধানের কবলে পড়তে হয়েছিল।[২৮২]

এতদসত্ত্বেও বাংলা প্রেসিডেন্সিতে পাট ও বস্ত্র শিল্প কেন্দ্রিক মাড়োয়ারি ও অবাঙ্গালী মুসলিম পুঁজি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারকারী ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করে। পাটশিল্পে একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে মাড়োয়ারিরা অভ্যন্তরীন বাণিজ্যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। এমন কি বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোয় যখন পাট শিল্পে মুনাফার হার তুঙ্গে তখন মাড়োয়ারি পুঁজি পাটকলের উদ্যোক্তা হিসেবে ঢুকে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মাড়োয়ারিদের বিপরীতে বাঙ্গালী উদ্যোক্তাদের কাজকর্ম মোটেও সন্তোষ জনক ছিলনা। এর কারণ বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্যোগ থাকলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মতোই তখনো জমি ও অবাণিজ্যিক পেশাই ছিল বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলিম শ্রেণীর প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র। তদুপরি ব্যবসা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাবে উচ্চ বিলাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্যোক্তাদের পক্ষে আধুনিক শিল্পে কার্যকর ভাবে প্রবেশ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় আবার অবাঙ্গালী মুসলিম ও মাড়োয়ারি পুঁজি কিছুটা সরকারী আনুকূল্য ও সমর্থন পায়। তদুপরি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান সমুহের গতি ধরে রাখতে মধ্য শ্রেণী তথা নয়া ব্যবসায়ী শ্রেণী ব্যর্থ হয়। এর কারণ বাঙ্গালীর দ্রুত বিত্তবান হওয়ার মানসিকতা।

তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলা বৈদেশিক শাসকদের জন্য কৃষিজ পশ্চাৎভূমিরূপে সেবা প্রদান করে এসেছে। সে হিসেবে পূর্ববর্তী বছরগুলোয় অর্থনীতির পশ্চাদপদতাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলে বাঙ্গালী মুসিলম শিল্পোদ্যোগের তালিকা কোন মতেই তাৎপর্যহীন নয়। বিনায়ক সেনের উপরোক্ত বিশ্লেষণের মূল বক্তব্য হচ্ছে, ঔপনিবেশিক শোষণ কেন্দ্রিক যুক্তি ও দেশীয় মূল্যবোধ কেন্দ্রিক যুক্তির বাইরেও ইতিহাসের বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় অভ্যন্তরীন সমাজ কাঠামোর কালকেন্দ্রিক বিশিষ্টতা

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পোদ্যোগ বিকশিত না হওয়ার অপর একটি কারণ। তার মতে, নচেৎ কিভাবে বাঙ্গালী শিল্পোদ্যাগ সূচনা করেও আবার মুখ থুবড়ে পড়ে? আবার অবাঙ্গালী ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ বিভিন্ন সময় কিভাবে বিকশিত হয়েছে? একই কাঠামোয় তাও বিশ্লেষণ করেছেন।

সিরাজুল ইসলাম ও বিনায়ক সেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাংখিত কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের তথা পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার যুক্তিসিদ্ধ কারণ উল্লেখ করেও দুটি মৌলিক কারণ উল্লেখ করেননি, যা দেলদুয়ার জমিদারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রমাণ হয়। প্রথমত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করায়, দ্বিতীয়ত: দেশীয় মূল্যবোধের পরিবর্তন হতে থাকলেও সামগ্রিক কৃষি বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের সার্বিক সাংস্কৃতিক মানস ও পরিবেশ তৈরী হয়নি। ফলে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কৃষির আবাদ আন্দোলন এবং অবাঙ্গালী, অংশত বাঙ্গালী শিল্পোদ্যোগ লক্ষ্য করা গেলেও সমগ্র ঔপনিবেশিক আমলে কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের তথা পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশ সম্পন্ন হতে পারেনি। দেলদুয়ারের জমিদারগণ তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী ইতিহাসে সামগ্রীক দিক থেকেই নানা কারনে ব্যতিক্রমী।

প্রথমত: দেলদুয়ার ও আতিয়া পরগনার মুসলমান জমিদার গন নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও নিজেদের জমিদারী রক্ষা করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয়ত: সাধারণ ভাবে জমিদার ও জমিদারদের শোষণ, বিলাসী ও লাম্পট্য জীবন সম্পর্কে সে সব ধারণা প্রচলিত রয়েছে, দেলদুয়ার ও আতিয়ার অধিকাংশ মুসলমান জমিদারদের ক্ষেত্রে তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং প্রজা দরদি ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের বিবরণই পাওয়া যায়। যতটুকু শোষণের তথ্য পাওয়া যায়, তাতে কেবল জমিদারদের বৈষয়িক জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সুবাদে হিন্দু ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তাদের ভূমিকাই দেখা যায়। তবে পার্শ্ববর্তী ধনবাড়ী ও সন্তোষ জমিদারীতে পুরোপুরি সামন্ত শোষণ ও নির্যাতনের তথ্য প্রমান পাওয়া যায়। তবে বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদে প্রায় সব জমিদারই ছিল সমানে সমান।

তৃতীয়ত : এতদাঞ্চলের মুসলমান জমিদারদের মধ্যে দেলদুয়ারের জমিদারগণই প্রথম কলকাতা ও সুদুর ইউরোপ থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করে একদিকে জমির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং অর্জিত মুনাফাকে শিল্প পুঁজিতে পরিণত করে।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক ভাবে রাষ্ট্রীয় সামন্তবাদী পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বাংলার সামগ্রিক পট প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ কোন ধারা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। কিংবা বলা যায় এই কৃষি উদ্যোগ ও শিল্পোদ্যোগ সমকালিন ইতিহাসের গতিপথের চোরাবালিতে হারিয়ে যায়।

সার্ভে রিপোর্ট ও গেজেটিয়ারের বিবরণে, পরগনা ও জমিদারী ইতিহাসে দেলদুয়ার জমিদারী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। স্বয়ং এফ. এ. সাকচী ময়মনসিংহের ও আতিয়ার এস্টেট সমূহের মধ্যে ৯নং তৌজি এস্টেটকে এই জন্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এস্টেট বলে আখ্যায়িত করেন।[২৮৩]

দেলদুয়ারে শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রধান ধারার জমিদারদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ; পাশাপাশি দেলদুয়ার, আতিয়া তথা দক্ষিণ টাঙ্গাইলের অন্যান্য প্রথাগত জমিদার, তালুকদার, মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার ও প্রজা সাধারণের অর্থনৈতিক জীবন ধারা ও চালচিত্র বিশ্লেষণ করে এ বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। এ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র এফ.এ. সাকচীর বিবরণ, পরিসংখ্যান ও রিপোর্ট সমূহ। উক্ত রিপোর্ট সমূহে পরগনা ভিত্তিক তথ্য পরিবেশিত হলেও অধিকাংশ তথ্য ময়মনসিংহ জেলা ভিত্তিক। ফলে এই সময়ে আতিয়া পরগনা ও দেলদুয়ার জমিদারীর আয়তন ও অন্যান্য তথ্যগুলো পরিসংখ্যান ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করে নিতে হয়েছে। যেমন ৪৬ টি পরগনায় ৬২২৭ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা। তন্মধ্যে আতিয়া পরগনা সবচেয়ে বৃহত্তম পরগনা।

আলোচ্য সময়ে ৬৩৫ বর্গমাইল আয়তন নিয়ে আতিয়া পরগনা যা জিলার এক দশমাংশ পরিমাণ নিয়ে বিস্তৃত।[২৮৪] তন্মধ্যে যমুনা নদীর কারণে পরগনার কিছু অংশ পাবনা জেলার এবং কিছু অংশ ঢাকা জেলার অধীন ছিল, যা আলাদা ভাবে সার্ভে করা হয়। সার্ভে রিপোর্টের ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত ভাবে আতিয়ার পরিচয়তুলে ধরা হয় যে, আতিয়া পরগনা মূলত মুসলমান পরিবারের নিয়ন্ত্রণে। একটি অংশ ঢাকার নবাবদের অধীনে এবং একটি অংশ হিন্দু নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আতিয়া সহ কয়েকটি জমিদারী এস্টেটের অংশীদারদের প্রায় সকলেই জীবিত এবং সম্রাট আকবর থেকে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত। এই জেলায় সার্ভে সম্পন্ন করা কিছুটা জটিল হলেও আতিয়ার কিস্তওয়ার ছিল তুলনামূলক সহজ। যদিও অনেক আন্ত:গ্রাম ও আন্ত মৌজা, আন্ত: এস্টেট সীমান্ত বিরোধ মিমাংসা করতে হয়।[২৮৫]

Dhaka University Institutional Repository

আতিয়া জমিদারী এ সময় ৫০টি তৌজিতে বিভক্ত হয়। প্রধান জমিদারী শেয়ার যথাক্রমে করটিয়া, দেলদুয়ার, পাকুল্লা ও ঢাকার নবাব প্রমুখ জমিদারগণ। প্রধান তৌজি রোল যথাক্রমে ৯, ১০, ১১, ১৬, ৫০৩১, ৫০৩২, ৫০৫১ ও ৫০৫২ নং।[২৮৬]

এ সময়ে জীবিত জমিদারগণ যথাক্রমে দেলদুয়ারের জমিদার আবদুল করিম খান গজনবী, আব্দুল হালিম খান গজনবী, সৈয়দ আহমদ হোসেন চৌধুরী, করটিয়ার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, হায়দার আলী খান পন্নী, ঢাকার নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, বগুড়ার সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী প্রমুখ। আতিয়া পরগনায় নিলাম ও ক্রয় সূত্রে অপর নয়া জমিদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মহেড়ার জমিদার রায় বাহাদুর রনদা প্রসাদ সাহা, নাগরপুরের রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র সাহা, কৈজুড়ির জমিদার নবকুমার রায় চৌধুরী; নিষ্কর ও ক্রয় সূত্রের অপর মুসলমান ক্ষুদ্র জমিদার, তালুকদারগণ হলেন যথাক্রমে ধলাপাড়ার চৌধুরী পরিবার ও সনেটিয়ার কবি রিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী, টিকরী পাড়া করিমবাদ এস্টেটের সৈয়দ আমীরুল্লাহ, সৈয়দ আহমদ উল্লাহ, ধরের বাড়ীর রেফাত উল্লাহ, চারানের ইউসুফজাই পরিবার প্রমুখ। দেবোত্তর সূত্রের ক্ষুদ্র হিন্দু জমিদার ও তালকুদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মগড়া গ্রামের দূর্গাদাস পাল ও কৈলাস চন্দ্র পাল, কাদিম হামজানির শ্যামাচরন পাল প্রমুখ।

১৮৯১ সালে টাঙ্গাইলের জনসংখ্যা ছিল ৮,৫৯,৪৭৫ জন, ১৯০১ সালে ৯,৭০,২৩৯ এবং ১৯১১ সালে ১০,৫৯৫৯১ জন।[২৯৬] এই সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ আতিয়া পরগনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তন্মধ্যে ৮০% জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল।[২৮৭] ইকওয়াল রেজিষ্টার অনুযায়ী আতিয়া পরগনার ১৪২২ জন জমিদার ও তালুকদারের অধীনে ৭৮০ টি গ্রামে ভূমির পরিমাণ ৪,১৮,০৭৮ একর, তন্মধ্যে ২০% ভূমি জমিদারদের খাস খামার জমি হিসেবে ব্যবহৃত, ১৮% মধ্যস্বত্বভোগী এবং ৬০% সরাসরি রায়তের অধীন।[২৮৭] ২% অধীন রায়ত অধিকারে। আতিয়া ও দেলদুয়ার জমিদারিতে পূর্বে রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবণতা না থাকলেও ১৯০৮ সালে ঢাকার নবাবের সহকারী ম্যানেজার প্রতি পাখি জমিতে খাজনা বৃদ্ধি করেন। ফলে পার্শ্ববর্তী সকল জমিদারীতে ইহা সম্প্রসারন্ ঘটে।[২৮৮]

এসময় কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ্য সম্পর্কিত সাধারণ কৃষকের গড় সংখ্যা ৩,৫৪,৮৬৭ জন, রাজস্ব সংগ্রহকারী স্বত্ব সংখ্যা প্রায় ৭,৪৮৪ জন, রাজস্ব সংগ্রহকারী এজেন্ট ১৬৩৯ জন, কৃষি মজুর ১৬,৪৯৪ জন। শাকসবজি ইত্যাদি উৎপন্নকারী ও খুচরা বিক্রয়কারীর সংখ্যা গড় ৩৫৯ জন।[২৮৯] কৃষি সংশ্লিষ্ট পেশা ব্যতীত সাধারণ পেশাজীবীর একটি বিপুল সংখ্যা ছিল মৎস্যজীবী, গড় ১৬,০০০ মৎসজীবীর অধিকাংশ মুসলমান ছিল। কিয়দাংশ ছিল হিন্দু যাদের কৈবর্ত বলা হতো। ১০,০০০ লোক কুটির শিল্প পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। ৬,০০০ লোক ব্যবসায়ী ও মহাজনি কারবারে নিয়োজিত ছিল। মহকুমা ও থানা শহর ব্যতীত গড়ে ৭ থেকে ৮ মাইল দুরে গ্রামে একটি করে হাট বসত। এসব বাজারে উৎপাদনকারী কৃষক, জেলে, শিল্পী ও অন্যান্যরা তাদের পণ্য বেচাকেনা করতো।[২৯০]

আতিয়ার অধিকাংশ ভূমি ছিল দোআঁশলি। তবে প্রধানত: ধান, পাট, ডাল ইত্যাদি উৎপন্ন হতো। মোট ভূমির ৬৬% ছিল কৃষিযোগ্য, তন্মধ্যে বেশীর ভাগ জমিতে বোরো ধান উৎপন্ন হতো। বোরো ছাড়া আউস ও আমন ধান প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হতো। এছাড়া ইক্ষু, তামাক, ডাল, গম, বার্লি, বাদাম, আলু ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন হতো। মৌসুমী ফল আম, কাঁঠাল প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হতো। এখানে তুলা ও প্রচুর উৎপন্ন হতো। গড়ে ১০ লক্ষ লোকের জন্য ১০ গুন অর্থাৎ ১০ মিলিয়ন গম, ধান উৎপন্ন হতো।[২৯১] মাথাপিছু প্রায় ১০ মন পরিবার প্রতি উৎপন্ন ফসল, প্রতি কৃষি উদ্বৃত্ত হতো ১৩৯ টাকা, একর প্রতি বিনিয়োগ লাভ সাধারণ ভাবে ৪৭ টাকা।[২৯২] দ্রুত আবাদি বৃদ্ধির ফলে এতদাঞ্চলের রাজস্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা তৎপূর্ব সময় থেকে ৭০ থেকে ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০৮ সালের এক হিসেব অনুসারে সকল শ্রেণীর ভূপতিদের লাভ হচ্ছে ৮,৫২,৩৯৬ টাকা। তন্মধ্যে ছয় লক্ষই লাভ করতো নগদে নিজ খামার জোত থেকে এবং দুই লক্ষ রায়ত থেকে। বাকী অংশ স্থানান্তর ফি, নতুন বন্দোবস্ত, মার্কেট, ফিশারীজ ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ হতো। সেটেলমেন্ট অফিসারের রিপোর্ট মতে ভূপতি প্রজা থেকে প্রায় ৫% রাজস্ব সংগ্রহ করতো।[২৯৩] সংগৃহীত রাজস্বের মাত্র ১/৮ অংশই তারা রাজস্ব পরিশোধ করতো। আতিয়ার ভূমির তিন চতুর্থাংশ সরাসরি জমিদারী এস্টেটের আওতায় ছিল। এতে খারিজা তালুক খুব বেশী ছিল না।[২৯৪]

প্রজাস্বত্বের ফলে প্রায় ৯০% রায়ত চিরস্থায়ী প্রজায় পরিনত হয়। যে প্রজা ৫০ একরের উর্ধ্বে স্বত্ব ভোগ করতো তাকে বলা হতো প্রথম শ্রেনীর প্রজা, যে ১০ একরের স্বত্বভোগ করতো তাকে বলা

Dhaka University Institutional Repository

হতো দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রজা এবং যে ৬ একরের স্বত্ব ভোগ করতো তাকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রজা বলা হতো। দ্বিতীয় শ্রেণীর রায়তগণকেই প্রকৃত রায়ত বলে অভিহিত করা যায়।[২৯৫] আতিয়ার এ সময় একর প্রতি রাজস্ব ছিল সাধারণত ১ টাকা ৪ আনা। যেখানে পার্শ্ববর্তী অনেক পরগনায় রাজস্ব ছিল এর তুলনায় অনেক বেশী। আতিয়ায় রাজস্ববিহিন বেশ কিছু এস্টেট ছিল এবং প্রায় ১০,০০০০ প্রজা এতে স্বত্ববান ছিল। এর মধ্যে ছিল লাখেরাজ, ওয়াকফ লিল্লাহ্, মাঝার মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ, দেবোত্তর ও ব্রাম্মোত্তর স্বত্ব। আতিয়ার সিকিমি, নিকলী ও ইজারা তালুক ব্যাপক ছিল কিন্তু পত্তনী তালুক খুব একটা ছিল না। কেননা দেলদুয়ারের জমিদার স্বয়ং অন্যান্য অনুপস্থিত ও উপস্থিত জমিদারদের অনেক তালুক বা এস্টেট ১২ বৎসরের জন্য লিজ নেন।[২৯৫খ]

এতে তিন ধরনের রায়তস্বত্ব ছিল যথাক্রমে চিরস্থায়ী রায়ত, স্থিতিবান রায়ত এবং অস্থিতিবান রায়ত। গড়ে একেকটি রায়ত হোল্ডিং ছিল প্রায় ৩ একর।[২৯৬] এদের মধ্যে নগদ খাজনা পরিশোধকারীর সংখ্যা ছিল বেশী। শস্যে খাজনা পরিশোধকারীর সংখ্যা ছিল কম। বর্গাদাররা কোথাও .৫ অংশ, কোথাও ১/৩ অংশ উৎপন্ন ফসলে প্রতি বৎসর রাজস্ব পরিশোধ করতো।[২৯৭] এখানে পাবনা প্যাটার্নে কিছু কবুলিয়ত গৃহীত হতো সাধারণ কন্ট্রাক্টে। এখানে কোন কোন বর্গাদার ২০ বৎসর পর্যন্ত চাষাবাদ ও ভোগদখল করে আছে।[২৯৮] সকল ধরণের কৃষক সাধারণ ভাবে প্রতি একরে ১৬ মন ধান বা শস্য উৎপাদন করতো। উৎপন্ন ফসলে রাজস্ব পরিশোধকারী রায়ত মোট আয়তনের ১.৩ ভাগ, কোথাও ২ ভাগ পর্যন্ত ছিল। কৃষি ভূমির ২৫% দুই বা ততোধিক শস্য উৎপাদন করতো। মোট ভূমির ৭৫% কোন না কোন চাষাবাদে যুক্ত। আমন ধান উৎপন্ন হয় মোট কৃষির অর্ধেকাংশে। এর পরেই পাট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন পাটের বার্ষিক মূল্যমান প্রায় ২২১৬ লক্ষ টাকা।[২৯৯]

পাটের মূল্য ১৯০০ সালের ৫ টাকা মন থেকে ১৯১১ সালে ১১ টাকা এবং ১৯১৩ সালে ১৩ টাকায় উন্নীত হয়। ফলে সকল দিক থেকেই এসময় প্রজা সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়। এসময় কৃষি শ্রম ছিল ৬০ টাকা। মাথা পিছু মাসিক আয় ৫৩ টাকা। কৃষি সংশ্লিষ্ট পরিবারের মাসিক খরচ ছিল ১৫২ টাকা। ধারনা করা হয় যে, গড়ে ৩০০০ পরিবারের আয় ৮০০ টাকার বেশী, ২৭০০০০ লোকের আয় ২৪০ টাকার বেশী, ৪৫০০০ লোকের আয় ১৫০ টাকার কম বেশী, এসব পরিবারের জীবন ধারনের নিত্য খরচের পর আর কিছু উদ্বৃত থাকতো না। এরা উৎপন্ন খাদ্য শস্য বিক্রি

Dhaka University Institutional Repository

করে বিনিময়ে প্রয়োজনীয় লবন্, তেল কাপড় সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতো। তবে অতিরিক্ত মৌসুমী শস্য, ফলফলাদি, শাক সবজি উৎপাদন করে; মাছ ধরে, ডেইরী ও পোলট্রি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করতো। পুরুষরাই সাধারণত বার্ষিক গড়ে ৪ মাস অর্থাৎ ১২০ দিন প্রকৃত কাজ করতো। বাকী সময় বসে থেকে মাছ ধরে কিংবা গল্প অথবা গৃহ কর্মেই কাটাত। মহিলা ও শিশুদের পারিবারিক আয়ে কোন অবদান ছিল না।[৩০০] তবে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এবং বাড়ী ঘরের আশে পাশে শাক-সবজি উৎপাদনে মহিলাদের কিছু ভূমিকা ছিল। যাকে খরচ সাশ্রয়ী ভূমিকাই বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ জমিদারী পতন পর্বের (১৯৩৮-৫০) দেলদুয়ার আতিয়ার জমিদারী ব্যবস্থাপনা ও দক্ষিণ টাঙ্গাইলের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ

সিরাজুল ইসলামের মতে, '১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনের পর জমিদার, তালুকদার তথা মধ্য স্বত্বাধিকারী উভয় শ্রেণীই খোলস সর্বস্ব স্বত্বায় পরিনত হয়। কেননা এর ফলে প্রজা জমির উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করলো এবং জমিদারি ব্যবস্থা চূড়ান্ত ভাবে এর কার্যকারিতা হারালো।... যৌক্তিক ভাবেই এই বন্দোবস্ত ১৯৫০ সালে বিলুপ্ত হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই এই বিলুপ্তি গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি।[৩০১]

এহেন প্রেক্ষাপটে দেলদুয়ার ও আতিয়া জমিদারীতে জমিদারী ব্যবস্থাপনা, খাজনানীতি, কৃষক শ্রেণীর অভ্যন্তরীন কাঠামো এবং এতদাঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতে কি পরিবর্তন বা প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে। প্রজাস্বত্বের ফলে রায়ত শ্রেণী অধিকারের দিক দিয়ে ক্রমাগত এমন শক্তিশালী হয় যে, বিশ শতকের শুরু থেকে জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধি করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষত বঙ্গ ভঙ্গ কে কেন্দ্র করে আন্দোলন, অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন, প্রজা সমিতি সংগঠন এবং ডায়ার্কী শাসন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশে এতদাঞ্চলের জমিদারগণ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। তাই দেলদুয়ারের জমিদারগণ টাকার নিরিখে খাজনার হার বৃদ্ধির পরিবর্তে আবাদ বাড়ানো এবং উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে আয় বাড়াবার চেষ্টা করেন। আতিয়া পরগনার করটিয়া জমিদারীর ছোট তরফের জমিদার হায়দার আলী খান পন্নী প্রজাদের খাজনা পরিশোধে অনীহার ফলে বাধ্য হয়ে প্রজা নির্যাতনের পরিবর্তে নিজ জমিদারী মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতা ভিত্তিতে কোর্ট অব ওয়ার্ডসে হস্তান্তর করেন। অবশ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক প্রজার উপর নির্যাতন চালিয়ে খাজনা আদায়ের পন্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে হায়দার আলী খান পন্নী কোর্ট অব ওয়ার্ডস থেকে জমিদারী পুনরায় প্রত্যাহার করে নিজ পরিচালনায় নিয়ে নেন।[৩০২] তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম দিকে প্রজার উপর খাজনার যে বোঝা ছিল, এ সময়ে এসে তা অনেকাংশে হালকা হয়ে যায়। এ সময় পর্যন্ত কৃষি পণ্যের মূল্য এবং ভূমির উৎপাদন যতো বেড়েছে খাজনার হার ততো বাড়েনি।[৩০৩] ফলে এক শ্রেণীর কৃষকের হাতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে। কেননা এসময়ে এতদাঞ্চলে খাজনার হার ছিল মোট ফসলের পাঁচ শতাংশ মাত্র,[৩০৪] পূর্বে যা ছিল ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত। এমনকি ১৯৪০ এর দশকে তা নামে মাত্র পরিনত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এতদসত্ত্বেও প্রজা এসময় খাজনা দানে কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ অনীহা প্রকাশ করে। এর ফলে প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক জমিদারের খাজনা পরিশোধের আহবান সম্বলিত বিজ্ঞাপন পর্যন্ত পত্রিকায় প্রকাশ করতে হয়েছে।[৩০৫] তবে কোন কোন চতুর জমিদার এ সময়ে কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাতের লক্ষ্যে খাজনা বৃদ্ধির পরিবর্তে ভিন্নপন্থা অবলম্বন করেছিল। তারা মূল খাজনা বহির্ভূত অন্যান্য আদায় যেমন আবওয়াব, সেস, সেলামি প্রভৃতি সম্পর্কে কৃষকের ঔদাসীন্য এবং ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি রায়তের শ্রদ্ধা ভাব লক্ষ্য করে সেগুলোর হার বাড়িয়ে দেয়। এ সময় কৃষক শ্রেণীর অভ্যন্তরীন কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন প্রজা ভূমি বন্ধক ও জমিদার কর্তৃক ভূমি হস্তান্তরের অধিকার লাভ করে, এই সুবাদে নগদ অর্থের প্রয়োজনে ভূমি বন্ধক ও বিক্রির হিড়িক পড়ে। ফলে হস্তান্তরের নাম জারি বাবদ জমির মূল্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ সেলামি গ্রহণ এবং অন্যান্য সেস বাবদ আনুপাতিক হারে আদায় করতো।[৩০৬]

প্রজাস্বত্বের বিকাশ, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ এর সুফল সাধারণ রায়ত বা কৃষক বেশী দিন ভোগ করতে পারেনি। সকল শ্রেণীর সাধারণ কৃষক ঋনের জালে আবদ্ধ থাকায় পরিপূর্ণ সুফল ভোগ করতেও পারেনি। তবে এ সময় পাট অর্থনীতি বিকাশের ফলে এক শ্রেণীর কৃষকের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসে। এ সময়ে আবার কৃষি নির্ভরহীন এক শ্রেণীর পেশাজীবী চাকুরিজীবী তাদের অর্জিত বৈধ অবৈধ অর্থ ভূমি ক্রয়ে কিংবা মহাজনি কারবারে নিয়োগ করে। আর স্বচ্ছল কৃষক তার উদ্বৃত্ত কৃষির সম্প্রসারণ অথবা নতুন ভূমি ক্রয়ে ব্যয় করে।

১৯২৮ সাল বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা লক্ষ্য করা গেলেও বাংলায় এর প্রভাব পড়ে ১৯৩০ সালে। ধান, পাট সহ কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস না পেলেও বাজার মূল্য ব্যাপক ভাবে কমে যায়। ফলে সাধারণ কৃষকের আয় কমে যাওয়ায় তারা জমিদারের রাজস্ব ও মহাজনের দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে জমি বন্ধকী ও জমি হস্তান্তরের অধিকারের সুবাদে দরিদ্র প্রজা কর্তৃক পরিস্থিতি মোকাবেলায় তার ভূমি বন্ধক বা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে মহাজন ঋণ সঙ্কোচনের সুযোগ নিয়ে ঋণী কৃষকের ভাল জমি সমূহ ক্রয় করতে থাকে। জমিক্রয়ে কৃষককে রাজী করাতে ব্যর্থ হলে পাওনা অর্থ ও সুদ আদায়ে আদালতের মাধ্যমে আইনের মারপ্যাচে ফেলে আরো স্বল্পমূল্যে কৃষকের জমিজমা হস্তগত করে। এর ফলে বহু সংখ্যক কৃষক ভূমিহীন হয়ে বর্গাচাষী ও কৃষি শ্রমিকে পরিনত হয়।[৩০৭]

Dhaka University Institutional Repository

তেতাল্লিশের মহাদুর্ভিক্ষের সময় ভূমি হস্তান্তরের মাধ্যমে বৈষম্য এত বৃদ্ধি পায় যে, মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ব্যাপক হারে ভূমিহীনে পরিণত হয় এবং তাদের জমি হস্তান্তরিত হয় গ্রামের মুষ্টিমেয় জোতদার মহাজনের হাতে।[৩০৮] ফলে নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো কৃষি কাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে জমিদার মহাজনের বাইরে গ্রামীণ সমাজ ধনী কৃষক ও ভূমিহীন বর্গাদার এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এই ধনী কৃষক কোন প্রগতিশীল ও উৎপাদন পরিবর্তনকারী কিংবা পুঁজিবাদী ধারার বিকাশকারী শ্রেণী হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃত কৃষির সাথে সম্পর্কহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা গ্রামীণ জোতদার হিসেবে আবির্ভূত হন। এদের উদ্বৃত্ত পুঁজি এরা পূর্বের ভূমি সম্প্রসারণে বিনিয়োগের পরিবর্তে নতুন ভূমি ক্রয়ের মত অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে সমাজে নতুন অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। ফলে প্রজাস্বত্বের উদ্দেশ্য ও তার যৌক্তিকতা অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পিত পুঁজিবাদী সম্ভাবনা হারিয়ে যায়। এ দুঃসময়ে কৃষকদের প্রতি জমিদার মহাজনের ভূমিকা সাধারণ কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ মানসিকতা সৃষ্টি করে। কোথাও এই অসন্তোষ সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করে। এসব আন্দোলন কৃষক সমিতি, প্রজা সমিতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে। এই অবস্থায় সরকার একের পর এক আইন সংশোধন করে জমিদার মহাজন ও কৃষক-খাতকের সনাতন সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রেখে উভয়ের স্বার্থরক্ষার নীতি গ্রহন করে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় কৃষি জমি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স পাশের মাধ্যমে অকৃষিজীবীদের কাছে ভূমি হস্তান্তর রোধের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এতদসত্ত্বেও ভূমি বিক্রয় লক্ষ্যনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। এ হস্তান্তর রোধ করার কোন উপায় ছিলনা। কেননা একদিকে চাষী খাতক আইন ও ঋন শালিশীবোর্ড মধ্যস্থতা করে কৃষি ঋন লাঘব করে ঠিকই কিন্তু তা কৃষকের জন্য ক্ষতিরও কারণ হয়। কেননা জমিদার মহাজন একদিকে প্রতিষ্ঠানিক আইন কাঠামোর মাধ্যমে আংশিক ঋণ আদায় করে। অপরদিকে ঋণ সংকোচন করে নতুন ঋণ দান প্রায় বন্ধ করে অন্যত্র অর্থ বিনিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। অথচ কৃষকদের ব্যক্তিগত জীবনে কৃষি কাজ পরিচালনার জন্য ঋণ ছিল অপরিহার্য। এভাবে চাষী খাতক আইন ও প্রজাস্বত্ব আইন দুটোই শেষ পর্যন্ত সাধারণ কৃষকের জীবনে দুর্দশা সৃষ্টি করে এবং গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নয়া পরিবর্তনের সূচনা করে। ধনী কৃষক আরও বিত্তশালী হয়ে জোতদার শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং মাঝারি কৃষক ভাগচাষী ও দিনমজুরে পরিণত হয়।[৩০৯]

Dhaka University Institutional Repository

এই অবস্থায় ত্রিশের দশকে জমিদারী উচ্ছেদের পক্ষে কৃষক সংগঠন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনমত সংগঠিত করতে থাকে। এমনকি কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। তাদের নেতা এ.কে ফজলুল হক কোয়ালিশন সরকার গঠন করে শরীক মুসলিম লীগের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করে। এবং সরাসরি সিদ্ধান্ত দেয়ার পরিবর্তে ১৯৩৮ সালে এসম্পর্কে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করে। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত কমিশন রিপোর্টে ক্ষতিপূরণ সহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ, মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থের বিলোপ এবং বিদ্যমান ভাগ চাষ ব্যবস্থার উন্নয়নের সুপারিশ করে। কিন্তু পরবর্তী সাত বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের ঢামাডোলে এ রিপোর্টটি কার্যকর করার পরিবেশ পাওয়া যায়নি। অবশ্য ১৯৪৭ সালে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী সভা জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব এবং বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিল আইন সভায় উপস্থাপন করে। কিন্তু দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান অর্জনের ঢামাডোলে তা আইনে পরিণত হতে পারেনি।[৩১০]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে পুর্ববাংলা প্রাদেশিক সরকার নতুন করে, নতুন প্রেক্ষিতে জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল আইন সভায় উপস্থাপন করে। দু'বছর অনেক বিতর্ক ও সংশোধনীর পর ১৯৫০ সালে "পূর্ববাংলা জমিদারী দখল এবং প্রজাস্বত্ব বিল" আইনে পরিণত হয়।[৩১১] আইনে পর্যায়ক্রমে জমিদারী উচ্ছেদের বিধান থাকায় ১৯৫২ থেকে জেলার বড় বড় জমিদারী এবং যাদের জমিদারীর বার্ষিক আয় ৫০,০০০ হাজার টাকা কিংবা এর উর্ধ্বে ছিল সেগুলো জরিপ ও হিসাব করে সরকার একে একে দখলে নেয়ার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তবে এর গতি খুবই মন্থর হলে যুক্তফ্রন্ট সরকার তড়িঘড়ি সামারি একুইজিশন অধ্যাদেশ জারী করে ১৯৫৬ সালের ১৪ই এপ্রিল থেকে সকল জমিদারী ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর জমি সরকারের দখলে নিয়ে নেয়।[৩১২] ফলে ক্ষতিপূরণের হিসেব বা প্রাপ্তি ছাড়াই অনেক জমিদারী ও মধ্য স্বত্বাধিকারী জমি সরকারের দখলে চলে আসে। জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট আবেদন পেশ করে।[৩১২খ] ফলে দীর্ঘ আইনী লড়াইয়ের পর কোর্ট আইনের পক্ষে রায় প্রদান করেন কিন্তু এতে কোন কোন ক্ষেত্রে জমিদারী উচ্ছেদ কাজ বিলম্বিত হয়।

এ সময় দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী জমিদারী ছিল ওয়াক্‌ফ আল আওলাদ। দেলদুয়ারে দক্ষিণ বাড়ী জমিদারী ছিল সাধারণ জমিদারী, তবে ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ প্রায় সব জমিদারীতেই কিছু অংশ ছিল। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

দেলদুয়ার ও আতিয়ার জমিদারগনের উক্ত জমিদারী সমূহে তিন ধরনের জমির ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারগণ কেবল ১০০ বিঘা জমি দখলে রাখার সুযোগ পায়।[৩১৩] আর দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী জমিদারগণ ওয়াক্ফ আল আওলাদ হিসেবে ৩৭৫ বিঘা জমি দখলে রাখার সুযোগ পায়।[৩১৪] নগদে এবং বন্ডে উভয় প্রক্রিয়ায় তারা বাৎসরিক আয়ের পাঁচগুন হারে ক্ষতিপুরণ আইনত: লাভ করে।[৩১৫] তবে মসজিদ, দরগাহ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দান কৃত "ওয়াক্ফ লিল্লাহ" সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিগ্রহনকৃত জমির বাৎসরিক প্রকৃত লাভের সমপরিমান অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্থায়ী ভাবে প্রতি বছর প্রদান করার নীতি গৃহীত হয়। জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ দান ও রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে একটি 'ল্যান্ড রেভেনিউ কমিশন' গঠিত হয়। কমিশন ১৯৫৯ সালে রিপোর্ট ও সুপারিশমালা পেশ করে। এতে জমিদারী উচ্ছেদের দরুন প্রাক্তন জমিদারদের আর্থিক দুর্দশা লাঘব কল্পে উচ্ছেদ পূর্বকালীন বকেয়া খাজনা, যা সরকারের প্রাপ্য ছিল তা জমিদারদের থেকে আদায় না করে ক্ষতিপুরণের টাকা থেকে আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ জন্য ক্রোক, নিলাম বা বিক্রির মাধ্যমে তাদের দখলে থাকা সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ নীতি পরিত্যাগ করা হয়।

জমিদারী উচ্ছেদের পর দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারগণ তাদের খাস দখলে থাকা ১২০ বিঘা জমি দখলে রাখতে সমর্থ হন। তন্মধ্যে ৬০ বিঘা বাড়ী এবং ৬০ বিঘা বাড়ীর বাইরে খাস জমি ছিল। যে প্রজার দখলে যে জমি ছিল, সে প্রজা সে জমির অধিকার লাভ করে। প্রজা থেকে বকেয়া খাজনা ও সেস আদায়ের দায়িত্ব নেয় সরকার।[৩১৬] দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর সর্বশেষ জমিদার সৈয়দ মোহাব্বত আলী ১৯৬৩ সালে মৃত্যুবরণ করলে তার তিন পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে মামলা মোমাদ্দমার পর আদালত কর্তৃক ১৯৯০ সালে চুড়ান্ত রায়ের পর সম্পত্তি বন্টনের মাধ্যমে বিরোধের অবসান ঘটে।[৩১৭]

দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদার বংশের প্রধান ও জ্যেষ্ঠ পুরুষ সৈয়দ মারহামাত আলী, তিনি বর্তমানে দেলদুয়ারে তিনকক্ষবিশিষ্ট একটি একতলা বাড়ী সহ ৮ বিঘা জমির মালিক। দেলদুয়ার এবং টাঙ্গাইলে প্রাপ্ত অবশিষ্ট জমি বিক্রি করে উত্তরায় ক্রয়কৃত সরকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫ কাঠার প্লটে একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেন। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত এডভোকেট সৈয়দ মারহামাত আলী দু'সন্তান নিয়ে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত হিসেবে জীবন যাপন করছেন।[৩১৮]

Dhaka University Institutional Repository

দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী জমিদারীতে একই ভাবে ওয়ারিশী বিরোধ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই বহু জমি হাতছাড়া হয়, তা স্বত্বেও জমিদারী উচ্ছেদের পর বসতবাটি সহ সমপরিমাণ জমি দেলদুয়ার উত্তরবাড়ী গজনবীদের একমাত্র বংশধর খোদাদাদ খান গজনবী কিছু সময় পর্যন্ত নিজ দখলে রাখতে সমর্থ হন। তিনি আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির উচ্চ পদে চাকুরীরত ছিলেন। ফলে জমিদারী উচ্ছেদের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আইনী লড়াই চালাতে গিয়ে এক দিকে ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হন, অপরদিকে জমিদারী অঞ্চলে অনুপস্থিত থাকার ফলে নিজ বসতবাটি ছাড়া তেমন কোন খাস জমি দখলে রাখতে পারেননি।

বিশেষত '৭১এর মুক্তিযুদ্ধের ঢামাডোলে খোদাদাদ খান গজনবী কর্মস্থল ঢাকা, করাচী ও লন্ডনে থাকার সুবাদে চক্রান্তকারী, দখলকারী কর্তৃক অধিকাংশ জমি বেহাত হয়। এমনকি মূল জমিদার বাড়ী লুণ্ঠন ও অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়। অনিন্দ্য সুন্দর বাংলো বাড়ির বিশাল অংশ ও বিভিন্ন মূল্যবান দ্রব্যাদি ভষ্মিভুত ও লুণ্ঠন হয়। পুরনো, নতুন সব দলিল দস্তাবেজ, লাইব্রেরীর ব্যক্তিগত সংরক্ষণের সব দুর্লভ গ্রন্থ সমূহ; বিশেষ করে আবদুল করিম গজনবীর লন্ডনে থাকাকালীন মাতা করিমুন্নেসার কাছে প্রেরীত বিভিন্ন চিঠিপত্র, বেগম রোকেয়ার বোনকে লেখা চিঠিপত্র, মীর মশাররফ হোসেন ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের সাথে করিমুন্নেসার যোগাযোগকৃত পত্র সমূহ, করিমুন্নেসার নিজ লেখা কবিতা, প্রবন্ধ; এ.কে. গজনবীর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থ ইত্যাদি ইতিহাসের সকল উপাদান হারিয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা জমিদারী দলিল দস্তাবেজ এবং জমিদারদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক তৎপরতার বিভিন্ন ছবি সম্বলিত মূল্যবান নিদর্শনগুলো হারিয়ে যায়। ফলে বাংলার আঞ্চলিক ও লোকিক ইতিহাস পুর্নগঠনের বিশাল ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যায়।

৪৭ এর স্বাধীনতা, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে এভাবে আঞ্চলিক ইতিহাসের মূল্যবান নিদর্শন সমূহ চিরতরে হারিয়ে যায়। উত্তর বাড়ীর একমাত্র পুরুষ খোদাদাদ খান গজনবী গুলশানে ১ বিঘা জমির উপর নির্মিত নিজ দোতলা বাড়ীতে অবস্থান করছেন। ব্যক্তিগত আয় থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জমিদার ভবন এবং স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রাচীন মসজিদের তত্ত্বাবধান করে আসছেন। এভাবে তিনি স্থানীয় কেয়ারটেকারের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ রক্ষণাবেক্ষন করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দেলদুয়ারের জমিদার বংশধর খোদাদাদ খান গজনবী ও অন্যান্যের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ জমিদার বাড়ীর জামাতা তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল আতিকুর রহমানের সহায়তায় ১৯৮৪ সালে দেলদুয়ার প্রশাসনিক থানায় উন্নীত হয়।[৩১৯] খোদাদাদ খান গজনবী কর্তৃক থানা স্থাপনের জন্য ভূমি দান করার ফলশ্রুতিতেই থানা ঘোষনা দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। জমিদারী উচ্ছেদকালে ভোগ দখলি স্বত্বের মালিকগণ বর্তমানে জমি বিক্রির প্রয়োজন হলে অদ্যাবধি নাম মাত্র মূল্যে খোদাদাদ খান গজনবী থেকে দলিল দান কবলা নিয়ে মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর অপরের নিকট প্রয়োজনে জমি বিক্রি করে থাকেন।[৩২০]

দেলদুয়ার সংশ্লিষ্ট আতিয়ার অন্যান্য জমিদারী ব্যবস্থাপনা

আতিয়ার প্রধান জমিদার করটিয়ার পন্নী পরিবারের তিনটি মৌল ধারা যথাক্রমে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, হায়দার আলী খান পন্নী ও মুজাফফর আলী খান পন্নী। তন্মধ্যে মুজাফফর খান পন্নী গোড়াই আদি বাড়িতে থেকে যান। কিন্তু করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার বাড়ী দু সৎ ভাই ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ও হায়দার আলী খান পন্নীর মধ্যে বিভক্ত হয়। জমিদারী উচ্ছেদকালে ওয়াজেদ আলী খানের একমাত্র পুত্র মাসউদ আলী খান পন্নীর অধীনে প্রায় ২ আনার বিশাল জমিদারী ছিল। জমিদারী উচ্ছেদের পর করটিয়ার জমিদার বাড়ীর মোট প্রায় ৩০ একরের প্রধান অংশ অর্থাৎ ২০ একরের অধিক এবং বাকী খাস ভূমি থেকে ওয়াক্ফ আল আওলাদ হিসেবে প্রায় ১২৫ একর দখলে রাখতে সমর্থ হন।[৩২১]

করটিয়ার ছোট তরফে জমিদার হায়দার আলী খান পন্নী মূল বসতবাটির সাড়ে ৭ একর এবং পার্শ্ববর্তী ধানী জমি থেকে বাড়ী ঘেরা আরো ৮ একর সহ প্রায় ১৫ একরের জমি এবং খাস জমি সহ মোট ১০০ একর নিজেদের অধিকারে রাখতে সমর্থ হন। জমিদারী উচ্ছেদ কালে তার প্রায় এক আনা জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা; ফরেস্ট, হাট বাজার, মাছের জলাশয়, হাওর, বিল মিলিয়ে সর্বমোট ২ লক্ষ টাকা আয় হতো।[৩২২]

দেলদুয়ার ও আতিয়ার জমিদারগন ওয়াক্ফ সম্পত্তিকে প্রথমে জমিদারী উচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে পরে জরিপ ব্যতীত একত্রে সকল জমিদারী দখলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কোর্টে রিট মামলা করেন। মামলায় হেরে সকল জমিদার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করলেও হায়দার আলী খান পন্নী শেষ পর্যন্ত মামলা চালিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যান এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেননি। এ সময় তার জমিদারীতে ১৫২৬ টি মৌজা ছিল। প্রতিটি মৌজা সর্বনিম্ন ৪০০ একর পর্যন্ত ছিল। গড়ে প্রতি মৌজায় ৫০০ একর হিসেবে সর্বমোট ৭৬,২৫০ একর জমি ছিল। ১৯৭০ সালে হায়দার আলী খান পন্নীর পক্ষে কোর্টের রায় হয়। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ঢামাডোলে এই রায় কার্যকর করা যায়নি।

১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে এ ধরনের রায় অস্বীকার করে জমিদারী উচ্ছেদ অ্যাক্টের বিরুদ্ধে কোন ধরনের মামলা নিষিদ্ধ করা হয়।[৩২৩] ফলে বাদী পক্ষ অবশেষে ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা করে এই মামলায় ১৯৯০ সালে বাদী পক্ষে রায় হয়। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে রায়ের কার্যকারীতা স্থগিত ও পরে আদেশজারী করা হয়, বাদী নিজে এস্টেট পরিচালনা করতে পারবে না, সরকার বাদীর পক্ষে এস্টেট পরিচালনা করবে। পরবর্তিতে এর বিরুদ্ধে জমিদার বংশধরগণ পুনরায় মামলা করলে চুড়ান্ত ভাবে আপীল আদালতে বাদী পক্ষ হেরে যায়। চুড়ান্ত রায়ে বলা হয় যে, ২৪টি মৌজার গেজেটে যেহেতু ক্ষতিপূরণ ২৭ হাজার টাকা নির্ধারিত হয়েছে সুতরাং প্রকৃত অর্থে বাদী ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছে।[৩২৪] জমিদার বংশধরগণের মতে, এভাবে করটিয়ার জমিদারগণ জমিদারী উচ্ছেদ ক্ষতিপূরণ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ জমিদারী উচ্ছেদকালে (১৯৫০-৬১) ভূমিবন্টন ও ব্যবস্থাপনায় দেলদুয়ার-আতিয়ার পতিত জমিদার, জোতদার, বর্গাদার, ভূমিহীণ মজুর শ্রেণীর নয়া অর্থনীতির স্বরূপ

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্বের সংশোধনীর ফলে দখলি প্রজা তার বন্ধক ও বিক্রয়ের অধিকার লাভ করে। এ অধিকার লাভ করে যেখানে কৃষক তার উদ্বৃত টাকা ভূমিতে কৃষি উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে এ আশা করা হয়েছিল, তার পরিবর্তে অর্থনৈতিক টানাপোড়নে ক্ষুদ্র কৃষক তার ভূমি বিক্রয় করে ভূমিহীন প্রজায় পরিণত হয়। আর স্বচ্ছল কৃষক ও মহাজন সে জমি ক্রয় করে জোতদারে পরিণত হয়।[৩২৫] এভাবে জোতদার বা ধনী কৃষক বনাম দরিদ্র কৃষক বা ভূমিহীন কৃষক উভয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে ভূমি কেন্দ্রিক নয়া বৈষম্যের অর্থনীতি বিকশিত হয়। সমগ্র বাংলার এই সাধারণ চিত্রের ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায়নি। আলোচ্য বৃহৎ জমিদার শাসিত অঞ্চলে দেলদুয়ার ও আতিয়া তথা দক্ষিণ টাঙ্গাইল। জমিদারী উচ্ছেদ পূর্ববর্তী এক দশকে প্রজা যেমন জমিদারকে প্রায় ক্ষেত্রেই খাজনা দেয়নি। জমিদারদের এসময় পূর্বের ন্যায় খাজনা আদায়ের অবস্থা ছিলনা। জমিদারদের খাস ভূমিই ছিল এই সময় তাদের আয় ও ব্যয় নির্বাহের প্রধান উৎস।[৩২৬] এ জন্যে এ সময়ে সচেতন জমিদার সন্তানরা দ্রুত নিজেদের সরকারী বেসরকারী চাকুরীতে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। যারা এসময় দ্রুত নিজেদের সম্মানজনক চাকুরীতে অন্তর্ভূক্ত করতে সমর্থ হয়, তারাই বর্তমানে সামাজিক ভাবে স্বচ্ছল অবস্থানে রয়েছে। আর যারা ব্যর্থ হয়, তারা বর্তমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন যাপন করছে। তদুপরি চাকুরিজীবী ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষকদের জমি ক্রয়ের ফলে উঠতি জোতদার শ্রেণী জমিদারদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। জমিদারী উচ্ছেদের পরেও স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এই জোতদার শ্রেণীই গ্রামীণ ও আঞ্চলিক অর্থনীতির নিয়ন্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

মূলতঃ জমিদারী উচ্ছেদ আইন এই জোতদারদের স্বার্থই সংরক্ষিত করে।[৩২৭] সাধারণ কৃষক কিংবা জমিদার কেউই এই ভূমি সংস্কারের সুফল ভোগ করতে পারেনি।

এতদাঞ্চলের অধিকাংশ জমিদার ওয়াক্ফ সম্পত্তির[৩২৮] সুবাদে অধিক জমি দখলে রাখতে সমর্থ হন। ফলে অনেক স্থানের জমিদারদের ন্যায় এতদাঞ্চলের জমিদারগণ একেবারে দেউলিয়া হননি। তদুপরি এতদাঞ্চলে বড় বড় জোতদারগণ বেনামীতে জমি দখল করায় খাস জমি খুব একটা উদ্ধার করা

সম্ভব হয়নি।[৩২৯] ফলে জমিদারী উচ্ছেদের লক্ষ্য খুব একটা অর্জিত হয়নি। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি এবং মামলা মোকাদ্দমার কারণে অনেক জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী যথাযথ ক্ষতিপুরণ লাভ করেনি। ভূমি বন্টনকে কেন্দ্র করে সরকার দলীয় ও সুবিধাভোগী একটি গ্রামীণ গোষ্ঠী বা টাউট বাটপার শ্রেণী সৃষ্টি হয়।[৩৩০] জমিদারী উচ্ছেদ আইনের সাথে বর্গাদারদের তেভাগা দাবী কার্যকর না হওয়ায় ভূমিহীন বর্গাদার শ্রেণীর অর্থনৈতিক জীবনে স্বচ্ছলতা আসেনি।[৩৩১]

১৯৪৭ এ দেশ বিভাগ উত্তর বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাতে দেখা যায় উৎপাদনের দিক থেকে ময়মনসিংহ জেলা খাদ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হিসেবে কর্ডন প্রথার আওতায় থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেলদুয়ার, আতিয়া অঞ্চল তথা টাঙ্গাইল মহকুমা খাদ্য ঘাটতি এলাকা ছিল এবং এখানে ঐ সময় কর্ডন ছিলনা।[৩৩২] ধান উৎপাদনের দিক থেকে ময়মনসিংহের সবচেয়ে উর্বর এলাকা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কৃত্রিম অর্থনৈতিক শ্রেণী ব্যবস্থার কারনে এখানে উৎপাদন ব্যাহত হয় ও খাদ্য ঘাটতি হয়।

উল্লেখ্য জমিদারী উচ্ছেদের পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে প্রচুর খাজনা অনাদায়ী থেকে যায়। তবে কাগজে পত্রে এসময় বাংলার সকল জমিদার থেকে সরকারী খাজনা আদায়ের পরিমাণ ছিল ২.২৪ কোটি টাকা। জমিদারী উচ্ছেদ পরবর্তী সরকার কর্তৃক প্রজা থেকে খাজনা আদায় বাবদ ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১.২৪ কোটি টাকা। এবং সরকারের অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ স্থির করা হয় ৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব বাবদ সরকারের আয় ৭ কোটি টাকার মত হওয়ার কথা যদিও ১৮৫৮ সাল থেকে খাজনা বৃদ্ধির পূর্ব পর্যন্ত আইনগত ভাবে বাংলার কৃষকদের দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮.৪২ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ১৯৫৮ থেকে খাজনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০ সালে এসে দাঁড়ায় ১৮.৫০ কোটি টাকা।[৩৩৩]

এ ভাবে বহু জমিদার থেকে একক রাষ্ট্রীয় জমিদার কর্তৃক কৃষকদের একই খাজনা শোষণের পরিচয় পাওয়া যায়। তদুপরি জমিদারদের গোমস্থা ও কর্মচারীদের স্থান দখল করে সার্কেল অফিসার, তহশিলদার, চৌকিদার প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীরা।[৩৩৪] কৃষক থেকে এরা পরোক্ষ ভাবে নির্যাতনমূলক খাজনা আদায় রীতিমতো অব্যাহত রাখে। অনেকের মতে, ব্যক্তি জমিদারীর স্থলে রাষ্ট্রীয় জমিদারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই বলা যায় জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ কার্যত সম্পূর্ণ ভাবে পাকিস্তান আমলে সম্পন্ন

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। অন্য কথায় জমিদারী উচ্ছেদের অর্থনৈতিক সুফল আসেনি। কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশ কিংবা কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়নি।

বাংলাদেশের তিন তিনটি ভূমি সংস্কার নীতির মাধ্যমে কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তির পদক্ষেপ নেয়া হয় কিন্তু বৈপ্লবিক সংস্কার না হওয়ায় কৃষি বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী হয়নি এবং কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশ হয়নি। যদিও বিশ্ব বাস্তবতায় কৃষি বিপ্লব আজ আর শিল্প বিপ্লবের পূর্ব শর্ত নয়। তবুও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নীতি না কৃষি বিপ্লব, না শিল্প বিপ্লবের ধারায় প্রবাহিত।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১০ জমিদারী উচ্ছেদ পরবর্তী জমিদার বংশধরদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

জমিদারী উচ্ছেদ পরবর্তী বাংলায় জাতীয় আর্থ-সামাজিক নয়া প্রেক্ষিত সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষিতে পতিত জমিদারদের অর্থনৈতিক অবস্থান নির্ণয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষা-দীক্ষায় যারা এগিয়ে ছিল তারাই বর্তমানে ভাল অবস্থায় রয়েছে।

দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুরুষ খোদাদাদ খান গজনবী অবসরপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট। বর্তমানে ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসা ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে কাজ করছেন। স্ত্রী সৈয়দা রুবি গজনবী বেগম করিমুন্নেসা খানমের মতই প্রতিভাশালী, তিনি বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রং এর উপর একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি "অরন্য ক্রাফটস" নামক হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ ক্রাফটস কাউন্সিল এর প্রতিষ্ঠাতা। অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। তারা উভয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এছাড়া জমিদারী উচ্ছেদ কালে দখলে থাকা জমি জমা তাদের আয়ের অন্যতম উৎস। সেই সাথে উচ্ছেদকৃত জমি থেকে বিভিন্ন সময়ে কবলা হস্তান্তর বাবদ বেশ অর্থ পাচ্ছেন। পক্ষান্তরে দক্ষিণ বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুরুষ সৈয়দ মারহামাত আলী সে তুলনায় সচ্ছল নন। একজন অবসর প্রাপ্ত এডভোকেট হিসেবে মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি থেকে আয় দিয়ে সংসার চালান। উত্তরায় সরকার থেকে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে দোতলা বাড়ীতে অবস্থান করছেন। এ বাড়ীর অন্য পুরুষগণ সকলেই সচ্ছল মধ্যবিত্ত। তবে পাকুল্লা জমিদারদের তিনটি ধারার দুটি সচ্ছল হলেও একটি সাধারণ মধ্যবিত্তের টানা পোড়নে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র- ২

১. রঙ্গলাল সেন, সমাজ কাঠামো : পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, বাংলা একাডেমী, পৃ-৩৮; D.D. Kosambi, *The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline*, London-1965, p. 50; মুসা আনসারী, ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২।

২. আফসান চৌধুরী, মধ্যযুগের বাংলার ভূমি শাসন ব্যবস্থা; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙ্গালী সমাজ, মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, ঢাকা, পৃ-১৬-১৯।

৩. মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ- ৯১

৪. ঐ

৫. W.K. Firminger, *Historical Intrduction to the Bengal Portion of the fifth Report*. Indian Studies, 1962, Neeraj Publishing House, Delhi, Vol. II, P.393

৬ক. *Revenew Survey Reports*, Vol. 2, 3, 5, Vol. 19, 37, 42; Old District Records M .ymensingh, National Archives; মোহাম্মদ বাকের, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ, ১৯৯৭, পৃ- ২১২; দেলদুয়ার ও আতিয়ার মৌজা ম্যাপ, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৬খ. W. Hunter, *A Statistical Accounts of Bengal,* Vol. V.I, Mymensingh District, Government of India, 1872, p. 477.

৭. F.A. Sachse, *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Mymensingh*, 1908-1919, Chapter-IV, p- 88.

৮. কেদার নাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের বিবরণ, ১৯০৪, পৃ-২; H.J. Reynald, *Report on the History and Statistics of the Dhaka District*, p- 863-69.

৯. জন অর্থনীতি বলতে রায়ত বা সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থাকে মুখ্যত বুঝানো হয়েছে।

১০. আঞ্চলিক অর্থনীতি বলতে নির্দিষ্ট আয়তন বিশিষ্ট পরগনা, থানা ও মহকুমা পর্যায়ের সাধারণ অর্থনীতি কে বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ টাঙ্গাইলের ৬টি থানা এবং বিশেষত: দেলদুয়ার থানা বিবেচ্য।

Dhaka University Institutional Repository

১১. ব্যক্তির ও অঞ্চলের সমষ্টিগত অর্থনীতিকে জাতীয় অর্থনীতির একটি অংশ হিসেবে ধরে নিয়ে তার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১২. খুররম হোসেইন, টাঙ্গাইল: ভূ-প্রকৃতি ও নদী, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মোহাম্মদ বাকের সম্পাদিত; ১৯৯৭, পৃ- ৮৭

১৩. গোলাম আম্বিয়া নূরী, টাঙ্গাইলের জন সমাজ নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি, পূর্বোক্ত পৃ-৯৮

১৪. ঐ, পৃ- ৯৯-১০০

১৫. ঐ, পৃ- ১০৪

১৬. ঐ, পৃ- ৮৯, ১০৪

১৭. ঐ, পৃ- ৮৯

১৮. ঐ, পৃ- ৮৯

১৯. ঐ, পৃ- ১০০

২০. ঐ, পৃ- ১০১

২১. ঐ, পৃ- ৮৯

২২. ঐ, পৃ- ৯০

২৩. কেদার নাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ- ৯১-৯২

২৪. ঐ, পৃ- ৯৩

২৫. ঐ, পৃ- ৯৪

২৬. ঐ, পৃ- ৯৪

২৭. মোহাম্মদ বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- **৯২**

২৮. ঐ, পৃ- ৯০

২৯. ঐ, পৃ- ২০৬-২১২

৩০. ঐ, পৃ- ৯১

৩১. ঐ, পৃ- ৯১

৩২. ঐ, পৃ- ৩২

৩৩. ঐ, পৃ- ৯৫

৩৪. ঐ, পৃ- ৯৫

৩৫. সিরাজুল ইসলাম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষি অর্থনীতি, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৬৫-৬৬; বাংলার ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃ-২৪৫

৩৬. আফসান চৌধুরী- পূর্বোক্ত, পৃ- ১৭

৩৭. ঐ, পৃ- ১৬

৩৮. রঙ্গলাল সেন, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৯

৩৯. ঐ, পৃ- ১৮

৪০. Shirin Akhter, *The Role of the Zamindars in Bengal 1707-1772* Asiatic Socity of Bangladesh, 1982, Dhaka, P.3-5, আব্দুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্রষ্টব্য; Irfan Habib, "*The Zamindars in the Ain*, Delhi 1958, p. 322.

৪১. B.R. Grover, *Evaluation of the Zamindari and Taluqdari System in Bengal, 1576-1757 A.D*; বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৩৮০ ২য় বর্ষ, বৈশাখ, পৃ- ৮৬-৮৯

৪২. ঐ, পৃ- ৮৬

৪৩. ঐ, পৃ- ৯০, মির্জা নাথান, বাহারীস্তান ই গায়েবী, দ্রষ্টব্য

৪৪. ঐ, পৃ- ৮৬

৪৫. ঐ, পৃ- ৮৭, ৯২, ৯৯

৪৬. ঐ, পৃ- ৮৮ ও ১০০

৪৭. আফসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৬

৪৮. Sirin Akhter, Op. Cit., P. 32-33

৪৯. Grover, Op. Cit., P.-99-100

৫০. ঐ, পৃ- ১০২

৫১. Sirin Akhter, Op. Cit., P. 179; সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস ২য় খন্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬৮-৩৬৯

৫২. ঐ, পৃ- ২৬৯

৫৩. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস ২য় খন্ড, পৃ-২৬৯; ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

৫৪ক. B.R.; Grober, Op. Cit.

৫৪খ. ঐ, পৃ- ৮৭

৫৫. মোঃ নজরুল ইসলাম, মুসলিম শাসনাধীন আটিয়ার ইতিহাস, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, সপ্তদশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৯ পোষ, ১৪০৬, পৃ- ১১১; আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

৫৬. আইন-ই-আকবরি, পৃ- ১৭৮-১৮০; আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

৫৭. Firminger, Op. Cit., p-180-84;

৫৮. হাবিবা খাতুন, ইসা খাঁ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য; কেদার নাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য; খোন্দকার আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য।

৫৯. ঐ

৬০. খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য।

৬১. Firminger, Op. Cit., p. 180-84.

৬২. ঐ, পৃ- ১৮৫-১৯০

৬৩. ঐ, পৃ- ১৯০

৬৪. ঐ, পৃ- ১৯৮-২০৪

৬৫. ঐ, পৃ- ২০৩

৬৬. ঐ, পৃ- ২০৪

৬৭. ঐ, পৃ- ১২৮, ২৫০, ২৯৩-৯৪

৬৮. ঐ, পৃ- ৩৯৪

৬৯. ঐ, পৃ- ৩৯৪, ৪০৩

৭০. ঐ, পৃ- ৪৬৩

৭১. ঐ, পৃ- ৩৯৩, ৪৬৩

৭২. বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ-২০৮

৭৩. Firminger, Op. Cit., p. 394

৭৪. ঐ, পৃ- ৩৯৪

৭৫. ঐ, পৃ- ৪৬৩

৭৬. ঐ, পৃ- ৪৬৩

৭৭. ঐ, পৃ- ৪৬৩

৭৮. বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ-২১০

৭৯. ঐ, পৃ-২১১

৮০. F. A. Sachse, Op. Cit., p-88; কেদার নাথ, ময়মনসিংহের বিবরন, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২০-২৪; খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৯; পরিশিষ্ট (বংশ তালিকা) দ্রষ্টব্য

৮১. কেদার নাথ, ময়মনসিংহের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ- ১১৩

৮২. কেদার নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ-১২৩, বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ-২০৪

৮৩ক. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭০; ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃ-১৭৫, ২০৩, ২০৯

৮৩খ. ঐ

৮৪ ঐ, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭২; ঐ, পৃ-১৬৬

৮৫. খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮৩

৮৬. কেদার নাথ, ময়মমন সিংহের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ-১১৩-১১৪

৮৭. ঐ, পৃ-১১৪

৮৮. ঐ, পৃ-১১৮

৮৯. ঐ, পৃ-১১৯

৯০. ঐ, পৃ-১২০

৯১. ঐ, পৃ-১২৫

৯২. ঐ, পৃ-১২৬

৯৩. ঐ, পৃ-১২৬

৯৪. ঐ, পৃ-১২৬

৯৫. ঐ, পৃ-১২৮

৯৬. ঐ, পৃ-১২৭

৯৭. ঐ, পৃ-১৩৩

৯৮. ঐ, পৃ-১৩৬

৯৯. ঐ, পৃ-১৩৮

১০০. ঐ, পৃ-১৩৮

১০১. ঐ, পৃ-১৩৭

১০২. সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ-৬৭০; ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃ- ২৪৮-২৫২

১০৩. বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ-২১০

১০৪. কেদার নাথ, ময়মনসিংহের বিবরণ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২২

১০৫. প্রকৃত নাম কোয়েস আলী খান, সৈয়দ মারহামাত আলী, সাক্ষাৎকার।

১০৬. F.A. Sachse, Op. Cit.

১০৭. আলিয়ার খাঁ পন্নীর পুত্র ও পাকুল্লা জমিদার বাড়ীর আদি প্রতিষ্ঠাতা

১০৮. F.A. Sachse, Op. Cit., p. 58, 242

১০৯. কেদার নাথ, পূর্বোক্ত-২২; খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮২

১১০. F.A. Sachse, Op. Cit., p-242; কেদারনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৩

১১১. শ্রী রাধা রমন সাহা, পাবনা জেলার ইতিহাস, ১ম খন্ড ১৩৩০ (১৯২৩ খৃ:) পৃ-১১০-১১

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ-১১১; বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১১; খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮০;

১১৩. খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮০; Syad Marhamat Ali, Memories of Delduar Zamindary, Tangail, 1961, Unpublished, p.6

১১৪. ঐ; কেদার নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৩

১১৫. খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত; Marhamat Ali, Op. Cit., p.6; পাবনার দুলাই জমিদার পরিবারের কাগজপত্র, বংশধর নাজলী চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১১৬. খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮০; Marhamal Ali, Op. Cit., p.6 ; বাধা রমন সাহা, পূর্বোক্ত , দ্রষ্টব্য।

১১৭. Marhamat Ali, Op. Cit..

১১৮. মো: আলমগীর, বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান পি.এইচডি থিসিস, ১৯৯৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; পৃ- ৫৬; উল্লেখ্য খাজা হাফিজুল্লাহ (মৃ ১৮১৫) মুতওলি থাকা কালে ১৮০৬ সালে আতিয়া পরগনায় আলিয়ার খাঁর কন্যার দু'অংশ ক্রয় করে প্রথম আতিয়া পরগনায় প্রবেশ করেন।

১১৯. F. A, Sachse, , P. 189; Marhamat Ali, Op. Cit., p. 4; আব্দুর রহিম, পৃ- ৩০-৩১; খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮০; বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১১; কেদার নাথ, পৃ- ২৩

১২০ক. বাকের, পূর্বোক্ত; দ্রষ্টব্য; Marhamat Ali, Op. Cit.; কেদার নাথ, পৃ- ১৮০

১২০খ. খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮০, কেদার নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৩

১২১. আলমগীর, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫; কেদার নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৩, বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১১; উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ১৮৪৬ সালের পূর্বেই আব্দুল গনির পিতা খাজা আলিমুল্লাহ আতিয়া পরগনার দুটি নিলামী স্বত্ব ক্রয় করেন। একটি হলো মীর নওয়াব বিলিয়াটির, অপরটি পন্নী পরিবারের একটি অংশ। পূর্বোক্ত, পৃ- ২০-২১; ঢাকা প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৮৮১

১২২. ঐ, পৃ- ৯, ২০-২১

১২৩. কেদার নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৪; Marhamat Ali, Op. Cit.

১২৪. Marhamat Ali, Op. Cit.

১২৫. ঐ

১২৬. F.A. Sachse, Op. Cit., p-88, 89, 242-243; কেদার নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪

১২৭. বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১১

১২৮. খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮২

১২৯. Marhamat Ali, Op. Cit..

১৩০ক. ঐ

১৩০খ. ঐ

১৩১. খোদাদাদ খান গজনবী, সাক্ষাৎকার

১৩২. Marhamat Ali, Op. Cit., পরিশিষ্টে বংশতালিকা দ্রষ্টব্য

১৩৩. বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ-২১১

১৩৪. ঐ, পৃ-২২১

১৩৫. ঐ, পৃ-২২২; F.A. Sachse, Op. Cit., p- 89

১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ-২২২; ঐ, পৃ-৯০

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ-২২৩; ঐ, পৃ-৯০

১৩৮. ঐ, পৃ-৯০

১৩৯. বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ-২১২

১৪০. F.A. Sachse, Op. Cit., p- 89

১৪১. ঐ, পৃ-৮৯

১৪২. ঐ, পৃ-৮৯

১৪৩. আলমগীর, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩০, ৬০; ঢাকা প্রকাশ, ৩০ আগস্ট, ১৮৯৬, পৃ-৫;
১৯০২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর নওয়াব সলিমুল্লাহ তার আতিয়া জমিদারী পরিদর্শন করেন। জামুর্কীতে চিকিৎসা ও মসজিদ নির্মাণে প্রচুর টাকা দান করেন। এবং গাবখানা নদী খননের প্রতিশ্রুতি দেন। কাছারির দরবার হলে গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হন। অভিনন্দন পত্রের জবাবে তিনি এই সব প্রতিশ্রুতি দেন। একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার ঘোষনা দেন। স্থানীয় জমিদারগণ তোরণ নির্মান করে তাকে সম্মানিত করে। ষ্টীমার ঘাট থেকে নেমে হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে কাছারিতে গমনকালে প্রজাবৃন্দ রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানায়। আতিয়া থেকে দেলদুয়ার জমিদারদের ও প্রশাসনের আমন্ত্রনে টাঙ্গাইল শহরে এক সভায় মিলিত হন। আতিয়ার প্রজাদের জন্য ১০,০০০ টাকা দান করেন এবং টাঙ্গাইল কৃষি ও শিল্প জাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর জন্য আরো ৫০০ টাকা দান করেন। শহরের জলাভাব দুরীকরণার্থে, জলাশয় খননে টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালটিকে ২০০০ টাকা দান করেন। এ ভাবে পূর্ববাংলার প্রজা ও জমিদার উভয় পক্ষেরই বরেণ্য নেতা হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। (ঢাকা প্রকাশ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯০২, পৃ-৬, ২১ সেপ্টেম্বর-১৯০২, ২৬ শে জুন, ১৯০৪)।

১৪৪. F.A. Sachse, Op. Cit., p- 90; জেলা গেজেটিয়ার দ্রষ্টব্য।

১৪৫. ঐ, পৃ-৯০; বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২০১

১৪৬. ঐ, পৃ-৯০;

১৪৭. ঐ, পৃ-৯১; বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২০১

১৪৮. ঐ, পৃ-৯১;

১৪৯. ঐ, পৃ-৯২; কেদারনাথ, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৩৭;

১৫০. ঐ, পৃ-৯২; সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮৬,

১৫১. ঐ, পৃ-৯১;

১৫২. ঐ, পৃ-৯১; বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ-

১৫৩. ঐ, পৃ-৯২;

১৫৪. ঐ, পৃ-৯২;

১৫৫. ঐ, পৃ-৯২;

১৫৬. ঐ, পৃ-৯২;

১৫৭. কেদার নাথ, ময়মনসিংহের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ- ১০১

Dhaka University Institutional Repository

১৫৮. ঐ, পৃ-১৪৭; সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

১৫৯. F.C. Herst, *The Revenue Report of Rangpur*, Notes on the Old Revenue Surveys of Bengal, Bihar, Orissa and Assam, Calcutta, 1912, p. 43; আসাদুজ্জামান, কর্মকর্তা, ভূমি ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা, সাক্ষাৎকার; ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটি রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৮৯, দ্রষ্টব্য

১৬০. *Revenue Survey and Settlement Report, Atia Pargana, 1848-1852*, Old District Records of Mymensingh, National Archives, Dhaka, Vol. 19, 37, 45.

১৬১. ঐ

১৬২. *The Revenue Reports of Rangpur*, Op. Cit., p-43; আসাদুজ্জামান, পূর্বোক্ত

১৬৩. *Revenue Survey Reports, Atia pargana*, National Archives, Op. Cit., পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য; বাকের, পৃ- ২১১, ম্যাপ দ্রষ্টব্য

১৬৪. F.A. Sachse, Op. Cit., p-48

১৬৫. Revenue Survey, Op. Cit.; বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১২

১৬৬. ঐ; বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১২

১৬৭. ঐ; Revenue Survey, Village No.- 291, vol. 2, Vand N. 42.

১৬৮. ঐ

১৬৯. ঐ, পৃ-২১১; Revenue Survey; Village No. 372, Vol. 3, V. No. 37

১৭০. এফ. এ. সাকচীর তথ্য থেকে এবং সমকালীন মুদ্রা মানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ; মারহামাত আলী, খোদাদাদ খান গজনবী, বায়েজীদ খান পন্নীর সাথে আলোচনা তথ্য সূত্র।

১৭১. ঐ

১৭২. ঐ

১৭৩. ঐ

১৭৪. ঐ

১৭৫. ঐ

১৭৬. ঐ; মারহামাত আলী, পূর্বোক্ত

১৭৭. ঐ; সৈয়দ মারহামাত আলী ও সৈয়দ মামুন চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত বংশ তালিকা

১৭৮. ঐ

১৭৯. মারহামাত আলী, পূর্বোক্ত

১৮০. W.W. Hunter, *A statistical Accounts of Bengal*, Vol. 5, p. 394, 477.

১৮১. ঐ, পৃ-৩৯৪

১৮২. ঐ, পৃ-৪৭৬

১৮৩. ঐ, পৃ-৪৭৬

১৮৪. ঐ, পৃ-৪১১

১৮৫. ঐ, পৃ-৪১৫

১৮৬. ঐ, পৃ-৪১৭, H. J. Reynold, *Report on the History and Statistics of the District of Mymensing (1863-69)*, p. 10; কেদার নাথ, ময়মনসিংহের বিবরণ পূর্বোক্ত, পৃ-২

১৮৭. ঐ, পৃ-৪৪২

১৮৮. ঐ, পৃ-৪৪২

১৮৯. ঐ, পৃ-৪৪২

১৯০. ঐ, পৃ-৪৪৪

১৯১. ঐ, পৃ-৪৪৭

১৯২. ঐ, পৃ-৪৪৮

১৯৩. ঐ, পৃ-৪৪৮

১৯৪. ঐ, পৃ-৪৪৯

১৯৫. ঐ, পৃ-৪৪৯-৫০

১৯৬. ঐ, পৃ-৪৫০

১৯৭. ঐ, পৃ-৪৫৫

১৯৮. ঐ, পৃ-৪৫৫

১৯৯. ঐ, পৃ-৪৫৭

২০০. ঐ, পৃ-৪৫৯

২০১. ঐ, পৃ-৪৬১

২০২. ঐ, পৃ-৪৬৫

২০৩. ঐ, পৃ-৪৭৬

২০৪ক. ঐ, পৃ-৪৭৬

২০৪খ. ১৮৭২-৭৩ সালের এক পরিসংখ্যানে সমগ্র বাংলার সামন্ত শ্রেণীর একটি চিত্র পাওয়া যায়; বিশ হাজার একরের উর্ধ্বে ভূস্বামীর সংখ্যা ৫০০ জন, ৫০০ হতে ২০০০০ একরের মধ্যে ১৬০০ জন, ৫০ হতে ৫০০ একরের ভূস্বামী ছিল ১,১৫,০০০ জন। আরো জানা যায় জমিদার জোতদার ও তাদের আমলা ফায়লা মিলে ৭ লক্ষ লোকের একটি সামাজিক স্তর তৈরী হয়েছিল। মুসা আনসারী, ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ- ১৬৬; R. Palme Dutt, Problems of Contemporary History, London, 1963 P-128, থেকে উদ্ধৃত। এই হিসাবে দেলদুয়ারের জমিদারগণ প্রথম শ্রেণীর বৃহৎ জমিদার শ্রেণী তথা ৫০০ ক্লাবের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

২০৫. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস ২য় খন্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭৭।

২০৬. ১৭৯৯ সালের কর্ণওয়ালিশ কোর্ড ও চিরস্থায়ী আইন সংশোধন করে পুলিশি ক্ষমতা ব্যতীত জমিদারদের সমস্ত সামন্ত ক্ষমতাই পুণর্বহাল করা হয়। সিরাজুল ইসলাম,ঐ, পৃ-১৬৬

২০৭.সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইতিহাস, ২য় খন্ড, ঐ, পৃ- ২৭৮

২০৮.Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal : A Study. Its Operation 1790-1819*, Dhaka, 1979, p. 22-30

২০৯.সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭১

২১০.ঐ, পৃ- ২৭৭; *Resolution of the Government General in Council*, 29 April, 1859, Bengal Government Proceedings, National Archives, Dhaka.

২১১.ঐ, পৃ- ২৭৭

২১২.চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কর্ণওয়ালিশ বাংলায় ইউরোপের ন্যায় কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বিকাশের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। সিরাজুল ইসলাম,ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, পৃ-৪২-৪৩

২১৩.সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭৭-৭৮

২১৪.ঐ, পৃ- ২৭৮

২১৫.ঐ, পৃ- ২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

২১৬. ঐ, পৃ- ২৭৯

২১৭. ঐ, পৃ- ২৮০; Chittabratapalit, *Tensions in Bengal Rural Socity, 1830-1860*, Calcutta 1975, p-190.

২১৮. ঐ, পৃ- ২৮০

২১৯. পাবনা জেলার ইতিহাস, দ্রষ্টব্য; Syad Marhamat Ali, Op. Cit., p. 5

২২০. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮০.

২২১. ঐ, পৃ- ২৮১

২২২. ঐ

২২৩. Government of East pakistan, *Report of the Land Revenue Commission*, Dhaka 1959; Kamal Siddique, *Land Reforms and Land Management in Bangladesh and West Bengal*; Comparative Study; বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃ- ৬৭০; মোঃ মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১), ১৯৯৯, পৃ- ৮৬-৮৮; বদরুদ্দীন ওমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- পূর্ববাংলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব আইন), পৃ- ১৮৩-১৮৪

২২৪. মারহামাত আলী ও খোন্দকার রহিম প্রদত্ত তথ্য থেকে গবেষক কর্তৃক পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ।

২২৫. ঐ

২২৬. বর্তমানে টাঙ্গাইল সদরে অবস্থিত 'শহীদ স্মৃতি আশ্রম'। দেলদুয়ার জমিদারের বর্তমান প্রধান খোদাদাদ খান গজনবী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দান করেন এবং প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর উদ্যোগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২২৭. *Year book, Knight Bachelor* গ্রন্থদ্বয়ে এ.কে. গজনবীর ঠিকানা দেয়া হয়েছে, রাইটার্স বিল্ডিং ও কলকাতা ক্লাব, কলকাতা। তবে ২৬ নং রোলেন রোডে মাতা করিমুন্নেসা সহ ভাড়া বাড়ীতে অবস্থান করতেন। পরে নিউ পার্ক স্ট্রীটে বাড়ী তৈরী শুরু করেছিলেন। অসম্পূর্ণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে নির্মাণ কাজ আর সম্পন্ন হয়নি। অপর পক্ষে আবদুল হালিম গজনবীর ঠিকানা ছিল ১৮ ক্যানাল স্ট্রীট, এন্টালী, কলকাতা। উক্ত বাড়ীসহ কলকাতার সব সম্পত্তি কলকাতাস্থ সিটি কলেজকে ট্রাস্ট দলিলে দান করে আসেন।

২২৮. খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ-

২২৯. খোদাদাদ খান গজনবী, সাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

২৩০.ঐ, ১৩৩৮ সালে আবদুল করিম গজনবী রেজিষ্ট্রিকৃত ওয়াক্‌ফ দলিল দ্রষ্টব্য।

২৩১.আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের দশ দিশারী, পৃ-১৭১-৭৩

২৩২.মারহামাত আলী ও খোদা দাদ খান গজনবীর সাক্ষাৎকার

২৩৩ক. ঐ, তথ্য অনুযায়ী গবেষকের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ

২৩৩খ. মারহামাত আলী, সাক্ষাৎকার

২৩৪. বায়েজীদ খান পন্নী, সাক্ষাৎকার, উত্তরাস্থ বাসবভনে প্রদত্ত

২৩৫. খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য; বায়েজীদ খান পন্নী, সাক্ষাৎকার

২৩৬. Procedings, *Collections from Secretarial Record, Revenue Catergory*, Vol. 473-666, Vol. 497 (January, 1913), Vol. 491, p. 88-89, 5-7, 13-16; বায়েজীদ খান পন্নী, সাক্ষাৎকার।

২৩৭. ঐ, আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের দশ দিশারী, দ্রষ্টব্য

২৩৮. আলমগীর, পূর্বোক্ত, পৃ- ২০

২৩৯. ঐ, পৃ- ২৫

২৪০. ঐ, পৃ- ১৯

২৪১. পূর্বোক্ত, পৃ- ২৩

২৪২. ঐ, পৃ- ২৫, ঢাকা প্রকাশ, ৯ জানু: ১৮৮১ খৃঃ

২৪৩. ঐ, পৃ- ২৫, ঢাকা প্রকাশ, ১০মে: ১৯০৩ খৃঃ

২৪৪. ঐ, পৃ- ২৬, ঢাকা প্রকাশ, ৯ জানু: ১৮৮১ খৃঃ

২৪৫. ঐ, পৃ- ২৬

২৪৬. ঐ, পৃ- ২৭

২৪৭. ঐ, পৃ- ৩০, ৬০

২৪৮. ঐ, পৃ- ২৮

২৪৯. ঐ, পৃ- ১৫১; ঢাকা প্রকাশ, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০২। কোন এক সময় নওয়াব সলিমুল্লাহ পিতার সাথে মনোমালিন্য হলে বাড়ী ছেড়ে দেলদুয়ারে এসে অবস্থান করেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরীতে যোগদান করেন।

২৫০. F.A. Sachse, Op. Cit.; বাকের, পুর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

২৫১. বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ২১১-১২

২৫২. ঐ , পৃ-২১২

Dhaka University Institutional Repository

২৫৩. ফিফথ রিপোর্ট, ও ডিস্ট্রিক সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট থেকে বিশ্লেষন; Marhamat Ali , Op. Cit., p- 5

২৫৪. ঐ, পৃঃ ৪৪

২৫৫. মারহামাত আলীর সাক্ষাৎকার; বাকের, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

২৫৬. বাকের, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

২৫৭. Marhamat Ali, Op. Cit., p. 6.

২৫৮. ঐ; মাবহামাত আলীর সাক্ষাৎকার

২৫৯. ঐ; বাকের, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

২৬০. দুলাই জমিদারীর পারিবারিক ওয়াক্‌ফ নামা, ১৯৪৫, রওশানজান চৌধুরী ও নাজলী চৌধুরী সৌজন্য প্রাপ্ত, পৃ-৪

২৬১. ঐ

২৬২. বিনায়ক সেন, বাংলার শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশ, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৪৭

২৬৩. ঐ; পৃ- ৪৪৬

২৬৪. ঐ

২৬৫. ঐ

২৬৬. ঐ

২৬৭. ঐ

২৬৮. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৭, ২৭১ (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষি নীতি)

২৬৯. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম, ২য়, ৩য় খন্ড দ্রষ্টব্য।

২৭০. সিরাজুল ইসলাম, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭২

২৭১. ঐ, পৃ- ২৭৫

২৭২. ঐ, পৃ- ২৭৬

২৭৩. ঐ

২৭৪. ঐ

২৭৫. বিনায়ক সেন, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৪৭-৪৮

২৭৬. সুশীল চৌধুরী, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫৫-৬১

২৭৭. বিনায়ক সেন, পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৩৪; Kling, Economic Foundations, p. 29

২৭৮. ঐ, পৃ-৪৩৭

২৭৯. ঐ, পৃ-৪৪০

২৮০. ঐ, পৃ-৪৪১

২৮১. ঐ, পৃ-৪৪৫

২৮২. ঐ, পৃ-৪৪৭

২৮৩. F.A. Sachse, Op. Cit., p-41

২৮৪. ঐ, পৃ-৪৫

২৮৫. ঐ, পৃ-৪৬

২৮৬. ঐ, পৃ-৪৬

২৮৭. ঐ, Appendix-IX

২৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ-৯১

২৮৯. ঐ, পৃ-১১, Census Report, 1011

২৯০. ঐ, পৃ-১০

২৯১. ঐ, পৃ-১৫

২৯২. ঐ, পৃ-২১

২৯৩. ঐ, পৃ-৩৫

২৯৪. ঐ, পৃ-৩৫

২৯৫ক. ঐ, পৃ-৪১

২৯৫খ. ঐ, পৃ-৪৩, পাবনা দুলাইর জমিদারদের পারিবারিক কাগজপত্রে দেখা যায়, দেলদুয়ারের আবদুল করিম গজনবী কর্তৃক আতিয়া পরগনা ও ময়মনসিংহ জেলাস্থ জমিদারী ভূমি চুক্তিপত্র (জুলাই জমিদার বংশের সদস্য নাজলী চৌধুরী সৌজন্যে প্রাপ্ত), পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২৯৬. ঐ, পৃ-৪৪

২৯৭. ঐ, পৃ-৪৬

২৯৮. ঐ, পৃ-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

২৯৯. এফ.এ. সাকচী কর্তৃক ১৪ জানুয়ারী, ১৯২০ সালে বাংলা সরকারের রাজস্ব বিভাগের সচিব বরাবরে পাঠানো সার সংক্ষেপ চিঠিতে প্রদত্ত বক্তব্য।

৩০০. ঐ

৩০১. সিরাজুল ইসলাম,বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ-২৮৬

৩০২. বায়েজীদ খান পন্নী, সাক্ষাৎকার; *Land Revenue proceedings, National Archives* vol. 496 December 1912, P-41, vol- 497, p-3-18, vol-498,553,491 (Ward Estate of Karatia); জেলা গেজেটিয়ার দ্রষ্টব্য।

৩০৩. সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮৩-৮৪

৩০৪. ঐ, পৃ- ২৮৫

৩০৫. রতন লাল চক্রবর্তী, গ্রামীন্ ঋনিতা, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫১৭

৩০৬. সিরাজুল ইসলাম, পৃ- ২৯৬

৩০৭. রতন লাল, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫২০, সারণী দ্রষ্টব্য; *Report of the Land Revenue Commission 1940*, Bengal, (Alipore; Bengal Government press), Vol. II, p- 120-21.

৩০৮. ঐ, পৃ-৫২১-২২

৩০৯. ঐ, পৃ- ৮২৯; সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ-২৮৬

৩১০. কামাল সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৬৬

৩১১. ঐ, পৃ- ৬৬৮; Government of East Pakistan, *Report of the Land Revenue Commission 1959*, Dhaka, দ্রষ্টব্য।১৯৫০ সালের এক হিসাবে জানা যায় যে, এসময় বাংলার ২,২৩৭ জন বৃহৎ ভূস্বামী ছিলেন। এর মধ্যে মুসলমান ভূস্বামী বা জমিদারের সংখ্যা ছিল ৩৫৮ এবং তাদের অধিকাংশই ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার বাসিন্দা ছিল। ঐ সময়ের ভূমি রাজস্ব বিভাগের হিসাব মতে ৮৯টি এস্টেটের রাজস্ব ছিল ১ লক্ষ টাকার উপরে এবং ১৩৭ টি এস্টেটের রাজস্ব ছিল বার্ষিক ৫০,০০০/- টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকার মধ্যে। সারাদেশে এই সংখ্যা হিসেবে শুধু ময়মনসিংহেই ক্ষুদেজমিদার তালুকদারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯,০০০ হাজার। শুধু আতিয়া পরগনায় ১৯১১ সালের হিসাবে ১৪২২ জন জমিদার ও তালুকদার ছিলেন এবং ৫০টির মত প্রধান তৌজিতে আতিয়া জমিদারীর লক্ষ ছিল। এই প্রত্যেক তৌজির অধিকারী জমিদার পরিবার সহ সকল জমিদার পরিবারের উপর গবেষণা করা হলে বাংলার আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও আঞ্চলিক লোকায়ত ইতিহাসের অনেক নতুন তথ্য ও উপাদান বেরিয়ে আসতে পারে। ১৯২১ সালের হিসাবে জমিদারদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ (চার) লক্ষ, ১৯৩১ সালে এসে দাঁড়ায় ৬ (ছয়) লক্ষের উপরে। ১৯২১ সালের অপর হিসাবে মধ্যস্বত্বভোগী সকল খাজনা প্রাপকের সংখ্যা ১৩ (তের) লক্ষের কিছু বেশী ছিল। এভাবে দেখা যায় ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২৩ ভাগ এবং ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৯ ভাগ। এভাবে এসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে : জমিদারী উচ্ছেদ পূর্ব পর্যন্ত। ১৯৪৬ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সে সময়ে হিন্দু মুসলিম মিলিতভাবে জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮ ভাগ। জমিদারী উচ্ছেদকালে দেখা যায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জমিদার, তালুকদার, জোতদার এবং মধ্যস্বত্বভোগী ও কৃষক মিলে ভূমি ও কৃষি খাজনা প্রদানকারী মোট সংখ্যা প্রায় ৫১ লক্ষ ছিল (তথ্য উৎস, রঙ্গলাল সেন, পূর্বোক্ত; মুনতাসির মামুন, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য)।

৩১২. ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ার, টাঙ্গাইল জেলা গেজেটিয়ার, নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, ১৯৯২, বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ৪৮৩৫ ও ৪৮৫২

৩১৩ক. দেলদুয়ার, করটিয়ার জমিদারগণ সহ ওয়াক্ফ ও দেবোত্তর সম্পত্তির জমিদারগণ সম্মিলিত ও ব্যক্তিগতভাবে রিট মামলা করেন। অনেক জমিদারের আবার ওয়ারিশদের মধ্যেকার বিবাদ সম্ভুত স্বত্ব মামলা বিরাজমান ছিল।

৩১৩খ. মারহামাত আলী, খোদাদাদ খান গজনবী, সাক্ষাৎকার

৩১৪. ঐ

৩১৫. জেলা গেজেটিয়ার, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

৩১৬. '*East Bengal State Aquisition and Tenancy Act.1950*, Government of East Pakistan; *Report of the Land Revenue Commissin 1959*, Dhaka, Govt. of East Pakistan 1959; ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ণ কমিটি রিপোর্ট, ১৯৮৯

৩১৭. মারহামাত আলী, খোদাদাদ খান গজনবী, বায়েজীদ খান পন্নী, সাক্ষাৎকার

৩১৮. মারহামাত আলী, সাক্ষাৎকার ;পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩১৯. মারহামাত আলী, খোদাদাদ খান গজনবী সাক্ষাৎকার; বাকের, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

৩২০. খোদাদাদ খান গজনবী, সাক্ষাৎকার

৩২১. বায়েজীদ খান পন্নী, সাক্ষাৎকার

৩২২. ঐ

৩২৩. ঐ

৩২৪. ঐ

৩২৫. রতন লাল চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫২০-৫২৯; সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৭৯, ২৮৬; উল্লেখ্য ১৮৫৯ সালের খাজনা আইনের মাধ্যমে কথিত রায়তি স্বত্বের বিকাশ ও ১৯৫০ সালে জমিদারী উচ্ছেদের মাধ্যমে শুধুমাত্র জোতদার শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা বিকশিত হয়। Ratan Lal Chakrabarty, *Rural Indebtedness in Bengal 1935-1947*, Dhaka University, 1988, p. 73.

৩২৬. ঐ, পৃ- ৫২৮, ২৮৬.

৩২৭. বদরুদ্দীন ওমর, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮২, ১৮৫; এস.এম. আকাশ, বাংলাদেশের ইতিহাস ২য় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ- ১১৭

৩২৮. অধিকাংশের ছিল 'ওয়াক্ফ আল আওলাদ' এবং কিছু অংশ ছিল 'ওয়াক্ফ লিল্লাহ'।

৩২৯. মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৬; বদরুদ্দীন ওমর, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮৩

৩৩০. বদরুদ্দীন ওমর, পূর্বোক্ত, পৃ- ১২৭-১৮৩

৩৩১. রতন লাল চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫২৯; সিরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮১

৩৩২. বদরুদ্দীন ওমর, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৩

৩৩৩. ঐ, পৃ- ১৮৩

৩৩৪. ঐ, পৃ- ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারার প্রেক্ষিতে দেলদুয়ার ও সংশ্লিষ্ট জমিদারদের ভূমিকা এবং দক্ষিণ টাঙ্গাইলের জনজীবন ধারা।

৪.১ ভূমিকাঃ টাঙ্গাইল জেলায় বসবাসকারী জনমানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি দেশের অন্যান্য জেলা থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। আবার টাঙ্গাইলে বসবাসকারী সকল সমাজের মধ্যে কোন একক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। এর কারণ সাংস্কৃতিক একতা গড়ে উঠতে একটি এলাকায় আগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান যতটা প্রাচীনত্বের দাবী রাখে, টাঙ্গাইলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান ততটা প্রাচীন [১] নয়। তাই টাঙ্গাইলে সমাজ ও সংস্কৃতির বহুবিভাজন,তবে এর মধ্যে প্রাচীন পুরা ভূমি দ্বারা গঠিত মধুপুর বেল্ট ও উত্তর টাঙ্গাইলের সাথে নব্য ও পলি গঠিত ভূমি দ্বারা গঠিত ভর অঞ্চল খ্যাত দক্ষিণ টাঙ্গাইলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধানই মৌলিক [২]।

একটি অঞ্চলের সামাজিক চেতনা ও আচার আনুষ্ঠানিক একতা উদ্ভুত হয় অতীত থেকে বর্তমান অবধি শাসকবর্গ, অভিজাতবর্গ, তাদের ধর্ম, শিক্ষা, স্থাপত্য ইত্যাদি ব্যক্তি ও অবস্থার প্রভাবে। অপর দিকে একটি অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক একতা উদ্ভুত হয় সে অঞ্চলের মানুষগুলোর জীবন চক্রে লালিত আচার, শখ, অভ্যাস,পছন্দ,ব্যবহৃত ভাষা, বোধ, সৃষ্টিশীলতা তথা নান্দনিক আয়োজন বা উপস্থাপন বিনির্মিত হয় অত্র এলাকার আবহাওয়া, জলবায়ু,উষ্ণতা, পরিবেশ, নদনদী এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাবে। অনেকে স্বীকার না করলেও বাস্তবে কিছুটা ধর্মীয় প্রভাবে। আবার সমাজ চেতনা ও সংস্কৃতি আমদানি হয়, অনুকরণ হয়, উদ্ভাবিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তি চরিত্রের মন-মানসিকতা পরিবর্তন হয় সাধারণত অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবেশগত এবং আবহাওয়াগত পরিবর্তন থেকে [৩]। এইসব প্রেক্ষাপটে দেলদুয়ার ও দক্ষিণ টাঙ্গাইলের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন ও বিকাশ ধারা বিশ্লেষণ করা হলো।

বাংলাদেশের যে কয়টি জেলা বৃহৎ জমিদারীর জন্য বিখ্যাত তন্মধ্যে টাঙ্গাইল ও বৃহত্তম ময়মনসিংহ প্রধান বলা যেতে পারে। আবার বৃহৎ মুসলিম জমিদারী হিসাবে টাঙ্গাইল প্রধান। একটি বৃহত্তম একক পরগনা মুঘল আমল থেকে শুরু করে নবাবি ও ইংরেজ আমলের সকল ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করে ১৯৫০ পর্যন্ত একই মুসলমান বংশ ধারায় সগৌরবে টিকে থাকা ! এটি সম্ভবত একমাত্র আতিয়া পরগনার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। কালের প্রবাহে যদিও তা বংশধরদের মধ্যে একাধিক জমিদারী ও

Dhaka University Institutional Repository

অসংখ্য ওয়ারিশ সৃষ্টি করেছে। এটি একমাত্র পরগনা যার অধিকাংশ বেহাত হওয়া অংশ অপর একজন মুসলমান নয়া জমিদার ক্রয় করেছে। একটি ক্ষুদ্র অংশই কেবল বণিকজাত নয়া হিন্দু জমিদারের হাতে পড়েছে। সকল দিক থেকেই উক্ত পরগনা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। উক্ত পরগনাই আজকের টাঙ্গাইল জেলার ১২টি থানার মধ্যকার দক্ষিণাঞ্চলের ৬ থেকে ৭টি থানা ব্যাপী বিস্তৃত। সমগ্র মুঘল ,নবাবি ও ইংরেজ আমলে এতদাঞ্চলে যে সমাজ সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে তাতে অন্যান্য সকল উপাদানের পাশাপাশি দেলদুয়ার ও দক্ষিণ টাঙ্গাইলের এই সব মুসলমান জমিদারদের বহুমুখী কার্যক্রম নিঃসন্দেহে রেখাপাত করেছে এতদাঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতিতে। বিশেষ করে জমিদার-জমিদারে সংঘাত,আন্তঃ জমিদারী সংঘাত, দুটি ধর্মগোষ্ঠীর অসম বিকাশ ও স্বার্থ সংঘাত,আচার অনুষ্ঠানের গ্রহণ-বর্জন, জমিদার-প্রজা সংঘাত,সম্মিলনের মধ্যে দিয়েই বিকশিত ও রূপায়িত হয়েছে আজকের দেলদুয়ার- টাঙ্গাইলের সমাজ ও সংস্কৃতি।

৪.২ দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারদের এবং দক্ষিণ টাঙ্গাইলের জনসমাজে নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ঃ

দেলদুয়ার ও দক্ষিণ টাঙ্গাইল অঞ্চলে কখন জনপদ গড়ে উঠেছে ? কোন জনগোষ্ঠীর প্রথম আগমন ঘটেছে ? খেচর ভূমি হিসেবে এই আরণ্য জনপদে, তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা কঠিন। প্রকৃতিগত ভাবে বা ব্যক্তি উদ্যোগে প্রাপ্ত সামান্য নিদর্শন বিশ্লেষণে ধরে নেয়া হয় যে, নব্য প্রস্তর যুগে টাঙ্গাইলের উঁচু ভূমিগুলিতে জনপদ গড়ে উঠেছে এবং টাঙ্গাইলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস শুরু হয়েছে সেখান থেকেই। কিন্তু এরা কারা? কোন অঞ্চল থেকে তাদের আগমন ঘটেছিল ? এ প্রশ্নের উত্তরে নৃতাত্ত্বিকরা বলছেন দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক কিংবা তুরানী বংশোদ্ভুত গারো,মান্দাই, রাজবংশী এবং ভূতনাগরী ভাষী পাহাড়ী জাতি তিব্বত, আসাম হয়ে কালক্রমে মধুপুর অঞ্চলে পৌঁছে সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর থেকে আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের পূর্বে। খৃষ্টপূর্ব তিনশত অব্দের পূর্বে, এরাই বর্তমানে টাঙ্গাইলের আদিবাসি হিসেবে চিহ্নিত। এ পথ দিয়ে এর পরেই আসে কোচ ও কাছার জাতি।

সমসাময়িককালে উত্তরা পথের গঙ্গাঋদ্ধি এলাকার যে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী অজয় নদীর তীরে পুন্ড্রে সমৃদ্ধ নগর সভ্যতা গড়ে তোলে তারাই বনজ সম্পদ,মৎস্য, প্রাকৃত ফসল ও খেচরের সন্ধানে এই অঞ্চলে আগমন করে টাঙ্গাইলের পাহাড়ি ঢালের সন্নিকটস্থ নদী অববাহিকায় বর্তমান উত্তর টাঙ্গাইলে সর্বপ্রথম পেশাভিত্তিক জনপদ গড়ে তোলে[৫]।এখান থেকেই তারা ভর অঞ্চলে প্রাপ্ত সামান্য অংশে কৃষি পালন করে, আবার বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢালে চলে যেত। পাহাড়ি ঢালের এই জনপদের কৃষিকর্মীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলে সে সাথে ভর অঞ্চলে পলি ভরাট হলে দক্ষিণে চর জেগে নদী ক্রমাগত সরতে থাকে। আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই সব ভূমিতে আস্তে আস্তে স্থায়ী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজনপদ গড়ে উঠতে থাকে। পর্যায়ক্রমিক ভৌগোলিক পরিবর্তন এবং স্থায়ী সমতট প্রসারতার সাথে সাথে সমতটের জনপদ প্রসারতা যেমন ঘটেছে তেমনি কর্ষণযোগ্য উর্বর মাটির লোভে পর্যায়ক্রমিক নবাগতদের ভিড়ও বেড়েছে। এই সমতটের ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী সমৃদ্ধ উর্বরা ভূমির ভিন্ন ভিন্ন ফসল প্রাপ্তি,এলাকা ভিত্তিক জনপদগুলোয় ভিন্ন ভিন্ন রীতি রেওয়াজ প্রতিষ্ঠা পায়[৬]। এই প্রক্রিয়াতেই টাঙ্গাইলের ভর আঞ্চলিক সমাজ ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গতার পথ পেয়েছিল একদিন। এদেরই বংশ পরম্পরা ভূমিজ সন্তানরা, যারা এই টাঙ্গাইলের মাটি প্রকৃতি নদ-নদী, আবহাওয়া ও পরিপার্শ্ব থেকে প্রাণ সংগ্রহ করে একান্তই টাঙ্গাইলের তথা বাঙ্গালীর দেশজ ও লোকজ সংস্কৃতি গড়ে তোলে। নবাগতরা এসে এর উপর নিত্য নতুন আচার আচরণ, শখ, পছন্দ ও পারদর্শীতা যুক্ত করতে থাকে। ফলে পুরাতন-নতুন ভিন্নতা, প্রাপ্তি ও পারদর্শিতা যুক্ত হয়ে তাদের অবসরকালীন সময়ে নিজের প্রয়োজন অথবা নিতান্ত খেয়ালের বসে একদা তৈরী করে কোন বয়ণ শিল্প অথবা ভোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

কোন কারুপণ্য কিংবা হৃদয়গ্রাহী অন্য কোন পণ্য। তাদের এই সৃষ্টি দিয়েই টাঙ্গাইলের জনমানুষের নিপুণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ ঘটেছিল[৭]।

কালে কালে এই নিপুণ সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়েছিল নিত্য নতুন পণ্যে যা একদিন আকৃষ্ট করে দেশের তথা বহিঃবির্শ্বের বাজারকে। এই বাজার প্রাপ্তি থেকেই উৎপাদন চাহিদা পূরণে নিত্য নতুন সমষ্টি যুক্ত হয়েছিল বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে। এই উৎপাদন পেশায় নিয়োজিত সমষ্টিই কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবী বা পেশাভিত্তিক গোত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। পারদর্শীতার মূল্যায়ণ, উৎপন্ন পণ্যের লভ্যাংশ এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর প্রেক্ষিতে গোত্রে গোত্রে, জনপদে জনপদে এক বিশাল মানসিক পার্থক্য সৃষ্টি করে বসে। মৌলিক সংস্কৃতি বা সংস্কৃতির মূল স্রোতধারা থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন না হয়েও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্ভর আচার আনুষ্ঠানিক ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতি গড়ে তোলে [৮]।

হাজার বৎসরের এই অর্থনৈতিক গ্রহণ-বর্জনের পাশাপাশি প্রকৃতির ঘটনা অঘটন থেকে সৃষ্ট বিশ্বাস,ধর্মবোধ এবং উত্তরা থেকে ধর্মজাত পেশাজীবী বর্ণগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। আগত গোষ্ঠী তুলনামূলক উন্নত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাস দিয়ে স্থানীয়দের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কৌম সমাজের অবসান ঘটিয়ে এসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা পায়। রাজ্যের নেতৃত্বদানকারী শাসক ও অভিজাতদের সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের উপর। আবার স্থানীয়দের প্রভাব পড়েছে আগত এবং অচিরেই নেতৃত্বদানকারী অবঙ্গীয় ও অস্থানীয় শাসক শ্রেণীর উপর। এই প্রক্রিয়ায় এতদাঞ্চলে একে একে পাল, সেন, তুর্কী, আফগান, ইরান,আরব ও ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে, এক সময় শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে। এদের আগমন আর স্থানীয়দের গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিনিয়ত রূপান্তর ঘটে। এরই একটি পর্যায়ে উত্তর টাঙ্গাইল থেকে দক্ষিণ টাঙ্গাইল তথা আতিয়া-দেলদুয়ারের সমাজ ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে।

এতদাঞ্চলে দ্বাদশ শতাব্দীর আগের কোন চিহ্ন বা প্রমাণ খুজে পাওয়া যায়নি। নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর পোড়া মাটির তৈজসপত্র ও বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন যেমন সাগর রাজা, বৈণ্যরাজাও ভাগবতদত্তের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেলেও নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস পাওয়া যায় সেন শাসনামল থেকে। উত্তর ভারতীয় সেনদের বর্ণবাদী, ব্রাহ্মন্যবাদী সংস্কৃতির পর আসে তুর্কী, আফগান, ইরানী, আরবী তথা মধ্যপ্রাচ্যের ও মধ্যএশিয়ার মুসলিম সংস্কৃতি। চর্তুদশ শতক থেকে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার

করতে তারা সমর্থ হলেও স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় মুঘল আমল থেকে। মুঘল, নবাবি ও ইংরেজ আমলে দক্ষিণ টাঙ্গাইলে স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতি গতি লাভ করে। আর এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একদিকে শাসক ও অভিজাত জমিদার শ্রেণী অপর দিকে অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিকজাত স্থানীয় কৃষক ও পেশাজীবী শ্রেণী।

দেলদুয়ার আতিয়ার সমাজ কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করে ধর্ম। প্রাচীনকালে বিশেষতঃ পাল আমলের প্রচুর বৌদ্ধ স্মৃতি ধরা পড়ে আতিয়া, হিঙ্গানগর ও এলাসিন-মাইঠানের কীর্তিকলাপে [৯]। বগুড়ার মহাস্থানের পুন্ড্রবর্ধন ও রাজাসন বজ্রযোগিনীর ধামরাই অশোক প্রবর্তিত ধর্মরাজিকার মতো দুই বৌদ্ধ প্রাধান্যস্থলের মধ্যখানে অবস্থিত বিধায় এতদাঞ্চলে স্বভাবতই বৌদ্ধ প্রভাব পড়ার কথা। কারো মতে, 'মধুপুর থানার রাঙামাটিয়া নামকস্থান ময়নামতির বৌদ্ধ চন্দ্র রাজাদের মাতৃভূমি ছিল [১০]। পরবর্তী সেনদের নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত বৌদ্ধ সাধকেরা যে সব জলাঘেরা দুর্গম স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল,সে সব এখনো যোগীরখোপা নামে টাঙ্গাইল জেলার নানা স্থানে পরিচিত। অনেক যোগী প্রাণ ভয়ে হিন্দু তাতীর বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের বংশধররা পরবর্তীতে হিন্দু বনে গিয়েছে এবং অদ্যবধি তাঁত বোনে। বৌদ্ধদের উপর এতদাঞ্চলের ব্রাহ্মনরা এমন অত্যাচার চালায় যে সেন শাসকরা তারই পুরস্কার স্বরূপ এতদাঞ্চলে প্রচুর ব্রাহ্মনকে ব্রম্মোত্তর দান করেছিল'[১১ক] ।ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক রেকর্ডরুম থেকে উদ্ধারকৃত এবং ন্যাশনাল আর্কাইভসে অসংগঠিত অবস্থায় রক্ষিত নথিপত্রে প্রচুর ব্রাহ্মোত্তর সনদ (দলিল) পাওয়া যায়, যার অনেকগুলো পরবর্তী কালের হলেও অনেকগুলোই সেন আমলের ধারাবাহিকতা বলে অনুমান করা হয় [১১খ]।

তাই এতদাঞ্চলে সেনদের ও সামন্তরাজাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে বৌদ্ধরা খুশী ও সমর্থন জানিয়েছিল। আবার অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়েও ব্রাহ্মনরা গৌড়েশ্বর গড়, গৌড়েশ্বর বিল ইত্যাদি খনন ও প্রতিষ্ঠা করে এতদাঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখে। ফলে বঙ্গ বিজয়ের অনেক পরে চর্তুদশ শতকে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের অধীনে এতদাঞ্চলে মুসলিম রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সাথে সে সময় এসেছিল শাহজালাল সৈয়দ শাহ নাসিরুদ্দীন সিপাহশালার, দরবেশ হামীদকলন্দর, জইনশাহ প্রমুখ অলী ও দরবেশ। এ সময় ব্রাহ্মন্য অত্যাচারে জর্জরিত অন্যান্য বর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা এবং শোষিত কৃষক শ্রেণী দরবেশদের সাধারণ জীবন দর্শনে ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে মোহিত হয়ে নয়া ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে এবং দীর্ঘকাল এ ধারা অব্যাহত থাকে। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে ও তারপরে গৌড়ে রাষ্ট্র বিপ্লবের ঝঞ্ঝা উপস্থিত হলে

Dhaka University Institutional Repository

ফাতমী, আলভী সৈয়দ ও অন্যান্য অলী দরবেশ পন্ডিত ও ভাগ্যান্বেষীদের এতদাঞ্চলের চরাভূমিতে ব্যাপক হারে আবির্ভাব ঘটে। আতিয়ার শাহানশাহ বাবা নামে খ্যাত সৈয়দ আদম শাহ কাশ্মীরি এই সময় গৌড় থেকে আতিয়ায় এসে খানকাহ স্থাপন করেন। এতদাঞ্চলের শাসন ভার পরিচালনা করে এখানেই সমাধিস্থ হন[১১]। তার মাযার বা সমাধি ও নির্মিত মসজিদকে কেন্দ্র করেই এখানে প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নগরের পত্তন ঘটে। জনবসতি বাড়ে, অনাবাদি জমি আবাদ হতে থাকে। তাদের নৈতিক প্রচার তৎপরতা এতদাঞ্চলের লোকের নৈতিক ও মানসিক বল দৃঢ় করেছিল।

গৌড়ের পরাজিত সুলতান ও ওমরাহগণ আফগান নায়ক, মোগল সৈনিকরা বিভিন্ন সময়ে এতদাঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে ও পরে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করে। হুসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ শেরশাহ সুরীর হাতে পরাজিত হয়ে আতিয়ার শাহ বাবার মাযারে আশ্রয় নেন এবং এখানেই সমাহিত হন[১২]। কররানী সুলতানদের আমলে কোচ ও কামরূপ কাছাড় অভিযানে এসে অনেক আফগান এতদাঞ্চলে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। আকবরের ইলাহী ধর্মের বিরুদ্ধে মির্জা মাসুম কাবুলীর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী মুঘল সেনারা এক সময় এখানে আশ্রয় নেয়। সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত শের শাহ নির্মিত গ্রান্ড ট্রাংক রোড এতদাঞ্চলের মধ্যে দিয়েই সংযুক্ত হয়েছে। ফলে এপথ বেয়ে মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে অপ্রতিহত গতিতে এতদাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর আগমন ঘটে[১৬]।

কররানীদের পতন কালে বিহার উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলা থেকে আফগানরা পলায়ন করে দলে দলে এতদাঞ্চলে আগমন করে এবং স্বাধীন বারোভূঁঞাদের অধীনে মুঘল প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করে। অনেকে স্বাধীন জমিদার হিসেবে আর্বিভূতহয়। সিলেট দৌলম্বাপুরের নৌকিজহিলের শেষ যুদ্ধে সর্বশেষ স্বাধীন আফগান নায়ক ওসমান খান লোহানী নিহত হয়, অনেকেই আহত হয়। আহত ও পলাতকেরা এতদাঞ্চলে চারান, পাঠানদহ, বাসাইল, কাঞ্চনপুর, চিনামুড়া, পাইকরা, নুকপাড়া প্রভৃতিস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে[১৭]। অদ্যাবধি এইসব পাঠান পরিবারের বংশধররা এতদাঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে।

দেলদুয়ারের গজনবীগণ পাঠান বীর ওসমান খান লোহানীর প্রধান বংশধর, করটিয়ার পন্নীগণ পাঠান সুলতান বায়েজিদ খান কররানীর বংশধর হিসেবে ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এইসব জমিদারদের ছবি শারীরিক গঠন ও তাদের জীবন ধারা সম্পর্কিত তথ্যে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ থেকে তাদের পাঠান বংশজাত বলে সহজেই প্রমাণ করা যায়। ১৮৭২,৮১,৯১ ও পরবর্তী আদমশুমারি সমূহ এবং ১৯০৮ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে প্রণীত সার্ভে ও সেটেলমেন্ট রিপোর্টে এতদাঞ্চলে সৈয়দ, শেখ, খান লোহানী, গজনবী, মির্জা ইত্যাদি উপাধিধারী আরব-ইরানী-তুর্কী-আফগান-পাঠান বংশীয় জনসংখ্যার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়[১১]।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজান ও আওরঙ্গজেবের সময়ে বিভিন্ন ওলী,দরবেশ,পন্ডিত ও সৈনিকগণ এতদাঞ্চলে লাখেরাজ সম্পত্তি পেয়েছিলেন এবং স্থায়ী ভাবে বসতিস্থাপন করেন[১১]। এতদাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী গোষ্ঠী মৎস্যজীবী মাহিফোরাস বা মোপলা সম্প্রদায়। মোফাখখারুল ইসলামের মতে, সুবাদার শায়েস্তা খা দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি হতে বদলী হয়ে বাংলায় আসেন। দাক্ষিণাত্যে নৌযুদ্ধে দক্ষ ও কৌশলী পর্তুগীজদের দমনে পর্তুগীজ নৌ কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ মালাবারের মোপলা যোদ্ধাদের সহায়তায় পর্তুগীজদের দমন করেন। বাংলায় পর্তুগীজ জলদস্যু দমনে দাক্ষিণাত্য হতে বহুসংখ্যক মালাবারী মোপলা যোদ্ধা আনয়ন করে বাংলার নওয়াব নওয়ারা বা নৌবাহিনী নতুনভাবে গঠন করেন; ইহাদের মুল্লাহ বা নেতাকে টাঙ্গাল বলা হতো[১৭]।

পর্তুগীজদের দমন শেষে এরা যমুনা মেঘনা বিধৌত এতদাঞ্চলে নওয়ারা রেখে তীরবর্তী স্থানে অবস্থান করে। টাঙ্গাইল এলাকার লৌহজং নদীর পশ্চিম পাড়ে জলাভূমিতে বেশ কিছু চর পড়েছিল। মুঘল নওয়ারার মোপলা সৈনিকরা এখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজন না থাকায় সাগরে ও নদীতে মাছ শিকার করে এরা সময় কাটাত। মালাবারে থাকতেও তারা অবসর সময়ে সাগরে মাছ শিকার ও মাছ ব্যবসা করেছে। পরবর্তীকালে মুঘল নওয়ারাচ্যুত হলেও এই মোপলা সিপাহীরা মৎস্য শিকারি হিসেবে স্থায়ীভাবে আতিয়া ও কাগমারীর জমিদারদের অধীনে থেকে যায়। এরা এখানে পরে নিকারি নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে এরা নিজেরা মাছ না ধরে পাইকারী কিনে পার্শ্ববর্তী বাজারে বিক্রি করতো। আতিয়া-কাগমারী পরগনার জমিদাররা টাঙ্গাইল শহর ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বাজারে মাছ বেচার একচেটিয়া অধিকার এদের দিয়েছিলেন।

মোপলারা যখন নওয়ারা বাহিনীতে নিযুক্ত ছিল তখন থেকেই মুঘল আমলের জাতীয় অনুষ্ঠান হিসেবে মুহররমের শোকানুষ্ঠান উদযাপিত হতো। এরা সেই মুহররমে নিজ নিজ যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করে ইয়াজিদ বংশীয় লোকদের প্রতি কাল্পনিক আক্রোশ প্রকাশ করতো। টাঙ্গাহল শহর ও এতদাঞ্চলে এই

Dhaka University Institutional Repository

দুধর্ষ ও সাহসী নিকারিরাই মুহররম পর্বকে উজ্জীবত করতো। তাদের মুহররম পর্ব দেখেই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মরহুম মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' মুহররম পর্ব লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। আদি টাঙ্গাইল সন্নিহিত গজনবী কাছারি 'শান্তিকুঞ্জ' মীর সাহেবেরই পরিকল্পনায় নির্মিত ও নাম প্রাপ্ত। এখানে কাছারি সম্মুখস্থ এবং দেলদুয়ারের মুল জমিদার বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাচীন কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে পড়ন্ত বিকেলে তিনি 'বিষাদ সিন্ধু'র অনেক অধ্যায় রচনা করেন। এই মোপলা মুল্লাহরাই টাঙ্গাইল প্রভাবিত স্থানের নাম দিহ টাঙ্গাল বা বাসস্থান নাম রাখে। এটিই শেষে আদি 'টাঙ্গাইল' হয়ে পড়েছে"।

কমলা কান্ত গুপ্ত মহাশয়ের মতে, "আর দ্বাদশ শতকে রাজা ভগদত্ত মদ খেয়ে আমোদ ফুর্তি করার জন্য উঁচু ভূমিতে যে পুরির প্রতিষ্ঠা করেন। তা থেকেই পাহাড়ি উঁচু অরণ্য ভূমি মধুপুর নামে খ্যাত হয়। গজনবী জমিদারদের লোহানী সাগরদিঘীর ক্রোশ খানেক পূর্বে মধুপুর অরন্যে গুপ্ত বৃন্দাবন নামে বৈষ্ণব হিন্দুদের তীর্থ প্রতিষ্ঠা হয়। সম্ভবত হোসেন শাহী আমলে মাধব নামের জনৈক বৈষ্ণব গোস্বামী এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন। কারো মতে, মধুপুরের বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন সঙ্করদেব, পরে সেখানে মাধব কর্তৃক গুপ্তবৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা হয়। এই গুপ্তবৃন্দাবন এবং পাশ্ববর্তী বারতীর্থ কে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজের গতিপ্রবাহ টাঙ্গাইল ময়মনসিংহে দীর্ঘকাল বিস্তৃত হয়। শুধু ময়মনসিংহই নয়, সমস্ত পূর্ব বাংলার হিন্দু সমাজের এটিই ছিল প্রধান তীর্থ কেন্দ্র"।

নবাব মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব সংস্কারনীতির আওতায় অনেক জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে নয়া জমিদার বসিয়ে আবাদ করার নীতি গৃহীত হয়। আতিয়া ব্যতীত বাংলার ও এতদাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী বহু জমিদারী নয়া হিন্দু জমিদার লাভ করেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার সুবাদে এতদাঞ্চলের বহু ফকির ও সন্ন্যাসী আলীবর্দী খানের নিকট থেকে লাখেরাজ সম্পত্তি লাভ করেন। ফলে ফকির ও সন্ন্যাসীদের অর্থনৈতিক শক্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পটভূমিতেই ইংরেজ আমলে খানকা আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজ ও জমিদার বিরোধী প্রবল শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দুই ধরণের ফকির সন্ন্যাসী ছিল যাদের এক বিরাট অংশ উত্তর ভারত বা উত্তরবঙ্গ থেকে এতদাঞ্চলে এসেছিল তাদের মুসাফির বা কলন্দর বলা হতো। অপর শ্রেণী ছিল স্থানীয় যাদের কায়িমী বলা হতো। আগত ফকির সন্ন্যাসীদের এই স্থানীয়রাই অভ্যর্থনা দেয় এবং স্থানীয় লোকদের সাথে যোগাযোগ করায়ে তাদের দল ভারী করায়। পরবর্তী কালে ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ দমন হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজগোষ্ঠী হিসেবে তারা এতদাঞ্চলে টিকে থাকে"।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিমধ্যে দক্ষিণ ও উত্তর ভারত থেকে আগত নাগরী ও ভূতনাগরী ভাষী জাতি গোষ্ঠী যারাএখানে নুনিয়া, মেহতা এবং ঋষি সম্প্রদায়; যারা বাধ্যকরের পেশায় নিয়োজিত ছিল এবং তারা ধুনকর (লেপ-তোশক তৈরীর পেশা) ও শেষোক্ত মাহীফরাশ সম্প্রদায়, এতদাঞ্চলে এসে প্রথমে স্বসংস্কৃতি পরবর্তীতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধারায় প্রভাবিত হয়। এভাবে স্বসংস্কৃতি থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে। গোলাম আম্বিয়া নুরীর মতে, ঐ সমষ্টির জীবন ধারার কোন সাংস্কৃতিক রীতি-অভিজাত ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেনি[২২]। যা হোক ধীরগতিতে হলেও এতদাঞ্চলে সমাজ সংস্কৃতি শংকরায়নের মাধ্যমে অব্যাহত ভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমান পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে।

কোম্পানি ও ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের দুশো বৎসরে এতদাঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি জাতীয় সমাজ সংস্কৃতির ন্যায় দ্রুত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে নতুন রূপ লাভ করেছে। যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অভিজাত সমাজ শ্রেণী তথা জমিদার, তালুকদারগণ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা ইংরেজ ও বাঙালী শিক্ষিত পেশাজীবী শ্রেণী। আর দ্বিতীয় প্রধান ভূমিকা পালন করেছে প্রধানত মুসলমান, হিন্দু এবং হিন্দু সনাতনধর্মী ও খৃষ্টান ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মাচারণ,চেতনা ও সংস্কার কার্যক্রম। প্রধান ধর্মজ ইসলামী সংস্কৃতি টাঙ্গাইলে প্রবেশের সঠিক লিখিত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও গড়বাড়ির বখতিয়ার খাঁর দিঘির ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্য থেকে প্রাপ্ত পূর্বোল্লিখিত শিলালিপি প্রমাণ করে যে, দ্বাদশ শতকেই এই অঞ্চলে ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে। ইসলাম ধর্মের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ইসলামের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে [২৩]।

চতুর্দশ শতকে গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ দেহলভীর অভিযানের মাধ্যমে এতদাঞ্চলে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্ক-আফগান, মোগল-বারোভূঁয়া যুগ সন্ধিকালের ঘটনা প্রবাহে এতদাঞ্চলে মুসলিম জনবসতি ও জনপদের সংস্কৃতি স্থিতিশীল ও শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ শাসনের সূচনা পর্যন্ত অপর প্রধান ধর্মাবলম্বী হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্মজ সংস্কৃতির সাথে সহাবস্থান করে উভয় সংস্কৃতি এতদাঞ্চলে লোকায়ত মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। এই সময়ে দেলদুয়ার ও আতিয়া অঞ্চলের অভিজাত শ্রেণী তথা জমিদার ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পারিবারিক ভাষা ছিল আরবি, ফার্সি ও উর্দূ। দেলদুয়ারের জমিদারদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দূ, তবে আরবি-ফার্সির লিখিত চর্চাও বিদ্যমান ছিল[২৪]। তাদের পারিবারিক সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে এতদাঞ্চলের সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের উপর। অর্থাৎ এভাবে আরব-ইরানী-তুর্কী-আফগান সংস্কৃতির সাথে লোকায়ত সংস্কৃতির পারস্পারিক গ্রহণ বর্জনের মধ্যদিয়েই এতদাঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়। আর তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অভিজাত জমিদার শ্রেণী।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ কোম্পানি শাসন কাঠামোয় দেলদুয়ার ও আতিয়ার সমাজ সংস্কৃতির ভাঙ্গন ধারায় দেলদুয়ার জমিদার ও অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিকা :

১৭৬০ সালে মীর কাশিম নওয়াব হয়ে খাজনার যে নতুন বন্দোবস্ত করেন। তাতে আতিয়া, কাগমারী, বড়বাজু, হোসেন শাহী পরগনা চতুষ্টয় প্রধানতঃ ৪ জন মুসলমান জমিদারের অধীনতায় ছিল বলে বিভিন্ন বিবরণে উল্লেখ পাওয়া যায় [২৫]। এ সব বিবরণ অনুযায়ী কাগমারী পরবর্তীকালে সন্তোষ নামে খ্যাত হয়। সন্তোষের হিন্দু জমিদারদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলিম ইনায়েতুল্লাহ খান। তিনি কাগমারীর শাসক ও পীর শাহ জামানের অথবা তার কোন বংশধরের পালিত পুত্র ছিলেন বলে কথিত। কথিত অপর বর্ণনায় মীর কাশিমের জীবদ্দশায় ইংরেজদের সাথে তার বিরোধকালে মক্কায় হজ্জ করতে যান। হজ্জ থেকে দেশে ফিরার পথে জমিদার ইনায়াতুল্লা খান ইন্তেকাল করেন। এ সংবাদে এনায়েতুল্লাহর হিন্দু ভাই বিশ্বনাথ তার দু'সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করে। এনায়েতুল্লাহর বিধবা স্ত্রী ও এক কন্যা বিশ্বনাথের হাত থেকে পালিয়ে মুঙ্গেরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রবাদ মতে, জবর দখলকারী ও ভ্রাতুস্পুত্রদের জীবন্ত হত্যাকারী জমিদার বিশ্বনাথকে গ্রেফতার করে মুঙ্গেরে পাঠাবার হুকুম দেয়া হয় স্থানীয় অপর বিধবা মুসলিম জমিদার রৌশন খাতুনের উপর[২৬]।

চারানের তালুকদার কামাল খানের কন্যা রৌশন খাতুন তখন আতিয়ার মুসলমান জমিদারের ছোট তরফ হিসেবে দেলদুয়ার জমিদারীর পত্তন করেন এবং প্রভাবশালী জমিদার হিসেবে আর্বিভূত হন। অতঃপর মুঙ্গেরের মুনশীখানার এক মুনশীর পরামর্শে অনেকগুলো গ্রাম নজরানা দিয়ে বিশ্বনাথ কয়েদ থেকে মুক্তি পান এবং বংশ পরম্পরায় জমিদারী ভোগদখল করেন। সে বংশেরই কালীহাতির দুর্গা গোবিন্দ মুনশি থেকে কবি কায়কোবাদ এবং তার কাছ থেকে গবেষক মোফাখখারুল ইসলাম উদ্ধৃত করেন যে, 'জীবন্ত সমাধির একই অপর ঘটনায় রোমান্সের গন্ধ থাকায় কবি কায়কোবাদ 'ভাওয়াল রাজ' এর ঘটনাকে নিয়ে তার 'শিব মন্দির' কাব্য রচনা করেন, যার অপর নাম জীবন্ত সমাধি কাব্য'[২৭]।

উল্লেখ্য দেলদুয়ার জমিদারী ও সন্তোষ জমিদারীর মধ্যবর্তী ইনায়েতুল্লাহ খার যাতায়াত পথ টান আইল'ই পরবর্তীকালে মোপলাদের মাছ বেচা কেনার সুবাদে ইংরেজ কর্তৃক নীল কুঠি স্থাপিত হয় এবং আরো পরে তাই টাঙ্গাইল শহর হিসেবে বিকশিত হয়[২৮]। সুতরাং আজকের টাঙ্গাইল জেলা শহর বিকাশের সাথে, প্রাচীন শহর আতিয়ার পতনের ইতিহাসের সাথে দেলদুয়ারের মুসলমান জমিদারদের সাথে

সন্তোষের হিন্দু জমিদারদের আর্থ-সামাজিক উত্থান-পতন ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাসের উক্ত ধারাগুলো চিহ্নিত করার প্রয়াসই আলোচ্য অধ্যায়ে করা হয়েছে। মোফাখখারুল ইসলাম এতদাঞ্চলে নওয়াব মীর কাশিমের (১৯৬০-৬৪) সময়ের অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, 'তার সময়ে দুই পাঠান বংশীয় বীর সেনানী হামীদ খাঁ ও মাহমুদ খাঁ নামে দু সহোদর উত্তরের মধুপুরের সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের দমনের জন্য 'কীলায়ে হাতির' কিল্লাদার হয়ে এসেছিলেন। ফটিকজানি সাফাই নদীর উত্তর তীর এখনো হামীদপুর নামে খ্যাত। পার্শ্ববর্তী অন্য এক মৌজা মাহমুদপুর নামে খ্যাত। হামদীপুরেরই এক মজা দীঘিতে ১৯৭৬ সনে পাঁচ ফুট দীর্ঘ এক রাজকীয় তলোয়ার পাওয়া যায়। নিকটবর্তী ভন্ডেশ্বর বা বন্দ-ই-শহর বর্তমানে যা আউলিয়াবাদ নাম করা হয়েছে। এতে মোগল আমলে তৈরীকৃত বিদ্রোহী মূর্চায় এই সময়ে ইয়াকিন শাহ ফকিরের আশ্রয়ে ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলনের এক আস্তানা রুপে ব্যবহৃত হয়"[২৯]।

এতদাঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে (১৯৬৯ খৃঃ) নানা কারণে সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ বাংলার বহু অঞ্চলে মারাত্মক আকার ধারণ করে বিশেষত ক্ষুদ্র জমিদারী অঞ্চলে। বৃহৎ জমিদারী অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রভাব ফেললেও ততটা মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। বৃহৎ জমিদারী অঞ্চলে জমিদার ও অবস্থা সম্পন্ন লোকেরা বহু দীঘি, পুস্কুরণী ও ইটের ভাটা তৈরী করে বহু লোকের আহার যুগিয়েছিল। দরিদ্র লোকেরা পেটের জ্বালায় তখন কেবল আহার পেয়েই মজুরী করতো[৩০]। দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার না হলেও চালের মূল্য টাকায় কখনো ১০-১২ সের থেকে কোথাও ২-৩ সেরে পর্যন্ত নেমেছিল। অনেক সময় খাদ্য পাওয়াই যেত না। দরিদ্র লোকদের একটি অংশ ক্ষুধার জ্বালায় ২/৩ টাকায় পুত্র ও কন্যা সন্তানদের বিক্রি করতো। সমকালীন ইতিহাসে এহেন মনুষ্য বিক্রির কওলা দলিলের নমুনা পাওয়া যায়[৩১]। কড়াপ্রতি ভূমি মূল্য আট আনা (।।০) থেকে তিন/চার টাকা পর্যন্ত ছিল।

৪.৪ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফারায়েজী-মোহাম্মদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ঃ

এতদাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ খরা মারাত্মক আকার ধারণ করলেও এরই প্রতিক্রিয়ায় ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ মারাত্বক আকার ধারণ করে। উত্তরাঞ্চলের প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও বিদ্রোহী অঞ্চল থেকে ফকির -সন্ন্যাসীগণ তুলনামূলক ভাল অন্নের সন্ধান পেয়ে, উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহ, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও পুলিশি অভিযানের মুখে এতদাঞ্চলে পলায়ন করে। মধুপুর অরণ্য এবং জামালপুর ময়মনসিংহের পাহাড়ি অরণ্য ঘেরা অঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে উৎপাত সৃষ্টি করে । এমনকি এতদাঞ্চলের বহুলোক এ সময় অনন্যোপায় হয়ে কিংবা উৎসাহ পেয়ে দস্যুদল ভুক্ত হতে থাকে। সরকারী কাগজপত্রে অবগত হওয়া যায় যে, ১৭৮১ হতে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত এতদাঞ্চলে দস্যুদের ব্যাপক অত্যাচার চলেছিল [১২]।

মধুপুরের নিবিড় অরণ্যে এই সন্ন্যাসীদের আড্ডা ছিল। এদের ভীষণ অত্যাচারে অনেক জমিদার ও তালুকদার বিপন্ন হয়েছিল। এ সময় দেশে এমনিতে খাদ্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব হয়েছিল, অর্থ দ্বারাও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতে পাওয়া যেত না। যার ঘরে যা কিছু অন্ন ও অর্থ থাকত, তা তারা অপর লোকের ও দস্যু ভয়ে, লুণ্ঠনের ভয়ে বের করতো না। প্রয়োজনে একরূপ অর্ধাহারে দিন কাটাত। হাটে বাজারেও জিনিস পাওয়া যেত না। সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ দমন করা হলে তবেই দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। যদিও এতদাঞ্চলে তা সাময়িক সময়ের জন্য নিবারিত হয়। সমকালীন দ্রব্যমূল্য ও সরকারী রিপোর্টে তার প্রমাণ পাওয়া যায়[১৩]। খরা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি হলে বিভিন্ন সময়ে এতদাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সামাজিক -রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ উত্তর বঙ্গ থেকে এতদাঞ্চলে প্রসারিত হয়। ফকির-সন্ন্যাসীরা অভিনব ধর্মমত প্রচারের ছলনায় দস্যুতা ও লুণ্ঠন করিত। ১৭৭২ সালের বর্ষা ঋতুতে প্রথম পঞ্চাশ হাজার সন্ন্যাসী বাহিনী নিম্ন বঙ্গে প্রবেশ করে এবং স্থানীয় লোকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করতে থাকে। ক্যাপ্টেন থমাস এর নেতৃত্বে প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয় স্বয়ং থমাস নিহত হয়। দ্বিতীয় অভিযান ও ব্যাহত হয়। অবশেষে হেষ্টিংস তিনজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে তিন দিক থেকে চূড়ান্ত আক্রমণ করে। ফকির -সন্ন্যাসীরা পালিয়ে মধুপুরের গহীন অরণ্যে ও জামালপুরের সন্ন্যাসগঞ্জে আশ্রয় নেয় এবং কিছুদিন নিরুদ্রপ থাকে[১৪]।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরায় ১৭৮১ সাল থেকে সন্ন্যাসীরা এতদাঞ্চলের উপর চড়াও হয় এবং জমিদার ও প্রজার অর্জিত শস্য কেটে নিয়ে যায়। জমিদারগণ অনন্যোপায় হয়ে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী রেভেনিউ বোর্ড সমীপে প্রতিকার প্রার্থী হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী রেভেনিউ বোর্ড হতে ঢাকার চীফের উপর সৈন্য প্রেরণ ও সাধ্যানুযায়ী সাহায্য এবং জমিদারদের রক্ষার আহবান জানান। কিন্তু ঢাকার চীফের পক্ষ থেকে প্রেরিত সৈন্যগণ বিপন্ন ও পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে আসে [৩৪]। উল্লেখ্য ১৭৮৬ এর পূর্বের এতদাঞ্চল ও ময়মনসিংহ জেলা সম্বন্ধীয় কোন কাগজপত্র জেলা কালেক্টরেটে নেই, রেভিনিউ বোর্ডেও নেই। তাই এর পূর্বের এ অঞ্চলের সন্ন্যাসী বিবরণ পাওয়া যায় না।

এতদাঞ্চলে পুনরায় সন্ন্যাসীদের আক্রমনে জেলার সকল জমিদার একযোগে রেভিনিউ বোর্ডে সন্ত্রাসী দমনের আবেদন জানায়। রেভেনিউ বোর্ড ভুলুয়ার (বেলুহার) রেসিডেন্ট হেনরীলজকে সন্ত্রাসী দমনে প্রেরণ করে এবং তাকে এতদাঞ্চলে নতুন জেলা স্থাপনের নির্দেশ দেন। লজের প্রেরিত রিপোর্ট পড়ে বোর্ড ঢাকার চীফকে আরো সৈন্য সাহায্যের নির্দেশ দেয়। সন্ন্যাসী দলপতি সাহামজরদ এর সাথে ইংরেজদের তুমুল যুদ্ধে সন্ন্যাসীরা পরাজিত, কেউ কেউ নিহত হয়। বাকীরা আবার জঙ্গলে পালিয়ে যায় [৩৫]।

এপ্রিল মাসে সন্ন্যাসীরা পুনরায় অত্যাচার শুরু করলে লজ সাহেব সৈন্য ও জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করে বৃহৎ বাহিনী গঠন করে সন্ন্যাসীদের আবারো পরাজিত করে। এরপর লজ সাহেব লক্ষ্মীপুর চলে যায়। ১৭৮৬ সালে ডানকান সাহেব সন্ন্যাসীদের দমনে নিযুক্ত হয়। তার প্রবল প্রচেষ্টায় সাহামজরদ দেশ ছেড়ে পালায় এবং এতদাঞ্চলের সন্ন্যাসী দল দুর্বল হয়ে পড়ে। অনতিকাল পরেই মধুপুরে জয়সিংগীর এবং পার্শ্ববর্তী শেরপুরে ভূপালগীর সন্ন্যাসী আবির্ভূত হয়। পুনরায় এতদাঞ্চলের অরাজকতা দমনে বেলুহার (ভুলুয়া বর্তমান নোয়ায়ালীর) কালেক্টর মি. রত্তন কে ময়মনসিংহে এসে জেলা সদর স্থাপনের নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনিও জয়সিংগীর কে স্থায়ীভাবে দমনে ব্যর্থ হয়।

অত:পর ১৭৯০ সালে জয়সিংগীরের বিরুদ্ধে জেলা কালেক্টর বিয়ার্ড সাহেব অভিযান পরিচালনা করে তাদের দমন করেন।[৩৬] এই সন্ন্যাসীর বংশধরেরা এখনো মধুপুরের টাঙ্গাইলের স্থানে স্থানে বাস করছে। তাদের প্রাচীন আস্তানার ভগ্নাবশেষ এখনো মধুপুর ও এতদাঞ্চলে পাওয়া যায়। এদের অত্যাচারে

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্য হয়ে অনেক জমিদার এদের বহু লাখেরাজ তালুক দান করে, সন্ন্যাসীদের বর্তমান বংশধররা তা ভোগ করছে। এরা গীর সন্ন্যাসী নামে পরিচিত ছিল। বঙ্কিম চন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে এদের মনোজ্ঞ বিবরণ আছে।[৩৮] কেউ কেউ মধুপুরের সন্ন্যাসী মঠ কে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের 'আনন্দমঠ' বলে অভিহিত করেন। মধুপুর ও এতদাঞ্চলের ফকির সন্ন্যাসীরা আবার ফকির সন্ন্যাসীদের সর্বাধিনায়ক মজনুশাহ্ ফকিরের অন্যতম প্রধান শিষ্য ও খলিফা চেরাগ আলীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে পরিচালিত হতো। মোট কথা আঠার শতকের শেষলগ্নে ইংরেজ কোম্পানির শাসন উচ্ছেদ করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশবাসীর উদ্ধারের লক্ষ্যে ফকির ও সন্ন্যাসীদের মিলিত বিপ্লবের একটি প্রধান কিল্লা ছিল এই মধুপুর থানা ও এতদাঞ্চল। তার বহু প্রত্নময় চিহ্ন এখনো রয়েছে।[৩]

উল্লেখ্য ফকির সন্ন্যাসীদের উৎপত্তির সূত্র সম্ভবত ১৭৪৪ সালের পূর্বে আলীবর্দীর সময়ে বা তৎপূর্বে। কেননা বিভিন্ন বিবরণে মারাঠা দস্যু তস্করদের বিরুদ্ধে ফকির সন্ন্যাসীদের সাহায্যের কথা জানা যায়। ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন এ কারণেই উত্তর বঙ্গ থেকে এসে এখানে বিস্তৃত হয়। ফকির-সন্ন্যাসীদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে বহু জমিদার ওদের নিস্কর ভূমি প্রদান করেছিলেন। এদের মধ্য উল্লেখ যোগ্য হলেন যথাক্রমে আনন্দগীর, বুধগীর, উদগীর, জয় সিংহগীর, মোহনগীর, পরশুরামগীর, রূপগীর প্রমুখ। এসব নিষ্কর স্থান অধিকাংশই বর্তমানে বংশধরদের হস্তচ্যুত হয়। অনেক প্রত্নময় চিহ্ন কৃষকদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়, জমিদারদের নিকট হতে জোত বন্দোবস্ত নিয়ে কৃষকগণ আবাদ কালে বহু প্রাচীন মুদ্রা ও সোনা রূপার জিনিস পেয়েছে। এখনো বহু ভগ্নাবশেষ মধুপুর ও এতদাঞ্চলে বিদ্যমান[৩৯]। সবচেয়ে বড় কথা, মোমেনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠার গোড়ায় আছে মধুপুর ও এতদাঞ্চলের ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন দমনের ইতিহাস। আর তার প্রায় একশতক পরে ইংরেজদের সৃষ্ট জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ষোলকলা পূর্ণ করতেই সময়ের দাবীতে এতদাঞ্চলকে প্রথমে আতিয়া মহকুমা পরে টানআইল মহকুমা করা হয়, যা পরে টাঙ্গাইল নামে পরিবর্তিত হয়[৪০]।

ফকির -সন্ন্যাসীদের কার্যক্রম কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হলেও ফকির বিদ্রোহ ১৭৯১ সালের পর আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এদের বিদ্রোহের মুল উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির সৃষ্ট ও প্রশ্রয় প্রাপ্ত শোষণকারী জমিদারদের উচ্ছেদ করা ও তাদের ধন সম্পদ লুট করা। উত্তরবঙ্গে এদের ব্যাপক অভিযানের ফলে বহু জমিদার ভীত হয়ে এতদাঞ্চলে বিশেষত ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছিল। ফকির আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মজনু শাহ, মাজু শাহ, বলাকী শাহ, টিপু পাগল ও গজনফর তুর্ক শাহ।

ফকিরদের বিরুদ্ধে অভিযানে কালেক্টর মিঃ রত্তন কে সাহায্যের জন্যে আসাম থেকে ক্যাপ্টেন প্লাটন কে পাঠানো হয়। বিভিন্ন সাঁড়াশী অভিযানের পর সাময়িক ভাবে সন্ন্যাসীদের ন্যায় ফকির আন্দোলন বন্ধ হওয়ার পর জমিদারগণ তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের নাম করে প্রজাদের নিকট থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করতে থাকেন। তাতে প্রজাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। তন্মধ্যে শেরপুরে ইহা মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছে।

১৮২০ সালে শেরপুরের জমিদারী ভাগবাটোয়ারায় পৃথক হয়ে অনেক জমিদারী সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র জমিদারদের প্রত্যেকে আয় বৃদ্ধির নিত্য নতুন উপায় বের করে তা জনগণের উপর চাপিয়ে দেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বহু প্রজা স্বতস্ফুর্ত বিদ্রোহী হন এবং একসময়ের পাগলপন্থী ধর্ম প্রচারক করিম শাহের পুত্র টিপু শাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। টিপুর নির্দেশে ১৮২৬ সাল থেকে জমিদারদের খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ফকির কৃষকদের দিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা হয়। জমিদারদের বাড়ী ও লুণ্ঠন করা হয়। জমিদারদের আহবানে ইংরেজ কোম্পানির ষাঁড়াশি অভিযানে টিপুকে বন্দী করা হয়। গজনফর তুর্কশাহ ইংরেজ সেনাদলকে আক্রমন করে টিপুকে মুক্ত করেন। পরবর্তীতে পুণরায় কৌশলে অভিযান চালিয়ে টিপুকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়।

অত:পর শেরপুর থেকে ফকির বিদ্রোহ এতদাঞ্চলে বিস্তৃত হয়। মধুপুর জঙ্গলে ফকিরদের একটি ঘাঁটি ছিল। এখান থেকে ফকিররা টাঙ্গাইলের বিভিন্ন জমিদার তালুকদার বাড়ীতে অভিযান ও লুটপাট করতো এবং পুলিশী অভিযানের সংগে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতো। এসব বিদ্রোহীর মধ্যে ছিলেন নজুমবাগের শাহ খলিল, লুহুরিয়ার শেখ মামুদ, সাবটির শেখ সাদেক, নাগ শিশিরের শেখ সেলিম প্রমুখ। নলুয়া নিকরাইলের বিশু ডাকাত ফকিরদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে ফকির বিদ্রোহ আন্দোলনে অংশ নেয়। ফকির বিদ্রোহ প্রথম মধুপুর গড় অঞ্চলে ও পরে পাকুল্লা দেলদুয়ার, কাগমারী, নাগপুর ও মির্জাপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কাহেতার বেনী ডাকাত, ভবানী ডাকাত প্রমুখ ডাকাতির পাশাপাশি এই বিদ্রোহের সাথে যুক্ত ছিল।[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

রাজা রামমোহন রায় যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু ধর্ম রক্ষার লক্ষ্যে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন; তার অনতিকাল পরেই বৃহত্তর ফরিদপুরের হাজি শরীয়ত উল্লাহ পাশ্চাত্য ও হিন্দু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা ও মৌল ইসলামী অনুশাসনে ফিরায়ে নেয়ার লক্ষ্যে পূর্ববাংলার মুসলমানদের মাঝে ফারায়েজী ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। ধীরে ধীরে এ আন্দোলন ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে জমিদার বিরোধী ও প্রজা স্বার্থের সামাজিক ও প্রতিবাদী আন্দোলনের রুপ পরিগ্রহ করে।

দেলদুয়ার, আতিয়া ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে। এতদাঞ্চলের ইতিহাসের মৌল সুত্র কেদার নাথ মজুমদারের বিবরণে মুসলমানদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এফ.এ. সাকচীর বিবরণে ও ডব্লিউ হান্টারের বিবরণে এসংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[৪২] এ ফরায়েজী আন্দোলন সাধারণ কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন করা এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমন পরিচালনা ও গ্রামে গ্রামে ধর্মীয় সংস্কারের পক্ষে ওয়াজ মাহফিল তথা প্রচারণা। এই ফরায়েজী আন্দোলনে এতদাঞ্চলের মৌলভী সৈয়দ বুজর্গ আলী, তিতু ফরায়েজী, মিলন মোল্লা, সিরাজ মোল্লা, হাজী আবুল কাশেম খান প্রমুখ অংশ গ্রহন করে।[৪৩]

হাজী শরীয়তুল্লাহর সমসাময়িক কালে সর্বভারতীয় পর্যায়ে বৃটিশ বিরোধী দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের এবং প্রথম মুসলিম ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমেদ বেরেলভী। মোহাম্মদীয়া আন্দোলন নাম হলেও বৃটিশরা একে ওয়াহাবী আন্দোলন নামে অভিহিত করে। সাধারণ ভাবে এটি জিহাদ আন্দোলন নামে পরিচিত। বাংলায় এ আন্দোলন প্রথম গড়ে তোলেন নারকেল বাড়িয়ার শেখ নেসার আলী তিতুমীর। পরবর্তীতে তিতুমীরের আন্দোলন জমিদার বিরোধী কৃষক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রুপ পরিগ্রহ করে। এতাঞ্চলের বহু কৃষক ও ওলামা তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং পাটনা স্কুল কেন্দ্রিক জেহাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের মাওলানা ইব্রাহিম, কাদিম হামজানীর হাফেজ আমির উদ্দীন, মুনশি আমির উদ্দীন। আকালু গ্রামের খন্দকার জহির উদ্দীন প্রমুখ। এরা ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক প্রজা আন্দোলনে নিজ এলাকায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

ফারায়েজী ও জিহাদ আন্দোলনের সময়কালে জমিদারদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় প্রজাদের সংর্ঘষের বিবরণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই সব সংঘর্ষের বেশীরভাগ হিন্দু জমিদারদের সাথে মুসলমান ও হিন্দু প্রজার সংঘর্ষ হিসেবে দেখা যায়। মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজা, এমনকি হিন্দু প্রজার বিদ্রোহও খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

কেদার নাথ মজুমদারের হিন্দু পক্ষপাত পূর্ন বিবরণে এতদাঞ্চলের জমিদারদের প্রজা নিপীড়নের তেমন কোন লোমহর্ষক বা ঘটনা বহুল বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তার বিবরণে এবং হান্টার ও সাকচীর বিবরণে দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারীর হিন্দু নায়েব গোমস্তা কর্তৃক প্রজার উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৮৫]

কোম্পানির শাসন পর্বে দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে আলিফ খান পন্নী ও আলিয়ার খান পন্নী, জাহাইয়ার খানা পন্নী, ফয়েজ আলী খান পন্নী, কোচালী খান, রওশন খাতুন, কামাল খান লোহানী প্রমুখ। এ সকল জমিদার সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে এবং সমকালীন বাংলার মুসলমান জমিদারদের অবস্থা ও তার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সমকালীন জমিদারগণ ব্যক্তিগত ভাবে প্রজা নির্যাতনকারী ছিলেন না। তাই বলে এই সকল ধর্ম সংস্কার আন্দোলনেও তাদের সমর্থন ছিলনা। তাদের প্রজাগণ এই সব আন্দোলনের সমর্থক কর্মী হলেও তাদের সাথে উক্ত জমিদারদের সংঘাত বা সংঘর্ষ ছিল বলে মনে হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে দেলদুয়ার আতিয়ার জমিদার ও প্রজা সম্পর্কের স্বরূপ ঃ

লুই বোর্নাদ নামী এক ফরাসী বণিক ১৭৭২ সালে বাংলাদেশে হুগলী জেলার তালভান্ডায় প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করে নীল চাষ শুরু করেন। ১৭৮৮ সাল থেকে বানিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপক ভাবে নীলচাষ শুরু হয়। একই সাথে নীলচাষের জন্য নীল কর সাহেবরা এদেশের কৃষকদের উপর চরম অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে। ১৮৩০ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের এক অধ্যাদেশ রায়ত অত্যাচারের পথকে আরো সুগম করে। ইতিপূর্বে জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ কৃষকরা বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এক্ষনে বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা নীলকরদের অত্যাচার সইতে না পেরে বিভিন্ন স্থানে নীল কুঠি আক্রমন ও বিদ্রোহ করে। নীলকরগণ কুঠিয়াল বাহিনী ও পুলিশের সহায়তায় নীলকরগন এই সব বিদ্রোহ দমন করত। অবশেষে ১৮৫৯-৬০ সালে সারা দেশব্যাপী নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয় এবং সরকার নীলকরদের নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়।

টাঙ্গাইল অঞ্চলেও নদীর ধারে অনেকগুলো নীলকুঠি ছিল। কেদার নাথ মজুমদার এরুপ কয়েকটি নীল কুঠির বর্ননা দেন যথাক্রমে সুবর্নখালী, কাগমাইর, ষোলকাহনীয়া, ছল্লাবাড়ী প্রভৃতি। নীলচাষ লাভজনক না হওয়া সত্ত্বেও নীলকররা জোর করে নীল চাষে কৃষকদের বাধ্য করত। অগ্রিম দাদন দিয়ে ঋণ জালে আটকিয়ে আইনের আশ্রয় নিয়ে কৃষকদের হয়রানি ও নীল চাষে বাধ্য করত। অনেক সময় কৃষকদের অজ্ঞাতে জাল কবুলিয়ত সম্পাদন করতো। অত্যাচারে অতিষ্ঠ কৃষকেরা আইনের আশ্রয় নিত, কিন্তু জমিদার তালুকদারগণ আদালতে জাল দলিল দাখিল করে বিচার কে অন্যায় ভাবে প্রজার বিরুদ্ধে প্রভাবিত করতো।[৪৬]

ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থে কাগমারীর নীল কুঠির অধ্যক্ষ কিং সাহেব এবং ষোল কাহানি কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াইজ কর্তৃক কৃষকের উপর অত্যাচারের মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। একই সাথে গোলক নাথ রায় কর্তৃক নীল কুঠি আক্রমন এবং বাঘিল গ্রামের গুরুচরণ মিত্র কর্তৃক রামদেবপুর কুঠি ও বেনী সাহেবের উপর আক্রমনের মনোজ্ঞ বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

এইরূপ অত্যাচার ও অরাজকতায় বিভিন্ন স্থানে কৃষকদের স্বার্থের সাথে জমিদাররা একাত্মতা ঘোষনা করেন। ফলে জমিদার ও কৃষক প্রজার সমবেত শক্তি যশোর কুষ্টিয়া অঞ্চলের সরকারের খাজনা বন্ধ করে দেয়। নীল কুঠিতে সশস্ত্র আক্রমন করে। খোন্দকার আবদুর রহিম টাঙ্গাইলের ইতিহাস গ্রন্থে টাঙ্গাইলের কৃষক কর্তৃক টান আইল কুঠি আক্রমন, এবং হুসেন ও বিশু সর্দার কর্তৃক নলুয়া নিকারাইল কুঠি, বেরী সাহেব কুঠি আক্রমন ও ধ্বংসের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন।[৮৮]

সার্বজনীন ভাবে জমিদারগন স্বীয় স্বার্থে নীলকর বিরোধী কৃষক আন্দোলনে প্রজাদের সাথে থাকলেও টাঙ্গাইলের জমিদারদের মধ্যে দুই ধারার অবস্থান ও ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সন্তোষের হিন্দু জমিদারগণ এখানে অত্যাচারী নীলকরদের সহযোগী হিসেবে রক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। পক্ষান্তরে দেলদুয়ার আতিয়ার মুসলমান জমিদারগণ নীল বিদ্রোহে নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।[৮৯]

আবহমান কাল থেকেই প্রথাগত ভাবে জমিদারগণ পরগনা বা জমিদারী অঞ্চলের বিচার শাসন করতেন। ১৭৭৪ সালে ওয়ারেন হোষ্টিংস জমিদারদের যে সনদ প্রদান করেন তাতে তাদের বিচার ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখা হয়।[৯০]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ইংরেজ শাসনের সূচনা পর্বে ইংরেজ কর্তৃক জমিদারী ইতিহাসে যে ভাঙ্গাগড়ার খেলা চলে,তাতে জমিদারী হারানো জমিদারগণ কোম্পানি ও নয়া জমিদারদের বিরুদ্ধে ফকির, সন্ন্যাসীদের উস্কে দেন। এতে পুরনো জমিদার কর্তৃক দেশে অরাজকতা সৃষ্টি ও ইংরেজ শাসননীতিকে ব্যর্থ করার সাধারণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দেলদুয়ার-আতিয়ার জমিদারদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নীতি লক্ষ্য করা যায়। আতিয়া- নাসিরাবাদ অঞ্চলে এই সময় স্থানীয় জমিদারদের জমিদারী অক্ষুন্ন থাকার ফলে সন্ন্যাসী, ফকির কিংবা দস্যুদের সহায়তা করতে হয়নি। বরং তারাই এই সব পরগনায় চড়াও হয়ে জমিদার ও প্রজার অর্জিত শস্য কেটে নিয়ে যায়। বার বার আক্রমন ও লুন্ঠনে অতিষ্ঠ জমিদারগণ অনন্যোপায় হয়ে রেভেনিউ বোর্ড ও কালেক্টর বরাবর আবেদন করে পুলিশী সহায়তা কামনা করে। এমনকি এদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে অনেক জমিদার এদেরকে বহু লাখেরাজ তালুক প্রদান করেছে। সে সূত্রে এতদাঞ্চলের অনেক তালুক সন্ন্যাসীদের বর্তমান বংশধররা ভোগ করছে।[৯১]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ কোম্পানির ঔপনিবেশিক আইন, বিচার ও প্রশাসনিক নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারী ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের জনজীবন ধারা ঃ

১৭৮৩ সালে ময়মনসিংহে লজ সাহেবের নেতৃত্বে অস্থায়ী ভাবে কানুনগো অফিস স্থাপন এবং ১৭৮৭ সালে রওন সাহেবের নেতৃত্বে স্থায়ী জেলা কালেক্টরেট স্থাপন করা হয়। একই সাথে তিনি জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেট ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। দিওয়ান ছাড়া অন্যান্য পাইক পেয়াদা প্রয়োজন মতো এতদাঞ্চলের প্রধান জমিদারগণই সরবরাহ করতো। এবং নানকার জমির বিনিময়ে জমিদারগণই তাদের বেতন প্রদান করত। ফলে অন্যান্য স্থানের ব্যতিক্রম হিসাবে এখানে জমিদার ও স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসনের সাথে একটি সম্পর্ক প্রথম থেকেই গড়ে ওঠে। এখানে ব্যাপক জল প্লাবনে অনেক জমিদার রাজস্ব অনাদায়ে রেহাই প্রার্থনা করলে মিঃ রত্তন অনেককেই রেহাই দিয়ে অনেক জমিদারি রক্ষা করেন। প্রথমেই নিলামে না দিয়ে সময় দিয়ে ব্যর্থ হলে তারপর নিলামে দেয়া হতো।[৫২] সেজন্য এখানে জমিদারী নিলামে উঠে তুলনামূলক কম, জমিদারী হাত বদল হয় তুলনামূলক কম। বনেদি জমিদারীগুলো বিভিন্ন হয়েও জমিদারী উচ্ছেদ পর্যন্ত কোন না কোন ভাবে টিকে থাকে।

অপর দিকে রত্তন সাহেবের সদাশয় ও কোমল আচরণের সুবাদে প্রজা সাধারণের উপর জমিদারদের অত্যাচারের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এক্ষেত্রে দেলদুয়ার আতিয়া জমিদারীতে বিলাসী ও উদাসীন জমিদারদের নায়েব, গোমস্তাদের হাতে প্রজা নির্যাতনের বেশী উদাহরণ পাওয়া যায়।

১৭৮৯ সালের বন্দোবস্ত এবং দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অনেক তালুক জমিদারী হতে খারিজ হয়ে পৃথক ক্ষুদ্র জমিদারী সৃষ্টি হয়। তার জন্য জমিদারী হিসাব সংরক্ষণে তৌজি ব্যবস্থা চালু ও তৌজিনবিশ কর্মকর্তার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন থানা চৌকি ও তাতে তহশীল কাছারী প্রতিষ্ঠা করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসন বিচার ও শাসন কার্যে মনোনিবেশ করে এবং সেই সাথে জমিদারদের বিচার ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু হান্টারের মতে, বাস্তবে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় বিচার করতেন।[৫৩] এসব বিচারে প্রজা তার ন্যায্য বিচার পেতো কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কালেক্টরেট বেয়ার্ড এর আমিন প্রদত্ত রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে কেদার নাথ মজুমদার বলেন, "ময়মনসিংহ জমিদারী প্রজা অত্যাচারের শ্রেষ্ঠ প্রমান, প্রজায় প্রজায় মোকাদ্দমা হলে ন্যায় অন্যায় পরিমাপের সুযোগ ছিল, কিন্তু প্রজা-জমিদারে হলে ন্যায় অন্যায় পরিমাপের কোন সুযোগ ছিলনা।"[৫৪]

কেদার নাথ মজুমদারের এই বক্তব্য সাধারণ ভাবে ময়মনসিংহের অনেক জমিদারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও দেলদুয়ার আতিয়া জমিদারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এমন কোন প্রমাণ কোন বিবরণে পাওয়া যায় না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দেলদুয়ার আতিয়ার জমিদার কর্তৃক প্রজাদের উপর অন্যায় নির্যাতন ও আইনগত হয়রানির যে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তার জন্য জমিদার নয় বরং জমিদারের নায়েব ও গোমস্তাগণই দায়ী। কেদার নাথ মজুমদারের অপর বর্ণনাই তার প্রমাণ, 'আতিয়ার বার আনার (দেলদুয়ার স্বত্ব) জমিদারগণ নাবালক বিধায় এই সকলের শাসন সংরক্ষনের ভার তাদের সরকার গোবিন্দ চাকী, পাচু বসু এবং রাম চন্দ্র মুখার্জীর হাতে ন্যস্ত আছে। ইহাদের অত্যাচার অপরিসীম। ইহার প্রজারা খাজনা একবার আদায় করে কাগজ পত্র গোপন করেছে। তারা দ্বিতীয়বার খাজনা দিতে অস্বীকার করায় তাগিদকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং সরকারী রাজস্ব বন্ধ করে ফেলেছে। এদিকে উৎপীড়িত প্রজা পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করিতেছে। মহালের ১৪০০ মৌজার মধ্যে মাত্র ৫০০ মৌজার প্রজা আছে তারাই কৃষিকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে। ...রাজস্ব বাকী না পড়লে এবং সে সময় তদন্তে না গেলে সুদূর অভ্যন্তরীণ অবস্থা তথা জমিদার প্রজা সম্পর্কের বাস্তব অবস্থা জানা সম্ভব ছিল না। উপায়হীন প্রজা নীরবে সব সহ্য করতো" [৫৫]।

বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারকে জজের অধীনে ন্যস্ত করা হয় ব্যক্তিগত ভাবে অপরাধের জন্য, আর রাজস্ব বাকীর জন্য কালেক্টরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। রাজস্ব বাকীর জন্য জমিদারের উপর চাপ বা নির্যাতনের পরিবর্তে মহালকে দায়ী করে মহাল নিলামের ব্যবস্থা করা হয়। আর অপরাধী জমিদারকে জজের নিকট থেকে জামিনে মুক্ত হতে পারার অর্থাৎ কারারুদ্ধ না করার নির্দেশ দেয়া হয়। অপর দিকে কালেক্টরের বিরুদ্ধে জজের আদালতে দেওয়ানী মামলা করার অধিকার জমিদারকে দেয়া হয়। জমিদার স্বভাবতই আইনের অপব্যবহার প্রশাসনের ক্ষেত্রে করতে না পারলেও প্রজার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে এতদাঞ্চলের জমিদারগণ প্রজার উপর নির্যাতন করার তথ্য পাওয়া যায়। যেমন রেভেনিউ বোর্ডে প্রেরিত চিঠিতে ১৮১২ সালে আতিয়ার অন্তর্গত কাপাকি প্রভৃতি স্থানে প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৮১৩ সালে তহশিল কাছারি প্রথা রহিত হলে প্রজার উপর দু'বার রাজস্ব আদায়ের এবং বিভিন্ন নির্যাতনের হার এতদাঞ্চলে সার্বিকভাবে বেড়ে যায় [৫৬]। প্রজাগণের দাবীর মুখে

Dhaka University Institutional Repository

কালেক্টরের নির্দেশে তাই ১৮১৯ সালে জমিদারগণ পুনরায় নিজ বেতনে কানুনগো কার্যালয় স্থাপনে বাধ্য হন। এবং ১৮২০ সালে জমিদারদের নির্যাতন থেকে প্রজাকে রক্ষার্থে এবং জমিদারী কাগজপত্র ও নথিপত্র সংরক্ষণে রেজিষ্টারের পদ সৃষ্টি করা হয়। যদিও পরবর্তীতে এ পদের দায়িত্ব অন্য দিকে প্রবাহিত হয়।

১৮৩৪ সালের পর থেকে স্থানীয় জমিদারদেরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রদত্ত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এ সময়ে কালেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্থানীয় জমিদার সমেত কমিটি অব ইমপ্রুভমেন্ট গঠিত হয় এবং কমিটির তত্ত্বাবধানে এতদাঞ্চলের রাস্তাঘাট ও পুল প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়েছিল। সমসাময়িক কালে দেলদুয়ার -আতিয়ার জমিদারদের নিকটবর্তী অনেক জমিদারদের ক্ষেত্রে জমিদারে-জমিদারে দাঙ্গা কিংবা জমিদার- প্রজা দাঙ্গার নজির পাওয়া গেলেও দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারিতে এহেন কোন দাঙ্গা বা সংঘাতের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারগণ অনেকটা প্রজা হিতৈষী এবং পার্শ্ববর্তী জমিদারদের সাথে প্রায়শঃ সদ্ভাব বজায় রেখেছিল।

সিপাহি বিদ্রোহ কালে এতদাঞ্চলের জমিদার প্রজাদের পক্ষে বিপক্ষে কোন ভূমিকার বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এতদাঞ্চলের উপর দিয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ দমন কালে পলায়ন করে। কতেক বিদ্রোহী এতদাঞ্চলে ও মধুপুরের বনাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সিপাহি বিদ্রোহ পরবর্তী কোম্পানি শাসনের পরিবর্তে বৃটিশ রাজের সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর নীলবিদ্রোহ দমন, 'নীল কমিশন' গঠন, সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন এবং আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রেক্ষাপটে 'আতিয়া' থানা চৌকি থেকে মহকুমায় উন্নীত হয়। এতে এতদাঞ্চলে দস্যুতা ও বিদ্রোহী তৎপরতা এবং সর্বোপরি সামাজিক অস্থিরতা কিছুটা হ্রাস পায়, আর্থ- সামাজিক নয়া প্রেক্ষিত তৈরী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে নয়া সমাজ সংস্কৃতির বিকাশে দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকাঃ

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর প্রথম পর্ব কোম্পানি আমলে পুরনো সমাজ ভেঙ্গে নয়া সমাজ গঠনে স্থানীয়দের মধ্যে জমিদার শ্রেণীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য ও প্রধান। তার সহযোগী ছিল বেনিয়া মুৎসুদ্দি শ্রেণী। সরাসরি বৃটিশ শাসন পর্বে ধীরে ধীরে এদের সাথে যুক্ত হয় শিক্ষিত ও পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

সিপাহি বিদ্রোহ পূর্ব ও পরবর্তী দু' দশকের মধ্যে জমিদার শ্রেণীর পাশাপাশি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে এবং সিপাহি বিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সরাসরি বৃটিশ রাজকীয় উপনিবেশ শাসন পর্বে জমিদার শ্রেণীর একচেটিয়া ভূমিকার পরিবর্তে তিনটি সমাজ শ্রেণীর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়; যথাক্রমে জমিদার, পেশাজীবী মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। এই পর্বে ঔপনিবেশিক সরকার তার শাসন ব্যবস্থা বজায় রেখেছিল জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা। এ দু'শ্রেণী বিভিন্ন ভাবে সাধারণ মানুষের উপর শাসকের চিন্তা ধারা চাপিয়ে দিতে সহায়তা করেছিল। এসময় শহর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের জগত আর গ্রাম কেন্দ্রিক কৃষকের জগতের সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক অপূর্ব অথচ বিকৃত এক সেতুবন্ধন রচনা করেছিল জমিদার সমাজ। ফলে পুরাতন সামাজিক সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহের কতেক পরিবর্তিত, কতেক বিলুপ্ত, আবার কতেক ঐতিহ্য ধারা নিয়ে টিকে থাকে। সব মিলিয়ে নয়া সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরী হয়; বিকশিত হয় আধা ঔপনিবেশিক সমাজ ও সংস্কৃতি। যার গতি প্রবাহ আমরা অদ্যাবধি বয়ে বেড়াচ্ছি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়া জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করে, যারা কোম্পানি শাসনের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। জমিদারদেরকে ইচ্ছামত ব্যবহার কালীন সময়েই কোম্পানি শাসনের উদ্ভুত নয়া প্রেক্ষাপটে ১৮৩০ এর দশক থেকে গৃহীত নীতি জমিদারের পাশাপাশি নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ ঘটায়, ধর্মীয় সম্প্রদায়ে যারা অধিকাংশ ছিল হিন্দু। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে অপর ধর্ম সম্প্রদায় মুসলমানদের মধ্য থেকে উক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপক জাগরণ ঘটে। সংবাদপত্র- সাময়িকী আন্দোলন হয়ে ওঠে এই মধ্যবিত্তের জাগরণের প্রধান বাহন। সিপাহি বিদ্রোহত্তোর সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিকাশ মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক বিকাশে সহায়ক হয়। অপর সাধারণ কৃষক শ্রেণী এই মধ্যবিত্তের সহায়তায় অধিকার প্রতিষ্ঠায়

Dhaka University Institutional Repository

সচেতন হয়ে ওঠে এবং তারই প্রেক্ষিতে প্রজাস্বত্বের বিকাশ সাধিত হয়। ফলশ্রুতিতে ইংরেজ শাসনের প্রথম ও সবচেয়ে সুবিধাভোগী জমিদার শ্রেণী ক্ষমতাহীন ও কোনঠাসা হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যায়ে জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের প্রেক্ষিত তৈরী হয়, ফলে সাধারণ কৃষক নিজ জমিতে প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে।

ঔপনিবেশিক শাসনের একেবারে শেষ পর্যায়ে তাই বাংলার সমাজ-সাংস্কৃতির বিবর্তনে নিয়ামক হয়ে ওঠে জমিদার শ্রেণীর পরিবর্তে মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী ও স্বচ্ছল কৃষক বা জোতদার প্রজা শ্রেণী। দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারী অঞ্চল তথা দক্ষিণ টাঙ্গাইলের সমাজ সংস্কৃতির বিকাশে ও বিবর্তনে এই তিন শ্রেণীর ভূমিকা এবং সমাজ-সংস্কৃতির কাঠামো, উৎপাদনগত বিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাপক বিশ্লেষণ ও গবেষণার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮ ঔপনিবেশিক শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষা উন্নয়ন ও জনকল্যাণে জমিদারদের ভূমিকা ঃ

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় পৌনে এক শতাব্দীকাল পরে ইংরেজ কোম্পানি শাসকবর্গ এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাও আবার নিজেদের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে। ১৮৩৫ সালে এডাম রিপোর্টের ভিত্তিতে লর্ড মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষানীতির ফলশ্রুতিতে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার শুভ সূচনা হয়। ১৮৫৪ সালে উড ডেচপাচের মাধ্যমে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। তিন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচন হয়।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের সূচনা লগ্নে মুসলমান নেতৃবৃন্দ অজ্ঞতা, ধর্মীয় বিদ্বেষ, অহংকার ও অবজ্ঞাবশতঃ ইংরেজী শিক্ষা পরিহার করে। পক্ষান্তরে সুচতুর হিন্দু বেনিয়া মুৎসুদ্দিগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে । ফলে ১৮৩০ এর মধ্যে বেসরকারী মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষালাভকারী একটি ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ ঘটে এবং ১৮৬০ এর মধ্যে এ শ্রেণীর ব্যাপক জাগরণ ঘটে। অবশ্য এর অধিকাংশ কলকাতা বা শহর কেন্দ্রিক ছিল। গ্রামে শিক্ষায় হিন্দু-মুসলমান একই চিত্র দেখা যায়। এর ফলশ্রুতিতে বাংলার মুসলমান সমাজ শ্রেণী শিক্ষাদীক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে পড়ে এবং শহর কেন্দ্রিক হিন্দু-মুসলমান শিক্ষা বৈষম্য মারাত্মক আকার ধারণ করে। কিন্তু অচিরেই মুসলমানগণ তাদের পশ্চাদপদতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং বেসরকারী উদ্যোগে কয়েকজন মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে। তারাই আবার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করে, জনমত গঠনে করে। এদের প্রচেষ্টায় এবং ডব্লিউ হান্টারের অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশের পর বাংলার মুসলমান শ্রেণীর প্রতি ইংরেজ নীতির পরিবর্তন আসে।

এ,কে,এম ইদ্রিস আলীর মতে, '১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই বৃটিশ নীতি মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বৃটিশ সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট হন। নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, আবদুল করিম, মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমুখ সরকারী ও বেসরকারী মুসলমান মনীষীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বঙ্গের মুসলমান সমাজ বৃটিশ সরকার প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তৎপর হয়। কিন্তু শতাব্দীকালের পিছিয়ে পড়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ কলিকাতার বাবুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে আশানুরূপ সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে যখন প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গকে দু'ভাগে বিভক্ত করে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত প্রদেশের রাজধানী ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা হয়, সেই সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধিবাসীগণ সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করতে থাকে' [৫৭]। তাই বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণীর মাঝে জাগরণ ও মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছে আগে ও পরে। একই কথা প্রযোজ্য হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম বাংলা এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। মুনতাসির মামুনের মতে, '১৮৭০ থেকে ১৮৯০ সময়কাল হচ্ছে পূর্ব বাংলার মধ্য শ্রেণীর জাগরণের কাল। এই জাগরণ শুধু ঢাকাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল না ঢাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয় হিন্দু -মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এতে অংশগ্রহণ করে' [৫৮]। ১৮৪৬ সালে সর্ব প্রথম এতদাঞ্চলের জেলা সদর ময়মনসিংহে ইংরেজি শিক্ষার সুত্রপাত হয় মধ্য ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮৫৩ সালে প্রথম গভর্ণমেন্ট জেলা স্কুল স্থাপিত হয়।

সিপাহি বিদ্রোহ পরবর্তী সরাসরি বৃটিশ রাজকীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আর্থ-সামাজিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থায় বেশ কিছু গুনগত পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অত্র জেলায় ব্যাপক হারে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৯]

১৮৭১ সালে স্যার জর্জ কেম্বেলের নিম্ন শিক্ষাবিস্তার বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশিত হলে জেলার পাশাপাশি মহকুমা, থানা পর্যায়ে এবং অধিকাংশ জমিদার বাড়ীর পাশে স্থানীয় জমিদারের উদ্যোগে অথবা মধ্যবিত্তের উদ্যোগে কিন্তু জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু প্রাইমারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও টোল প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে আতিয়ায় নতুন মহকুমা সদর টাঙ্গাইলে প্রথম (জেলায় দ্বিতীয়) ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ সালে সন্তোষ জমিদারদের উদ্যোগে 'সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর একে একে প্রতিষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইল বিন্দু বাসিনী স্কুল, নাগরপুর হাইস্কুল , করটিয়া হাইস্কুল, সূবর্ণখালী শশীমুখী হাইস্কুল প্রভৃতি [৬০]। উল্লেখ্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের জাতীয় আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এবং দেলদুয়ারের নিকটবর্তী আতিয়া থেকে সদর দফতর সন্তোষের নিকট বর্তমান টাঙ্গাইলে স্থানান্তরের ফলে দেলদুয়ার-আতিয়ার মুসলমানদের পক্ষে প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপন করার কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার কন্যা, স্বচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষা প্রাপ্ত বেগম করিমুন্নেসা দেলদুয়ারের পুত্রবধু হয়ে আসা সত্ত্বেও দেলদুয়ার জমিদার পরিবারের পক্ষে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য পারিবারিক দিক থেকে তার প্রয়োজন হয়নি। কেননা জমিদার পরিবারের নবীন সদস্যগণ অর্থাৎ পরবর্তী কালের খ্যাতিমান আবদুল করিম গজনবী ও আবদুল হালিম গজনবী কে নিয়ে তদীয় মাতা করিমুন্নেসা খানম দেলদুয়ার

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে কলকাতায় অবস্থান করেন এবং কলকাতা ও বিলেতে সন্তানদের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। দেলদুয়ারের অন্য জমিদারগণ তাদের পুত্রদেরকে সাধারণ বাংলা স্কুলে পড়াশুনা করান, কেউ কেউ জেলা সদরে কিংবা কলকাতায় সন্তানদের পড়াশুনা করান। এদের মধ্যে কারোরই উচ্চ শিক্ষা বা বিলেতি ডিগ্রী অর্জনের তথ্য পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য ১৮৭০ সাল পর্যন্ত যারা শিক্ষিত ও বড় লোক তথা জমিদার, তালুকদার, বেনিয়া; তাদের ছেলেদেরই শুধু ইংরেজি স্কুলে পড়তে দেয়া হতো। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুও এই সময় পর্যন্ত ইংরেজি স্কুলকে ঘৃনার চোখে দেখতো। ফলে মফস্বলে হিন্দু -মুসলিম উভয় শ্রেণীই ইংরেজি স্কুল পরিহার করতো। তবে ইংরেজি শিক্ষিতের কদর ছিল অনেক বেশী। দু' একজন ইংরেজি শিক্ষিতের চালচলন নবীন যুবকদের অনুকরণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৬ সালে আতিয়া মহকুমার প্যারী মোহন প্রথম বি,এ পাশ করেন ও ১৮৬৭ সনে এম, এ পাশ করেন। তাকে দেখার জন্য লোকে লোকারণ্য হতো। এমনকি বহু দূরদূরান্ত থেকেও লোক তাকে দেখতে আসতো [৩১]।

অন্তঃপুরে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্ত্রী শিক্ষা সমিতি নামে সংগঠন স্থাপিত হয়। জেলা বোর্ড এদের জন্য বাৎসরিক ২৫০ টাকা অর্থ বরাদ্দ করে অন্তঃপুরে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করে। আতিয়ার কুমুদিনী মিত্র শুধু মহকুমার নয় বরং সমগ্র ময়মনসিংহ জেলার প্রথম মহিলা বি,এ গ্রাজুয়েট ছিলেন। এতদাঞ্চলের আনন্দ মোহন বসু প্রথম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বারধারী প্রথম বাঙালী গ্রাজুয়েট হবার গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়। এতদাঞ্চলের পন্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের নাম সমগ্র বাংলায় সুপরিচিত ছিল।

উনিশ শতকের সমাপ্তি ও বিশ শতকের সূচনাকালীন পরিসংখ্যানে দেখা যায় পুরনো আতিয়া বা নবীন টাঙ্গাইল মহকুমার তিনটি থানা মিলিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত নারী -পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪৭৯ জনে এবং লেখাপড়া জানা শিক্ষিতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫,২৫৩ জনে। এরা যথাক্রমে বাংলা, আরবি, উর্দূ, ফার্সি জানা লোক [৩২]।

দেলদুয়ার জমিদারদের মধ্যেকার সবচেয়ে খ্যাতিমান পুরুষ নওয়াব স্যার আবদুল করিম খান গজনবী। নিজ মাতা করিমুন্নেসার হাতে অক্ষর জ্ঞান শেখে, কলিকাতায় প্রাথমিক স্কুলে পড়াশুনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ইংল্যান্ডের কোন একটি পাবলিক স্কুলে তাকে ভর্তি করা হয়। ইংল্যান্ডের ডেভেনশায়ারে অন্তর্গত এক্সমাউথের সেন্ট পিটার্স স্কুল থেকে এন্ট্রাশ পাশ করেন। লন্ডনের মেসার্স বেন এ্যান্ড গাটে ইনস্টিটিউশন থেকে হায়ার এন্ট্রাশ বা দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হন। অতপর লন্ডনের অক্সফোর্ড ও জার্মানীর জেনা ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন ও পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। এছাড়া তিনি ফ্রান্স ও ইটালীতে কিছুকাল অতিবাহিত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উক্ত ভাষা সমূহ শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই এ সময় পরিভ্রমন করে তরুন বয়সে ইউরোপের শিক্ষা কেন্দ্র সমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৯০ সালেই তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আই সি এস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সরকারী চাকুরীতে যোগদান না করে তিনি ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং দেলদুয়ার এস্টেটের জমিদারী দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন[৮৩]।

সম্ভবতঃ এই সময়ে দেলদুয়ার জমিদারী নিয়ে সৃষ্ট আন্তঃবিরোধ এবং এস্টেট ম্যানেজার খ্যাতিমান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের সাথে মাতার বিরোধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে নিজের উচ্চ শিক্ষাকে জমিদারী আয় উন্নতিতে কাজ লাগানোর চিন্তা করে আবদুল করিম গজনবী দেশে ফিরে আসেন। তার পরবর্তী জীবনের কর্মকান্ড এ ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। উল্লেখ্য ১৮৯৪ সালে তিনি যখন বাইশ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন, তখন তার মত উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি মুসলমান সমাজে খুব বেশী ছিল না[৮৪]।

উচ্চশিক্ষিত আবদুল করিম গজনবী জমিদারী পরিচালনার মধ্যেই নিজেকে সীমিত রাখেননি এবং অচিরেই রাষ্ট্রীয় উচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখেন। বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আবদুল করিম গজনবী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমান এলাকা থেকে ১৯০৯ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ইমপিরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে এবং ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর মুসলমান এলাকা থেকে ভাইসরয় কাউন্সিলে সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন। এ দায়িত্বে থাকার সুবাদে তিনি সর্বভারতীয় ও বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নে সরকার বা বড়লাটকে দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়ে নেন।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য ১৮৭১ সালে হান্টার রিপোর্ট প্রকাশের পর সরকারী সার্কুলারের মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নে তথা আরবি ও ইংরেজি শিক্ষার সমন্বয়ে মুসলমান শিক্ষায় আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। বিশ শতকের সূচনায় সেই প্রক্রিয়ারই দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। আধুনিক শিক্ষা সংস্কারের পক্ষে জনমত গঠন ও সরকারের নিকট দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা সমিতি গঠন, সম্মেলন আয়োজন ও কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলোর মধ্যে হর্নেল কমিটি (১৯১৪) ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ [৬৫]।

উক্ত কমিটি গঠনের পটভূমিতে যেমন রয়েছে এ.কে. গজনবীর একক ভূমিকা, তেমনি কমিটি কর্তৃক মুসলমান শিক্ষা উন্নয়নে সুপারিশমালা তৈরী ও তার বাস্তবায়নে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে আবদুল করিম গজনবী দিল্লীতে গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের সকল মুসলিম সদস্যদের এক কনফারেন্সের আয়োজন করেন। ঐ কনফারেন্সে তিনি মুসলিম শিক্ষা বিষয়ের প্রতি স্বয়ং বড়লাট এবং বড়লাট পরিষদের শিক্ষা সদস্য স্যার হারকোর্ট বাটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। আবদুল করিম গজনবীর প্রস্তাব এবং সরকারের সম্মতি ও কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার ১৯১৩ সালের ৩রা এপ্রিল এক পত্রে সকল প্রাদেশিক সরকারকে মোহামেডান এডুকেশনাল এডভাইজরী কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী বাংলায় প্রদেশের জনশিক্ষা পরিচালক ডব্লিউ ডব্লিউ হর্নেল নেতৃত্বে ১৯১৪ সালে প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। যা সাধারণভাবে হর্ণেল কমিটি নামে অভিহিত হয়। আবদুল করিম গজনবী ছিলেন ১৪ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির অন্যতম বেসরকারী সদস্য [৬৬]।

কমিটির সভায় আবদুল করিম গযনবী সার্বিক মুসলিম শিক্ষানীতি, প্রাইমারী থেকে মেট্রিকুলেশন পর্যন্ত পাঠ্যসূচী, কারিগরী ও বাণিজ্য শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশমালা পেশ করেন। তার ঐ সুপারিশমালা এডভাইজরী কমিটির রিপোর্টের সাথে প্রকাশিত হয়। পরে তা 'মোসলেম এডুকেশন ইন বেঙ্গল' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

আবদুল করিম গজনবীর সুপারিশ সমূহের মূল কথা ছিল প্রাইমারী শিক্ষার মাধ্যম হবে শুধু বাংলা, তবে আধুনিক জ্ঞানার্জন ও ধর্ম শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও সামান্য মাত্রায় আরবি শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকাসহ যে সকল স্থানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা উর্দু;

Dhaka University Institutional Repository

শুধু সেখানেই উর্দুর মাধ্যমে প্রাইমারী শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় স্তরে মাধ্যমিক পর্যায়ে (৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী) মাতৃভাষারূপে হয় বাংলা, নয় উর্দু; একটি নিতে হবে। আর ইংরেজি ও আরবি বাধ্যতামূলক হবে। উচ্চতর পর্যায়ে তথা আই, এ, বি,এ পর্যায়ে মাতৃভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। সকল প্রতিষ্ঠানে কারিগরী ও বাণিজ্যিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। স্ত্রী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। মুসলমানদের জন্য এলক্ষ্যে কোন স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, বরং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে দিকগুলো মুসলমান শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে পারছেনা, কেবল সেগুলোর সংশোধন করে নেয়া উচিত কিংবা স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা উচিত "[৬৭]।

এম. আবদুল্লাহ বলেন- " আবদুল করীম গযনবী অভিপ্রেত শিক্ষানীতির বিশ্লেষণ করা হলে প্রতীয়মান হবে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল। যে সময় এদেশে স্ত্রী শিক্ষার কথা উচ্চারণ করাই ছিল অপরাধ, সেই যুগে তিনি স্ত্রী শিক্ষাকে পুরুষদের শিক্ষার চেয়ে ও অধিকতর জরুরী বলে ঘোষণা করেন। আধুনিক জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি প্রাইমারী থেকে ইংরেজি শিক্ষাদানের পরামর্শ দেন। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাপন্ন করে তোলার মানসে তিনি প্রাথমিক স্তর থেকে আরবির ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করেন। আই,এ ও বি,এ পর্যায়ে মাতৃভাষাকে বাধ্যতামূলক করা তিনি সমীচীন মনে করেননি। তার ঐসব অভিমত এখনো বুদ্ধিজীবীদের কাছে একটি চিন্তনীয় বিষয় হয়ে রয়েছে "[৬৮]।

পারিবারিক পরিমন্ডলের ভাষা উর্দূ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষার প্রতি আবদুল করিমের যে অনুরাগ দেখা যায় সমসাময়িক কালের মুসলমান নেতাদের মধ্যে কেবল নওয়াব আলী চৌধুরী ব্যতীত অপর কোন নেতার মধ্যে তা দেখা যায় না। ১৯২৮ সালে ডিসেম্বরে হারটগ কমিটিতে স্বাক্ষ্য প্রদান কালে আবদুল করিম গযনবী বাংলাকেই বাঙ্গালীদের সার্বজনীন মাতৃভাষা রূপে অভিহিত করেন। সে সময় বহু মুসলমান নেতাও পত্র-পত্রিকায় তার এই মতামতের সমালোচনা পর্যন্ত করেছিলেন। অনেকে সরাসরি ভারতের 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসেবে উর্দূর পক্ষেই ওকালতি করেছেন। একমাত্র স্কুল ইনস্পেক্টর মৌলভী আবদুল করীম বিভিন্ন পত্র -পত্রিকায় এক বিবৃতিতে আবদুল করিম গযনবীর মতামতের প্রশংসা ও তার বক্তব্যের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি তুলে ধরেন"[৬৯]।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল করিম গজনবীর ভ্রাতা স্যার আবদুল হালিম গজনবী ১৯২৯ সাল থেকে ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। মাত্র দু বছরের ছোট আবদুল হালিম কলিকাতার সিটি স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে উচ্চ শিক্ষা ও গ্রাজুয়েশন প্রাপ্ত হন। তিনি সরকার বিরোধী কংগ্রেসী রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী হিসেবে বেশী সুপরিচিত ছিলেন। তবুও ব্যক্তি উদ্যোগে মুসলিম শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন। কর্মজীবনের শুরুতে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, লোকাল বোর্ডের সদস্য ও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ফলে এই সময়ে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে আর্থিক বরাদ্দ সহ শিক্ষা সংস্কৃতিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িতও ছিলেন। যেমন- ঢাকা ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, এবং বেংগল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তিনি কলকাতা সিটি কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন। এমনকি ১৯৪৮ সালে কলকাতা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসার সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে ট্রাস্ট ডীড করেছিলেন , তাতে তিনি সিটি কলেজ স্কুলের জন্য বাৎসরিক দু'টি রৌপ্য পদকের ব্যবস্থা রেখেছিলেন[১৮]। টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে প্রতিষ্ঠিত অদ্যাবধি বিদ্যমান স্যার আবদুল হালিম গযনবী হাইস্কুল তার শিক্ষানুরাগ ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার অনন্য স্বাক্ষর হিসেবে বিদ্যমান।

দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর প্রখ্যাত জমিদার নওয়াব আবদুস সোবহান চোধুরী ; বৈবাহিক সূত্রে তিনি শেলবর্ষ পরগনার বিশাল সম্পত্তি পান, পরবর্তীতে বগুড়ার নবাব হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বগুড়া ও কলকাতায় থেকে তিনি বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ১৮৯০ সালে বগুড়া পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য একটি দালান নির্মাণ করেন, যা পরে 'উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরী' হিসেবে নাম করণ করা হয়। ১৮৮৭ সালে বগুড়ার ভিক্টোরিয়া মাদ্রাসা স্থাপন ও তার ভবন নির্মাণ করেন। এটি প্রথমে ছিল মক্তব, পরবর্তীতে সেন্ট্রাল মাদ্রাসা, আরো পরে হাইস্কুলে পরিণত হয়। ১৮৮২ সাল থেকে মাসিক আট টাকা হারে কয়েকটি ছাত্র বৃত্তি, তিনটি পুরস্কার ও দুটি মূল্যবান পদক বাবদ তিন হাজার টাকা শিক্ষা বিভাগকে প্রদান করেন।

সংগঠনগত ভাবে তিনি নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর শিক্ষা কর্মসূচী ও আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' অধিবেশনে যোগ দেন। ঢাকায় 'মোহামেডান হল' নির্মাণের জন্য নিজে চাঁদা দেন ও অন্যদের থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। ১৯১০ সালে এই সংগঠনের বগুড়ায় তৃতীয় বার্ষিক

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অধিবেশনে উর্দু, ফার্সি ও আরবিতে দক্ষ সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী উর্দুতে একটি স্বাগত অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। পরে দৌহিত্র সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী সেটি বাংলায় পাঠ করে শোনান। ভাষনে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং একটি বিশেষ শিক্ষা কর ধার্য্য করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সম্মেলনে গৃহীত হলেও গভর্ণমেন্ট কর্তৃক তা বাস্তবায়িত হয়নি। এতদসত্ত্বেও শিক্ষা উন্নয়নে তার ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে মুসলমান নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেন। এমনকি শিক্ষা- সাংস্কৃতির উন্নয়নে তার অবদান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ১৮৮২ সালের সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় পত্রে, ১৮৯১ সালে সরকারের নিকট প্রেরিত বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শারপের এক রিপোর্টে, এমনকি ১৮৯৪ সালে নওয়াব উপাধি প্রদান অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর চারলস্ এলিয়েট শিক্ষা সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার অবদানের কথা স্বীকার করেন। বিশেষ করে বগুড়া শহরে স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপন, ছাত্রবৃত্তি ও পদবী দান, নিজ জেলার সাধারণ শিক্ষা বিশেষত স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি বিধানের কথা স্বরণ করেন [১১]।

দেলদুয়ারের দক্ষিণ বাড়ীর অপর খ্যাতিমান জমিদার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী এতদাঞ্চলের শিক্ষা উন্নয়নে ও মুসলমানদের শিক্ষা আন্দোলনে অর্থ সাহায্য দিয়ে ভূমিকা পালন করেছিলেন। সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। নিজ ব্যায়ে দেলদুয়ারে একটি মিডল ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। পরে এটি সৈয়দ আবদুল জব্বার সরকারী হাইস্কুলে পরিণত হয়। তিনি ১৮১৮ সালে লর্ড ডাফরীন কর্তৃক ঢাকা আগমনে তাকে প্রদত্ত মুসলিম ডেলিগেট সদস্য হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে লক্ষীবাজারে ডাফরীনের নামে একটি মুসলিম হোষ্টেল 'ডাফরিন মুসলিম হোস্টেল' নির্মাণের জন্য সে সময় ১০০০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলন। উল্লেখ্য আতিয়ার চাঁদ ও বাংলার দ্বিতীয় মহসিন খ্যাত করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পিতা হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী এই ডেলিগেটে অংশ নেন এবং ৫০০০ টাকা চাঁদা দেন[১২]।

দেলদুয়ার জমিদারীর সাথে আত্মীয়তা সূত্রে সম্পর্কিত ও পার্শ্ববর্তী আতিয়া আদি জমিদারীর মূল ধারার জমিদার করটিয়ার মৌলভী ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছিলেন এতদাঞ্চলের শিক্ষা উন্নয়নে সবচেয়ে ত্যাগী ও দানশীল জমিদার। এক্ষেত্রে ঢাকার নবাব পরিবারের পরেই সম্ভবত সমগ্র বাংলায় তার স্থান

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া যেতে পারে। তিনি ১৯০১ সালে পিতা প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরেজি স্কুলটিকে করটিয়া হাইস্কুলে উন্নীত করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় মুসলমানদের স্কুল- কলেজ বর্জনের ফলে তারা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। তখন চাঁদ মিঞা জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে এই সন্ধিক্ষনে জীবনের আরদ্ধ শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক কর্মকান্ডে আরো বেশী এগিয়ে এলেন। তার প্রতিষ্ঠিত এ্যাংলো ওরিয়েন্টোল হাইস্কুল যা এ সময়ে ন্যাশনাল স্কুলে পরিণত হয়। তাকে ১৯২৬ সালে পুনর্গঠন করে 'মাহমুদিয়া হাইস্কুল' নামকরণ করেন এবং দেশখ্যাত শিক্ষাবীদ অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে এর প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেন। একই বছর দাদার নামে 'করটিয়া সাদাত কলেজ' দাদীর নামে 'রোকেয়া হাই মাদ্রাসা' স্থাপন করেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর পরিচালনায় এটি সমগ্র বাংলার প্রথম কলেজ এবং আলীগড় বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে পুর্ণাঙ্গ আবাসিক কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সৈয়দ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী করটিয়াকে আলীগড় মডেলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এর পর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিচালনার জন্য তিনি তৎকালীন তিন লাখ টাকা আয়ের জমিদারী ওয়াক্ফ করেন। এতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বরাদ্দ করেন জমিদারী আয়ের মাত্র এক চতুর্থাংশ[৭৩]।

ব্যক্তি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থদানের পাশাপাশি ওয়াজেদ আলী খান পন্নী শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং শিক্ষা আন্দোলনে জীবনের প্রথম পর্বে সংগঠনিকভাবে স্বীয় মেধা ও অর্থ ব্যয় করেন। ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ এর আঞ্জুমানে ইসলামীয়া সংগঠনের এক সময় তিনি সভাপতি ছিলেন। নওয়াব আলী চৌধুরী, এ. কে. গজনবী প্রমুখ এলাকার জমিদার বর্গ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দ অনেকেই এই সংগঠনের সহসভাপতি ছিলেন, সদস্য ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে ও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জাতীয় জাগরণের আন্দোলন ও সংগ্রামে তিনি সক্রিয় নেতা ও কর্মী ছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি তাদের শিক্ষা আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। গৃহশিক্ষকের কাছে অনানুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা লাভ করেই তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি ও উর্দূতে জ্ঞানার্জন করেন এবং দক্ষতার সাথেই সমিতির নেতৃত্ব দেন ও বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতি ও অতিথির বক্তব্য রাখেন, বিভিন্ন সরকারী কমিশনে সাক্ষাৎ দেন[৭৪]।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন পর্বে মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়ন ও আন্দোলন কয়েকটি স্তরে বিকশিত হয়। প্রথম স্তরে নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এবং সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে, জনমত গঠনে, সরকারের মনোভাব পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে ইংরেজ কর্মকর্তা ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের অনুষ্কানী রিপোর্ট ও প্রতিবেদন ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হলে সরকার ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ উভয়ের মাঝেই নয়া বোধোদয় হয়। যে সরকারী সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় মুসলিম শিক্ষা সংযুক্ত করতে বাধ্য হয়। আবদুল্লাহর মতে, এখানেই মুসলিম শিক্ষার প্রতি বৃটিশ সরকারের বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন সূচীত হয় (১৮৭১ সালের মেয়ো সরকারের সার্কুলার)। এখানেই মুসলমানরা তাদের হারানো সম্বিৎ ফিরে পায় এবং উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রতি ধাবিত হয়। যদিও তখনো অন্যান্য বাধা অপরিবর্তিত ছিল। ১৮৮২ সালের হান্টার শিক্ষা কমিশনে এসব বাধা দূর করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়[১৫]।

এই উদ্যোগ প্রক্রিয়াকে বেসরকারী পর্যায়ে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক সভা, সমিতি, সম্মিলন এবং সংবাদপত্র-সাময়িকী আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু বিশ শতকের সূচনায় এই প্রক্রিয়া (ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা) যখন আর আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে কোন ভূমিকা পালন করতে পারছিল না ; তখন নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব শামসুল হুদা, মাওলানা আবু নসর ওয়াহিদের উদ্যোগে নয়া শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের প্রেক্ষিত তৈরী হয়। ১৯০৩ সালে মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স এর বাংলায় শাখা স্থাপনের মাধ্যমে বাংলার মুসলিম শিক্ষা আন্দোলন এই নবতর স্তরে উন্নীত হয়। নিউ স্কীম মাদ্রাসা ও যুগোপযোগী মুসলিম শিক্ষা পুনর্গঠনের এই নীতি আন্দোলন বাস্তবায়নে সরকারী উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন নবাব স্যার আবদুল করিম গজনবী এবং তৃতীয় পর্যায়ে শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক। আর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বাস্তব আন্দোলনে এগিয়ে আসেন ঢাকার নবাব পরিবারের পরেই আতিয়ার সৈয়দ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ও দেলদুয়ার তথা পরবর্তীতে বগুড়ার সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী। এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উত্থিত স্কুল ইনস্পেক্টর মৌলভী আবদুল করিম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যত বাংলার মুসলিম শিক্ষা আন্দোলনে এ সময় দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায় এর একটি হলো ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভকারী অগ্রগামী চিন্তার ধারক জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা হলেন যথাক্রমে নবাব স্যার আবদুল করিম গজনবী, স্যার আবুল হালিম গজনবী, ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল, স্যার আবদুর রহিম, শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক , বেগম রোকেয়া, স্কুল ইনস্পেক্টর মৌলভী আবুল করিম প্রমুখ। অপর ধারা সমাজের প্রভাবশালী, দেশীয় উচ্চ শিক্ষা লাভকারী জমিদার শ্রেণী এবং মাদ্রাসা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরা হলেন যথাক্রমে নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব সিরাজুল ইসলাম, নবাব শামসুল হুদা, নবাব সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী, মাওলানা আবু নসর ওয়াহিদ প্রমুখ।

শিক্ষা কেন্দ্রিক এই দ্বিবিধ ধারার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় কলকাতার পাশাপাশি ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, বগুড়া, যশোর প্রভৃতি মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র তথা জেলা ও মহকুমা সমূহে। এই সব নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ.কে. গজনবীর ভূমিকা নানা দৃষ্টিকোণ থেকেই স্বতন্ত্র বলা যায়। সমকালীন অন্যান্য জমিদারগণ যেখানে ১৯০৩ সাল থেকেই বিভিন্ন কনফারেন্স সভা, সমিতি, আয়োজন, প্রস্তাবনা পাশ, ডেলিগেট প্রেরণ ইত্যাদি দীর্ঘ মেয়াদী, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য কাজের মাধ্যমে শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। সেখানে এ.কে. গজনবী দল ও সমিতি চর্চা থেকে সাধারণ ভাবে দূরে থেকে মাত্র একটি কনফারেন্সের মাধ্যমেই প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দিল্লীতে কনফারেন্সের আয়োজন করেন। এরই মাধ্যমে সমগ্র ভারতে এবং হর্ণেল কমিটির মাধ্যমে সমগ্র বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নবস্তরে উন্নীত করেন।

হর্ণেল কমিটিতে তার প্রদত্ত সুপারিশ ও নোট সমূহ অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও প্রগতিশীল ছিল। তার প্রচেষ্টায় এভাবে সরকারী উদ্যোগে বাংলা ও ভারত ব্যাপী কমিটি গঠিত না হলে বাংলা ও ভারতে মুসলমান শিক্ষার জন্য দেশবাসীকে আরো অনেক কাল অপেক্ষা করতে হতো।

আবদুল করিম গজনবীর ভূমিকার গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায় হর্ণেল কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট ও সুপারিশ সমূহের বাস্তবায়নে। কমিটি বাংলার মুসলমাদের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় ও স্ত্রী শিক্ষার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে মোট ১৯৭ টি সুপারিশ করে। এর আলোকে সরকার একটি সার্কুলার প্রকাশ ও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো- মুসলমানদের স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ডিস্ট্রিক বোর্ড সমূহের শিক্ষা কমিটিতে মুসলমান সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, টেক্সস্টবুক কমিটিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন বাংলা করা, মক্তবের জন্য জেলা বোর্ডের স্বতন্ত্র বাজেট বরাদ্দ, বিভিন্ন স্কুল পরিচালনা কমিটিতে মুসলিম সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, স্কুলে অধিক সংখ্যক মুসলিম শিক্ষক নিয়োগ, উর্দূকে দ্বিতীয় পাঠ্য ভাষা হিসেবে অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটে অধিক সংখ্যক মুসলমান নিয়োগ, মহসিন ফান্ডের আরো সম্প্রসারণ, একাডেমিক প্রতিটি কমিটিতে অন্ততঃ একজন মুসলমান সদস্য নিয়োগ, মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলাম সংস্কার, স্কুল কলেজ টেকস্টবুক বোর্ডে মুসলিম লেখকদের গ্রন্থ পাঠ্য করা সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ[৭৬]।

এর মধ্যে তড়িৎ গতিতে সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা হলো- স্কুল, কলেজে ২৫% আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ এবং প্রধান ৪টি মাদ্রাসার (ওল্ড স্কীমে প্রতিষ্ঠিত) জন্য সরকারী রাজস্ব তহবিল গঠন, মুহসিন ফান্ডের অর্থ সহযোগিতা সারাদেশে সম্প্রসারণ, সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক (মুসলিম) পদ সৃষ্টি ও মুসলিম শিক্ষাবিদ নিয়োগ, কলকাতায় টেলর হোস্টেল স্থাপন ও বেকার হোস্টেলে মুসলমান ছাত্রের জন্য ৭০টি সীট সংরক্ষণ এবং মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি[৭৭]।

অতঃপর হার্ন্টে কমিটি (১৯১৬), বিস কমিটি (১৮১৮) , শামসুল হুদা কমিটি (১৯২১), নাথান কমিটি (১৯১৭), মোমেন কমিটি (১৯৩১), মাওলা বখশ কমিটি (১৯৩৮) ও মোয়াজ্জম কমিটি (১৯৪৬) গঠিত হলেও কেবল মাত্র মাওলা বখশ কমিটিই উক্ত কমিটির ফলো আপ কমিটি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে । শেরে বাংলা একে এম ফজলুল হক কর্তৃক এর সুপারিশ সমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলার মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে তৃতীয় অধ্যয়ের মাইল ফলক উন্মোচিত হয়। ৪৭ এর স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষা ধারা অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯. আঞ্চলিক সাহিত্য, সংবাদপত্র-সাময়িকী ও সভা-সমিতি আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ ও সাংস্কৃতির জাগরণে জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ঃ

সিপাহি বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এদেশে ক্ষমতার প্রাদপ্রদীপ থেকে ইউরোপের সামন্তবাদী বণিকতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং অংশত রেঁনেসা চিন্তারধারক বণিকতন্ত্রের নেতৃত্বে বাংলা-ভারতে শাসন কর্তৃত্ব পরিচালিত হয়। সরাসরি বৃটিশ রাজকীয় শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে নয়া সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরী হয়। যাকে ঐতিহাসিকগণ এক কথায় আধা ঔপনিবেশিক বিকৃত সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেন।

বস্তুত সিপাহি বিপ্লবের পটভূমিতে বঙ্গবাসীর অন্তঃজীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে, বঙ্গবাসীর চিত্ত জেগে ওঠে বিভিন্নভাবে। সিপাহি বিপ্লবের বহু আগেই হিন্দু সম্প্রাদায়ের মাঝে বেসরকারী হিন্দু কলেজ ও সরকারী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কে কেন্দ্র করে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও রামমোহন রায়ের তৎপরতায় পাশ্চাত্য ভাবধারায় ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। নব্য হিন্দু বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে প্রথম গদ্য সাহিত্য চর্চার এক নব সূচনা ঘটে। আর এ কলেজদ্বয়কে কেন্দ্র করে ডিরোজী ও ডেভিড হেয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তার ধারক 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে নব্য বিপ্লবী গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে। আবার এদের বিরুদ্ধে ঐতিহ্যবাদী সংস্কারকদের পাল্টা অভ্যুদয় ঘটে। এভাবে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ও রক্ষনশীল প্রতিক্রিয়াশীল অথচ সংস্কারবাদী অভিজাতদের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের প্রেক্ষিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারাজাত সাহিত্য ও সংবাদ পত্র আন্দোলনের সূচনা হয়।

সিপাহি বিপ্লবের পূর্বেই কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলার হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও উদীয়মান হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্যোগে সংবাদপত্র ও সাহিত্য আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়। ধীরে ধীরে তা মফস্বল শহর ও গ্রাম পর্যায়ে হিন্দু মানস লোককে প্রভাবিত করতে থাকে।

কিন্তু বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা কারনে দেরীতে ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফলে কলকাতা কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র মুসলিম মধ্যবিত্ত শিক্ষিত গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে অনেক দেরীতে। সিপাহি বিদ্রোহ পরবর্তী নয়া আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে মুসলমানদের মধ্যে নব চিন্তার উন্মেষ ঘটে। ততদিনে হিন্দুদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রশাসন সহ সর্বত্র ঝোঁকে বসে।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের মধ্যে এ সময় হাতে গোনা কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত। এদের মধ্যে নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী এসময় শিক্ষা আন্দোলন সহ বিভিন্ন সংস্কারবাদী কর্মকান্ডের সূচনা করেন। ফলে অচিরেই ক্ষুদ্র ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে এই শ্রেণী নয়া চেতনাজাত মুসলিম অভিজাত জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী জাগরণের এবং খৃষ্টান ধর্ম প্রচারনার বিরুদ্ধে কর্মকৌশল গ্রহণ করে। তারা প্রথমে কলকাতা ও পরে মফস্বল শহর কেন্দ্রিক সাহিত্য ও সংবাদ পত্র আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জাগরণে সচেষ্ট হয়। একই সাথে সভা-সমিতি গঠন এবং সম্মেলন, ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে হাজার বছরের নীরব বাংলার গ্রামীণ জীবনে প্রাণচঞ্চলতা সৃষ্টি করে।

কলকাতা কেন্দ্রিক মুসলিম জাগরণের এই ঢেউ অচিরেই মফস্বল শহর টাঙ্গাইলে এসে পড়ে। মুসলিম মধ্যবিত্ত নয়া সাহিত্যিক কবি, শিক্ষক ও পন্ডিতদের উদ্যোগে জমিদার প্রভাবিত এতদাঞ্চলের আধা কলকাতাবাসী ও আধা দেলদুয়ার-করটিয়া নিবাসী মুসলমান জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংবাদ পত্র-সাময়িকী ও সভা-সমিতি আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মৌল প্রকৃতি ছিল একদিকে রক্ষনশীল চেতনাজাত, অপরটি ছিল উদার ও অগ্রগামী চিন্তা চেতনার ধারক। এহেন প্রেক্ষাপটে দেলদুয়ার আতিয়া জমিদারদের ভূমিকা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা এবং সাধারণ কৃষক ও কর্মজীবী শ্রেণীর ভূমিকা গবেষণার দাবী রাখে।

দেলদুয়ার জমিদারদের উদারনৈতিক ধারা বনাম করটিয়া জমিদারদের রক্ষনশীল ধারার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সন্তোষ ও অন্যান্য হিন্দু জমিদারদের ভূমিকা ঃ

দেলদুয়ার, করটিয়া, পাকুল্লা, ধনবাড়ী প্রমুখ এতদাঞ্চলের বড় ও ঐতিহ্যবাহী জমিদারদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু।[৮] এছাড়া শায়েস্তাবাদ, মকীমপুর, বগুড়া, রংপুর, পায়রাবন্দের সাবের পরিবার, ঢাকার নবাব পরিবার সহ অধিকাংশ জমিদার পরিবার এবং নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবার সমূহ যেমন নওয়াব আব্দুল লতিফ, আমীর আলী ও সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের পরিবারের ভাষা ছিল উর্দূ। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই সব পরিবারের সদস্যগণ দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা কিংবা ব্যক্তিগত চেষ্টার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা রপ্ত করেন এবং অনেক সদস্য নতুন কালচারের অংশ হিসেবে সাধারণ কথাবার্তায় ইংরেজি চর্চা করতেন।[৯] তবে এই দু'ভাষা ছাড়াও আরবি, ফার্সি ভাষায় অনেকের দখল ছিল প্রায় বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

উল্লেখ্য উত্তর ভারতের লোকায়ত মৌখিক ভাষা ছিল উর্দূ। সম্রাট শাহজাহানের আমল থেকে সেনা ছাউনি ছেড়ে দরবার এবং দরবার থেকে সারাদেশের অভিজাত পরিবার সমূহে পারিবারিক ভাষা হিসেবে উর্দু ছড়িয়ে পড়ে।[৮০] অচিরেই এটি সর্বভারতীয় অভিজাত মুসলমানের ভাষা হিসেবে আবির্ভুত হয়। যেমন সুলতানী আমলে আরবি এবং মুঘল আমলে ফার্সি রাজভাষা বা অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে এসে জমিদার ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী উর্দূ, ফার্সি, ইংরেজি এই তিনটি ভাষারই চর্চা করেছেন। ভাষার এ বেড়ী ভেঙ্গে এগিয়ে এসে বাংলা ভাষায় বিদ্যা ও সাহিত্য চর্চা শুরু করে মীর মশাররফ, কায়কোবাদ, বেগম রোকেয়া প্রমুখ মুসলিম সাহিত্যিক। [৮১] বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় এরা আবার দেলদুয়ার ও অন্যান্য মুসলিম জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

মীর মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায় পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত একজন জমিদার ছিলেন।[৮২] কিন্তু পৈতৃক জমিদারীর বিভিন্ন মহল নিলাম ও আত্মীয় কর্তৃক কতেক অংশ জবর দখলের ফলে জমিদারী আয়ে স্বচ্ছল ভাবে চলছিলনা। ফলে তিনি কোন বড় জমিদারীতে এস্টেট ম্যানেজারের চাকুরি খুঁজছিলেন, এই সময় দেলদুয়ারের বিধবা জমিদার করিমুন্নেসা খানম একজন যোগ্য এস্টেট ম্যানেজার খুজছিলেন। ততদিনে মীর মশাররফের সাহিত্য প্রতিভার খবর অভিজাত ও শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে করিমুন্নেসা খানম যথাযথ মর্যাদার সাথেই দেলদুয়ার এস্টেট ম্যানেজার হিসেবে তাকে নিয়োগ দেন এবং তার সাহিত্য প্রতিভাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন।

মীর মশাররফ হোসেন ১৮৮৪ সালে দেলদুয়ারের ম্যানেজার পদে যোগ দেন এবং দীর্ঘ দশ/বার বৎসর দেলদুয়ার অবস্থান করেন। সে হিসাবে ১৮৯৪ মতান্তরে ১৮৯৬ সালে দেলদুয়ার এস্টেট ম্যানেজারের পদ ছেড়ে আবার কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়ায়, পরে রংপুর, বগুড়া ও দীর্ঘকাল কলকাতায় অবস্থান করেন এবং জীবন সায়াহ্নে কৈশরের স্মৃতিবিজড়িত পদমদিতে অবস্থান করেন। তার দেলদুয়ার ত্যাগ স্বাভাবিক ভাবে হয়নি, কেননা দেলদুয়ারের বিভিন্ন এস্টেটের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব কলহে তিনি জড়িয়ে পড়েন। এমনকি মামলা জেল, জরিমানার শিকার হন [৮৩]। তার দেলদুয়ার ত্যাগের সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে [৮৪]।

মীর মশাররফের সাহিত্যিক কর্মের শ্রেষ্ঠ ফসল 'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) দেলদুয়ার ও টাঙ্গাইলে অবস্থান কালেই রচিত হয়। দেলদুয়ারে জমিদার বাড়ীর খোলা লনে বিশাল দেবদারু ও কৃষ্ণচূড়া গাছের

Dhaka University Institutional Repository

নীচে বিকেলের রৌদ্র ছায়ায় বসে বিষাদ সিন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ রচনা করেন। বহিঃ দেয়াল ঘেরা জমিদারী প্রসাদের সম্মুখ খোলা লনের ঐতিহাসিক বৃক্ষটি এখনো বিদ্যমান রয়েছে [৮৫]। বিষাদ সিন্ধু'র প্রথম খন্ড (১৮৮৫) প্রথম সংস্করণ তিনি দেলদুয়ার এস্টেটের প্রধান জমিদার করিমুন্নেসা খানমের নামে উৎসর্গ করেন[৮৬]।

করিমুন্নেসা খানম নিজেই ছিলেন কবি ও লেখক, একই সাথে সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক। পিতৃ ও শ্বশুরকুলের পারিবারিক পরিবেশ উর্দূ হওয়া সত্ত্বেও সাবের পরিবারের দুই সহোদর শিক্ষিত ভ্রাতার সহযোগিতায় এবং নিজ চেষ্টায় তিনি বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। স্বামীর প্রচ্ছন্ন সমর্থনে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অল্প বয়সে দুই শিশু পুত্রকে কলকাতা ও বিদেশে পাঠিয়ে উচ্চ শিক্ষা দান করেন। নিজে দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল ও কলকাতায় দৌড়াদৌড়ি করে, সে যুগের কঠিন পরিবেশে বাংলায় সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখেন [৮৭]।

বেগম করিমুন্নেসা খানমের সহোদর বোন বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশে ও নারী শিক্ষা আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল দেলদুয়ারের এই জমিদার পত্নীর অমূল্য অবদান। বেগম রোকেয়া শৈশবে এই বড় বোনের কাছেই বাংলা, ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। বিবাহপূর্বে দীর্ঘকাল দেলদুয়ার জমিদারীতে বড় বোনের সাথে থাকার সুবাদে বোনের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বেগম রোকেয়া এরই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার 'মতিচুর' ২য় খন্ড ১৯২১, গ্রন্থখানা করিমুন্নেসার নামে উৎসর্গ করেন। এছাড়া তার শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে করিমুন্নেসা ও দেলদুয়ার জমিদারগণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক অনেক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন [৮৮]।

দেলদুয়ার এস্টেটের অপর পক্ষ, বড়বাড়ী ও মধ্যবাড়ী জমিদারীর দু'অংশের পক্ষে এস্টেট ম্যানেজার ছিলেন আতিয়া মহকুমার চারান নিবাসী সাহিত্যক ও সাংবাদিক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই[৮৯]। তিনিও দেলদুয়ার জমিদারদের বিশেষ করে করিমুন্নেসা খানমের পৃষ্ঠাপোষকতায় স্বীয় সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। করিমুন্নেসার অর্থানুকূল্যে ও সার্বিক উৎসাহে দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল থেকে পাক্ষিক 'আহমদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মীর মশাররফ ছিলেন তার সহকর্মী। তিনজনের প্রচেষ্টায় অচিরেই পত্রিকাটি অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে খ্যাতি অর্জন করে। তার আগে থেকেই পার্শ্ববর্তী করটিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয় 'আখবারে ইসলামীয়া' পত্রিকা। এই পত্রিকার সাথে 'আহমদী' পত্রিকার ছিল অহিনুকুল সম্পর্ক, বিশেষত গো-হত্যা ও হানাফী লা-মাজহাবী প্রশ্নে। অন্যকথায় রক্ষনশীলতা ও উদারতা এবং ধর্মীয় পুণর্জাগরণ প্রশ্নে।

আশরাফ সিদ্দিকী ও অন্যান্য সাহিত্যিকের মতে, দেলদুয়ার জমিদার কন্যা নজমুন্নেসার সাথে আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাইর প্রেম ছিল। কিন্তু তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকেই আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই 'বিরাগ সঙ্গীত' (১৯৮০), 'প্রবোধ সঙ্গীত' ও 'উদাসী' কাব্যগ্রন্থ দুটি আধ্যাত্মিক প্রেম ধারায় প্রকাশ করেন [৮৫]।

বেগম করিমুন্নেসা খানমের পৃষ্ঠপোষকতায় মীর মশাররফ হোসেন তার লাহিনী পাড়া থেকে পূর্বে প্রকাশিত 'হিতকরী' পাক্ষিক পত্রিকা টাঙ্গাইলে এনে নতুন করে প্রকাশ করেন। টাঙ্গাইলের অপর খ্যাতিমান সাংবাদিক ও লেখক মোসলেম উদ্দীন খান এর যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। করিমুন্নেসার সাথে মীর মশাররফের মনোমালিন্য ও বিবাদের ফলে মীর এস্টেট ম্যানেজারী পদ ত্যাগ করে, এমনকি টাঙ্গাইল ছেড়ে চলে যান। করিমুন্নেসার উৎসাহ ও সহোযোগিতায় মোসলেম উদ্দীন খান 'সাপ্তাহিক টাঙ্গাইল হিতকরী' নামে পত্রিকাটি কিছু কাল সম্পাদনা করে টিকিয়ে রাখেন [৯১]। তিনিও বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করে লেখক, সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

ঐতিহ্যবাহী ও প্রতিভাবান দুই জমিদার পরিবারের রক্তের উত্তরাধিকার, বেগম করিমুন্নেসা খানমের দুই প্রতিভাবান পুত্র আবদুল করিম খান গজনবী ও আবদুল হালিম খান গজনবী একইভাবে ভাষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র - সাময়িকী আন্দোলনে মাতার ন্যায় পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন।

মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদের বিবরণ মতে, 'দেলদুয়ারের জমিদার মিঃ একে গজনবী সাহেব ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পন্ডিত রেয়াজ উদ্দীন মাশহাদী সাহেবকে স্বীয় এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। তিনি কলকাতা মাদ্রাসা ও জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপকের চাকুরী ছেড়ে স্বদেশে চলিয়া যান। .... ম্যানেজারী পদ গ্রহণের পর তিনি সাহিত্য সেবা হইতে এক প্রকার চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিযাছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী এবং উর্দূভাষায় মোটামুটি অধিকার ছিল' [৯২]।

Dhaka University Institutional Repository

টাঙ্গাইলের চারান গ্রাম নিবাসী পন্ডিত মাশহাদী ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার ও জেভিয়ার্স কলেজের আরবি, ফার্সির অধ্যাপক। দেলদুয়ার জমিদারদের আদিসূত্রের আত্মীয়। দেলদুয়ার জমিদারীর চার মহিলার আন্তঃদ্বন্দ্ব ও বিশৃংখল অবস্থার প্রেক্ষাপটে আবদুল করিম গজনবী ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে মায়ের কাছ থেকে স্বহস্তে জমিদারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ততদিনে মীর মশাররফ তার ম্যানেজার পদ ছেড়ে দিলে জমিদারীতে আরো বিশৃংখল অবস্থা দেখা দেয়। এই অবস্থায় আবদুল করিম গজনবী দ্রুত দেশে ফিরে জমিদারী দায়িত্ব গ্রহণ করে জমিদারীতে শৃংখলা ফিরে আনেন এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে জমিদারী আয় বৃদ্ধি করেন। স্বীয় চাচাত বোন সাইয়েদুন্নেসা খানমকে বিয়ে করে দেলদুয়ার ও কলকাতায় স্থায়ী হন। পন্ডিত মাশহাদীকে দেলদুয়ার জমিদারীর ম্যানেজার করে নিয়ে আসেন। মাশহাদী কলকাতার সাহিত্য সংবাদপত্র জগত ছেড়ে আমৃত্যু দেলদুয়ার ও চারানে অবস্থান করেন। ম্যানেজার পদ গ্রহণের পর তিনি সাহিত্য সেবা হতে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে তার সাহিত্যিক সহকর্মী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন যে কথা উল্লেখ করেছেন, তা সঠিক নয়। কেননা তার রচনা সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেলদুয়ারে আসার এর পরেও সুরিয়া বিজয় (১৮৯৫) গ্রন্থ সহ বেশ কিছু প্রবন্ধ তিনি রচনা ও প্রকাশ করেন[১৩]। অবশ্য 'সমাজ সংস্কারক' ও 'অগ্নিকুক্কুট' **সহ** তার মৌলিক রচনা সমূহ দেলদুয়ারে আগমনের পূর্বেই রচিত হয়। প্রথমটি বৃটিশের শ্যোন দৃষ্টিতে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়।

আলোচ্য সমাজ ও যুগ পর্বে মুসলমানদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি গ্রন্থ 'ইসলাম তত্ত্ব' গ্রন্থখানি 'সুধাকর' গোষ্ঠীর চারজনের সম্বিলিত প্রয়াসে লিখিত হয়। তন্মধ্যে রেয়াজ উদ্দিন মাশহাদী ছিলেন অন্যতম [১৪]। বস্তুত মিহির ও সুধাকর সাহিত্য গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয় তাকে কেন্দ্র করেই। কাজেই তিনি কেন কলকাতার পন্ডিত ও সৃষ্টিশীল সমাজ ছেড়ে গ্রামে চলে আসেন, এসম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যেমন পাওয়া যায় না তার সাহিত্যকর্ম ও ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক কোন তথ্য[১৫]।

দেলদুয়ারের খ্যাতনামা জমিদার নবাব স্যার আবদুল করিম গজনবী নিজেও ছিলেন একজন লেখক এবং ভাষা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তিনি তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন যথাক্রমে - (১) ভাষা ও শিক্ষা প্রস্তাবনা বিষয়ক 'মুসলিম এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (২) আরব ও ফিলিস্তিনে ভ্রমনের উপর ' পিলগ্রিম ট্রাফিক টু হেজাজ এন্ড প্যালেস্টাইন' (৩) রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক 'দি ওয়ার্কিং অবদি ডায়ার্কিকাল সিসটেম ইন বেঙ্গল'[১৬]। এই গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হলেও বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় না। জমিদার

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ীতে সংরক্ষিত থাকা কপিগুলো আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভুলক্রমে মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক আক্রমণে ও অগ্নি প্রজ্জ্বলনে ভস্মিভূত হয়ে যায়[৯৮]।

দেলদুয়ারের নিকটবর্তী, আত্মীয়তা সূত্রের টাঙ্গাইলের অপর বৃহৎ জমিদার করটিয়া জমিদারগণ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অফুরন্ত পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে রক্ষনশীল ধারার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লেখক, কবি ও সাহিত্যিকগণ বেশী বেশী তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- মৌলভী মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন, নওশের আলী খান ইউসুফজাই, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ প্রমুখ।

কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলার মুসলিম জাগরণের পুরোধা সুধাকর গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সুধাকর' প্রকাশে (১৮৮৯) করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন [৯৯]। পরবর্তীতে টাঙ্গাইলের অপর জমিদার দেলদুয়ারের আত্মীয় সূত্রে সম্পর্কিত নওয়াব আলী চৌধুরী এই পত্রিকা গোষ্ঠীকে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা দেন [১০০]। এই গোষ্ঠী থেকে উৎসাহ পেয়ে কলকাতা ও সারাদেশে বিভিন্ন মুসলিম সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশের হিড়িক পড়ে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি হয়। এই জাগরণের ঢেউ ধীরে ধীরে মফস্বল শহর ছেড়ে অনেক গ্রাম, পল্লীতে এসে পড়ে।

অবশ্য 'সুধাকর' প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বেই মাহমুদ আলী খান পন্নী নিজ বাড়ীতে 'মাহমুদিয়া' নামে একটি প্রেস জমিদারী নথিপত্র মুদ্রনের জন্য স্থাপন করেন। পরে মৌলভী নঈমুদ্দীনের সম্পাদনায় 'আখবারে ইসলামিয়া' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন[১০১]। এখান থেকেই এতদাঞ্চলের বিভিন্ন লেখক, সাহিত্যিক, ধর্মবেত্তার বিভিন্ন গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। একই ধারা অব্যাহত রাখেন তদীয় পুত্র আতিয়ার চাঁদ এবং বাংলার দ্বিতীয় ও পুর্বাঞ্চলীয় মহসিন খ্যাত মৌলভী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী। তিনি 'মিলনাশ্রম' নামে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। যাতে ' শাহনামার' পান্ডুলিপি সহ দুর্লভ সকল গ্রন্থ সংগ্রহে ছিল [১০২]।

নওশের আলী খান ইউসুফজাই টাঙ্গাইলের অপর রক্ষণশীল লেখক ও সাহিত্যিক। চারানের ক্ষুদে জমিদার হলেও পাকুল্লার খ্যাতনামা জমিদার মীর আতাহার আলীর মেয়েকে বিয়ে করে চারান থেকে পাকুল্লায় নিবাস গড়েন। উত্তরাধিকার সূত্রে দু তরফে ভূমিস্বত্বের অধিকারী হন। পাকুল্লা সাব রেজিষ্ট্রি

Dhaka University Institutional Repository

অফিসের প্রথম সাবরেজিষ্ট্রার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন ও পরে সাব ডেপুটি হন[১০৩]। ঢাকা কলেজে অধ্যায়ন কালে 'ঢাকা প্রকাশে' লেখালেখি প্রকাশ করেন। অতঃপর ইসলাম প্রচারক, নবনুর, মিহির ও সুধাকরে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেন । এভাবে অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন।

তিনি করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তার সাথে একত্রে সভাসমিতি ও শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং রক্ষনশীল ধারার নেতৃত্ব দেন। তার সকল গ্রন্থই করটিয়ার মাহমুদীয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। শুধু ব্যতিক্রম 'শৈশব কুসুম' কবিতা গ্রন্থ, এটি দেলদুয়ারের জমিদারদের মালিকানাধীন ' আহমদী প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয় [১০৩]। আর এই একটি কবিতা গ্রন্থেই কেবল স্বদেশ প্রেমের সাথে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য কামনা করা হয়েছে। তাই সম্ভবতঃ এটি উদার ও প্রগতিশীল ধারার আহমদী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

টাঙ্গাইলের অপর সাহিত্যিক, খ্যাতিমান প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ একইভাবে ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে করটিয়া জমিদারীর এস্টেট ম্যানেজার, করটিয়া হাইস্কুলের হেডমাষ্টার পরবর্তীতে করটিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং চাঁদ মিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল কর্মকান্ডের সার্বক্ষনিক সহযোগী। স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধীতা করে বিখ্যাত 'লাল ইস্তেহার' প্রণয়ন করে সারাদেশে খ্যাতিমান হয়ে পড়েন। দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার পর তিনি শিক্ষা বিভাগ সহ বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ দায়িত্ব পালন এবং একে একে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন[১০৪]। রক্ষণশীল ধারার অপর লেখক, সাহিত্যিক, ডভটন ও সেন্টজেভিয়ার্স কলেজের আরবি ও ফার্সির অধ্যাপক মেয়ারাজ উদ্দিন আহমদ বহুল পরিচিত 'ধর্ম যুদ্ধ' গ্রন্থটি করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীকে উৎসর্গ করেন[১০৫]। এভাবে টাঙ্গাইল ও টাঙ্গাইলের বাহিরের বহু লেখক, সাহিত্যিক কে পৃষ্ঠপোষকতা করেন আতিয়া-দেলদুয়ারের জমিদারগণ। এই ধারাকে আরো পরিপুষ্ঠ করেন ধনবাড়ীর জমিদার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী।

তবে করটিয়া ও ধনবাড়ী ধারা যেখানে রক্ষনশীল ধারার কবি, সাহিত্যিককে পৃষ্ঠপোষকতা করে; সেখানে দেলদুয়ার জমিদারগণ তুলনামূলক প্রগতিশীল, উদারমনা এবং হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য প্রয়াসী ধারার কবি, লেখক সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আর ব্যক্তিগতভাবে কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় করটিয়া-ধনবাড়ী জমিদারদের থেকে দেলদুয়ারের জমিদারগণ অনেক বেশী প্রগতিশীল, অনেক বেশী

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভাশালী ও উদার মন-মানসিকতার অধিকারী ছিল।' এর কারণ প্রথমতঃ উভয় ধারার পারিবারিক শিক্ষা, পরিবেশের ব্যতিক্রম ও বৈচিত্র্য। এই যুক্তি ঐতিহাসিকতাবে বিশ্বজনীন স্বীকৃত। অপর যে কারণটি এক্ষেত্রে কাজ করেছে, সম্ভবত তাহলে-- দুই বিপরীত অঞ্চলের মানুষের বিবাহ্ এবং সে সূত্রে দুই বিপরীত শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের সম্মিলনের ফলে পরবর্তী প্রজন্ম মেধাবী ও চৌকস হয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। এভাবে নানাবিধ কারণে আমরা একই জমিদারী অঞ্চলে এবং একই বংশধারার দুটি জমিদারীতে দু'ধরনের আর্থ-সামাজিক মন মানস, ও মূল্যবোধ বিরাজমান দেখতে পাই। অন্য কথায় জাতীয়ভাবে সমকালীন মুসলিম জমিদার সমাজে এবং মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণীতে বিদ্যমান দু'ধারার আর্থ-সামাজিক চেতনা আমরা আতিয়া ও দেলদুয়ার জমিদারীতে দেখতে পাই। সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র-সাময়িকী আন্দোলন এবং হিন্দু মসলিম সম্পর্ক নিরিখে বাংলার সামাজিক ধর্মজ- সাংস্কৃতিক জাগরণে জমিদার ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর ভুমিকা বিশেষ ভাবে গবেষণার দাবী রাখে।

উনিশ শতকের বাংলায় সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র-সাময়িকী আন্দোলন সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি ও জনমত গঠনে অনেক সহায়তা করে। বিশেষ করে জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন মানসিকতা, সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত অবস্থান এবং বৈপরীত্য বুঝতে সাহায্য করে[১০৩]। কোম্পানি শাসনের প্রথমপর্বে পুর্ববাংলা ও মুসলমান সমাজে কোন সভা-সমিতি কিংবা সংবাদপত্র-সাময়িকী প্রকাশ খুব একটা চোখে পড়ে না। এ সময়ের সভা-সমিতির সূচনা করে ইংরেজরা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর এই প্রক্রিয়া বিকশিত হয় কলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু পন্ডিত ও জমিদারদের উদ্যোগে। রাজা রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা', 'ব্রাহ্মসভা'! তার উত্তরাধিকারীদের তত্ত্বোধিনী সভা এবং হিন্দু জমিদারদের ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদি সভা-সমিতি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দু সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। এই শ্রেণী আবার সংস্কার ও রক্ষনশীল দুটি ধারায় বিভক্ত হয়। ফলে এ সময়ে কলকাতা থেকে জেলা শহর পর্যায়ে হিন্দু মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণীর মাঝে ব্যাপক অলোড়ন সৃষ্টি হয়।

এই সময় পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় পুনরুজ্জনবাদী সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ পড়লেও আর্থ-সামাজিক সংস্কার চেতনা সৃষ্টি হয়নি। ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্বের কোম্পানি শাসনের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে সিপাহি বিপ্লব উত্তর মুসলমানদের মাঝে আর্থ-সামাজিক সংস্কার চেতনা উদ্ভুত হয়। ইংরেজি শিক্ষিত তিনজন মধ্যবিত্ত মুসলিম নেতৃত্ব এ চেতনা সঞ্চারে এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে নওয়াব আব্দুল

Dhaka University Institutional Repository

লতিফ, তিনি কলিকাতা কেন্দ্রিক প্রথম মুসলমান সভা 'মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। কাছাকাছি সময়ে সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠা করেন 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। সারা দেশে মফস্বল জেলা সমূহে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সৈয়দ আহমেদ খানের তৎপরতা ছিল উত্তর ভারত সহ সমগ্র ভারতব্যাপী।

এদের মানস ও ভাব চেতনাকে পুঁজি করে একই সময়ে সারা দেশে জেলা শহর বা জমিদার এলাকার মফস্বল শহর গুলোতে হয় এদের শাখা সমিতি,নচেৎ নতুন কোন স্থানীয় সভা-সমিতি গড়ে উঠে। এ সময়ের কলকাতা ভিত্তিক মুসলিম সভা-সমিতিগুলো ভাষার প্রশ্নে উর্দু ফার্সির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে কিন্তু মফস্বলের অধিকাংশ সমিতি বাংলা ভাষার স্বপক্ষে প্রচার চালিয়েছে[১৮৭]।

ফলশ্রুতিতে পূর্ব বাংলায় ঢাকা কেন্দ্রিক সভা-সমিতি ও শিক্ষা আন্দোলনের অপর একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিন্টেডডেন্ট ওয়ায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী ১৮৯৭ সালে ঢাকার বিদগ্ধ সমাজ তথা ঢাকা আলিয়ার ছাত্র শিক্ষক নিয়ে 'সমাজ সম্মিলনী সভা' গড়ে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৩ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। টাঙ্গাইলের জমিদার, পরবর্তীকালে সাব রেজিষ্ট্রার নওশের আলী খান ইউসুফজাই; দেলদুয়ার জমিদারদের অপর আত্মীয় বলিয়াদীর জমিদার কাজেমুদ্দীন সিদ্দিকী এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন[১৮৮]। ঢাকার নবাবদের এ ধরনের সকল সংগঠনের প্রতি সকল সময়ই পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত ছিল।

অপরদিকে নওয়াব আবদুল লতিফের মৃত্যু এবং সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলে পূর্বের সংগঠনদ্বয় কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থায় ১৮৯৩ সালে প্রধানতঃ সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের উদ্যোগে গঠিত হয় কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই প্রথম কলকাতা কেন্দ্রিক একটি সংগঠনে টাঙ্গাইল সহ বিভিন্ন শহর ও মফস্বলের সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে এসেছেন। ১৮৯৫ সালের একটি তালিকা থেকে করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর নাম পাওয়া যায়[১৮৯]। ১৮৯৬ সালে ব্যারিষ্টার আবদুর রহিমের নেতৃত্বে আরেকটি সংগঠন মোহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। এতেও মফস্বলের জমিদার ও মধ্যবিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব ছিল। দেলদুয়ারের আত্মীয়তা সূত্রের শায়েস্তাবাদের জমিদার নবাব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন এই উদ্যোগের সাথে সক্রিয় ভাবে ছিলেন।

১৮৯৯ সালে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়নী মুসলমান সমিতি' গঠিত হয়। **মোহাম্মদ ইদরিস** এর মতে, এটিই পরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'তে রূপান্তরিত হয়'[১১১]।

বাংলার শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রদূত নওয়াব আলী চৌধুরীর উদ্যোগে সৈয়দ আহমদ প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সের বার্ষিক সভার অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের সাফল্যের ভিত্তিতে পরে, 'কলকাতা মোহামেডান ইউনিয়নের' উদ্যোগে ও সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের প্রস্তাবক্রমে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রচার ও জনপ্রিয়তায় মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের পরেই এই সংগঠন স্থান লাভ করে। সৈয়দ আহমেদের সংগঠনের অনুকরণে প্রতি বৎসর এদেশের বিভিন্ন জেলা শহরে এ সংগঠনের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জমিদারদের স্থায়ীভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ততা বেড়ে যায়। একই ভাবে শিক্ষা-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে মফস্বলের বা গ্রামের মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণও বেড়ে যায়।

দেলদুয়ারের জমিদার নবাব সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী ও সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী, করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, এবং পাকুল্লার ক্ষুদে জমিদার নওশের আলী খান ইউসুফজাই প্রমুখ এ সংগঠনে ও বাংলার শিক্ষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গ প্রদেশ বিভক্ত হলে, একে কেন্দ্র করে 'ঢাকা' নতুন শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের নয়া কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। ধনবাড়ীর জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরীর উদ্যোগে এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমে 'পুর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয় । এ সমিতি মুসলমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, আর অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা সে যুগে এমনটি হয়নি। ওয়াকিল আহমেদের মতে, 'এদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ, বাস্তবমুখী এবং প্রগতিশীল, তারা সাধারণ মানুষের সম্পর্শে এসেছেন, ধর্ম-শিক্ষার সংস্কার চেয়েছেন, নারী

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার আবশ্যকতার কথা বলেছেন, বুঝেছেন। জমিদার, চাকুরীজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে একত্র করেছেন। এটাই শিক্ষা সমিতির স্বাতন্ত্রের দিক ও সাফল্যের চাবিকাঠি [১১২]। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারগণ এবং তাদের আত্মীয়সূত্রের সকল জমিদার তথা করটিয়া, ধনবাড়ী, পাকুল্লার জমিদারগণ। দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর গজনবীগণ এই ধারার সভা-সমিতি থেকে দূরে থাকলেও প্রশাসনের উচ্চপদে থেকে প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে, সরকারী কমিটি গঠন ও সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিকল্প ও তৃতীয় পন্থায় শিক্ষা-সামাজিক আন্দোলনকে সাফল্যের দ্বারে পৌছে দিয়েছেন।

স্থানীয় ভিত্তিক বিভিন্ন সভা সমিতি গঠনেও জমিদারদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ময়মনসিংহ জেলায় ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আনজুমান-এ-ইসলামিয়া' ছিল এতদাঞ্চলের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত জনকল্যাণমূলক সমিতি। এতে দেলদুয়ার, করটিয়া ধনবাড়ীসহ প্রায় সকল আঞ্চলিক জমিদারদের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। ১৯২৩ সালের একটি রিপোর্টে সমিতির সভাপতি হিসেবে ওয়াজেদ আলী খান পন্নী এবং সহ সভাপতি হিসেবে নওয়াব আলী চৌধুরী ও এ, কে, গজনবীর নাম পাওয়া যায় [১১৩]।

এ.কে গজনবী বাংলার ছোট লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলর নিযুক্ত হলে তার স্থলে কংগ্রেস নেতা আবুল মনসুর আহমদ সহ সভাপতি হন। আঞ্জুমান কংগ্রেস বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় মুসলমান ভ্রাতাদের অনুরোধে তিনি এ পদ গ্রহণ করেন। আবার জেলা প্রজা সমিতির নেতা হিসেবে তিনি আঞ্জুমান বিরোধী ভূমিকা নিলে স্বাভাবিকভাবেই সহসভাপতি পদে ইস্তফা দেন[১১৪]।

দেলদুয়ার প্রথিতযশা সাহিত্যিক এবং লেখকদের পদাচারনায় মুখরিত থাকলেও তথায় দেলদুয়ার জমিদারের উদ্যোগে কোন ধর্মসভা বা সমিতি গড়ে তোলার তথ্য পাওয়া যায় না। তবে করটিয়ায় ওয়াজেদ আলী খানের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলভী মোহাম্মদ নঈমুদ্দীনের উদ্যোগে 'আনজুমানে মঈনাল ইসলাম' (১৮৯১) নামে একটি ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধর্মসভার সাথে জড়িত ছিলেন যথাক্রমে জমিদার নওশের আলী খান ইউসুফজাই, তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, নবাবজাদা মসউদ আলী খান পন্নী; লেখক মোসলেম উদ্দীন, ইব্রাহিম খান, মোতাহার আলী খান প্রমুখ। এদের মধ্যে মোসলেম উদ্দীন খান পরে এ সভা ছেড়ে গজনবীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মীর মশাররফ হোসেনের ও আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাইর নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল ধারায় চলে যান। প্রথমে মীর মশাররফের সহকারী হিসেবে পরে

Dhaka University Institutional Repository

সরাসরি তার সম্পাদনায় হিতকরী পত্রিকা টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হয়। দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জমিদার পত্নী করিমুন্নেসা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অপর দিকে মুনসী ইব্রাহিম খান অপর একটি ধর্মসভা 'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। এটিও রক্ষনশীল ধর্মসভার প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯০৫ সালের পর বঙ্গভঙ্গ কে কেন্দ্র করে প্রথম 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন', পরে 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হলে দীর্ঘদিনের সভা-সমিতি গুলো ঝিমিয়ে পড়ে। জমিদার ও মধ্যবিত্ত সচেতন মানুষ তখন অধিকমাত্রায় রাজনীতিমুখী হয়ে পড়ে। হিন্দু শ্রেনী বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী-সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়। বাংলার হিন্দু-মুসলিমের সামাজিক একতা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এবং দু শ্রেণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘাত স্থায়ীরূপ লাভ করে। বঙ্গ ভঙ্গ রদ হলে উভয় শ্রেণী কখনো ঐক্যবদ্ধভাবে, কখনো একক ভাবে স্বায়ত্তশাসন ও জনগণের অধিকার তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মেতে ওঠে।

এই প্রক্রিয়ায় সারা বাংলায় এ.কে.ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রজা সমিতি গড়ে ওঠে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা কেন্দ্রিক 'শিখা গোষ্ঠী' নামে মুসলিম সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণী গড়ে ওঠে। যেমন কলকাতায় গড়ে ওঠে বহু আগে 'সুধাকর গোষ্ঠী'। এভাবে কলকাতায় আগে ও ঢাকায় পরে এবং মাঝামাঝি সময়ে মফস্বল ও জেলা শহরগুলোতে মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালের মধ্যে বাংলায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বিকাশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রজা শ্রেণীর ব্যাপক ও চূড়ান্ত উত্থান ঘটে এবং জমিদার শ্রেণীর ভূমিকা কেবল আভিজাত্য প্রকাশের পর্যায়ে এসে পৌছে। জমিদার কে তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এখন প্রজার সম্মুখীন হতে হয় কিংবা প্রজার কাছে যেতে হয়। এই প্রজার কাছে গ্রহণযোগ্যতার নিরিখেই ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জমিদাররা কেউ সফল হয়, কেউ ব্যর্থ হয়। সাধারণভাবে স্থানীয় জমিদারের স্থান দখল করে নয়া গ্রামীণ অভিজাত 'জোতদার' বা ধনী কৃষক আর শহুরে জমিদারের স্থান দখল করে মধ্যবিত্ত পেশাজীবীগণ,বিশেষত আইনজীবীগণ।

১৮১৮ সাল থেকে রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদী হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের বিতর্ককে কেন্দ্র করে বাংলায় সংবাদপত্র - সাময়িকী আন্দোলনের সূচনা ঘটে। একদিকে রামমোহনের নিজের "সম্বাদ কৌমুদী", অপরদিকে ভবানী চরন বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদিত নিষ্ঠাবান হিন্দুর রক্ষনশীল পত্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

'সমাচার চন্দ্রিকা', এরপরে একে একে গড়ে উঠে তত্ত্ববোধিনী সহ বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয় ।

পঞ্চাশের দশকে এসে মুসলমানদের সম্পাদিত ফার্সি পত্রিকা 'দুরবীন' প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় কলকাতা থেকে প্রথম মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশিত হয় সত্তরের দশকে। হিন্দু উগ্রপন্থী লেখক, সাহিত্যিকদের ও খৃষ্টান পাদ্রীদের মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণার প্রেক্ষিতে একদল মুসলিম সাহিত্যিক ও সাংবাদিক গোষ্ঠীর আবিভার্ব ঘটে। তারাই সংবাদপত্র সাময়িকীর মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের মাঝে গণ- জাগরণের ঢেউ সৃষ্টি করে। এই ঢেউ নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জনপদেও আছড়ে পড়ে।

এভাবে দেখা যায় ষাট ও সত্তরের দশকে একদল মুসলিম গদ্য সাহিত্যিক, কবি ও লেখকের অভ্যুদয় ঘটে এবং এরই ভিত্তিতে আশি ও নব্বই দশকে শহর থেকে গ্রাম পর্যায়ে সংবাদপত্র-সাময়িকী প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে; রীতিমত একটি আন্দোলন গড়ে উঠে। এর মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেনী পূর্ণতা পায়। সাধারণ শ্রেনীর মাঝে জাগরণ সূচিত হয়। ১৮১৭ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত এবং ১৮৭৮ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত বাংলার সংবাদপত্র ও সাময়িকীর আলাদা পরিসংখ্যান থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।[১১৫]

এ সকল পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশের উদ্যোক্তা মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর সাহিত্যিক কবি, লেখকগণ হলেও ব্যয় বহুল এই উদ্যোগের পশ্চাতে অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন প্রভাবশালী জমিদারগণ। এসকল জমিদারদের নয়া প্রেক্ষাপটজনিত ভূমিকার কারণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। মুসলমান লেখক ও সাহিত্যিক সম্পাদিত পত্রিকা ১৮৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সৈয়দ আবদুর রহিম বরিশাল থেকে সাপ্তাহিক 'বালারঞ্জিকা' প্রকাশ করেন, এর পর মীর মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়া থেকে "আজীজেন নেহার" নামে মাসিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলকাতা থেকে কাজী আব্দুল খালেক প্রথম অর্ধ সাপ্তাহিক "মোহাম্মদি আখবার" পত্রিকা ১৮৭৭ সালে প্রকাশ করেন।

১৮৮৪ সাল বাংলার সংবাদ পত্র সাময়িকী আন্দোলনের একগুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। সুধাকর গোষ্ঠীর চার সদস্যের অন্যতম অধ্যাপক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ কলকাতা থেকে দুটি সাপ্তাহিকী যথাক্রমে 'মুসলমান' ও 'মুসলমান বন্ধু' প্রকাশ করেন। একই বৎসর মফস্বলে টাঙ্গাইলের প্রত্যন্ত গ্রামীণ জমিদারী শহর করটিয়া থেকে মাসিক 'আখবারে ইসলামিয়া' প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৬ সাল সংবাদপত্র-সাময়িকী আন্দোলনের দ্বিতীয় মাইল ফলক। এ বৎসর কলকাতা থেকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় 'নব সুধাকর' প্রকাশিত হয়। একই সময়ে টাঙ্গাইল দেলদুয়ার থেকে আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাইর সম্পাদনায় পাক্ষিক 'আহমদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১১৬]

কলকাতায় শেখ আব্দুর রহিমের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকর পত্রিকার একত্রে প্রকাশনার মাধ্যমে ১৮৯৫ সালে তৃতীয় মাইল ফলক উম্মেচিত হয়। ইতোমধ্যে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ সুধাকর গোষ্ঠীর একটি অংশ নিয়ে মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে দিয়ে সংবাদপত্র-সাময়িকী আন্দোলন তথা সাহিত্যক্ষেত্রে 'সুধাকর গোষ্ঠী' ও 'ইসলাম প্রচারক গোষ্ঠী' নামে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তা গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এসময় টাঙ্গাইল থেকে প্রথমে মীর মশাররফ এর সম্পাদনায়, পরে মোসলেম উদ্দীনের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক হিতকরী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[১১৭]

এভাবে কলকাতায় সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের তিনটি গোষ্ঠীর উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা কেন্দ্রীক সংবাদ পত্র ও সাংবাদিকদের মধ্যেও সেই প্রভাব ধীরে ধীরে পড়ে। এমনকি মফস্বল শহর টাঙ্গাইলে একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। এখানে একদিকে রক্ষণশীল ধারার "আখবারে ইসলামী" প্রগতিশীল ধারার 'আহমদী' এবং মধ্য ও স্বতন্ত্র ধারার 'হিতকরী পত্রিকা' তিন ধরনের ভূমিকা পালন করে। প্রথম ধারার পৃষ্ঠপোষকতা করে রক্ষণশীল জমিদার পন্নী পরিবার, অপর দিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে দেলদুয়ারের উত্তর বাড়ীর গজনবী পরিবার। দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারগণ এই সকল ক্ষেত্রে গজনবীদের বিরোধী ধারায় অবস্থান নেয়। অর্থাৎ পন্নীদের রক্ষনশীল ধারাকেই সব সময় সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়।[১১৮] 'আহমদী' পত্রিকা ১৮৮৯ থেকে 'আহমদী ও নবরত্ন' নামে প্রকাশিত হয়। ধারনা করা হয় 'নবরত্ন' নামের কোন পত্রিকা উদ্যোক্তা কর্তৃক চালাতে না পেরে 'আহমদী'র সাথে সংযুক্ত করে দেয়।[১১৯]

বাঙ্গালী মুসলমানদের পত্রিকা প্রকাশের আন্দোলন যখন কলকাতায় শুরু হয়নি, সুধাকর গোষ্ঠীর প্রকাশ হয়নি; তখন টাঙ্গাইলের মত একটি মহকুমা শহরে চার চারটি পত্রিকা প্রকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারন টাঙ্গাইলের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত; বিশেষত টাঙ্গাইল খ্যাতিমান জমিদার প্রভাবিত অঞ্চল এবং পূর্ববাংলার অগ্রগামী শিক্ষিত অঞ্চল ছিল। বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রথম গ্রাজুয়েট

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ ও মহিলা ছিল এই টাঙ্গাইলেরই অধিবাসী।[১২০] পাশাপাশি দুটি জমিদারীর মধ্যকার আভিজাত্য ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্বও অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে। পত্রিকা সমূহে এই দুই জমিদার 'গজনবী' ও পন্নী পরিবারের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। পন্নী ও দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী এবং পাকুল্লা জমিদারেরা আধুনিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের চিন্তা ধারায় রক্ষণশীল ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। তদুপরি তাদের প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন একজন ধর্মীয় পন্ডিত। তাও প্রথাগত বা প্রতিষ্ঠানিক পন্ডিত ছিলেন বলে মনে হয়না অথবা এসম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ধর্মীয় বক্তৃতা ও ওয়াজ মাহফিল ছিল তার প্রধান পেশা। হানাফী-লামাজহাবী আহ্‌লে হাদীস দ্বন্দ্ব এবং হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব, গোবধ-গোরক্ষা দ্বন্দ্বই তার পত্রিকায় উজ্জীবিত ছিল। বাকী সবটাই ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক।

কাজী মান্নানের মতে 'সাহিত্য চর্চা নয়, ধর্মান্দোলনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। [১২১] তবে স্থানীয় জনমতকে 'আখবারে ইসলামী' তার রক্ষনশীল নীতিতেই বেশী প্রভাবিত করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। কেননা 'আখবারে ইসলামী' এক পর্যায়ে উদারনীতির প্রবক্তা, প্রগতিশীল 'আহমদী' গ্রুপকে কোনঠাসা করতে সক্ষম হয়। এমনকি 'গো' বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলার প্রথম মুসলিম গদ্য সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনকে মামলায় জড়িয়ে জেলে আবদ্ধ করে, এমনকি দেলদুয়ার ও টাঙ্গাইল ছাড়া করতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত মীর মশাররফের রচনার ধারা পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে যায়।[১২২]

'আহমদী' ও 'হিতকরী' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক করিমুন্নেসা খানম রংপুরের সাবের পরিবারের সাহিত্য, সাংস্কৃতিক প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। অনেক উদার ও উন্নত পরিবেশে নিজেকে বিকশিত করেছেন। তার সাথে মীর মশাররফ হোসেন এবং আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজাই এর মত পোড় খাওয়া, বিদগ্ধ ও বর্ণাঢ্য জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কথা শিল্পীর সমন্বয় ঘটেছে। ফলে 'আহমদী' পত্রিকা রক্ষনশীল ও ধর্মীয় পত্রিকার গন্ডি পেরিয়ে সমাজ বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে। এর সাথে রাজনৈতিক সচেতনতা যুক্ত হয়ে দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছে। ওয়াকিল আহমদের মতে, কেবল সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ নয়া, সাহিত্যিক রচনাও পত্রিকাগুলিতে স্থান পেত।[১২৩]

এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মৌলনীতির দিক থেকে এবং সৃজনশীল, গঠন মূলক সমাজ বিকাশের দৃষ্টি ভঙ্গিতে 'আহমদী' ও 'হিতকরী' পত্রিকা সফল হয়েছে বলা যায়। সাময়িক জনমত গঠনে তারা বাহ্যিক

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে ব্যর্থ হলেও এদেরই ফলশ্রুতিতে টাঙ্গাইলে প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদদের একটি ইতিবাচক ধারা তৈরী হয়; যা বর্তমান সমাজ ধারা পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিথযশা বর্তমান কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের উল্লেখযোগ্য অংশ এই টাঙ্গাইলের মাটিরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এর ভিত্তি, এই দুটি পত্রিকা গোষ্ঠী, যা সে সময়ে নিস্তরঙ্গ জনমানসে চিন্তা-ভাবনায় জাগরণ সৃষ্টি করে। এতদাঞ্চলের একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক, গবেষক **আশরাফ সিদ্দিকী** 'হিতকরী' সম্পর্কে লিখেছেন- "এ পত্রিকা তখন অত্যাচারী জমিদারবর্গ, জমিদারী সেরেস্তা, ঘুষখোর কর্মচারী, চরিত্রভ্রষ্ট মহকুমা হাকিম, মুনসেফ, দারোগা প্রভৃতির প্রতি খড়্গহস্ত ছিল।"[১১৪]

উল্লেখ্য এদেরই এক ষড়যন্ত্র মামলায় এবং পরে পাল্টা মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়ে সম্পাদক মীর মশাররফ এক মাস কারাভোগ করেন। কলকাতা নিবাসী অনুজ ব্যরিষ্টার মীর মোহতেশাম হোসেন কলকাতা থেকে টাঙ্গাইল এসে জামিনে তাকে মুক্ত করেন।

হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে সংবাদপত্র-সাময়িকী, সভা-সমিতি এবং সাহিত্যকর্ম সমূহের বিশ্লেষণ, সমকালীন সমাজ প্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। জমিদারদের ভূমিকা এক্ষেত্রে ক্রীড়নকের। মূল ভূমিকা রেখেছে মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিতদের একটি শ্রেনী। পক্ষে-বিপক্ষে তারাই ভূমিকা পালন করেছে, কর্মসূচী দিয়েছে; জমিদাররা কেবল তাতে সায় দিয়েছে, অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে এবং কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেছে, সভাপতির বক্তব্য দিয়েছে।

স্বল্প শিক্ষিত পন্নী ও তার সমর্থক জমিদার গোষ্ঠী এসকল পত্র পত্রিকায় কোন লেখা বা প্রবন্ধ প্রকাশ করেননি, সে সাধ্য ও ইচ্ছা কোনটাই তাদের ছিলনা। দেলদুয়ারের গজনবীগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন। তবে তারা সমকালীন বিষয়ে তেমন লেখালেখি করেননি। কলকাতা-দিল্লীতে থেকেই উচ্চ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় দেশ সেবা করেছেন।

কাজেই স্থানীয় জনমানস গঠনে স্থানীয় মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব এবং সংবাদ পত্র-সাময়িকীগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক মীর মশাররফ হোসেনের 'গোকূল নির্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধ কে কেন্দ্র করে শুধু টাঙ্গাইল নয়, গোটা বাংলা জুড়ে বিতর্কের ঢেউ উঠে; দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় এবং হিন্দু-মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

অবনতিশীল সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। সে সাথে মুসলমানদের মধ্যকার রক্ষণশীল ও প্রগ্রতিশীল ধারার দ্বন্দ্ব প্রকট ভাবে প্রকাশিত হয়।

মীর মশাররফ হোসেন হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়বাদীতার আদর্শ ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোন থেকে গো-সম্পদের অর্থনৈতিক কার্যকারিতার যুক্তি তুলে ধরেন। কেননা 'গো-হত্যা' হিন্দু মুসলিম উভয়ের সম্পর্কের ফাটল ধরায় বলে তিনি মুসলমানদের গো-কোরবানী বন্ধ ও গো মাংস ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেন।[১৩৭] অর্থাৎ হাজার বছরের বাংলার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা মেনে নিয়ে সমন্বয়বাদীদের স্বার্থে মুসলমানদের অমৌলিক বিষয়ে কিছুটা ছাড় দিতে বলেন।

কিন্তু হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষী রচনা, মুসলমানদের প্রাপ্য অধিকার দিতে হিন্দুদের অনীহা এবং পত্রপত্রিকা মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণা, সর্বোপরি 'হিন্দু মেলা' ও হিন্দু মহাসভার নামে হিন্দু উগ্র-জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার মুসলমানদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অবশ্য ততদিনে মুসলিম শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ তাদের রচনা ও লেখনীর মাধ্যমে হিন্দুদের এই প্রচেষ্টার মোকাবেলার চেষ্টা করেন। এহেন প্রেক্ষাপটে মীর মশাররফ হোসেনের যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোনকে ভেবে দেখার সুযোগ সমকালীন মুসলিম আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ছিল না।

কলকাতার সুধাকর গোষ্ঠী ও ইসলাম প্রচারক গোষ্ঠী সহ অধিকাংশ সংবাদপত্র-সাময়িকী আন্দোলন এবং সারাদেশের বিভিন্ন জেলার স্থানীয় সভা-সমিতি গুলো মীর মশাররফের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করে কঠিন বক্তব্য প্রদান করে। তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহীতার, স্ত্রী তালাক হওয়ার ফতুয়া দেয়, সরকারের নিকট বিচার দাবী করে। কিন্তু সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে সতর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মীর মশাররফ ও তার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের ঝড় তোলে স্থানীয় অপর জমিদার পন্নী পরিবারের অধীন "আখবারে ইসলামীয়া" পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী নঈমুদ্দীন। তিনি গ্রামে গ্রামে ওয়াজ করে মশাররফ এর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ এনে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এমনকি তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা জুড়ে দেয়। আর কলকাতার সুধাকর গোষ্ঠীর বিভিন্ন পত্রিকা নঈমুদ্দীনের

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। দেলদুয়ার জমিদারীর নতুন ম্যানেজার পন্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, নঈমুদ্দীন প্রমুখ মশাররফের প্রবন্ধের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করে।

এভাবে মধ্যযুগীয়-ধর্মজ মানসিকতা সম্পন্ন ঔপনিবেশিক শাসনে সমসাময়িক বাংলায় সাধারণ ধর্মীয় ইস্যু সমাজের উচ্চ শ্রেণী থেকে নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত প্রচন্ড নাড়া দেয়। এই সময় পর্যন্ত অন্যকোন বিষয় সাধারণ গ্রাম বাংলার মানুষকে এভাবে নাড়া দিতে পারেনি।

একই চিন্তার অনুসারী হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের সমর্থক সাহিত্যিক, সাংবাদিক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই তার সম্পাদিত পত্রিকায় মীর মশাররফের সমর্থনে সম্পাদকীয় লিখে, বিভিন্ন চিঠি ও সংবাদ প্রকাশ করে। মীর মশাররফ নিজে বিভিন্ন অভিযোগ খন্ডন করে প্রবন্ধ লেখেন এবং সেগুলো একত্র করে আবার 'গো জীবন' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আদালতে নঈমুদ্দীন ও আখবারে ইসলামিয়ার বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করে। এতে বিরোধী পক্ষ আরো ক্ষুব্ধ হয়, টাঙ্গাইলের স্থানীয় দ্বন্দ্ব সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। উভয় পক্ষের মামলা পাল্টা মামলার প্রেক্ষিতে আদালত কমিশন গঠনের মাধ্যমে এই উত্তেজনা সাময়িকভাবে অবদমিত করে, কিন্তু গো সমস্যা দূরীভূত হয়নি।

সমকালীন বুদ্ধিজীবি মহলে পন্ডিত রেয়াজ উদ্দীন মাশহাদীর একচেটিয়া প্রভাব ছিল। নঈমুদ্দীনের 'গো কান্ড' গ্রন্থের পর তিনি নিজে ' অগ্নি কুক্কুট' রচনা করেন। তার প্রভাবে সুধাকর গোষ্ঠী সহ প্রায় পুরো বুদ্ধিজীবী মহল মীর মশাররফের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ওয়াকিল আহমেদের মতে, ফলে নঈমুদ্দীন খুব সহজেই ধর্মসভার মাধ্যমে স্থানীয় জনমত গঠন করেন[১২৬]।

মীর মশাররফ তার প্রতিভা ও চারিত্রিক গুণে, দেলদুয়ার-টাঙ্গাইলে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যে, দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদী আন্দোলন টাঙ্গাইলে তার অবস্থানকে টলাতে পারেনি। এর পরেও দীর্ঘকাল তিনি টাঙ্গাইলে অবস্থান করেন, এতে মনে হয় না নঈমুদ্দীন মীর মোশাররফের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তুলেছেন; তাহলে এরপর তার পক্ষে দেলদুয়ার-টাঙ্গাইলে অবস্থান সম্ভব হতো না। তবে টাঙ্গাইলে পক্ষে বিপক্ষে উভয় দিকেই জনমত সমান ছিল, তবে সারাদেশে তার বিপক্ষে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

মীর মশাররফ এ যাত্রায় নিজের অবস্থানের পক্ষে বলিষ্ঠ দৃঢ়তা দেখালেও ভিতরে মনে হয় ভেঙ্গে পড়েন। রক্ষনশীল দৃষ্টিভঙ্গির কাছে আত্মসমর্পন করেন। পরবর্তীকালের রচনা সমূহ তার প্রমাণ[১১৭]। দেলদুয়ার- টাঙ্গাইলের এ ঘটনা স্থানীয় ও জাতীয় ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এর আগে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক বহুমাত্রিক সমস্যায় আন্দোলিত হলেও তা ছিল শহর ও রাজধানী ভিত্তিক। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ইতিপূর্বে কোন সময় এত বড় আকারে দেখা দেয়নি।

উল্লেখ্য হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধে স্থানীয় জমিদারদের ভূমিকা বিশেষভাবে বিবেচ্য। গো বিতর্কের অব্যবহিত পরেই মুক্তগাছা, অম্বরিয়া ও অন্যান্য হিন্দু জমিদারদের পাশাপাশি দেলদুয়ারের পার্শ্ববর্তী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সন্তোষের হিন্দু জমিদারগণ কয়েকজন গ্রামবাসীকে গো কোরবানীর জন্য জরিমানা করেছিলেন। এতে প্রমানিত হয় স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ সাম্প্রদায়িক বীজ বপনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। সে ক্ষেত্রে মুসলমান জমিদাররা কি করেছেন ? তারা হিন্দু প্রজার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে অথবা সক্রিয় প্রতিবাদ করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র স্থানীয় মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিবাদী আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন ও অর্থ সাহায্য হয়ত দিয়েছেন। এর মধ্যে গজনবী জমিদারগণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আহবানই কেবল জানিয়েছেন।

সুতরাং হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানো হয়েছে এবং শুধুমাত্র শহরে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। গ্রামে হিন্দু বিরোধ বড় আকারে ছিল না, এ তত্ত্ব টাঙ্গাইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হয় না। বরং এখানে গ্রাম থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হয়েছে। হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান প্রজার উপর ধর্মীয় নিপীড়ন করেছেন, বিপরীতে মুসলমান জমিদারগণ ধৈর্য্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। গ্রামের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বিরোধ শহরবাসীকে আলোড়িত করেছে এবং হিন্দু- মুসলিম বিরোধ ক্রমেই বিকশিত হয়েছে। গ্রামীণ হিন্দু জমিদারগণই সম্প্রদায়িক বিরোধের বীজ বপন করেছেন। হিন্দু মধ্যবিত্ত একে ব্যবহার করে রাজনীতি করেছেন, সাহিত্য রচনা করেছেন, যা হিন্দু পুনরুত্থানবাদের জন্ম দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০. আইন, বিচার ও প্রজাস্বত্বের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম, বর্ণ ও পেশা ভিত্তিক নয়া সমাজ শ্রেণীর বিকাশে জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকাঃ

বাংলায় দ্বিতীয় পর্বের ঔপনিবেশিক সমাজ গঠন কালে জমিদার, মধ্যশ্রেণী ও সাধারণ মানুষ এই তিন শ্রেণী একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে যুক্ত থেকেছে স্বশ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সাথে। যা এ পর্বের সমাজ, শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিন্যাসের ওপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শহুরে বিন্যাসের চাইতে গ্রামীণ বিন্যাস প্রবল থাকায় শ্রেণী ও সম্প্রদায়ে ভিন্নতা তৈরী হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শহর, বাজার, কৃষিপণ্যের বিকাশ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের দরুন প্রশাসনের স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরী হয়। বিশ শতকের পূর্বেই ধর্ম ও এর সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্প্রদায়িক চেতনার মতাদর্শগত যুক্তি তৈরী করেছে। আর বিশ শতকের প্রথম থেকে প্রশাসন একে সমর্থন দিয়েছে । এ সময় পর্যন্ত ধর্মের লোকজ ব্যবহার জনমনে সম্পৃক্ত থাকলেও সচেতন অংশের মাঝে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ এক অংশের মাঝে তৈরী করেছে ধর্মান্ধতা, অপর অংশের মাঝে ধর্মনিরপেক্ষতা। এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্র বিশ শতকের প্রথামার্ধেও ছিল শহর, গ্রাম নয়। জনগণের পেশাভিত্তিক ভোটাধিকার প্রাপ্তির পর থেকে গ্রামেও তা বিস্তৃত হয় নানা কারনে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের প্রচারনায় রাজনৈতিক ও স্বীয় অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে উনিশ শতকে সাম্প্রদায়িক বিন্যাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল মুখ্য।

বিশ শতকে এসে তা মুসলিম সম্প্রদায়ের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং ত্রিশের দশকে এসে পূর্ববাংলা, বর্তমান বাংলাদেশে মুসলমান সম্প্রদায় প্রবল হয়ে ওঠে। এই প্রবল শ্রেণীতে জমিদার ও মধ্যবিত্তের ভূমিকা ছিল মুখ্য। অধঃস্তন কৃষক শ্রেণী পুরো ঔপনিবেশিক পর্বে কখনো প্রবল শ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়নি। যদিও এদেশে জমিদার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে এদের একটা সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে, কিন্তু তার কোন ধারাবাহিকতা ছিল না এবং তাদের সংগ্রাম ছিল বিচ্ছিন্ন ও পশ্চাদপদ, ধর্মজ-অর্থনৈতিক, সাময়িক সমস্যাজাত চেতনা থেকে উদ্ভুত; স্থানীয় পর্যায়ে সুসংগঠিত ভাবেও নয়, সুদুর প্রসারী রাজনৈতিক চেতনা থেকেও নয়। সে জন্য দেখা যায় ১৯৩৮ সালের পূর্বে কৃষকের বিদ্রোহ ও অধিকার নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোন আগ্রহ দেখায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের উপরিকাঠামোর এই তিন মৌল শ্রেণীবিন্যাস ছাড়া ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক পেশাজীবী সমাজ শ্রেণীর বিকাশ ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বিতীয় পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ একটি জমিদারী প্রভাবিত থানা ও মহকুমা অঞ্চলে এই পেশাজীবী শ্রেণীর বিকাশে তিনটি শ্রেণী সমাজের ভূমিকা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সমঝোতার গতি প্রকৃতি বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ যোগ্য।

আবহমান কাল তথা স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের উৎপত্তির পর থেকেই এদেশে বর্ণ ও পেশাভিত্তিক শ্রেণী সমাজের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বর্ণ ও পেশাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রাবল্য ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। এর মধ্যে দ্বিতীয়ার্ধ বিশেষত ১৮৭১ সাল বাংলার শ্রেণী সমাজের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। হান্টারের ইন্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থ ও তার 'ঔপনিবেশিক নীতি' তত্ত্ব প্রকাশিত হলে, পরপর একাধিক আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হলে, গেজেটিয়ার, সার্ভে রিপোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস ইত্যাদি প্রকাশিত হলে; বাংলার ইতিহাসে নয়া বর্ণ ও পেশাজীবী শ্রেণী সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতার ভিত্তিতে দ্বন্ধ সংঘাত বিকাশের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

আদমশুমারি চলাকালে সরকারী কর্তৃপক্ষ জনমানসে এ ধারণা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যে, বর্ণগত ক্রম সামাজিক মর্যাদার চিহ্ন জ্ঞাপক। ঐ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০১ ও ১৯১১ সালের আদমশুমারির সময় বংশ কৌলীন্য পরিবর্তনে শুধু ময়মনসিংহে যে দরখাস্ত পড়েছিল তার ওজনই ছিল দেড় মনের মত[১২৯]।

উল্লেখ্য ১৮৭২ সালের প্রথম আদমশুমারী সুক্ষভাবে হয়নি। ফলে দেখা যায় বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা ছিল কিছুটা কম [১৩১]। তদুপরি এ শুমারি জনমনে খুব একটা সাড়া জাগাতে পারেনি। পরবর্তী ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে পূর্বের ত্রুটি বিচ্যুতি পরিহার করা হয়। এতে দেখা যায় বাংলায় মুসলমান সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বেশী[১৩১]। এ পরিসংখ্যান প্রকাশের পর থেকে বাংলার মুসলমান জমিদার ও মধ্যবিত্তের মাঝে রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই আদমশুমারির উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে সাধারণ জনগণ সন্দেহ ও সংশয়ে ভোগে। কেদার নাথ মজুমদারের মতে, রক্ষনশীলরা একে 'ছেনিকাড়ার ধুম' আখ্যায়িত করে দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্র পাত করে। এমনকি সেন্সাসের পরও বহু লোকের আতঙ্ক দূর হয়নি"[১৩২]।

প্রতিদশ বৎসর পরবর্তী শুমারিতে মুসলমানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে হিন্দু-মুসলিম সংখ্যার ব্যবধানও অনেক বেড়ে যায়। এগুলোতে জনগনের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এসকল রিপোর্টে দেখা যায় ময়মনসিংহ জেলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু সংখ্যার তিনগুন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতও অধিক। তবে এ অনুপাত ময়মনসিংহ সদরে ও জামালপুরে বেশী, প্রায় সাড়ে চারগুন। নেত্রকোণায় আবার সবচেয়ে কম। টাঙ্গাইলে আবার ব্যতিক্রম, সেখানে হিন্দু-সংখ্যা অন্যান্য মহকুমা অপেক্ষা বেশী। জামালপুরে আবার হিন্দুর সংখ্যা সবচেয়ে কম[১৩৩]। টাঙ্গাইলের হিন্দুর মধ্যে আবার বৈদ্য শ্রেণী অধিক ছিল। নমশুদ্রের সংখ্যা ছিল অনেক, তার পর কৈবর্ত ও কায়স্থ। কৈবর্ত, সাহা ও তিয়ার জাতির লোক পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী বেশী ছিল।

মুসলমানদের সংখ্যা সর্বাধিক হলেও তারা শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, কুলু ও জোলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। আতিয়া-দেলদুয়ার অঞ্চলে অতিরিক্ত আরেকটি শ্রেণী ছিল 'মাহিফোরাশ' নামের জেলে ও মৎসজীবী শ্রেণী। ঐতিহাসিকদের মতে, বাংলা- ভারতের নব গঠিত মুসলমান সমাজ কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় আর্য হিন্দু বর্ণ বৈষম্যবাদের প্রভাব এ সময় পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র বা রক্ত ভিত্তিক চতুবর্ণের ভেদরীতি কেবল নাম পাল্টিয়ে আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ ও আরজল প্রভৃতি নাম গ্রহণ করেছিল[১৩৪]। সমাজের মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ প্রধানতঃ ধর্ম ও খানদান বা রক্ত ধারা দিয়ে নির্ণিত হয়েছে। সৈয়দ, শেখ ,মুঘল ও পাঠান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমানরা নিজেদের আশরাফ বলে পরিচয় দেয়[১৩৫]। এগুলো ছিল বহিরাগত পদবী। আবার দেশীয় পেশাভিত্তিক অনেক পদবী ছিল যেমন তালুকদার, পাটওয়ারী, চৌধুরী, ভূঁইয়া ইত্যাদি ভূমিজ ও রাজস্ব সংগ্রহ পেশা সম্পৃক্ত পদবী। অন্যান্য পেশা সম্পৃক্ত পদবী ছিল যেমন আবদল, বাদ্যকর, বাজিকর, কেলি , কখো, যোরহি, মাহিফোরাশ ইত্যাদি।

১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে মোট ২০টি উপাধি এবং ১০২ টি মুসলমান পেশার উল্লেখ রয়েছে[১৩৬]। ১৮৯১ সালের ময়মনসিংহের সেন্সাস রিপোর্টে দেলদুয়ারের প্রখ্যাত জমিদার আবদুল করিম

Dhaka University Institutional Repository

গজনবী প্রদত্ত বিবরণ উদ্বৃত হয়। তিনি বলেন, ময়মনসিংহ জেলার মুসলমানের মধ্যে মোটামুটি ভাবে ২০% ভাগ বিদেশাগত বংশধর, ৫০% ভাগ মিশ্র রক্তের লোক এবং বাকী ৩০% ভাগ ধর্মান্তরিত অধিবাসী[১৩৭]। এতদাঞ্চলের ইতিহাস পর্যলোচনা করলে এ তথ্য সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা - প্রথমতঃ বনাঞ্চল ও চরাঞ্চলের প্রেক্ষিতে নতুন ভূমি আবাদ, একই সাথে ধর্ম আবাদের জন্য বহু অলী, দরবেশের এতদাঞ্চলে আগমন ও ধর্ম প্রচারের বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ গৌড়ে রাষ্ট্র বিপ্লবের ঝঞ্ঝায় এবং মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের সময় উত্তর ভারত, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গের বহু আরব, ইরানী এবং প্রধানত আফগানরা এতদাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বারোভূঁঞাদের পরাজয়ের পর তারা এতদাঞ্চলের জনমানুষের সাথে মিশে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই গজনবীর তথ্য সারা বাংলার মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলের মুসলমানদের ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রযোজ্য[১৩৮]। সেন্সাসের সময় থেকে সরকারের সার্কুলারের প্রেক্ষিতে ও সামাজিক অবস্থার নতুন প্রেক্ষাপটে নতুন বংশীয় নামধারনের ও শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের হুজুগ শুরু হয়। যেমন হালুয়াগণ মাহিয়া উপাধির জন্য আবেদন করে, মুসলমানদের মধ্যে কুলু ও জোলা সম্প্রদায় যথাক্রমে ব্যাপারী ও কারিকর বাচ্যে অভিহিত হবার প্রার্থনা করে[১৩৯]।

এ সময়ে অনেক অভিজাত নিজেদের উচ্চ অভিজাত , সাধারণ লোকজনের উচ্চবংশ ও বর্ণ গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে অনেকে সরকারের নিকট আবেদন না করেই অভিজাত্য প্রকাশের প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক ভাবে নিজেদের কোন একটা প্রাচীন বংশের সাথে সংযুক্ত করেছে। এর কারণ ছিল, মুসলমান সমাজের জাতিভেদ হিন্দু সমাজের ন্যায় অলংঘনীয় হয়ে দাঁড়ায়নি। ধর্মের দিকে থেকে জাতিভেদ না থাকায়, নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীতে উঠার পথ অবরুদ্ধ ছিল না। এক শ্রেণীর মানুষ বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করতে পারলে উপরের তলায় উঠে যেতে পারত এবং আশরাফের সমমর্যাদার অধিকারী হত। মূলতঃ মুসলমান সমাজে হিন্দুর ন্যায় আশরাফ আতরাফ বিষয়টি অত গভীর ও ব্যাপক ছিল না। ভারতীয় হিন্দু সমাজের জাতিভেদের প্রভাবেই নিতান্ত কৃত্রিম ও শিথিল শ্রেণীভেদ মুসলমান সমাজে ক্ষেত্র ভেদে দেখা যায়[১৪০]।

নিম্নশ্রেণী থেকে উত্তরণ তথা বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির মধ্যে আধুনিক শিক্ষা, উচ্চপদস্থ চাকুরির পাশাপাশি উচ্চ বর্ণে বিবাহের একটি প্রক্রিয়া মুসলমান সমাজে বিদ্যমান ছিল। কোন কোন

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের মুসলমান সমাজে মেলামেশা, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং আহার বিহার, আসনে বসা ইত্যাদি কঠোর নিয়ম পালন করা হতো। এক্ষেত্রে 'অনুলোম' বিবাহ পদ্ধতি কোথাও চালু ছিল। তবে 'প্রতিলোম' পদ্ধতির বিবাহ সামাজিকভাবে অচল ছিল। দেলদুয়ার-আতিয়ার জমিদারগণ এবং দেলদুয়ারের এস্টেট ম্যানেজার ও কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ার ক্ষয়িষ্ণু জমিদার মীর মশাররফ হোসেনের পরিবার এই প্রক্রিয়ার উদাহরণ[১৪১]।

অভিজাত জমিদারদের ক্ষেত্রে দেখা যায় জমিদার পুত্ররা অনেকেই অরো উচ্চ জমিদার পরিবারে বিয়ে করে জমিদারী বাড়িয়েছেন। ছোট জমিদার থেকে বড় জমিদার হয়েছেন। একই ভাবে মেয়েদের আরো উচ্চ জমিদার পরিবারে বিয়ে দিয়েছেন। তবে বিশ শতকে এসে মধ্যবিত্ত অথচ ক্ষমতাবান উচ্চ শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীর গৃহস্থ বংশে মেয়ে দিয়েছেন। পুত্রদের ক্ষেত্রে কখনো সাধারণ শিক্ষিত বা সাধারণ তালুকদার পরিবারে সুন্দরী কন্যার সাথে বিবাহ দিলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে আরো সচেতন ছিলেন। সমকক্ষ বড় পরিবারের পাত্র না পাওয়ায় অনেক মেয়ের বিবাহ দেয়া হয়নি। দেলদুয়ারের জমিদার পরিবার এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মুসলিম পরিবার এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ[১৪২]।

এতদাঞ্চলের মুসলমান জমিদার, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণী আন্তঃ মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে সুন্নী মতাদর্শের অনুসারী ছিল। শুধুমাত্র মাহিফোরাশ সম্প্রদায় ছিল শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত[১৪৩]। শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যায় কম হলেও শিয়া ধর্মের আচার ও সংস্কৃতির প্রভাব সুন্নী মুসলমানদের মাঝে পড়ে। কেননা মুঘল আমলে মাঝে মাঝে এবং নবাবী আমলে শিয়া সংস্কৃতি ছিল রাজকীয় সংস্কৃতি, এর প্রভাবে বিশেষ করে অভিজাত সমাজে যেমন মিলাদ, মহরম উৎসব, দরগাহে শিরনী, ওরশ, দরুদ ইত্যাদি আচার চালু হয়। আবার সুন্নী ধারার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এতদাঞ্চলে আগত বিভিন্ন সুফী দরবেশদের প্রভাবে, তাদের মাজার দরগাহকে কেন্দ্র করে তরিকাভিত্তিক বিভিন্ন পীরবাদ ও সুফীবাদে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া বাংলার আবেগ প্রবণ মনোভূমি সম্ভূত বৌদ্ধ সহজিয়া, হিন্দু নাথ ও দ্বৈত বৈষ্ণববাদের সাধারণ প্রভাবে কুংস্কার ও পৌরহিত্যবাদ এতদাঞ্চলের মন মানসে অবাধে প্রবেশ করে[১৪৪]। সতের শতকের পর থেকে আবার সুফিতত্ত্বের মিশ্রনে শাস্ত্রজ্ঞান বর্জিত লোকায়ত বাউল মতবাদ প্রসার লাভ করে। এই সব ধারা আবার হানাফি মাজহাবের অনুসারী ছিল। কিন্তু শাস্ত্র জ্ঞানের অভাবে, হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ায় পূর্বের হিন্দু ধর্মের প্রভাবে সুফীবাদে পীরগুরুর প্রাধান্য বেড়ে যায়। ফলে মাজার, দরগাহ, আস্তানা নির্মাণ করে তাতে শিরনী, মানত, ধুপধুনা দেয়া, জিয়ারত, সিজদা, উরস ও নৃত্যরীতির উদ্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য সময়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে এবং জৈনপুরী, শর্ষিনা, ইমামউদ্দীন নুরী প্রমুখ পীর ও আলেমের ধর্মীয় জলসা, আধুনিক শিক্ষিত ও মাদ্রাসা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের লেখনীর মাধ্যমে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটে। মানুষ শাস্ত্রীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে থাকে।

হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের ক্ষেত্রে আন্তঃ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মন, শুদ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণ এই চার বর্ণ প্রথার লোকই ছিল। তবে নমশুদ্র ও বৈদ্য পেশার এবং সাহা বংশের লোক সংখ্যা বেশী ছিল। আতিয়ার নিবিড় অরণ্য গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মের আখড়ায় পরিণত হয়। ইহার প্রধান মাধবাচার্য (কথিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয় প্রনেতা) প্রথম এতদাঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। অবশ্য আধুনিক গবেষণায় উক্ত মাধবাচার্যকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করা হয়।

উনিশ শতকে রামমোহনের সংস্কার, ব্রাহ্মসভা, আত্মীয় সভা এবং তার উত্তরাধিকারীদের দুটি ধারায় বিভক্তির মাধ্যমে হিন্দুদের মাঝে সংস্কারবাদী ও রক্ষনশীল দুটি ধারার বিকাশ লাভ করে। স্বামীবিবেকানন্দ সহ অসংখ্য ধর্মনেতা বিভিন্ন মত ও পথ সৃষ্টি করে। সকল ধারার লোকই এতদাঞ্চলে কম বেশী প্রভাবিত হয়[১৪৭]।

উচ্চ পদস্থ কয়েকজন ইংরেজ কর্মকর্তা, নীলকুঠির কুঠিয়াল এবং উপজাতি গোষ্ঠী সম্ভুত মধুপুর অঞ্চলে মিশনারী তৎপরতার প্রেক্ষিতে ধর্মান্তরিত কতেক হাতে গোনা খৃষ্টানের উপস্থিতির তথ্যই কেবল এতদাঞ্চলের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

উচ্চ শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা এবং শহরে আভিজাত্য প্রকাশের জন্য এতদাঞ্চলের গ্রামীণ জনসংখার একটি অংশ ময়মনসিংহ সদর, একটি অংশ ঢাকা এবং একটি অংশ কলকাতায় প্রবাস জীবন যাপন করতেন। আবার ভূমি সম্ভুত অস্থায়ী রায়ত ও মজুর শ্রেণীর একটি অংশ পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহে প্রবাস জীবন যাপন করত[১৪৮]।

হিন্দু-মুসলিম এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজ ও পেশাজীবী শ্রেণীকে ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে ৫২০ অনুবিভাগে ভাগ করা হয়। ঔপনিবেশিক সরকার ধর্ম ও বর্ণের দিক থেকে সমাজকে

Dhaka University Institutional Repository

বিচার করেছিল নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে। এই রক্ষার পটভূমি ও শ্রেণী বিন্যাসের ধারা ফুটে উঠে ঐতিহাসিকদের রচিত আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে[১৪৭]। আনিসুজ্জামানের মতে- ডব্লিউ হান্টার, এ. আর. মল্লিক, সুফিয়া আহমেদ প্রমুখের সূত্র অনুযায়ী মুসলমানদের ক্ষতির কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, বরং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহাই মুসলমানদের ক্ষতির মূল কারণ। তার মতে, এ সময়ে ইংরেজ শাসনজাত মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্রামীণ সমাজের ভাঙ্গন। তিনি আরো তথ্য উপস্থাপন করেন যে, পাটচাষের ফলে প্রথম মুসলমান কৃষকদের স্বচ্ছল অবস্থা আসে ও ভূমি সম্ভুত বিত্তবান কৃষক সমাজের অভ্যুদয় ঘটে, একটি ক্ষুদ্র সংখ্যক মুসলিম শিক্ষার্থী কলকাতায় খানসামাদের আশ্রয় ও সাহায্য নিয়ে পড়াশুনা করে। এরাই পরে কলকাতার মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে[১৪৮]।

এই মধ্যবিত্ত পেশাজীবীর মধ্যে 'আইনজীবী' শ্রেণী সৃষ্টি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম সৃষ্টি এবং মধ্যবিত্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী ও আকর্ষণীয় পেশা। সিরাজুল ইসলাম ও মুনতাসির মামুনের মতে, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার- প্রজার পূর্বেকার সম্পর্কের স্থলে নয়া সম্পর্কের ভিত্তি হয়ে দাড়ায় আইন কানুন ও বিচার ব্যবস্থা। অর্থাৎ জমিদার ও রায়তের অধিকার আইনগত ভিত্তি পেলে বাহ্যিক ভাবে মনে হবে পূর্বের জমিদার প্রজা সম্পর্কই রয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবে উপরিকাঠামো অংশত ঠিক থাকলেও তার অন্তসার গেল বদলে। অর্থাৎ এ সম্পর্কের ভিত্তি এখন আর পূর্বের জোর জবরদস্তি নয় বরং ধনতান্ত্রিত্তক অর্থনীতির আইন কানুন'[১৪৯]।

প্রথাগত আইনের পরিবর্তে ঔপনিবেশিক আইন চালুর মাধ্যমে জমিদারের হাত থেকে বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। ফলে জমিদারদের সাথে পূর্বের প্রশাসনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমন্বয় ব্যবচ্ছেদ হলো। এতে অচিরেই উৎপাদন পদ্ধতি ও সমাজ কাঠামো মৌলভাবে ও গুণগত ভাবে নয়া রূপ লাভ করে। এশীয় সামন্তবাদকে টিকিয়ে রেখে ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক উপাদানের সংমিশ্রন ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির যোগসূত্র স্থানীয় উৎপাদন ও আত্মসাৎকরণের পদ্ধতিটি বদলে দিয়েছিল । ফলে ধনতান্ত্রিক হতে গিয়ে তা হয় বিকৃত। উৎপাদন পদ্ধতি না রইল আদি সামন্ততান্ত্রিক, না হলো পূর্ণ ধনতান্ত্রিক বরং পরিণত হলো ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতিতে, যা মৌলিক ভাবে সামন্ততান্ত্রিক[১৫০]। আবার দ্বিতীয়ার্ধে এসে আইন ও শাসন ব্যবস্থার নয়া বিকাশে এটি পূর্ণ ঔপনিবেশিক হলো না, হলো আধা ঔপনিবেশিক। বাংলার যোগসূত্র স্থাপিত হয় হয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সাথে। এর ফলে দেশীয় শিল্প সমাজ ধ্বংস হয়ে ঔপনিবেশিক পণ্যের স্থানীয় বাজারে পরিণত হয় বাংলা[১৫১]।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় শিল্প ধ্বংস হওয়ায় এবং বিকল্প রুজি না থাকায় সবাই ভীড় করে জমিতে। কিন্তু জমিতে গিয়েও পণ্য উৎপাদনের ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ঔপনিবেশিকনীতি সহ নানাবিধ কারণে ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ অলাভজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রমাণিত হয়। ফলে জমিদাররা বিনা পুঁজিতে জমিতে পত্তনী প্রথার মাধ্যমে সৃষ্টি করে অসংখ্য মধ্যস্বত্বাধিকারী, পরজীবী শ্রেণী। যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত না হয়ে, উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকের উদ্বৃত্ত ভোগ করে। কর্মহীন ভোগ তাদের বিলাসী, আয়েসী, নাচ, গান, বাঈজী আসর ও মদের আসরের ভোগবাদী জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে[১৭২]। মূল জমিদার গ্রামের জমিদারী ছেড়ে শহরে গিয়ে পরিণত হন অনুপস্থিত জমিদারে। আর মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেরা সরাসরি উৎপাদন না করে চালু করে বর্গা প্রথা বা বর্গাদার শ্রেণী। তারা তৈরী করে পেটে ভাতে সস্তা শ্রমের মজুর বা ক্ষেতমজুর। এদের পর এই পর্বে জমিদারের পরিবর্তে গোমস্তাসহ মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ চলে। জমিদারের ভূমিকা হয় দূর সম্পর্কের, পিতৃত্ব মূলক আচরণের ও দান খয়রাতের। উনিশ শতকের শেষার্ধে জমিদার নিজেই নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন প্রজার মুরব্বি হিসেবে। মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার শ্রেণীর হাত থেকে প্রজাকে রক্ষার কর্মসূচীতে দেখা যায় জমিদারের অংশগ্রহণ[১৭৩]।

এভাবে দেখা যায় উনিশ শতকের শেষ পর্বে ও বিশ শতকের প্রথম পর্বে এসে পূর্বের জমিদার শ্রেণী থেকে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার, জোতদার ও গ্রাম টাউটের আর্বিভাব হয়। আবার রায়ত কৃষক শ্রেণী থেকে বৃটিশবাজারে উৎপাদন তথা পাট ও চা উৎপাদনের সমৃদ্ধির ফলে গৃহস্ত বা ধনী কৃষকের অভ্যুদয় ঘটে। জমি ক্রয়-বিক্রয় স্বত্বকে কেন্দ্র করে মাঝারী কৃষক, ক্ষুদ্রকৃষক বা প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার, ও মজুর শ্রেণীর আর্বিভাব ঘটে[১৭৬]।

ভূমিসত্ত্বের এহেন পরিবর্তনে বৃটিশ পণ্যের কাঁচামাল উৎপাদন ও রপ্তানিকারক এবং বৃটিশ শিল্পের আমদানিকারক হিসেবে ক্ষুদ্র একটি ট্রেডিং বা সাধারণ ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। এদের অধিকাংশ ছিলেন অবাঙ্গালী অথবা ইংরেজ[১৭৭]।

এখানে কৃষক এবং রপ্তানিকারকের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল কয়েক স্তরের ফাড়িয়া ব্যবসায়ী। বাংলার বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীন বাণিজ্য প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করে আরমেনীয়, গ্রীক, মাড়োয়ারি বা ইংরেজরা। শেষ পর্যায়ে এসে ইস্পাহানী, আদমজী, বাওয়ানী প্রমুখ বোম্বে ও গুজরাটী ভিত্তিক দু একটি মুসলিম সম্প্রদায় ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে। এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশ শতকের প্রারম্ভে এসে স্বদেশী যুগে

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর আত্মপ্রকাশ ঘটে যথাক্রমে দেলদুয়ারের জমিদার আবদুল হালিম গজনবী ও সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী এবং মির্জাপুরের রনদা প্রসাদ সাহা প্রমুখ। তবে বাঙ্গালীদের মধ্যে তিলি ও সাহা সম্প্রদায়ের হিন্দু শ্রেণী এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী থেকে শিল্পপতি শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে[১৫৬]।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার কৃষক সম্পর্কের তথা ভূমিস্বত্বের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যকে বেগবান করার জন্য কর্ণওয়ালিশ আইন সংগঠন সৃষ্টি করেন। এতে বেতনের পরিবর্তে মক্কেলদের থেকে ফি নেয়ার অনুমতি দিয়ে পেশাদার আইনজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়[১৫৭]। যা বিচার ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ফলে আইনজীবীদের মধ্যে অধিক হারে মামলা করে, মামলার সময় বাড়িয়ে, মক্কেলের কাছ থেকে দীর্ঘসময় ব্যাপী বেশী বেশী ফি নিয়ে বিত্তবান হওয়ার হিড়িক পড়ে। ফলে মামলা নিষ্পত্তি নয় বরং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং আইনের কুটতর্ক আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে তারা আদালতকে ব্যবহার করে[১৫৮]।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাথমিক আইনে জমিদার কর্তৃক মালামাল ক্রোকের বিরুদ্ধে প্রজা আদালতে মামলা করার অধিকার পেল। জমিদারের অযৌক্তিক মালামাল ক্রোক প্রতিরোধের অধিকার পেয়ে প্রজা যখন সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে, তখন অপরাধও বৃদ্ধি পায়; দেওয়ানী ফৌজদারী মামলাও বৃদ্ধি পায়, ঘুষ-দূর্নীতি বেড়ে যায়। মামলা এগিয়ে আনা, দ্রুত শুনানি করানো, পক্ষে রায় নেয়ার জন্য অন্যায় চেষ্টা চলে। উকিলের সহকারী মোক্তার ও মুহুরী এবং অনেক এজেন্ট বা দালাল শ্রেণীর পেশা বিকাশ লাভ করে[১৫৯]।

জমিদারদের ক্ষমতার অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী অপব্যবহারের ফলে মামলার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যায়। সামাজিক মূল্যবোধ দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রতিকারে প্রথমে নিম্ন আদালতে সামান্য মাত্র বেতনে দেশীয় মুন্সেফ, আমিন ও সদর আমিন নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থার ফলে উচ্চ পদে দেশীয় বিচারক নিয়োগের সুযোগ হয়। এদেশীয় বিচারকগণ স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে বেশী অবগত থাকায় বিচার প্রার্থীরা ইংরেজ বিচারক থেকে অধিকতর ন্যায় বিচার পেতেন[১৬০]। এই সময়ে জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী ও স্বচ্ছল কৃষকদের সন্তানেরা অরো বিত্তবৈভব এবং সামাজিক মর্যাদা সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়। সর্বোপরি ইংরেজ এলিটদের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবেও উচ্চতর আদালতের বিচারপতি হওয়ার আগ্রহে আইন বিষয়ে ডিগ্রী নেয়ার ও আইনজীবী পেশা গ্রহণের হিড়িক পড়ে। প্রথমে হিন্দু সম্প্রদায় পরে মুসলমান মধ্যবিত্তের জাগরণ কালে মুসলমান সম্প্রদায়ও এই পেশায় আকৃষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র ঔপনিবেশিক পর্বে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা ছিল শুধু কালক্ষেপনকারী, ব্যয়বহুল ও দূর্নীতি পরায়ন। দেশীয় প্রেক্ষাপটে অনভিজ্ঞ সিভিলিয়ানদের মফস্বলে বিচারক নিয়োগ করা হয়। তারা মানুষের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় মামলায় মূল বক্তব্যের পরিবর্তে মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমাণের উপর এবং দেশীয় অধঃস্তনদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এতে মামলাকারীরা জালিয়াতি করে মিথ্যা সাক্ষ্য দানে উৎসাহিত করতো। ফলে সুবিচার প্রদানে প্রায়শ বিচারকরা ব্যর্থ হত। ফৌজদারী মামলায় বাদীর প্রতি সাক্ষ্য প্রমাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এবং অভিযুক্তদের নীরব থাকার সুযোগ দিয়ে সন্দেহের অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করে মামলা থেকে প্রকৃত দোষী ব্যক্তির খালাস পাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অপর পক্ষে অকাট্য ও সঙ্গতিপূর্ণ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান করে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাদের নিরপরাধ প্রতিপক্ষকে দন্ডিত করতো। চতুর লোক ছাড়া সাধারণ কৃষক পেশাজীবী ব্যক্তিরা অবস্থার শিকার হয়ে বাধ্য না হলে আদালতের শরণাপন্ন হতো না। জমিদার ও প্রভাবশালীর অত্যাচার প্রায়শই প্রজা নীরবে হজম করতো। কেননা একজন মামলাকারী অসংখ্য কোর্টে মামলা করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যেত। বস্তুত একাধিক আপীলের বিধান সম্পন্ন এবং মামলার নিষ্পত্তিতে অধিক বিলম্বকারী বিচার প্রশাসন ব্যবস্থা মামলাকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও হয়রানীমূলক করে তোলে[১৬১]।

এই আইন ও বিচার ব্যবস্থা কেন্দ্রিক নিম্নপদস্থ কেরানি, সেরেস্তাদার, মুন্সেফ, দারোগা প্রভৃতি চাকুরিজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করে। উচ্চ পদস্থ আমিন, ডেপুটি কালেক্টর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ইন্সপেক্টর, উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি পেশাজীবী শ্রেণী সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। এই আইনজীবি ও বিচারক শ্রেণী তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা দিয়ে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। পাট চাষের ফলে স্বচ্ছল কৃষক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটলে, এই সব ধনী কৃষকরা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দান ও উচ্চ শিক্ষার্থে শহরে ও বিদেশে পাঠিয়ে সরকারী চাকুরী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এদের সন্তানরাই বিশ শতকের সূচনায় ব্যাপক হারে আইন পেশায় নিয়োজিত হয়ে প্রচুর বিত্তবৈভবের মালিক হয়। নিজের সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করতে সচেষ্ট হয়। আমাদের আলোচ্য সময়ে শহরে, বিশেষত মফস্বলে সব কিছুর কেন্দ্র বিন্দু হয়ে ওঠে কোর্ট কাচারি। একে আশ্রয় করেই অনেকে জীবিকানির্বাহ করতে লাগলেন। মফস্বল শহরের আধা গ্রামীণ, আধা নাগরিক সমাজে তারাই হয়ে ওঠেছিলেন সমাজের নেতা[১৬২]। দেলদুয়ার জমিদার পরিবার এবং দেলদুয়ার - টাঙ্গাইলের জমিদারী অঞ্চলে টাঙ্গাইলের মহকুমা কোর্ট কাচারিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমাজ কাঠামো তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময়ের বিকাশমান গদ্য সাহিত্য আন্দোলনের ধারায় প্রণীত উপন্যাস ও উপাখ্যানে এই চিত্র অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক সাহিত্যিকগণ। প্যাঁরীচাদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল, বঙ্কিম চন্দ্রের কমলা কান্তের দপ্তর, দীনেশ চন্দ্রের নীল দর্পন, মীর মশাররফের জমিদার দর্পনে এই সব চিত্র জোরালো ভাবে ফুটে উঠেছে। দেলদুয়ার জমিদারী ও টাঙ্গাইলের কোর্ট কাচারি কেন্দ্রিক মফস্বল সমাজের ..... ফিরিস্তি ফুটে উঠেছে 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপাখ্যান ও বিবি কুলসুম' জীবনী গ্রন্থে।

যাহোক ১৮৫৯ থেকে প্রজাস্বত্ব আইনের ও ১৮৬০ থেকে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ, নয়া সমাজ শ্রেণীর অভ্যুদয় ও উৎপাদন পদ্ধতির বিচ্ছিন্ন কিছু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন প্রকার স্বত্ব সৃষ্টি করে প্রণীত আইন সমূহ, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার পদক্ষেপ সমূহ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিকাশ গ্রামীণ সমাজ কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন ও ১৯৩৭ সালে নির্বাচনোত্তর স্বায়ত্তশাসনের সূচনা পর্যন্ত। অতঃপর বাংলার সমাজ উপাদান সামাজিক বিন্যাসে নয়া কাঠামো সংযোজন করে।

আলোচ্য সময়ে পেশাভিত্তিক সমাজ শ্রেণীর বিকাশ ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে এদাঞ্চলের পরিসংখ্যানগত তথ্য উপস্থাপন করেছেন কেদার নাথ মজুমদার। তার পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ সময়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী, ১০ জন শ্রমজীবী, ১ জন ব্যবসায়ী, ১২ জন পৈত্রিক ব্যবসায়ী, ৩ জন মৎস ব্যবসায়ী ও ৩.৮ জন দিনমজুর ছিল। কৃষিজীবীর মধ্যে শতকরা ৯৫ জন প্রজা ও ২ জন তালুকদার ছিল। এদের একটি অংশ চাকুরিজীবী ও অপর অংশ ব্যবসায়ী, একই সাথে চাকুরিজীবী ছিল। কেদার নাথ এই শ্রেণীর জেলা ভিত্তিক সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, শতকরা হার উল্লেখ করেননি। উক্ত সংখ্যা কে বর্গমাইল অনুযায়ী গড় করলে এতদাঞ্চলের পুরুষ, স্ত্রী ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চাকুরিজীবীর সংখ্যা বের করা যেতে পারে।

কেদার নাথ বলেন, পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে এ জেলার লোক চাকুরীর জন্য লালায়িত হতো না, এমনকি নিম্ন শ্রেণীর মজুর দিগকেও পরিবার প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিন পরিশ্রম করতে হতো না[১৬১]। হান্টারের রিপোর্ট এ বক্তব্যের প্রমাণ[১৬২]। এ থেকে আলোচ্য সময়ে এতদাঞ্চলের সাধারণ শ্রেণী সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ছবি ফুটে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও গ্রামীণ উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে জমিদার ও বিভিন্ন সমাজ শ্রেণীর ভূমিকাঃ

আলোচ্য পর্বে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গঠন প্রক্রিয়া গতি লাভ করে প্রধানত দুটি কেন্দ্রে একটি গ্রামে, অন্যটি শহরে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে দেলদুয়ার-করটিয়া-সন্তোষ জমিদার বাড়ী সম্ভুত গ্রাম বা ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসনকে কেন্দ্র করে বিকশিত নয়া মফস্বল শহর বা মহকুমা শহর হিসেবে টাঙ্গাইলের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

এই মহকুমা শহর টাঙ্গাইলের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে- নগর ইতিহাস বিষয়ক প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিপরীত কিছু বৈশিষ্ট্য। মফস্বল শহর পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সিরাজুল ইসলাম বলেন, "উনিশ শতকের শেষ দিকে মফস্বল শহর গুলোর ভর কেন্দ্র কাছারি চত্বর থেকে বাণিজ্যিক এলাকায় সরে যায় এবং এই পরিবর্তন ঘটে মূলত জনসংখ্যাবৃদ্ধি, যাতায়ত ব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য ও অপ্রধান শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগমনের ফলে"[১৬৪] ।

নগরায়নের বিস্তার না হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির প্রশাসনিক পদক্ষেপে দেশে নতুন নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়। এগুলো হলো দেশের অভ্যন্তরীন জেলা প্রশাসনের কেন্দ্র, যা অচিরেই শহর রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। নগর ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক শরীফ উদ্দিন আহমদ নগরায়নের সাধারণ বৈশিষ্টের উল্লেখ করে বলেন, "উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্যের বিনিময়কে কেন্দ্র করেই মূলতঃ কৃষিভিত্তিক এই ভুখন্ডে নগর গড়ে ওঠে। .... ফলে নদীর তীর, রাজপথ ও অবস্থানগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকা গুলোকে ঘিরে কৃষিজাত পণ্য বিনিময় কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছিল। এই বিনিময় কেন্দ্রগুলোই কালক্রমে নগর কেন্দ্রে রুপান্তরিত হয়। এই মফস্বল শহর গুলোর অধিকাংশই উদ্ভব হয়েছিল মূলত প্রধান প্রশাসন কেন্দ্র বা তাদের সহায়ক উপকেন্দ্র হিসেবে। স্থান গুলোকে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচনের পিছনে ছিল মূখ্যত এদের নিজস্ব অবস্থানগত গুরুত্ব এবং সম্পূরক সুবিধা। এই মফস্বল শহরগুলো অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সমস্ত মফস্বল শহরকে পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হলেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যদিও শহরগুলোর অপরিকল্পিত বিকাশ পরবর্তী সময়ে পৌর এবং স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করে সেগুলো সময়ের অগ্রগতিতে খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তবুও একথা নিশ্চিভাবে বলা যেতে পারে যে, বিশ শতকের প্রারম্ভে এই শহরগুলোর নাগরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি সুস্পষ্ট রূপ নেয়। এই শহরগুলোর অধিকাংশই নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়'[১৬৫] ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকদ্বয়ের মতামত জেলা সদর এবং সার্বজনীন ভাবে গড়ে ওঠা শহরগুলো সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও আলোচ্য মফস্বল শহর এবং প্রশাসনিক মহকুমা সদর টাঙ্গাইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা টাঙ্গাইল শহর গড়ে ওঠার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্যগত ভাবে কতগুলো ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ টাঙ্গাইল শহরটি কোন কৃষিপণ্য বিনিময় কেন্দ্র কেন্দ্রিক গড়ে ওঠেনি বরং একটি মৎস্য বিনিময় কেন্দ্রকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠেছে [১৩০]। দ্বিতীয়ঃ ভূকৌশলগত কিংবা প্রশাসনিক সুবিধাগত গুরুত্বপূর্ণ কালীহাতি বা পার্শ্ববর্তী কোন একস্থানে না হয়ে একটি হিন্দু জমিদারী প্রভাবিত অগুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে স্থানান্তরিত মহকুমা সদর কেন্দ্র হিসেবে এটি গড়ে ওঠে। অথার্ৎ ভূমি কিংবা প্রশাসনগত সুবিধাজনক অবস্থান এই শহর উৎপত্তিতে পরিলক্ষিত হয় না। তদুপরি প্রশাসন কর্তৃক নতুন নতুন থানা ও চৌকি প্রতিষ্ঠার সময়ে, দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত একটি থানা চৌকি কেন সকল ঐতিহ্য ও নিয়ম নীতি লংঘন করে একটি নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হয় তা অবশ্যই গবেষণার দাবী রাখে। আলোচ্য সময়ে আতিয়ার জমিদারগণ আতিয়া থেকে তাদের জমিদারী কেন গোড়াই ও পরে করটিয়ায় স্থানান্তর করেন ?

আতিয়া থানাকে প্রথমে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের অধীনে আনা হয় এবং ময়মনসিংহের অধীনে মহকুমা ঘোষণা করা হয় অতপর হঠাৎ করেই উক্ত মহকুমা সদরকে 'আতিয়া' থেকে সম্পূর্ণ গ্রামীণ একটি ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী মৎস বিনিময়স্থান টাঙ্গাইলে স্থানান্তর করার কারণ নিঃসন্দেহে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, টাঙ্গাইল নগর পত্তন ও বিকাশ সম্পর্কিত স্থানীয় ইতিহাস তথা গবেষক মোফাখখাররুল ইসলাম, খন্দকার আবদুর রহিম ও কেদার নাথ প্রমুখের বিবরণ বহুলাংশেই যুক্তিযুক্ত, গ্রহণযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ।

এদের বিবরণ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, নদীর তীর নয়, ব্যবসা বা কৃষি কেন্দ্র হিসেবে নয়, এমনকি ইংরেজের নির্বাচিত প্রথম প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবেও টাঙ্গাইল শহরের পত্তন হয়নি। শুধুমাত্র সন্তোষ জমিদার বাড়ী থেকে সদর কাছারিতে যাতায়াতের পথ, আর এ পথে লাখেরাজ প্রাপ্ত একটি জায়গায় যমুনা ও লৌহজং নদীর জেলেদের মাছ বিক্রির একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রকে ঘিরেই পরিচিত ছিল টান আইল[১৩১]। আলোচ্য ঔপনিবেশিক পর্বে এটি একটি স্থানান্তরিত মহকুমা শহরে রূপান্তরের পটভূমি বা গুরুত্ব এই যে, উক্ত 'টান আইল' এর পাশেই ছিল ইংরেজ নীলকুঠি আর কাছেই ছিল স্থানীয় ইতিহাসের অগ্রগামী চালিকা শক্তি স্থানীয় হিন্দু জমিদার 'সন্তোষ জমিদার' বাড়ী। অপর পক্ষে পূর্বের আতিয়া ছিল

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা সমৃদ্ধ একটি মফস্বল শহর। যা প্রথমে ঢাকা জেলার অধীনে একটি থানা শহর হিসেবে পরিচিতি পায়। আদম শাহ কাশ্মীরির মাজারকে কেন্দ্র করে সুলতানী যুগে এই শহরের পত্তন হয়। আতিয়া জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা পন্নী পরিবার দ্বারা এই শহর সমগ্র মুঘল আমলে বিকশিত হয়।

আলোচ্য সময় কালে যদিও 'আতিয়া' জমিদাররা গোড়াইতে বসতি স্থাপন করায় আতিয়ার ঔজ্জল্যকে ম্লান হয়ে যায়, তবুও ময়মনসিংহ জেলার অধীনে প্রথমে থানা ও পরে মহকুমা প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, 'আতিয়ার' পুরনো গৌরব মাথা চাড়া দেয়ার সুযোগ পায়। যেমন পেয়েছিল পূর্ববাংলা ও আজকের বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। কিন্তু স্থানীয় সুন্দরী বিধবা হিন্দু জমিদার, সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ নীলকর আর স্থানীয় ইংরেজ আমলা চক্রের কলকাঠিতে হিন্দু সন্তোষ জমিদারদের আবদারে টানআইলে মহকুমা প্রশাসন স্থানান্তর করা হয়। এভাবেই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবেই একটি মহকুমা প্রশাসন কেন্দ্র, একটি শহর থেকে পার্শ্ববর্তী অন্য আরেকটি গ্রামেই কেবল স্থানান্তরিত হয়ে শহরের উৎপত্তি হয়। পরবর্তীতে এই মহকুমা প্রশাসনকে কেন্দ্র করে বসতি ও বাজার বৃদ্ধি পেয়ে শহর পত্তন হয়।

আমাদের আলোচ্য পর্বে সকল স্থানীয় জমিদার তাদের নিজ বাড়ীর জমিদারী কাছারির একটি সদর কাছারি এই মহকুমা সদরে স্থানান্তর করেন। অনেক জমিদার সদর কাছারির পাশাপাশি মহকুমা সদরে কাছারি সংলগ্ন একটি অস্থায়ী নিবাসও স্থাপন করেন। দেলদুয়ার জমিদারদের কাছারি ও নিবাসের কেন্দ্র বর্তমানে টাঙ্গাইলের 'শহীদ স্মৃতি আশ্রম' হিসেবে তাদেরই দানে গড়ে উঠেছে। মীর মশাররফ হোসেনের 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপাখ্যানের 'শান্তিকুঞ্জ' নামের বাড়ীকে ঘিরে যে রসাত্বক বিবরণ দেয়া হয়েছে তা জমিদারদের এই সদর কাছারি বাড়ীকে কেন্দ্র করেই কল্পিত।

এভাবেই হিন্দু জমিদারদের সাথে ইংরেজ স্থানীয় আমলা শ্রেণীর আঁতাত, ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি মুসলিম ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ও মুসলিম জমিদারী প্রভাবিত শহরের বিনাশ করে একটি হিন্দু জমিদার প্রভাবিত ও ইংরেজ নীল কুঠিওয়ালাদের নিকটবর্তী একটি গ্রাম্য ধানক্ষেতে মহকুমা শহর স্থাপিত হয়। এবং বাংলার ইতিহাসের নগর পত্তন ধারার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি ধান ক্ষেতে মাটি ভরাট করে অপরিকল্পিত ভাবে পরিকল্পিত একটি মহকুমা সদর স্থানান্তর করা হয়। আর তাকে কেন্দ্র করেই এতদাঞ্চলের গ্রামীণ ও মফস্বল বাজার ইতিহাসের বিকাশ লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

আতিয়া শহর থেকে আবার গ্রামে ফিরে যায়। ৪৭ এবং ৭১ এর স্বাধীনতা উত্তর বাংলায় মুসলিম জমিদার বাড়ী কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র গ্রাম্য বাজারগুলো আবার বিকশিত হয়। বর্তমানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিকাশে নতুন নতুন থানা প্রতিষ্ঠায় দেখা যায় পূর্বের অবহেলিত মুসলিম জমিদার বাড়ী ও বাজার কেন্দ্রগুলো স্বাভাবিক বিকাশ হয়ে থানা সদর বা ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। এমনি ভাবেই সম্প্রতি দেলদুয়ার ও ধনবাড়ী ইউনিয়ন থেকে থানা সদরে উন্নীত হয়। করটিয়া ও পাকুল্লা জমিদারী এলাকা ইউনিয়ন পরিষদ হলেও বৃহৎ ব্যবসা ও শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। খন্দকার আবদুর রহিমের ভাষায়, টাঙ্গাইলের বিবর্তনের ইতিহাস একটা কালচারের অবলুপ্তি, আরেকটা কালচারের অভ্যুদয়[১৬৮]।

প্রাচীনকাল থেকেই স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে স্বাধীন গ্রাম পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাক কোম্পানি যুগে তার উপরে ছিল পরগনা ভিত্তিক জমিদার শাসিত ব্যবস্থা। তার পাশাপাশি পুলিশী ভূমিকার দায়িত্বে ছিল ফৌজদার। উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন জমিদার। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা জমিদারদের উপর কিছু দায় দায়িত্ব অর্পিত হলেও তারা নানা কারণে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে জেলা, মহকুমা ও থানা ভিত্তিক তিন স্তর বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ প্রশাসন ব্যবস্থাই ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। প্রায় শতবর্ষ পরে ১৮৫০ সালের পর থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ১৮৫১ সালের ৮ম আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রথম এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়[১৬৯]। এই বিধান বলে রাস্তা ও ফেরিঘাটের উপর কর ধার্য্য, ধার্য্যকৃত করের উপর জেলার অংশ নির্ণয় এবং প্রাপ্ত অংশের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সহযোগিতা করার জন্য কিছু সংখ্যক মনোনীত ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি ছোট কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু পদক্ষেপটি বাস্তবে ফলপ্রসু না হওয়ায় অচিরেই বাতিল হয়ে যায়।

পরে ১৮৭০ সালে গ্রাম্য চৌকিদারী আইন বা ৭ম আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে এদেশে সর্বপ্রথম আইনের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর লক্ষ্য ছিল গ্রামবাসীদের উপর করধার্য্য ও নিয়ন্ত্রণ এবং কর আদায়ের মাধ্যমে চৌকিদারদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তিন বছরের জন্য এদের মনোনীত করা হতো। সাধারণতঃ জমিদার, তালুকদার, বিত্তশালী কিংবা শিক্ষিত ব্যক্তিদের পঞ্চায়েত হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হতো। ১৮৭১ সালে জেলায় রাস্তাঘাট নির্মাণ তদারকি ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ বেসরকারী সদস্য মনোনয়ন দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে রোড

সেস কমিটি গঠন করা হয়। এতেও স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার, তালুকদার বা শিক্ষিত ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়া হতো।

১৮৮৫ সাল বাংলার গ্রামীণ ও আঞ্চলিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। স্থানীয় সরকার আইন ১৮৮৫ এর বিধান অনুযায়ী তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জেলায় জেলা বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড, এবং গ্রাম পর্যায়ে পঞ্চায়েতের পরিবর্তে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করে এদের উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু করা হয়।

৫ থেকে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি, ইউনিয়নের প্রাপ্ত বয়স্ক জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য জীবন নতুন করে জেগে ওঠে। নাগরিকদের অধিক হারে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহকুমা পর্যায়ে গঠিত লোকাল বোর্ড গুলো প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সরকার মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হতো। লোকাল বোর্ডের নিজস্ব কোন আয়ের উৎস ছিল না। জেলা বোর্ড প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে লোকাল বোর্ড নিম্ন প্রাইমারী শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য বিধান এবং গ্রাম্য পথঘাটের রক্ষনাবেক্ষণ করতো। উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা না থাকলেও জেলা বোর্ডের অর্ধেক সদস্য লোকাল বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হতো।

জেলা বোর্ডে একই ভাবে প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে অর্ধেক সদস্য লোকাল বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত এবং অন্য অর্ধেক অংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো[১০]। জেলা বোর্ড স্থানীয় সরকারের প্রধান কর্তৃপক্ষে পরিণত হয় । কিন্তু লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটি সমূহ অত্যান্ত সীমিত পরিমান কাজ করতে পারতো। কারণ অর্থের জন্য তাদেরকে জেলা বোর্ডের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হতো। জেলাবোর্ডেরও অর্থের সীমাবদ্ধতা ছিল যথেষ্ট। ১৯০৮ সালের ৫ম আইনে ১৮৮৫ সালের অ্যাক্টের বিভিন্ন ধারার পরিবর্তন সাধন করা হয়। বস্তুত ১৯০৭ সাল থেকেই কমিশন গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

অবশেষে ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দু স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। মহকুমা বোর্ড বিলুপ্ত করা হয়। জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটির নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়[১১]। প্রায় ১০

Dhaka University Institutional Repository

বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এবং প্রায় ৮,০০০ লোক নিয়ে গঠিত হয় একটি ইউনিয়ন বোর্ড। ইউনিয়নবোর্ডের দুই- তৃতীয়াংশ সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতেন এবং বোর্ড সমূহ কে তাদের সদস্যদের মধ্যে হতে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার অধিকার দেয়া হয়। এসব বোর্ডকে প্রশাসনিক মিউনিসিপ্যাল ও বিচার সংক্রান্ত কাজের অধিকার এবং এসব কাজের সমর্থনে তহবিল গঠনের জন্য মৌলিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের আয় ছিল মূলত নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত খোয়াড়ের আয়, জেলা বোর্ডের অনুদান এবং ইউনিয়নের অধিবাসীদের উপর ধার্য্যকৃত কর। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে[১৭১]। ১৮৮৭ সালে দেলদুয়ার ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯২৪ সালে নতুন আইনে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়, এই কমিটি ও পরিষদে সভাপতি হিসেবে অধিকাংশ সময় দায়িত্ব পালন করেন দেলদুয়ার উত্তর ও দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারগণ যথাক্রমে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ আব্দুল জব্বার চৌধুরী, স্যার আবদুল হালিম খান গজনরী, খান বাহাদুর সৈয়দ আহমেদ হোসেন চৌধুরী , লেঃ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ মহব্বত আলী চৌধুরী প্রমুখ[১৭৩]।

১৮৬৯ সালে টাঙ্গাইলে মহকুমা স্থাপন হয় একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে। এবং তারই সভাপতিত্বে ১৮৮৫ সাল থেকে গঠিত তিন বৎসর মেয়াদী নিম্নে ৬ সদস্য বিশিষ্ট লোকাল বোর্ড ১৯১৯ সাল পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্য্যক্রমের সমন্বয় করে। যদিও লোকাল বোর্ডের তেমন আয় ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। লোকাল বোর্ডের আয়-ব্যয় ও উন্নয়ন কার্য্যক্রম সম্পর্কে বিশদ কোন তথ্য স্থানীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না[১৭৪]। যেমন পাওয়া যায় ইউনিয়ন ও পৌরসভা সংক্রান্ত তথ্য। প্রতিষ্ঠানগত ধারাবাহিকতা ও শক্তিশালী ভিত্তিই সম্ভবতঃ এর কারণ। লোকাল বোর্ড সমূহে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। কখনো শিক্ষিত আইনজীবী বা অন্য পেশাজীবী নেতৃত্বকেও সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হতো। আলোচ্য পর্বে বোর্ডে বেসরকারী সদস্য একজন সহ সভাপতিই ছিলেন বেসরকারী প্রধান ব্যক্তি। তার বেতন ছিল না কিন্তু দায়িত্ব ছিল, আর ছিল সামাজিক সম্মান। এক্ষেত্রেও দেখা যায় অধিকাংশ সময় ইংরেজ সরকার অনুগত ও প্রভাবশালী জমিদার তালুকদার অথবা শিক্ষিত নেতৃত্বকে এ পদে মনোয়ন দেয়া হতো। আলোচ্য সময়ে দেলদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবীকে বিভিন্ন সময়ে লোকাল বোর্ডের সহ সভাপতি হিসেবে বেসরকারী উন্নয়ন সদস্য হিসেবে দেখা যায়। অবশ্য ১৯০৯ সালের পরেই তাকে লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড সহ ধাপে ধাপে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় তথা জাতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে দেখা যায়।

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন দেলদুয়ারের দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারগণ। প্রতিষ্ঠাকালে টাঙ্গাইল মহকুমা লোকাল বোর্ড ১০৪৮ বর্গ মাইল আয়তন ও ৯,৫৩,৭৮১ জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত হয়। প্রায় অর্ধ শতাধিক গোদারা ঘাট এবং প্রায় ১৩টির মত দাতব্য ঔষধালয় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ছিল[১৭৫]।' ১৯০৩ সাল পর্যন্ত বোর্ডের অধীনে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ মাইল কাঁচা পাকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়[১৭৬]। এ সময় পর্যন্ত টাঙ্গাইলে ১৬১০ জন চৌকিদার ও ১৪১ জন দফাদার বিভিন্ন ইউনিয়ন পর্যায়ে আইনশৃংখলা রক্ষায় কাজ করে। যাদের বেতন দেয়া হতো স্থানীয় ইউনিয়ন কমিটি থেকে। দেলদুয়ার জমিদারদের প্রভাবে দেলদুয়ারে এতদাঞ্চলের অন্যতম সাব অফিস ডাক ঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়[১৭৭]।

টাঙ্গাইল মহকুমার অধীনে তিনটি থানা ছিল। তম্মধ্যে সদর থানা বর্তমানে ৬টি থানা সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ টাঙ্গাইল, যার আয়তন ছিল ৪৪৬ বর্গ মাইল। গ্রামের সংখ্যা ৮২৯টি। পৌরসভা সহ জনসংখ্যা ছিল ৪৬,৭৭৩০ জন। প্রতি বর্গমাইলে ছিল ১০৪৯ জন লোকের বাস। যেখানে পুরো মহকুমার গড়বাস ছিল ৯১৪ এবং পুরো জেলায় গড়ে বাস ৬১৮ জন। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় দেলদুয়ার আতিয়া জমিদারী শাসিত কৃষি প্রধান সমতল এই চরাঞ্চল ছিল লোকবসতি পূর্ণ[১৭৮]।

ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে দক্ষিণ টাঙ্গাইলে মুসলমান সংখ্যা ছিল বেশী আর উত্তর টাঙ্গাইলে হিন্দুর সংখ্যা বেশী ছিল[১৭৯]। ময়মনসিংহের অন্যান্য থানা শহরের তুলনায় অনেক দেরীতে ১৮৮৭ সালে টাঙ্গাইল মহকুমা শহরকে মিউনিসিপ্যালটিতে উন্নীত করা হয়[১৮০]। ময়মনসিংহের অন্য ৫টি মহকুমা সদরকে মিউনিসিপ্যালটি করা হয় ১৮৬৯ সালে। এর কারণ সে সময়ে এগুলো ছিল স্বাভাবিক ভাবে বর্ধিষ্ণু মফস্বল শহর। কিন্তু আতিয়া থেকে মহকুমা সদর টাঙ্গাইলে স্থানান্তর হলেও সে সময়ে টাঙ্গাইল শহর হিসেবে গড়ে ওঠেনি। শহর হিসেবে গড়ে ওঠার পর সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষুদ্র শহর হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণীর এটি মিউনিসিপ্যালটি মর্যাদা লাভ করে।

তখনো কিন্তু টাঙ্গাইল শহর দ্বিখন্ডিত, একটি আতিয়া অপরটি টাঙ্গাইল। মিউনিসিপ্যালটি গঠিত হলে প্রথম নির্বাচিত সদস্যের প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত এমনকি সভাপতি হিসেবে এস ডি ও বা সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। এবং এই অবস্থা ১৯০৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রতিষ্ঠাকালে ৫.২৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত হয় টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালটি[১৮১]। ১৮৯১ সালে

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে এ শহরের লোক সংখ্যা ছিল ১৭৯৭৩ জন সেখানে ১৯০১ সালে লোক সংখ্যা দেখা যায় ১৬,৬৬৬ জন[১৮২]। যেখানে লোক সংখ্যা বাড়ার কথা, সেখানে লোক সংখ্যা কমলো কেন ? তা গবেষণার দাবী রাখে। এর কারণ সম্ভবতঃ শহরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি, ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তবে ম্যালেরিয়ার কারণে জলবায়ু দুষিত হওয়ায় বহু লোক শহর ত্যাগের তথ্য এ সময় পাওয়া যায়[১৮৩]।

টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালটিতে প্রথম দিকে পুরো হিন্দু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯০৯ সালে মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন জারী হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে কিছু অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোক মিউনিসিপ্যালটিতে ভাইস চেয়ারম্যান ও মেম্বার হওয়ার সুযোগ পায়। তবে বেঙ্গল এ্যাক্টের বাস্তবায়ন ও ১৯২৮ সালের পূর্বে টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালটিতে মুসলমান নেতৃত্ব শুরুর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৯২৮ সালে প্রথম খোন্দকার আহরাম উদ্দীনকে, পরে দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদার সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান পদে দেখা যায়। অবশ্য তারও পূর্বে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছুদিনের জন্য দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর প্রভাবশালী জমিদার আবদুল হালিম খান গজনবী পৌর চেয়ারম্যান পদে সমাসীন থাকার বিবরণ পাওয়া যায়। চেয়ারম্যান থাকা কালে এস,ডি,ও কোর্ট থেকে শান্তিকুঞ্জ কাছারি পর্যন্ত মেইন রোডটি তিনিই প্রথম পাকা করেছিলেন[১৮৪]। খোন্দকার আবদুর রহিমের মতে, 'তার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়ার সময়কাল সম্ভবত বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১৩-১৫ সময় কাল। টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটি উৎপত্তিকালে এর আয় ব্যয় সম্ভবত তিন/চার হাজার টাকার অধিক ছিল না। ১৯০২ সালে এর আয় দেখা যায় ৯০৩১ টাকা ব্যয় ও নিশ্চয়ই একটু বেশী হবে। আর ১৯২১ সালে এটি বেড়ে দাড়ায় ১৬,৪৮৯ টাকায় এবং ১৯৩১ সালে ২১,৫৭৭ টাকা। অবশ্য সময়ে সময়ে শহরের আয়তন ও জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়। তেমন বৃদ্ধি পায় শহরের নানাবিধ নতুন নতুন সমস্যা এবং জীবন যাত্রার মান ও ব্যয় সমান তালে বৃদ্ধি পায়' [১৮৫]।

বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদের অন্তবর্তীকালীন সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা প্রবাহ এতদাঞ্চলের গ্রামীণ ও নগর জীবনে গুনগত কতগুলো পরিবর্তন নিয়ে আসে। আলোচ্য সময়ে সমাজ কাঠামো, শ্রেণী বিন্যাস এবং গ্রামীণ ও নগর জীবন যাত্রা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কলকাতা, ঢাকা ও বগুড়ায় বহুপূর্বেই মুসলমান মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু এতদাঞ্চলে ১৯০৯ সালের সংস্কার বাস্তবায়নের পূর্বে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। কেননা টাঙ্গাইল শহরে প্রভাব বিস্তার করে ছিলেন সন্তোষের হিন্দু জমিদারগণ। তারা যেখানে দীর্ঘকাল গরু-কোরবানী করতেই দেয়নি, সেখানে মুসলিম শিক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে প্রভাবশালী মুসলিম জমিদার গজনবীগণ স্থানীয় পর্যায়ে মুসলমান শ্রেণীকে পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে ইংরেজদের প্রতি অনুগত ও সরকারী সেবার নীতি গ্রহণ করে। ফলে তারা উচ্চপদ লাভ করে এবং নীতি নির্ধারণী ভূমিকার মাধ্যমে মুসলিম ও জাতীয় স্বার্থে যৌথভাবে কাজ করে। ফলে সাধারণ জনগণকে সংগঠিত করা ও ব্যাপক স্থানীয় শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গের ফলে এর পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন জনসভা আয়োজন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, স্বদেশী-পক্ষে, বিপক্ষে আন্দোলন; ন্যাশনাল স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা সহ দেশীয় তাঁত ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ হয়। ফশশ্রুতিতে জনজীবনে নতুন চেতনার অভ্যুদয় ঘটে।

এই রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় চেতনার পাশাপাশি ১৯০৯ সালে মর্লিমিন্টো সংস্কার আইনের প্রেক্ষিতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলিতে পৃথক নির্বাচন প্রথায় মুসলমান মেম্বার প্রশাসনে অংশীদারিত্বের সুযোগ পায়। ১৯১৬ সালের কংগ্রেস মুসলিম লীগ লক্ষ্মৌ চুক্তি এবং ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন এবং সংখ্যানুপাতে মনোনয়ন ও চাকুরী সুবিধা নীতি মেনে নেয়া হয়। ফলে ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড এবং পৌরসভাগুলোতে বনেদি মুসলিমগণ মেম্বর হয়ে স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসন ব্যবস্থায় অবদান রাখতে শুরু করে[১৮৬]। এই সময়ই টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী জমিদার সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী বঙ্গীয় নির্বাহী পরিষদে মনোনীত হন আর দেলদুয়ারের জমিদার আবদুল করিম গজনবী বড় লাটের কাউন্সিলে সদস্য মনোনীত হয়ে এতদাঞ্চলের জনমানসে মর্যাদার আসনে সমাসীন হন। একই সময়ে ছোট ভাই আবদুল হালিম গজনবী মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

স্বদেশী আন্দোলন পর্বে সন্তোষ জমিদারগণ দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে। স্বদেশী সভায় যোগদানকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের চাপে সন্তোষ জমিদার কর্তৃক বিন্দু বাসিনী হাইস্কুলের ছাত্রদের জরিমানা করে। এর প্রতিবাদে আবদুল হালিম গজনবী উদ্যোগ নিয়ে অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, খড়্গ সিংহ, প্রেমাদিত্য ঘোষ, মনমোহন নিয়োগী প্রমুখ স্বদেশী হিন্দু নেতার সহায়তায় টাঙ্গাইলে বিকল্প ইউনিয়ন হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আবদুল হালিম গজনবী হলেন তার প্রথম সেক্রেটারী[১৮৭]। যেটি বর্তমানে শিব নাথ হাইস্কুল নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গভঙ্গ রদ উত্তর আলোচ্য সময়ে অন্যান্য স্থানের ন্যায় টাঙ্গাইলে মুসলিম জনমানসে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও মুসলিম স্বার্থ চেতনা খুব একটা বিকশিত হয়নি। কেননা টাঙ্গাইল শহরে যে দুটি মুসলিম জমিদারের প্রভাব ছিল, একটি হলো দেলদুয়ারের গজনবী পরিবার, অপরটি সন্তোষের রায় পরিবার। এই দু' পরিবারে দু'জন করে ক্ষনজন্মা পুরুষ সে সময়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোচিত ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তারা ছিলেন তখনো পর্যন্ত কংগ্রেসী ধারায়। অপরপক্ষে মুসলিম লীগ প্রভাবিত করটিয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী এবং ধনবাড়ীর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী স্বীয় ইউনিয়নে ব্যক্তি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে খ্যাতিমান হলে ও টাঙ্গাইল শহরে বা তার আশেপাশে জমিদারী না থাকায় এখানে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কম ছিল। তদুপরি মুসলিম লীগ তখনো অভিজাতদের গন্ডি ছেড়ে মধ্যবিত্তের স্তরে এসে, মফস্বলে সংগঠন গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করতে পারেনি।

খন্দকার আবদুর রহিমের মতে, '১৯১৩ সনে দেলদুয়ারে এ,কে গজনবী সাহেব মনোনীত হলেন বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য। গজনবী সাহেব উক্ত পদ লাভ করার পর যখন টাঙ্গাইলে ফিরে এলেন তখন এলাসিন জাহাজ ঘাট থেকে দেলদুয়ার পর্যন্ত জনতার সারি তাকে এগিয়ে নিয়ে এলো। সেই সময় থেকেই গজনবী সাহেব ইংরেজ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা দেখাতে শুরু করে দিলেন। তার ফল দাড়ালো এই যে, টাঙ্গাইলের আপামর জনসাধারণ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে মনোভাব পোষন করার কোন উৎসাহ পেলো না'[১৮৮]। অবশ্য এ,কে, গজনবী স্থানীয় উন্নয়ন ও রাজনীতিতে কখনোই অংশ গ্রহণ করেননি। ফলে তার ব্যক্তিগত ভূমিকা মূল্যায়নের দাবী রাখে জাতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে। সেখানে দেখা যায় তিনি সরকারী প্রশাসনে ছিলেন। চেতনাগতভাবে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ও তাদের কর্মকান্ডের প্রতি তার সমর্থন বা আগ্রহ কোনটিই ছিল না, তবে তিনি সজাগ ও সচেতন ছিলেন মুসলিম স্বার্থের প্রতি। কিন্তু আবদুল হালিম গজনবী ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন একাধারে কংগ্রেসী ও স্বদেশী। যদিও হিন্দু ও কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক নীতিতে ভীতশ্রদ্ধ হয়ে মাঝখানে কিছু দিনের জন্য মুসলিম লীগে যোগ দেন। তাও মুসলিম লীগের জিন্নাহ গ্রুপের পরিবর্তে ক্ষুদ্র অথচ প্রগতিশীল ধারা শফি গ্রুপে ছিলেন। ফলে দলগত ভাবে স্থানীয় পর্যায়ে তার কোন প্রভাব পড়েনি। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে আবার প্রজা পার্টি থেকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। টাঙ্গাইল দক্ষিণ মুসলিম আসন থেকে মুসলিম লীগ প্রার্থী অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁকে পরাজিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

যা হোক এদের প্রভাবে এতদাঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থের আন্দোলন অরাজনৈতিক সংগঠনের ব্যানারে ভিন্ন রূপে বিকশিত হয়। এ সময় টাঙ্গাইলে ব্যাপক ভাবে প্রজা সমিতি গড়ার হিড়িক পড়ে, বিশেষত টাঙ্গাইল সদরে, সন্তোষের হিন্দু সন্তোষ জমিদার শাসিত অঞ্চলে। এদের অধিকাংশ প্রজাই ছিল মুসলমান। ১৯১৬ সালে টাঙ্গাইলে মুসলিম বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত হয় আবদুল হালিম গজনবীর নেতৃত্বে। ১৯২১ সালে টাঙ্গাইল পার্কে খেলাফত আন্দোলন দিবসে আবদুল হালিম গজনবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পঞ্চাশ হাজারের বেশী লোক সমাগম হয়। আবদুল হালিম গজনবীর উদ্যোগে এতদাঞ্চলের জনমানসে যে রাজনৈতিক -সামাজিক আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে। তার ফল ভোগ করে প্রথম কৃষক প্রজা পার্টি ও পরে মুসলিম লীগ। এ সময় ছায়েফ উদ্দীন কিচলু এখানে 'তানজীম আন্দোলন' গড়ে তোলে। ১৯২৬ সনে টাঙ্গাইলে মহকুমা প্রজা সমিতির কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এর পর টাঙ্গাইলের বিভিন্ন স্থানে ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে প্রজা সমিতি গঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানে এ উপলক্ষ্যে কনফারেন্স হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় শ্রেণীর সমর্থকগণ প্রজা সমিতির মধ্যে প্রবেশ করে প্রজা সমিতিকে নিরপেক্ষ করে রাখার চেষ্টা করতো। সেজন্য এতদাঞ্চলে প্রজা সমিতির ব্যাপকতায় ইংরেজ সরকার উদ্বিগ্ন বোধ করতো না। রাজনৈতিক দলগুলোও না।

এসময়ে এতদাঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব চলে যায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে ও হিন্দু উচ্চবিত্ত শ্রেণীর হাতে। মাওলানা হেকিম হাবিবুর রহমান মুসলিম লীগকে এবং নিজাম উদ্দীন মোক্তার প্রজা সমিতিকে এতদাঞ্চলে সুসংগঠিত করে তোলেন। আর এই সময়ে বিভিন্ন সূত্রে টাঙ্গাইলে উপস্থিত হন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি কাগমারী পরগনার মোগল শাসক শাহজামানের মাঝারে আস্তানা স্থাপন করেন। এবং মাঝারের তত্ত্বাবধায়ক রোস্তম আলী ফকিরের সহায়তায় টাঙ্গাইলের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব পদে আসীন হন। এ সময়ে সন্তোষের জমিদারগণ স্থায়ীভাবে কলকাতায় অবস্থান করেন। একইভাবে দেলদুয়ারের জমিদারগণ। অবশ্য দেলদুয়ারের উত্তর বাড়ীর জমিদারগণ মাঝে মধ্যে দেলদুয়ার টাঙ্গাইলে এসে অবস্থান করেন এবং দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারগণ স্থানীয় রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকান্ড বিশেষত স্থানীয় প্রশাসনে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখেন। পুরো পাকিস্তান পর্বেও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে জমিদার বংশধরদের ভূমিকা অক্ষুন্ন থাকে[১৮৯]।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২ দেলদুয়ার টাঙ্গাইলের সমাজ ও সংস্কৃতিতে জমিদারদের অভিজাত ও নৈতিক জীবন ধারার প্রভাব প্রেক্ষিত 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপাখ্যান ও সমকালীন সাহিত্য ঃ

জমিদার প্রভাবিত টাঙ্গাইল-দেলদুয়ারের জনজীবনে জমিদারদের অভিজাত পারিবারিক ও নৈতিক জীবনের প্রভাব ব্যাপক ভাবে পড়েছিল। গবেষকদের গবেষণা ছাড়াও সমকালীন সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস ও লোককথায় জমিদারদের কৌতুকাবহ জীবন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে চরিত্রগত দিক থেকে ঔপনিবেশিক আমলে হিন্দু জমিদারদের সাথে মুসলমান জমিদারদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। বঙ্কিম চন্দ্রের 'কমলা কান্তের দপ্তর' দীন বন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পন' প্রভৃতি উপন্যাসে জমিদারদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়াও অনেক গবেষণা গ্রন্থে জমিদারদের সম্পর্কে কৌতুকাবহ ফিরিস্তি পাওয়া যায়। জলসা ঘর, বাগান বাড়ী বাঈজী নাচ, মদের আসর এসব ছিল জমিদার ও জমিদার আমলাদের সাধারণ রুটিন কাজ । মীর মশাররফের জমিদার দর্পন, আমার জীবনী, উদাসীন পথিকের মনের কথা, কুলসুম জীবনী, এবং গাজী মিয়ার বস্তানী উপাখ্যানে মুসলমান জমিদারদের পারিবারিক ও অভিজাত জীবন ধারার রূপক চিত্র পাওয়া যায়।

আবদুস সোবহানের ন্যায় হিন্দু বিদ্বেষী লেখক সমকালীন মুসলমান জমিদার সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'এরা কবুতর উড়িয়ে, মোরগবাজি করে, সতরঞ্জি খেলে বা স্রেফ ঘুমিয়ে দিন কাটান। মোসলমান কুলে জন্ম গ্রহণ না করিলে, মোসলমান মহিলাগণ এই আবর্জনাগুলিকে প্রসব না করিলে, সমাজের অধঃপতনের আশংকা কিছু কম হইত'[১৯০] ।

মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পন' সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে নানা কারণে। প্রধানত এতে মুসলমান জমিদার শ্রেণীর নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জমিদার দর্পনের নায়ক হায়ওয়ান আলী[১৯১], সে কামুক, অত্যাচারী; আবু মোল্লা তার রায়ত, মোল্লার স্ত্রী নুরুন্নেহার সুন্দরী। হায়ওয়ান তাকে হস্তগত করতে চায় এবং এজন্য সে আবু মোল্লার ওপর অত্যাচার করে এবং নুরুন্নেহারকে জবরদস্তি করে তুলে আনে, ধর্ষন করে,নুরন্নেহারের মৃত্যু হয়। মামলা চলে, কিন্তু যেহেতু জমিদার ও আইনের রক্ষকের মধ্যে আঁতাত আছে সেহেতু হায়ওয়ান মুক্তি পায় এবং মোল্লা সর্বস্বান্ত হয়[১৯২] ।

Dhaka University Institutional Repository

উদাসীন পথিকের মনের কথা'র উপজীব্য বিষয় জমিদার নীলকর এবং প্রজা। নীলকর রেনীকে কেন্দ্র করে তা আবর্তিত। একজন নীলকরের পক্ষে প্রজার উপর যা যা অত্যাচার করা সম্ভব রেনী তা করেছে এবং তাকে সহায়তা করেছে প্রভাবশালী জমিদার মীর সাহেব। তবে প্যারী সুন্দরী নামে এক মহিলা জমিদার রেনীর বিরোধীতা করে। অন্যদিকে মীরের জামাই সাগোলাম তাকে সম্পত্তিচ্যুত করে এবং সবশেষে প্রজার পক্ষ নেয়। মীর কিন্তু জমিদারীচ্যুত হয়েও রেনীর পক্ষে থাকে[১৯৩]। সম্ভবত ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। মীর মশাররফকে তারই সহায়তায় বিলেত পাঠাতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মীর মশাররফের মায়ের অনিচ্ছায় তা হয়ে ওঠেনি। ফলে তার পরিবর্তে ছোট ভাইকে বিলেত পাঠানো হয়। মীর মোয়াজ্জম বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে আসে। দেলদুয়ার টাঙ্গাইলে দুর্দিনে মশাররফ যখন ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জেল খেটে ছিলেন, তখন এই ভাই কলকাতা থেকে ময়মনসিংহ জজ আদালতে আপীল করে তাকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন[১৯৪]।

মীর মশাররফের 'আমার জীবনী', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' ও 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থে আমরা এ সংক্রান্ত স্বয়ং মীরের উক্তিতে বিবরণ পাই। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' উপাখ্যানে প্রধান উপজীব্য হচ্ছে জমিদারী এবং আদালতী হট্টগোল। বস্তানীতে জমিদারী এস্টেটে কাজ করা কালে গ্রাম্য জমিদারদের বিবাদ ও রেষারেষির মধ্যে মশাররফ হোসেন নিজে জড়িয়ে পড়েছেন। সেখানে জমিদারী সেরেস্তা, সরকারী অফিস, হাকিমের আদালত এবং সে সব ঘিরে যে সব মানুষ, তাদের সঙ্গে তার জীবন এক অবিচ্ছিন্ন কাহিনীতে পরিণত হয়ে গেছে। মানুষ সেখানে ঘরে ঘরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে, ছলনা ও জুয়াচুরি চলছে, লাঠালাঠি হচ্ছে, মিথ্যা মোকাদ্দমা আদালতে উঠছে। মাঝে মাঝে গান বাজনার আসরও বসে, পত্র পত্রিকার কথাও ওঠে, সম্পাদকের মাথা ভাঙ্গার চেষ্টাও চলে, গ্রন্থ রচনার আভাসও পাওয়া যায়[১৯৫]।

মীর মশাররফের উদ্ধৃতিতে বলা হয়, গাজী মিয়ার বস্তানী' রঙ্গপুরের কাহিনী অবলম্বনে প্রণীত। এজন্য অনেক গবেষক একে রঙ্গপুরের কিংবা উত্তর বা দক্ষিণ বঙ্গের কোন জমিদারের ছায়া অবলম্বনে নির্মিত বলে মনে করেন। নিঃসন্দেহে বস্তানীর চরিত্রগুলো কাল্পনিক এবং বিবরণগুলো সাহিত্যালংকারে ভাবের দ্যোতনায় অতিশয়োক্তি । তবুও মীর মশাররফ হোসেনের সমকালীন অন্যান্য জীবনীমূলক গ্রন্থসমুহের বর্ণিত উক্তি এবং বস্তানী কাহিনীর সাথে দেলদুয়ারের জমিদারদের পারিবারিক ইতিহাস এবং দেলদুয়ার এস্টেটে মীর মশাররফের ম্যানেজারের চাকুরীকালীন সময়ের কর্মতৎপরতা বিশ্লেষণ করলে,

Dhaka University Institutional Repository

একথা প্রমাণে অসুবিধা হয় না যে, বস্তানী উপাখ্যান বাস্তবে দেলদুয়ার জমিদারী এস্টেট এবং টাঙ্গাইলের আদালত পাড়া ও সমাজ জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও টানাপোড়নের জীবনেরই এক কৌতুকবহ ফিরিস্তি। কাজেই 'বস্তানী' উপাখ্যানের চরিত্র ও জীবন যাত্রা বিশ্লেষণে আমরা দেলদুয়ারের জমিদারদের জীবন ও সমাজ চরিত্রেরই স্বরূপ দেখতে পাই।

'বস্তানী' তথ্যের বাইরে সমকালীন লোক কথা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, জমিদার পরিবারের বর্তমান সদস্য এবং এলাকার বয়স্ক মানুষের শোনা কথা থেকেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। যা দেলদুয়ার -আতিয়া জমিদারদের অভিজাত জীবন এবং দক্ষিণ টাঙ্গাইলের সামাজিক জীবনে তার প্রভাব বিশ্লেষণে সহায়ক হয়। চাকুরী উপলক্ষ্যে মশাররফ হোসেন সবচেয়ে দীর্ঘকাল, ধারাবাহিক ভাবে টাঙ্গাইল অঞ্চলে বাস করেন। তার সেরা সাহিত্য সৃষ্টিগুলো এসময় কালেই রচিত হয়[১৯৮]। এ সময়েরই জীবন কাহিনী তিনি ' গাজী মিয়ার বস্তানী'তে ও ' বিবি কুলসুম' গ্রন্থে দিয়েছেন। বস্তানীতে তিনি নিজের চেয়ে জীবনের পরিবেশ ও পরিমন্ডলকে বেশী চিত্রিত করেছেন। তবে নিজেকে 'বেড়াকান্ত' নাম দিয়ে আর স্ত্রীকে 'বেড়াকান্তর বউ' নাম দিয়ে এ সময়ের নিজের দাম্পত্য জীবনের যে কাহিনী বস্তানীর শেষ অংশে দিয়েছেন তাকেই আবার বিবি কুলসুম গ্রন্থে আলাদা না বলে হুবহু তুলে ধরেছেন[১৯৯]।

আলোচ্য পর্বে বেড়াকান্ড ওরফে মীর মশাররফের দাম্পত্য জীবন বাদ দিয়ে বস্তানীর অপর চরিত্র ও কার্যক্রমগুলো বিশ্লেষণ করলে দেলদুয়ার-টাঙ্গাইলের জমিদারী ও সমাজ চিত্র বেরিয়ে পড়ে। বস্তানীর দুটি কার্যক্ষেত্র যমদ্বার ও অরাজকপুর। এ দুটি স্থান বলতে লেখক দেলদুয়ার জমিদার বাড়ী ও টাঙ্গাইল শহরকেই রূপক নামে অভিহিত করেছেন[২০০]।

বস্তানীতে আমরা পাই বেগম সাহেবা বা পয়জারুন্নেসা বা বেগম ঠাকরুন, সোনা বিবি, মতি বিবি এই চার মহিলা জমিদারের কৌতুকাবহ ফিরিস্তি। জমিদারী সংঘাত, ব্যক্তিসত্তার সংঘাত, ম্যানেজার ও ন্যায়ের গোমস্তাদের নিজের একক নিয়ন্ত্রণে রাখার সংঘাত, জমিদারী পরিবারিক রাজনীতি, কোর্ট কাছারি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্বার্থ মত ব্যবহারের চেষ্টা, সামাজিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে মহিলা জমিদার কর্তৃক প্রশাসনিক আমলা ও উকিল বাবুদের সাথে অবৈধ ও গোপন অভিসার, মদের আসর, নাচের আসরে অংশ গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। জমিদার পুত্রের সাথে মায়ের সংঘাত সৃষ্টি, নিজ স্বামী জমিদারের উপর নির্যাতন ও বিকলাঙ্গ করে রেখে পর পুরুষ নায়েব-গোমস্তাদের সাথে অবৈধ দেহিক

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক, জমিদারের কন্যা সন্তানদের বিবাহ দিতে না পারা দু'একটি কন্যা সন্তানের বিয়ে হলেও পৌরুষহীন দুর্বল আন্তঃজমিদার পরিবারে বিবাহ, ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর তার প্রভাব ইত্যাদি সব বস্তানীর উপজীব্য অথচ বাস্তব সমাজ চিত্র। নায়েব-গোমস্তাদের স্বার্থ সিদ্ধি, প্রয়োজনে স্বার্থ উদ্ধার আর স্বার্থ-হাসিল হলে কিংবা স্বার্থ না পেলে বিশ্বাস ঘাতকতা; পুলিশ-দারোগার ঘুষ-দূর্নীতির ভূমিকা, উকিল বাবু ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদের ভূমিকা, কেরাণী-মোক্তারদের ভূমিকা, জেলার- প্রহরীদের ভূমিকা সবই বস্তানীতে চিত্রিত হয়। অবিবাহিত জমিদার কন্যাদের জৈবিক আর্তনাদ ও যৌন রসালাপ, প্রজাবৃন্দের এনিয়ে গুঞ্জন করা কিন্তু মুখ ফুটে বলতে না পারা; খাজনা পরিশোধ নিয়ে জমিদারে জমিদারে দ্বন্দ্বের শিকার প্রজার করুন অবস্থা ও একাধিক পক্ষকে খাজনা পরিশোধ করা, নায়েব গোমস্তাদের খুশী-রাখা, উপঢৌকন প্রদান, জমিদার বাড়ীতে কিংবা জমিদারী বাড়ীর পাশ দিয়ে সহজে যেতে না পারা ইত্যাদি সব উপাখ্যানে বাস্তব-কল্পনার মিশেল পাওয়া যায়।

এখানে চার জটিল ও কুটিল নারী চরিত্রে ফুটে উঠেছে সমকালীন জমিদার পরিবারের এক বাস্তব চিত্র। এ সময়ে দেলদুয়ার জমিদারী এস্টেটের চার তরফে চারজন সুন্দরী মহিলা জমিদার ছিলেন যথাক্রমে করিমুন্নেসা খানম, রাহাতুন্নেসা খানম ,নাজমুন্নেসা খানম ও নুরুন্নেসা খানম। এরাই ছিলেন রূপক নামে বেগম সাহেবা বা পায়জারুন্নেসা , সোনা বিবি, মনিবিবি ও মতিবিবি। পুরুষ জমিদার চরিত্রে একমাত্র সাবলুট চৌধুরী যিনি দক্ষিণ বাড়ীর জমিদার সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী। যার কাজ ছিলো চার মহিলা জমিদারের মধ্যে সংঘাত বাধিয়ে কৌশলে ফায়দা হাসিল করা। এক্ষেত্রে টাঙ্গাইলের ইতিহাস গবেষক খন্দকার আবদুর রহিমের বিবরণ বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' দেলদুয়ার জমিদারীতে স্ত্রী লোকের রাজত্বের এক কৌতুকবহ ফিরিস্তি। দেলদুয়ার জমিদারীর চারটি তরফে যে সমস্ত মহিলা সে সময় জমিদারী পরিচালনা করেছেন, তাদেরকে তিনি মতি বিবি, সোনা বিবি, মনি বিবি ও পায়জারুন্নেসা ইত্যাদি ছদ্ম নামকরণ করে গাজী মিয়ার বস্তানী রচনা করেছেন। গাজী মিয়ার বস্তানীর লেখক অতিশয়োক্তি যাই করুন, একথা কারো অবিদিত নেই যে, দেলদুয়ারে সে সময় বিভিন্ন তরফের জমিদারী পরিচালনা করেছেন কয়েকজন পরমা সুন্দরী, গুনবতী বিদুষী মহিলা।

যে সময়ে দেলদুয়ারে কয়েক তরফে মহিলা জমিদার, সেই সময়ে সন্তোষে পাঁচ আনী ও ছয় আনী তরফে দুই মহিলা জমিদার গদিনশীন ছিলেন। সন্তোষের মহিলা জমিদারদের মধ্যে বিশেষ করে জাহ্নবী চৌধুরানী প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ছয় আনী তরফের জমিদারি পরিচালনা করেছেন। শোনা যায়, জাহ্নবী

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরানী ও বিন্দুবাসিনী চৌধুরানী এই দুটি শরিক কেবল যে রেষারেষী করে ক্ষমতার বাহার দেখিয়েছেন, তাই নয়, প্রজাদের জানমাল নিয়ে কত রকমের হুলি খেলা যায়, তারও প্রতিযোগিতা করে গেছেন। অনেক সময় একই ভিটার উপর ছয় আনী ও পাঁচ আনী জমিদারের বাড়ী। একই দ্বিতল ইমারত হচ্ছে দু' তরফের বসবাসের জায়গা। তবুও জেদাজেদী করে সেই দ্বিতল ইমারতের মাঝখানকার দেওয়ালে পিঠাপিঠি লাগিয়ে পৃথক করে নিয়েছিলেন তাদের দুটি আঙ্গিনা । একটি পূজার মন্ডপ ঘর হলেই অনায়াসে চলতে পারতো তাদের দু'তরফের সকাল সন্ধ্যার পূজা অর্চনা কিন্তু জেদাজেদী করে এক শরীক আরেক শরীকের চেয়ে শান শওকতের সাথে পৃথক পৃথক দুটো মন্ডপ ঘর তৈরী করে নিয়েছিলেন ।

সেই পারিবারিক রেষারেষি ইংরেজ আমলে পেলো আরো আস্কারা। ইংরেজ সরকারের পদস্থ কর্মচারী দু'তরফেই পদধুলি দিতেন। দু তরফের পিঠ চাপড়াতেন, এককে চেতিয়ে তুলতেন অপরের বিরুদ্ধে। দু'তরফেই খয়ের খাঁ হয়ে ইংরেজ সরকার ছলাকলার তালে তালে করতেন পাগলা নৃত্য। প্রজাদের স্বার্থ তখন কে দেখে। দেশের স্বার্থই বা যায় কোন চুলোয়[১৩২]। কাজেই এ থেকে একটি বাস্তব সত্য বেরিয়ে আসে, সমকালীন বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকল জমিদারী জীবন চিত্র ছিল প্রায় একই। অবশ্য দু একটি ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। যেমন করটিয়া জমিদার ও ঢাকার নবাবগণ। আর এই সময়ে বাংলার বহু হিন্দু -মুসলমান জমিদারীতে মহিলা জমিদার বা বিধবা জমিদারদের উৎপাত লক্ষ্য করা যায়[১৩৩]। মহিলাদের হাতে পড়ে জমিদারদের কদর্য ইতিহাস আরো কদর্য, নোংরা, চরিত্রহীন, নীতিহীন হয়ে পড়ে। আমলা, নায়েব গোমস্তাদের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ও প্রজা নিপীড়ন আরো বৃদ্ধি পায়।

বস্তানীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সোনা বিবির নায়েব দাগাদারি। তিনি একাধারে ম্যানেজার ও নায়েব, আবার বিদগ্ধ কবি ও সাহিত্যিক। সোনা বিবির সকল কাজে একান্ত বিশ্বস্ত হিসেবে কাজ করে, যদিও শেষ দিকে বেড়াকান্তের তালে পড়ে সোনা বিবির বিশ্বস্ততা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়; শেষ পর্যন্ত জেল খাটে, জেল থেকে বের হলে সেও সোনা বিবির কাছ থেকে কেটে পড়ে। দাগাদারি নামের এই চরিত্রের সাথে টাঙ্গাইলের খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক রাহাতুন্নেসা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাইর রূপক মিল রয়েছে। তিনি দেলদুয়ার থেকে প্রকাশিত 'আহমদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কথিত যে, দেলদুয়ার জমিদার কন্যার সাথে তার প্রেম ছিল। এবং সে প্রেম ব্যর্থ হলে, তারই প্রতিক্রিয়ায় কবি 'উদাসী কাব্য' ও 'বিরহ সঙ্গীত' গ্রন্থ রচনা করেন[১৩৪]।

Dhaka University Institutional Repository

দারোগা ভোলানাথ হাকিম ও উকিল বাবু এবং বড় সাহেব এই সব চরিত্রের সাথে মিল খুজে পাওয়া যায় সেই সময়ের থানা দারোগা, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ এবং নামজাদা হিন্দু উকিলের চরিত্রের সাথে। এই সব চরিত্রের মামলা মোকাদ্দমার বিবরণের মাধ্যমে আদালত কেন্দ্রিক ষড়যন্ত্রের, দুর্নীতির এবং প্রজার উপর নিপীড়নের এক গ্লানিকর ও বিকৃত সমাজ চিত্র আমরা দেখতে পাই।

এছাড়া অন্যান্য স্থান, কাল, পাত্র, বিবরণগুলো গভীর ভাবে দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় এটি তৎকালীন দেলদুয়ার টাঙ্গাইলের জমিদার ও প্রজা জীবনের সমাজ চিত্র। ভেড়াকান্ত, দাগাদারীর ন্যায় জমিদার পুত্র তথা অভিজাত সমাজ যখন জমিদার, নায়েব গোমস্তার রেষারেষি, ঝগড়া বিবাদ, আদালতের ষড়যন্ত্র, মারপ্যাচ, দূর্নীতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি। সেখানে সাধারণ প্রজার কি দুর্দশা তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য দেলদুয়ার ও সন্তোষের পরবর্তী জমিদার প্রজন্মে দু জন করে চারজন ক্ষনজন্মা পুরুষের আর্বিভাব ঘটে, তাদের উচ্চ শিক্ষা, উন্নত রুচিবোধে, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার ফলে উক্ত জমিদারীর বাহ্যিক আভিজাত্যের বড়ং, চাকচিক্য, জাকজমকতা, প্রজা নিপীড়ন ইত্যাদি হ্রাস পায়। দেলদুয়ার ও সন্তোষের জমিদারদের অপর একটি অংশ যারা উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত রুচিবোধ অর্জনে ব্যর্থ হয় তাদের মধ্যে পূর্বের জমিদারী মানসিকতা, আভিজাত্যের বড়ং, ভূমি নির্ভরতা তথা প্রজা শোষণ করে খাজনা সংগ্রহ করা ইত্যাদি আরো কিছুকাল অব্যাহত থাকে।

জমিদারী পতন যুগে বা প্রজাস্বত্বের যুগেও তাই আমরা দেলদুয়ার ও অন্যান্য জমিদারীতে লক্ষ্য করি বাস্তবতার বিপরীত আভিজাত্য ও চাকচিক্য। আভিজাত্যের গৌরব ও চাকচিক্যতায় উত্তর বাড়ীর চেয়ে দক্ষিণ বাড়ীর সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী অনেক এগিয়েছিলেন। সেই সময়ে জমিদারদের আভিজাত্য প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম ছিল কার বাড়ীতে কত ঝাড়ের বাতি থাকতো। দক্ষিণ বাড়ীতে সর্বোচ্চ ২৪টি কাঁচের ঝাড়ের লণ্ঠন ছিল। দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারগণ কলকাতা বাসী ছিলেন না, ফলে স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের সরাসরি সংযোগ ছিল। তদুপরি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার সুবাদে জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল মধুর। স্থানীয় বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর বাড়ীর জমিদার পরিবারে রংপুর সাবের পরিবারের শিক্ষিতা রুচিশীল সাহিত্যসেবী করিমুন্নেসা খানমের বিয়ে এই জমিদারীকে কলকাতা মুখী করে তোলে। বিয়ের অল্পকাল পরে দু'সন্তান রেখে স্বামী আবদুল হাকিম খান গজনবী মারা গেলে বিদুষী মহিলা তার দু'ভায়ের সহায়তায় কলকাতায় গিয়ে আবাস গড়েন এবং দু' সন্তানকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। এভাবে বাংলার দু' প্রান্তের দু' সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও উন্নত রক্তের ধারক হয়ে এবং সুশীল পরিবেশ পেয়ে আবদুল করিম গজনবী ও আবদুল হালিম গজনবী নিজেদের ক্ষনজন্মা প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে একটি সত্য প্রভাবিত হয় যে, যদি আবদুল হাকিম গজনবী অন্যান্য ভাইয়ের মত নিজের চাচাত বা মামাত বোন অর্থাৎ স্বগোত্রীয় কোন মেয়েকে বিয়ে করতেন তবে এই উচ্চ জন্মগত প্রতিভা ও মিশ্র রক্তের সুবিধা ভোগ করতেন কিনা ? তা সহজেই অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে আন্তঃ পরিবারে বিবাহ করা জমিদার সন্তানদের বংশ ধারা না থাকা এবং বিকলাঙ্গ ও বন্ধ্যা সন্তান হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়[১৩৫]। যদিও বিষয়টি নৃতত্ব ও বংশবিশারদ বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। তবুও জমিদারদের পারিবারিক ইতিহাসে ভিন্ন রক্তের বিবাহে ও ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠার মধ্যে দিয়ে একই জমিদারী বংশে দু'ধরনের ফলাফল সমকালীন প্রায় জমিদারীতেই লক্ষ্য করা যায়।

দেলদুয়ার-আতিয়া-সন্তোষ প্রমুখ জমিদারীর পৃষ্ঠপোষকতার ধারাবাহিকতায় এই টাঙ্গাইলে এতদাঞ্চলের অন্য যে কোন স্থানের চেয়ে বেশী প্রতিভাশালী কবি সাহিত্যিক ও সৃজনশীল মানুষের জন্ম ও বিকাশ হয়। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত টাঙ্গাইল নিবাসী কবি সাহিত্যিকদের তালিকা দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে সন্তোষ জমিদাররা হিন্দু মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটিয়েছেন, তবে অনেক দেরিতে। আর আতিয়ার জমিদাররা মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটিয়েছেন, দেলদুয়ারের জমিদারগণ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারার উন্মেষ ঘটিয়ে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় ও সহাবস্থানের চেষ্টা করেছেন। মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে নীরব পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। মুসলমানদে বিভিন্ন পালাপার্বনে উৎসাহ দিয়ে, অর্থ সাহায্য দিয়ে, সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি তৈরীতে সহায়তা করেছেন। জনকল্যাণ, শিক্ষা উন্নয়ন, জনসেবা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৩ স্থাপত্য ও প্রত্নকীর্তি এবং লোকশিল্প ও লোক ঐতিহ্য ধারার বিকাশে দেলদুয়ারের জমিদার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ঃ

দেলদুয়ার, আতিয়া তথা টাঙ্গাইল জুড়ে প্রাচীন আমল, সুলতানী আমল ও মোগল আমলের বিপুল স্থাপত্য ও প্রত্ন নিদর্শন জেলার প্রায় সকল থানা ও ইউনিয়নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ সকল স্থাপত্য ও প্রত্নকীর্তি এবং সে সাথে স্থানীয় লোকশিল্প, লোকঐতিহ্য ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর অনেক গবেষণা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে আলোচ্য নিবন্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত জমিদারীতে এতদপ্রতিষ্ঠান সমূহের বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

দেলদুয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রওশন খাতুন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন এক সময়ে পাকুল্লা, চারান ও দেলদুয়ার জমিদার বাড়ী সম্মুখে তারকা খচিত মোজাইকে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট তিনটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদগুলোয় শেষ মুঘল যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সমূহের ছাপ পরিলক্ষিত হয়[২০৬]। তিনটি মসজিদ ছাড়াও পাকুল্লা, দেলদুয়ারে দুটি অনিন্দ সুন্দর জমিদারী প্রাসাদ নির্মাণ করেন। দেলদুয়ার বাড়ীটি ২২৫ বিঘার বাগান ও তিনদিকে লেক সদৃশ্য নালা বেষ্টিত ছিল[২০৭]। জমিদারদের বংশ বৃদ্ধির ও জমিদারী ভাগ বাটোয়ারার ফলে এটি চার ভাগে এবং বহু এস্টেটে বিভক্ত হয়।

রওশন খাতুনের এক বোন দৌলত খাতুনের বংশধরগণ সর্ব দক্ষিনে গিয়ে আলাদা বাড়ী তৈরী করেন। যা দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী নামে খ্যাত হয়। এ বাড়ীর খ্যাতনামা জমিদার ছিলেন সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী, খান বাহাদুর সৈয়দ আহমেদ হোসেন চৌধুরী, লেঃ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ মোহাব্বত আলী চৌধুরী। সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরীর পিতা সৈয়দ মুহলন্দ আলী চৌধুরী এখানে অনিন্দ সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যে প্রাসাদে ৩০০ এর অধিক কর্মচারী কাজ করতো। দ্বিতল বিশিষ্ট দালানে জলসা ঘর সহ বহু কক্ষ ছিল। এবং চারিদিকে দেয়াল ঘেরা বাড়ী। পাশে বিশাল দিঘীতে নৌকাবাইচ হতো। বাড়ীর সম্মুখে সুন্দর কাছারি ঘর ছিল, যেখানে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী বিচার ও মামলা মোকাদ্দমা পরিচালনা করতেন।

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হওয়ার পর সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী একে আরো সুন্দর করে পুনঃ নির্মাণ করেন[২০৮]। বর্তমানে এটি আর বিদ্যমান নেই, কেবল ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ওয়ারিশদের

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক কলহে এটি ভেঙ্গে ফেলতে হয় এবং ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন পক্ষের আক্রমনে ইহা বিধ্বস্ত হয় এবং লুণ্ঠন হয় মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী। যা প্রত্ন সম্পদ হিসেবে রক্ষিত হতে পারতো। আর পরবর্তীকালে ওয়ারিশগণ বাকী দ্রব্যসামগ্রীসহ সকল সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নেন। কিছু নিদর্শন জমিদার বংশের জ্যেষ্ঠ পুরুষ সৈয়দ মারহামাত আলী চৌধুরীর উত্তরাস্থ বাড়ীতে বিদ্যমান রয়েছে[১০৯]।

৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে দেলদুয়ারের গজনবী খ্যাত উত্তর বাড়ী বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হয়। ফলে জমিদারী প্রাসাদের একাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জমিদারীর বাকী অংশ ঐতিহ্যের নিদর্শন নিয়ে কোন রকমে ভগ্নাবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু নিদর্শন কলকাতায় ৪৭ এর স্বাধীনতা উত্তর কালে নিলামে বিক্রয় করে রেখে আসতে হয়। বাকী কিছু নিদর্শন এই ধারার ১৩টি এস্টেটের একমাত্র জীবিত ও পুরুষ জমিদার তনয় খোদাদাদ খান গজনবীর বর্তমান ঢাকার গুলশানস্থ বাসায় বিদ্যমান[১১০]।

উল্লেখ্য উত্তর বাড়ীর দক্ষিণ পাশেই সালামত আলী খান প্রতিষ্ঠিত বড় বাড়ীতে একটি বিশাল দ্বিতল প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। ১৮৮০ সালে ভূমিকম্পে উক্ত বাড়ী ধ্বসে গেলে তার বংশধরগণ জীবিত না থাকায় পরবর্তীতে তা আর নির্মাণ হয়নি। একই ভাবে আবদুল আজিজ খান প্রতিষ্ঠিত মধ্য বাড়ীর স্মৃতিচিহ্নও আজ বিলুপ্ত। এতদাঞ্চলের অন্যান্য জমিদারদের মধ্যে সন্তোষ জমিদার বাড়ীতে মোহাম্মদ আলী কলেজ ও মাওলানা ভাসানীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রয়েছে। তবে মূল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কেবল কালের সাক্ষী হিসেবে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে ধনবাড়ীর জমিদার বাড়ী, মহেড়া জমিদার বাড়ী, নাগরপুর জমিদার বাড়ী, হেমনগর, আলোয়ার জমিদার বাড়ী এবং করটিয়া জমিদার বাড়ী। পাকুল্লা ও গোড়াই জমিদার বাড়ীর কেবল ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান[১১১]।

দেলদুয়ার-টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোকশিল্প ও লোকঐতিহ্য ধারার বিকাশে যে সকল ব্যতিক্রমী ও জমিদার প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হলো পেশাভিত্তিক জনপদ গঠন[১১২]। আরব, ইরান, আফগান,পাঠান,মুঘল বংশধর জমিদাররা ঐ সব অঞ্চলের এবং উত্তর ভারতের অনেক খাদ্য দ্রব্য, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি নির্মাণ উপকরণ ও পদ্ধতি নিয়ে আসে। যার ফলে নতুন নতুন শিল্প ও কারুপণ্য, খাদ্য দ্রব্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন কেন্দ্রিক পেশাভিত্তিক জনপদ গড়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে জমিদারদের বিভিন্ন বিলাসী দ্রব্য উৎপন্ন ও সরবরাহ করতে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীকে জমিদার বাড়ীর আশেপাশেই অবস্থান করতে হতো। এর ফলে পূর্বের পেশাভিত্তিক জনপদ নতুন আঙ্গিকে আরো বিকশিত হয়। জমিদারী পতন কালে

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারীতে পন্য সরবরাহকারী ঐ সব পেশাজীবী স্বাধীন পেশাজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং অন্যান্যদের সহযোগীতায় স্বাধীন কুটির শিল্প তৈরী ও বাজার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। স্থানীয় পাল্কি বাহন, গাড়ি বাহন ও স্বর্ণকারগণ মূলত জমিদার কেন্দ্রিকই সৃষ্টি[১১৩]।

নাগরী ভাষী দেশীয় নারী ও আরবী পুরুষের শংকর জাতির শিকারি, ধুনকর, ও মাহিফোরাশ সম্প্রদায় এতদাঞ্চলে এই জমিদারদের সহায়তায় বিকশিত হয়। তারাই ক্ষুদ্র শিয়া ধর্ম সংস্কৃতি এতদাঞ্চলে বিকাশে ভূমিকা রাখে। সুন্নী ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় বিশেতঃ "তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া" আন্দোলনে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ সরকারী রোষানল থেকে এখানে আশ্রয় নিয়ে এতদাঞ্চলে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন প্রচার করে। দেলদুয়ার ও অন্যান্য মুসলিম জমিদারদের সহায়তায় এতদাঞ্চলে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়[১১৪]।

সন্তোষ জমিদারদের কারণে টাঙ্গাইল সদরে বিশেষ অনুমতি ছাড়া গো-হত্যা নিষিদ্ধ থাকায় গো মাংস ভক্ষণ করতে পারেনি কিন্তু দেলদুয়ার অঞ্চলের মুসলমান প্রজাগণ এদিক থেকে সৌভাগ্যবান ছিলেন[১১৫]। জমিদার শ্রেণী থেকে বিত্তবান শ্রেণীতে, আবার বিত্তবান থেকে দরিদ্র শ্রেণীতে পারিবারিক অনুষ্ঠান হিসেবে গাওয়াল নিমন্ত্রণ বা জিয়াফতের আয়োজন চালু হয়[১১৬]। নৌকাবাইচ ও ঘোড়দৌড়কে জমিদাররাই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে[১১৭]। গ্রামীণ লাঠিয়াল বাহিনীর ইতিহাসও সংস্কৃতি এই জমিদারদের বদৌলতেই সৃষ্ট[১১৮]। প্রথম দিকে সঙ্গীত, যাত্রা, পালাগান, কাব্য, গীত সকল সৃজনশীল কার্য্যক্রমই জমিদাররের অবগতি , অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বিকশিত হতে পারতো না। ক্রমান্বয়ে এই বিষয়গুলি জমিদারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় চলে যায়।

আতিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী নিজে ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী। বায়েজিদ খান পন্নী ছিল বংশীবাদক, দেলদুয়ারের জমিদারগণ ছিলেন নাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষক। সন্তোষের জমিদারগণ ছিলেন স্বয়ং এতদাঞ্চল ও বাংলার নাট্য আন্দোলনের পথিকৃত। যাত্রা, সঙ্গীত, নৃত্য কলার মত নান্দনিক শিল্প সংস্কৃতির বিকাশে মুসলমান জমিদারদের চাইতে হিন্দু জমিদারদের ভূমিকাই বেশী ছিল[১১৯]। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই সব সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারেনি। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই সব শিল্পকর্মের রূপকার ছিল। আতিয়ার জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আতিয়ায় পাট থেকে কাগজ তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠার তথ্য পাওয়া যায়। টাঙ্গাইল শাড়ি নামে যে শাড়ীর নাম

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদে পরিণত হয়েছে তা দেলদুয়ারের ও আতিয়ার জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছিল[২২০]। হিন্দু তাতি ও মুসলমান জোলা উভয় রকম শিল্পী-কারিগরই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে।

দেলদুয়ার জমিদারদের জনকল্যাণ ও সেবামূলক কার্য্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দেলদুয়ার ও টাঙ্গাইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা[২২১]। দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসালয় পরিচালনা। পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাম অফিস প্রতিষ্ঠা। জনকল্যাণে, বিভিন্ন দান-দক্ষিণা, অবশ্য এক্ষেত্রে দেলদুয়ার জমিদারদের চেয়ে করটিয়া ও ধনবাড়ীর জমিদারগণ অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন; এমনকি সন্তোষ, নাগরপুর, হেমনগরের জমিদারগণও হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের জনকল্যাণমূলক দান ও প্রতিষ্ঠান সমূহ পরে মুসলমানদের কল্যাণেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৪ জমিদারী উচ্ছেদ পরবর্তী জমিদার বংশধরদের সামাজিক অবস্থা ঃ

দেলদুয়ারের জমিদার বংশধরগণ ঐতিহাসিকভাবে সৃজনশীল ও সেবামূলক কার্যক্রমের ঐতিহ্যের ধারক। জমিদারী হারিয়েও তারা তাদের এই ঐতিহ্য ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এদের কেউ জমিদারী হারিয়েও উচ্চশিক্ষা, চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবাদে বর্তমানে অভিজাত জীবন যাপন করছেন। বিদেশে অথবা গুলশান, বনানীতে অভিজাত পাড়ায় বসবাস করছেন। অধিকাংশই এলাকার সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করছেন। তবে পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা স্বতস্ফুর্ত ভাবেই এলাকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন।

দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর খোদাদাদ খান গজনবী অবসরপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট ও ব্যবসায়ী। ঢাকার জীবনের ব্যস্ততার পাশাপাশি তিনি কেয়ারটেকার রেখে মূল জমিদার বাড়ী যতটুকু সম্ভব রক্ষাবেক্ষণ করছেন। এতে বৎসরে তার প্রায় দু' লক্ষ টাকার মত খরচ হচ্ছে। তবুও ঐতিহ্যের টানে তিনি তা রক্ষা করতে সচেষ্ট। এলাকার মানুষের সাথেও তার যোগাযোগ নিবিড়। তবে টাঙ্গাইল কোর্টে এখনো জমিজমা সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা রয়েছে, ফলে জমিদারীর মূল্যবান ঐতিহাসিক দলীল ওয়াক্ফ নামাটি টাঙ্গাইল জজকোর্টে জমা থাকায় অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ থেকে গবেষক বঞ্চিত হয়েছেন।

খোদাদাদ খান গজনবীর স্বনামধন্য স্ত্রী সৈয়দা রুবী গজনবী করিমুন্নেসার মতই প্রতিভাশালী, উদ্যোগী, পরিশ্রমী। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী, 'অরণ্য ক্রাফটস' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং 'বাংলাদেশ ক্রাফটস কাউন্সিল' এর প্রেসিডেন্ট। উদ্যোক্তা, সংগঠক এই পরিচয়ের বাইরে তিনি বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রং ব্যবহারের উপর একজন বিশেষজ্ঞ। ১৯৮২ সালে ভারতে একটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে ভারতীয় নেত্রী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতৃবধু কমলা দেবীর উৎসাহে প্রাকৃতিক রং ব্যবহার বিষয়ে আগ্রহী হন। দেশে ফিরেই কাজে লেগে যান। বিসিক এর সহযোগিতায় বিভিন্ন ওয়ার্কশপ আয়োজন করেন।

সম্প্রতি রং নিয়ে আমেরিকার আইওয়া ইউনির্ভাসিটিতে 'কালার কংগ্রেস-২০০২' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রঙের পুনরুজ্জীবন বিষয়ে (দ্যা রিভাইভাল অব নেচারাল ডাইজ ইন বাংলাদেশ) একটি গবেষণা নিবন্ধ উপস্থাপন করেন সৈয়দা রুবি গজনবী। এছাড়া তিনি 'বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক রং' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ নিয়ে ' প্রাকৃতিক রং জীবনের রং" শিরোনামে দৈনিক জনকণ্ঠের শুক্রবার সাময়িকী পাতায় একটি সচিত্র নিবন্ধ ছাপা হয়।

তার প্রচেষ্টায়, ক্রাফটস কাউন্সিল তার উদ্যোগে বিসিকের সহায়তায় সারাদেশে স্থায়ী ডাই সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। মজার বিষয় প্রথম ডাই সেন্টারটি অচিরেই উদ্বোধন হতে যাচ্ছে দেলদুয়ার জমিদারী অঞ্চল টাঙ্গাইলেরই পাতরাইলে। এতদাঞ্চলেই মুঘল, নবাবি যুগে প্রাকৃতিক রং উৎপাদন হতো এই জমিদার পরিবারদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এছাড়া পুরো অঞ্চলই তাঁত ও জামদানী শিল্পের চারণভূমির ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। রুবী গজনবী মাটির টানে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের নয়া ইতিহাস তৈরীর কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুরুষ সৈয়দ মারহামাত আলী একজন ইতিহাস অনুরাগী ও ঐতিহ্য প্রেমিক । পরিবারের ঐতিহ্য রক্ষার শেষ চেষ্টা তিনি করেছিলেন গৌরবময় জমিদার ভবনটি রক্ষার জন্য। কিন্তু অন্যান্য শরীকদের কাছে এটি একটি আবেগ মাত্র ছিল। তাই তাদের ইচ্ছায় এবং জমিদার বাড়ীর ঐতিহাসিক নিদর্শনটি রক্ষার জন্য নগদ অর্থের অভাবে অবশেষে দোতলা বিশাল প্রাসাদটি ১৯৯০ সালে ভেঙ্গে ফেলা হয়। ওয়ারিশগণ সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করে নেন। এভাবে একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। সৈয়দ মারহামাত আলী পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি ইংরেজি আর্টিকেল রচনা করেন। 'The Memories of Deldur Zamindary' শীর্ষক রচনাটি - এখনো প্রকাশিত। এছাড়া তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন দেলদুয়ার জমিদারদের বংশ তালিকা, বিভিন্ন দুর্লভ ফটোগ্রাফ এবং দলিলপত্র । যা আঞ্চলিক ও জাতীয় ইতিহাস বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের আজীবন সদস্য এবং ইতিহাস সম্মেলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন।

দেলদুয়ার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জমিদার পরিবারের সদস্যগণ একইভাবে যার যার অবস্থান থেকে শত বছরের জমিদারী শোষণের প্রায়চিত্ত স্বরূপ ইতিহাসের দায় শোধের অনুভূতি নিয়ে জীবনযাপন করছেন বলে গবেষকের মনে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র-৩

১। গোলাম আম্বিয়া নূরী, টাঙ্গাইলের জনসমাজঃ নৃতাত্ত্বিক ,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, জেলা পরিষদ, টাঙ্গাইল- ১৯৯৭, পৃ-৯৭

২। ৪৭ ও ৭১ উত্তর কালের বিবর্তনে বর্তমানে এই ভিন্নতা খুব একটা চোখে পড়ে না।

৩। নূরী, পূর্বোক্ত, পৃ- ৯৮

৪। ঐ, পৃ- ১০৬

৫। ঐ, পৃ- ১১৩

৬। ঐ, পৃ- ১১১

৭। ঐ, পৃ- ১১২

৮। ঐ, পৃ- ১১৩

৯। মুফাখখারুল ইসলাম, টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ ইতিহাস প্রসঙ্গে, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ, ১৯৯৭ পৃ- ২২।

১০। ঐ, পৃ- ১৩

১১ ক। কেদার নাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯০৫, দ্রষ্টব্য।

১১ খ। ময়মনসিংহ পুরাতন ডিস্টিক্ট রেকর্ডস, ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা, দ্রষ্টব্য।

১২। খোন্দকার আব্দুর রহিম, টাঙ্গাইলের ইতিহাস, ১ম খন্ড, টাঙ্গাইল, ১৯৮৬ পৃষ্ঠা- ১২ -৪৩; মুহাম্মদ বাকের সম্পাদিত, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ, ১৯৯৭ পৃ- ১৭- ৭০

১৩। মুফাখখারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪

১৪। মোঃ বাকের , টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য,পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য

১৫। ঐ,পৃ- ২৫

১৬। কেদার নাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ; পুরাতন ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার দ্রষ্টব্য।

১৭ক। কেদার নাথ মজুমদার, এফ.এ, সাকচী, খোন্দকার আবদুর রহিম, মুফাখখারুল ইসলাম, মোহাম্মদ বাকের প্রমুখের বিবরণ এবং জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক রেকর্ডরুমের পুরনো নথি পত্র।

Dhaka University Institutional Repository

১৭খ। পুরান ঢাকার কুট্রিদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারাও এ সময় মালাবার থেকে ঢাকা এসে গৃহ কাজে নিযুক্ত হয়।

১৮। মুফাখখারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০-২৬; খোন্দকার আবদুর রহিম, টাঙ্গাইলের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

১৯। ঐ, পৃ- ২১,

২০। মুফাখখারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৬-৪৬

২১। কেদার নাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য, মুফাখখারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫৩-৫৮।

২২। নুরী- পূর্বোক্ত পৃ- ১১৫

২৩। ঐ, পৃ- ১১৬

২৪। সাক্ষাৎকার, সৈয়দ মারহামাত আলী চৌধুরী, দেলদুয়ার জমিদার পরিবার দক্ষিণ বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ, আইনজ্ঞ, সাংবাদিক ও লেখক।

২৫। W.K. Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report,* Indian Studies, New Delhi, 1962. ; মুফাখখারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত - পৃ- ১৭

২৬। মুফাখখারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত- পৃ- ১৮

২৭। ঐ, পূর্বোক্ত পৃ- ১৮

২৮। খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত পৃ- ৬০, ১২৪

২৯। মুফাখখারুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৬-২৭

৩০। কেদার নাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের বিবরণ, স্যানাল এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯০৪ (ভাদ্র ১৩১১) পৃ- ১৩৬।

৩১। *Old District Record,* Mymensingh, National Archives, Vol.-2,3,5 : কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের বিবরণ, পৃ- ১৩৬; ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ-১২৭-১২৮।

৩২। W.Hunter, *M.S. Records of the Board of Reveneue*, Collector Letter to Governor General in Council and Co. 12.1.1791; কেদার নাথ, ময়মনসিংহের বিবরণ, পৃ- ১৩৬।

৩৩। F. L. Gross, *Annual Report to the Board of Revenue* , Date 1.1. 1796;

Dhaka University Institutional Repository

কেদার নাথ, ময়মনসিংহের বিবরণ, পৃ- ১৩৭।

৩৪। কেদার নাথ, ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ- ৯৭; খান সাহেব আবদুল্লাহ, মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস , নাহরা, বোকাইনগর থেকে প্রথম প্রকাশ মার্চ- ১৯৭১, পৃ- ২৯০-৯১।

৩৫। W.Hunter, *Bengal M.S. Records* No. 30, 1.1.1782 and No. 50, 14.2.1882; কেদার নাথ ,ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ- ৯৫।

৩৬। Petition of Ramjimal, *Bengal M.S. Record*, No-146, 3.6.1782, No.153, 3.6.1782; No. 177, 4.7.1782, No- 199, 236- 3.10.1782; No-255, 311-13.1.1783, No-317,361,396-10.24.31-7-1787; কেদার নাথ, ময়মনসিংহের ইতিহাস পৃ- ৯৭-৯৮।

৩৭। *Maymensingh Collectors Letter to Governor General in Council*, 1.12.1791; কেদার নাথ,ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ- ৯৯-১০০ ;

৩৮। কামাক্ষা নাথ সেন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ- ৩৪০।

৩৯। মুফাখখারুল ইসলাম, পৃ- ৫১-৫৮; *Old District Records of Mymensingh*, National Archives.

৪০। খোন্দকার আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত , পৃ- ১৬৯- ১৭২

৪১। *History of Disterbances* Submitted by J.Dunbar Magistrate of Mymensingh to the Commissioner, dated 5.9.1833; *Old District Records*, National Archives; কেদার নাথ, ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ- ১৪৯; কামাক্ষনাথ, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও টাঙ্গাইল, পৃ- ৩৪১-৪৩

৪২। ঐ

৪৩। কামাক্ষনাথ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৪৩।

৪৪। ঐ

৪৫। কেদার নাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ- ১৩৭-১৩৮

৪৬। ঐ, পৃ- ১৭২

৪৭। ঐ, পৃ- ১৭৩-১৭৪; কামাক্ষা নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

৪৮। খোন্দকার আবদুর রহিম,পূর্বোক্ত, পৃ- ১২৩-১২৮ ;

৪৯। খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য বৃটিশ সরকার ১৮৬০ সালের ৩১ শে মার্চ নীল কমিশন গঠন করে।ফলে নীল বিদ্রোহ ধীরে ধীরে প্রশমিত হয় এবং অচিরেই নীল উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়। সে সাথে একটি সম্ভাবনাময় শিল্পের মৃত্যু ঘটে। মুসা আনসারী, ইতিহাস; সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ- ২০৫

৫০। কেদারনাথ মজুমদার, পৃ-৮৭

৫১। ঐ ,পৃ- ৯৫-১০০

৫২। ঐ, পৃ- ১২৫-১২৬

৫৩। ঐ, পৃ- ১৩৫-১৩৬

৫৪। ঐ, পৃ- ১৩৭

৫৫। ঐ, পৃ- ১৩৮

৫৬। ঐ পৃ- ১৪৭

৫৭। এ.কে.এম. ইদ্রিস আলী, বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ ও রাজনীতি, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, চতুর্বিংশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, পৃ- ৩৫; এ.কে.ফজলুল হক ও সমসাময়িক রাজনীতি, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা; পৃ- ৯৫; আ.ক.ম. ইদ্রিস, মুসলিম শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গ ভঙ্গ ও বঙ্গ ভঙ্গ রহিত করার প্রভাব, পৃ- ৪৮।

৫৮। মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সমাজ, ঢাকা- ১৯৮৬, পৃ-১৬

৫৯। ১৮৬৭ সালের মধ্যে জেলায় মোট ৭টি গভর্ণমেন্ট ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে এন্ট্রাস, বঙ্গ, নর্মাল ও মডেল স্কুল ছিল। ২৫টি মধ্য ইংরেজী স্কুল, ৪৭ টি মধ্য বাঙালা স্কুল, ৭টি বালিকা ও ২৩টি সার্কেল স্কুল সহ মোট ১০৯টি বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। যাতে ৩৯৮৪ জন ছাত্র ছাত্রী ছিল। কেদার নাথ, ময়মনসিংহের বিবরণ, পৃ- ৫৫

৬০। কেদার নাথ মজুমদার,ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ- ১৬০-১৭০,পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৬১। ঐ, পৃ- ১৮৭

৬২। ঐ, পৃ- ১৬৫-১৭০, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

৬৩। Gerald W. Wollaston, *Knight Bachelors 1938-1939,* Nineteenth Edition Printed by Geo. Gibbons ltd. Leicester.

Dhaka University Institutional Repository

P. 145-146; Sir Stanley Reed Kr. K.B.E. L.L.D and Francis Law, *The Indian year book 1936-37*, Volume XXIII, Twenty third year of Issue, Coleman and Co. Ltd. London, Page- 1066; Naresh Kumar, Jain (ed.), *Muslims in India* (1), New Delhi, 1976, P-179.

৬৪। আজাদ, কলিকাতা, ৯ শ্রাবন, ১৩৪৬/২৫ জুলাই ১৯৩৯ পৃ- ৪; আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের দশ দিশারী, বাংলা একাডেমী , ঢাকা, পৃ- ৯৬

৬৫। আবদুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ- ৭২-৭৩।

৬৬। *Report of the Committee Appointed by the Government to Consider Questions Connected with Muhammadan Education:* A Note on Muhammadan Education by the Hon'ble Mr. A.K. Ghuznavi to be Considered by the Muhammadan Educational Advisory Committee, Calcutta, Bengal Seretariet Book Dept. 1915, p.1, National Archives Records, Proceedings and Secretarial Records, Dhaka.

৬৭। ১৮৬১ থেকে ১৯৭৭ সময়কালের মধ্যে বাংলার শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের রিপোর্ট সমূহের সংকলন দ্রষ্টব্য; Sekandar Ali Ibrahimy, *Reports on Islamic Education in Bengal (1861-1977)*, Vol 1-5, Vol- II, Report no-17 Islamic Foundation, Dhaka, 1985; Hornell Committee Report 1914-15, Calcutta, 1915.

৬৫। আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের দশ দিশারী, পূর্বোক্ত , পৃ- ৯৯

৬৯। আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৬৬।

৭০। Sen, S.P (ed), *Dictionary of National Biography*, Vol 11, Institute of Historical Studies, Calcutta, 1973 P 32-33

৭১। *Bogra District Gazetters 1979*, p- 215N; প্রভাস চন্দ্র সেন, বগুড়ার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ- ৩৬৮-৯১; *Proceedings of the*

Muhammedan Educational Conferrence, Eastern Bengal and Assam 1906, p- 23; 1910, p-3-4, 60-114-119

৭২। Syad Marhamat Ali Chowdhury, *Memories of Dilduar Zamindary*, Tangail, Mymensing, prepared in 11.11.1961, p-2 (Unpublished Article) স্বয়ং লেখকের সাথে গবেষকের সিরিজ সাক্ষাৎকার হয়, তিনি উক্ত জমিদারের প্রপৌত্র ও সৈয়দ মহব্বত আলী চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র।

৭৩। The Musalman, 1 May, 1936; মোহাম্মদী ২য়বর্ষ, ১ম খন্ড, কার্তিক-চৈত্র -১৩৩৫, পৃ- ৩৭৩; আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের দশ দিশারী, বাংলা একাডেমী, পৃ- ৮৮-৯০।

৭৪। *Govt of Bengal, Political Department*, Sept. 1923, File No-8-A-1, Progs. Nos. 143-158, Serial Nos, 1-16, National Archives, Dhaka; Rare Section, Dhaka Univesity Library; আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশবছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রন ১৯৯০, পৃ- ৩০; Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal (1882-1912)* Dhaka 1974 p-282; *Procedings of the Provincial Mohammedan Educational Conference*, Eastern Bengal and Assam 1906, p-23; *Report of the fourth Session of the Provincial Mohamedan Educational Conference* held at Rangpur on the 15th & 16th April, 1011, p-8-13;

Muslem Chronicle, 25, April, 1903 p-197, 21 October, 1905, p-439, 11 November 1905; ঢাকা প্রকাশ ১৭ এপ্রিল ১৯১০।

৭৫। আবদুল্লাহ্ , আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী,পৃ- ১৩।

৭৬। কলকাতা গেজেট, ৯ আগষ্ট , ১৯১৬, পরিশিষ্ট বিশ্লেষণ; মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা, মোস্তফা নুরুল ইসলাম অনুদিত, পৃ- ১১৩-১১৫।

৭৭। *Report of the Musalman Education Advisory Comittee* 1934 p-18-19, Sikandar Ali Ibrahimi, p-121-123.

৭৮। ওয়াকিল আহমদ,উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ২য় খন্ড,ঢাকা,পৃ- ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৭৯। জমিদার পরিবার সমূহের বর্তমান সদস্যের সাথে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য।

৮০। আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী পৃ- ৭৭।

৮১। ওয়াকিল আহমদ, পৃ- ১৪৩।

৮২। খন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৪৬; ওয়াকিল আহমেদের মতে, জমিদার নয় বরং জোতদার ছিলেন। পূর্বোক্ত,পৃ- ২৫৯; মীর মশাররফের আত্মজীবনী 'আমার জীবনী' মতে ছোট জমিদার ছিলেন বলেই মনে হয়। মীরের নিজের উক্তি, ১ম খন্ড, পৃ- ১৯১, নিবেদন অংশ, জমিদার দর্পণ, মশাররফ রচনা সম্ভার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮৩। করটিয়া থেকে প্রকাশিত এবং মৌলভী নঈমুদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক আখবারে ইসলামিয়া, ১৮৯২ খৃ এপ্রিল সংখ্যা (১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা), 'কি ভিষন সংবাদ' শিরোনাম।

৮৪। কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত মশাররফ রচনা সম্ভার, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, ভূমিকা, পৃ- (ছিয়াত্তর); ওয়াকিল আহমেদ ,পূর্বোক্ত, পৃ- ২৫৯।

৮৫। দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদার বাড়ী দৃশ্যমান সম্মুখ অংশ এবং স্থানীয় কেয়ার টেকার ও লোকমুখে প্রাপ্ত তথ্য।

৮৬। ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৯৭।

৮৭। তিনি 'দুঃখ তরঙ্গিনী' ও 'মানস বিকাশ' (অপ্রকাশিত) নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং অসংখ্য কবিতা (আংশিক প্রকাশিত, আংশিক অপ্রকাশিত) রচনা করেন। কয়েকটি কবিতা "সাবের বংশের জনৈক কন্যা' এরূপ অনুক্ত নামে কলকাতার কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। বেগম রোকেয়া "লুকানো রত্ন" ও অন্যান্য রচনাবলীতে করিমুন্নেসা কর্তৃক কবিতা লেখার তথ্য পাওয়া যায়। দেখুন আব্দুল কাদির সম্পাদিত, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী ১৯৭৩, পৃ- ২৮৭; পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য; ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৯৭; উল্লেখ্য শিক্ষানুরাগী ও সাহিত্যমনা জমিদার পত্নী করিমুন্নেসার এ সকল অপ্রকাশিত রচনা এবং তদীয় পুত্র বাংলার সাবেক মন্ত্রী বড়লাট পরিষদের সদস্য, স্বনামখ্যাত নবাব স্যার আব্দুল করিম খান গজনবীর অপ্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ সহ জমিদারীর মূল্যবান কাগজপত্র ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে ভুলক্রমে মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নবাব পরিবারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী সহ বাড়ির বৃহদাংশ আগুনে ভস্মীভূত হয়। ফলে আঞ্চলিক ও জমিদারী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রাপ্তি থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত

হয়। (তথ্য সূত্র- দেলদুয়ার জমিদারীর বর্তমান বংশধর আবদুল করিম খান গজনবীর পৌত্র খোদাদাদ খান গজনবী, সাক্ষাৎকার ঢাকা-২০০১)

৮৮। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, বেগম রোকেয়া জীবনী দ্রষ্টব্য

৮৯। আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই এর পুত্র নুরুর রহমান খান ইউসুফ জাই এবং পৌত্র জাহাঙ্গীর খান ইউসুফজাই ছিলেন যথাক্রমে পিতা ও দাদার মতই একই ধারার প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যিক ও লেখক। খন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮৬-২৮৮।

৯০। আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই, বিরাগ সঙ্গীত, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল , ১২৯৭, আশরাফ সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার-২০০০।

৯১। ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৪২-৪৩, ৪০৮-৯;

৯২। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৬ , পন্ডিত রেয়াজ উদ্দিন মাশহাদী শিরোনাম, তার মৃত্যুর অব্যাবহিত পর।

৯৩। মাশহাদী রচনাবলী, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ- ৩৩১-৩২

৯৪। মোহাম্মদ ইদরিস আলী, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩৬৫, পৃ- ৩৪-৩৫; মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন, আমার সংসার জীবন (১৯১৪)।

৯৫। ওয়াকিল আহমেদ পূর্বোক্ত পৃ- ২৯৮।

৯৭। *Who's Who- Indian Princes, Chief and Nobles- The Indian year Book 1936-1937*, Volume-XXIII- Pg.1066; *Knight Bachelor 1938-1939*, Op. Cit, P- 146.

৯৮। সাক্ষাৎকার ২০০০ খোদা দাদ খান গজনবী।

৯৯। সওগাত, আশ্বিন. ১৩৭০, পৃ- ৬৯৬

১০০। ঐ

১০১। ঐ

১০২। ঐ

১০২। ইব্রাহিম খাঁ, নওশের আলী খান ইউসুফজাই, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র- অগ্রাহায়ন- ১৩৬৬

১০৩। ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, ইউসুফজাই, শৈশব কুসুম, আহমদী প্রেস, টাঙ্গাইল ১৩০২, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

১০৪। ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত পৃ- ৪০৭; আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৮১-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

১০৫। ঐ, পৃ- ৪০১

১০৬। মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সমাজ, সমাজ নিরীক্ষন কেন্দ্র ঢাকা- ১৯৮৬, পৃ- ১৫।

১০৭। ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৩৬

১০৮। ঐ, পৃ- ১৭৯,১৯০

১০৯-১১০। ঐ, পৃ- ১৭৯।

১১১। মোহাম্মদ ইদরিস আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ শ্রাবন-১৩৭৪

১১২। ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত পৃ- ১২৮।

১১৩। আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের দশ দিশারী, পূর্বোক্ত,পৃ- ৮২।

১১৪। আবুল মনসুর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৬৫-৬৮।

১১৫। মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ পৃ- ১৫, ২৩৭-২৮০ বাংলা, পূর্ব বাংলা, এবং মফস্বল জেলা ময়মনসিংহের পরিসংখ্যান বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো।

১১৬। সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত ,পৃ- ৪২৯; ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত , পৃ- ৪৪২

১১৭। ঐ

১১৮। সাক্ষাৎকার, খোদাদাদ খান গজনবী ২০০০ ইং।

১১৯। মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃ- ৬৭।

১২০। কেদার নাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

১২১। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃ- ২১৬

১২২। মীর মশাররফ রচনাবলী, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত দ্রষ্টব্য; মুনীর চৌধুরী, মীর মানস দ্রষ্টব্য; ওয়াকিল আহমেদ, পৃ- ৮১, ২৭৮।

১২৩। ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৪৮।

১২৪। আশরাফ সিদ্দিকী, হিতকরী, মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র পৃ- ২৬-৩৩

১২৫। ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত পৃ- ৪৮-৪৯

১২৬। ঐ

১২৭। মীর মশাররফ রচনাবলী দ্রষ্টব্য ; মীর মানস দ্রষ্টব্য।

১২৮। মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ-৭২-৭৪।

১২৯। Sekhar Banddopadhay, *Caste, Class and Census: Aspects of Social Mobility under British Rule in the late Nineteents and*

Dhaka University Institutional Repository

Early Twentieth Century Bengal, 1872-1931, Centre for Southeast Asian Studies, University Calcutta, Monograph p- 2-3

১৩০। *Report on the census of Bengal 1872*, Calcutta, 1872 P-XXXII-XXXIII (General Statement IB)

১৩১। *Report on the Census of Bengal 1881*, Calcutta 1883, p-74, Secretariat Book Dept. National Archives, Alipur, Calculta, India; National Archives, Dhaka; Dhaka University Library.

১৩২। কেদার নাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের বিবরণ- পৃ- ৪৭

এ সম্পর্কে তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলা কালেক্টর আলেকান্ডার সাহেব বলেন, " I do not remember ever to have noticed such strangulation in public opinion, that if we conier that of masses and not that of the educated minority: Perhaps it was the excitment caused by the census last year (*General Administration Report, 1881-82,* Land Revenue Procedings, National Archives, Dhaka.

১৩৩। কেদার নাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত পৃ- ৪৬

১৩৪। F.Steingas ed., *Persian-English Dictionary,* London, 1954 4th Edition; ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৫

১৩৫। সাধারণতঃ আরবরা সৈয়দ বংশজাত, আরব ও ইরানীরা শেখ বংশজাত, তুর্কী ও আফগানরা পাঠান বংশজাত, মধ্য এশীয়রা মুঘল বংশজাত। সৈয়দ বংশজাত লোকেরা আবার হোসাইনি, রিজভী, নকভী, ইসমাঈলী, বোখারী, কিরমানী প্রভৃতি পদবী এবং শেখ বংশজাত লোকেরা সিদ্দিকী, ফারুকী, আব্বাসী, শাহ, খোন্দকার ইত্যাদি পদবী; পাঠানরা খান, গুর, লোহানী গজনবী, খাজা, খলজী, মালিক প্রভৃতি উপাধি; মুঘলরা শাহী, বেগ, মীর, মল্লিক, লস্কর, ইত্যাদি উপাধি ধারণ করতো। আবার ধর্মান্তরিতগণ নিজেদের অবস্থা ভেদে সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী শেখ, খান, মালিক প্রভৃতি পদবী নতুন করে যোগ করতেন। Khondoker Fazle Rubbe, *The Origin of the Musalman of Bengal* p-101-102

১৩৬। *Census of India, 1891*, Vol- V, Lower Provinces of Bengal and their Feudateries, Calcutta, 1983, p-17-19
উপাধিগুলো অক্ষরানুক্রমিক সাজালে সেগুলির নাম হয় আখাদজী (আখুন্দি বা আকন্দ পরিবর্তিত) আতরাফ, খান, গাইন, গাজী, চৌধুরী, দফাদার, দেওয়ান, নায়ক, পাঠান, বিশ্বাস, বেগ, মীর মীর্জা, মোগল, শেখ, সানা, সবদার, সৈয়দ ও হাজরা। এগুলোর মধ্যে গজনবী, লোহানী, খাজা ইত্যাদি অনেক উপবংশ ছিল পাঠান পদবীর অধীনে। টাঙ্গাইলের আব্দুল করিম সম্পাদিত 'তরফ গৌরাঙ্গীর ইতিহাস, গ্রন্থে এতদাঞ্চলের এহেন বংশাবলীর অতীত ধারাবাহিক বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। তিনি কতিপয় বংশের যথাযথ কৌলীন্য ও পাঠান বংশীয় যথার্থতা চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া উক্ত গবেষণার, 'পারিবারিক অধ্যায়' আলোচ্য জমিদারদের বংশীয় কৌলীন্যের যথার্থতা চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৩৭। *The Census Report of Indian* 1901, by E.A. Gait, Vol VI, `902. p-26.

১৩৮। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের উপর প্রণীত বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ ,ডিস্টিক্ট রেকর্ডস, সেন্সাস রিপোর্ট, সার্ভে রিপোর্ট ও প্রসিডিংস ইত্যাদি গ্রিয়ার্সন, ডব্লিউ হান্টার, উইলিয়াম কুক, জেমস ওয়াইজ, হার্বাট রিজলী প্রমুখ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এবং এদের অনুকরণে অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক বাংলার মুসলমান কুল পরিচয়ে এবং সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের জনগনের ব্যাপক হারে ধর্মান্তর গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন (Shilasen, *Muslim Politics in Bengal -1937-1947*, New Delhi, 1976 p-3) কিন্তু খোন্দকার ফজলে রাব্বী এমত খন্ডন করে গ্রন্থ রচনার পর, পরবর্তীতে আবদুর রহিম, আবদুল করিম, এ আর মল্লিক, সুফিয়া আহমেদ প্রমুখ এমতের স্বপক্ষে আরো বিশ্লেষণ ও তথ্য উপস্থাপন করেছেন। আবদুর রহিম বিস্তৃত ভাবে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমানের ৩০% বহিরাগত বংশধর, ৭০% ভাগ স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত। তার মতে বহু বিবাহ , বিধবা বিবাহ জন্ম হার বেশী প্রভৃতি প্রথার কারণে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি দ্বারা বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যা উক্ত ৩০% ভাগে দাঁড়ায়। ধর্মান্তরিত মুসলমানের মধ্যে প্রায় সমপরিমান্ অভিজাত ও নিম্নবর্ণে হিন্দু-বৌদ্ধ বংশধর আছে। (*Social and Cultural History of Bengal vol-I, II 1200-1757* Dacca-1961)

Dhaka University Institutional Repository

একজন আধুনিক ঐতিহাসিক রেহলায়ে ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে 'দাস প্রথা' উল্লেখ করেছেন। যা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পায়নি। (Hossainur Rahman, *Hindu Muslim Relations in Bengal, 1905-1947*, Nachiketa Publications Ltd. Bomby, 1974, p-1) ওয়াকিল আহমেদ সকলের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বলেন- 'খোন্দকার রাব্বীর বক্তব্যের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে ঠিকই, যা আবদুর রাহিম সাহেব প্রমাণ করেছেন, কিন্তু বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশাগত বনেদি মুসলমানদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল এটা মেনে নেয়া যায় না"। কিন্তু কেন ? তার ব্যাখ্যা ও প্রমাণ তিনি দেননি। কাজেই তিনি এবং মুনতাসির মামুন উভয়েই বাংলার জনপ্রবাহের মূল ধারা হিসেবে ধর্মান্তকরণকেই চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে- জনপ্রবাহের এই মুল ধারার সাথে আরব-ইরান-তুরস্ক-খোরাসান-আফগানিস্তান থেকে আগত একটি উপধারা মিলিত হয়েছে। দুই ধারার মধ্যস্থলে আছে মিশ্র রক্তের প্রবাহ, আর এর সাথে মুসলমানদের বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রথার ফলে তিনটি ধারায়ই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তিন ধারার শতকরা হিসাব নির্ণয় করা আজ আর সঠিক ভাবে সম্ভব নয়।

১৩৯। *Census Superintendents letter* no. 1627 dated 21.11.1900; letter no. 1200 dated 25.2.1901; District Records and Procedings, National Archives.
এছাড়া Census Report এ তদানীন্তন ডেপুটি কালেক্টরের মন্তব্যঃ ' If government had not objected to the payment NAZRANA (fine) it would have afforded an opprtunity of securing an innocent income: (*District Census Report, 1901*)

১৪০। J.D. Curninghum, *A History of the Shiekhs*, 1903, p-31;
ওয়াকিল আহমেদ দুটি প্রবাদের উল্লেখ করেছেন যাতে জাতিভেদের শিথিল রূপ ধরা পড়ে

১. আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দীন
তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন।

২. গতবছর আমি একজন জোলা ছিলাম,
এ বছর আমি একজন শেখ,
আগামী বছর ভাল দর পেলে

Dhaka University Institutional Repository

আমি একজন 'সৈয়দ' হব।

৩. একই প্রবাদ ফারসী'তে পাওয়া যায়-

পেশ আজ ইন কাসরবুঁদে

বাদাজান গুশতে শৈখ

ঘালা টু আরজান শাওয়াদ

ইস যাল 'সৈয়দ মেশাওয়ে।

(*The Modern Muslim political Elite in Bengal, 1903*, p-31) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

১৪১। বিত্তবান গৃহস্থ ঘরের কন্যা বিত্তহীন আশরাফগণ গ্রহণ করতেন, কিন্তু আশরাফগণ কোন অবস্থায় কৃষক, জেলে, জোলার ঘরে কন্যা বিবাহ দিতেন না। এতে খানদানের অবমাননা হত। এটাই সংস্কার ছিল, তবে বিত্তবান ও প্রভাবশালী আতরাফগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে সামাজিক ভাবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতেন। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীতে দেখা যায়, তার পিতামহ মীর ইব্রাহিম হোসেন এক মলঙ্গ ফকিরের লাখেরাজ সম্পত্তি প্রাপ্ত কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। স্বয়ং মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী কুলসুম বিবি ছিলেন এক দরিদ্র কৃষক কন্যা (আমার জীবনী, মীর মশাররফ হোসেন রচনাবলী, সৈয়দ আব্দুল মান্নান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা; আমার জীবনী, সম্পাদনা ডক্টর দেবীপদ ভট্টচার্য, কলিকাতা, ১৯৭৭)।

১৪২। দেলদুয়ার জমিদারের বংশ তালিকা, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য; আবদুল করিম গজনবীর এক ফুফু এবং একাধিক চাচাত বোন সঠিক পাত্রের অভাবে অবিবাহিত ছিলেন। যে কয়জনের বিবাহ হয়েছিল তার অধিকাংশেরই আন্তঃবিবাহ অথার্ৎ চাচাত ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ হয়েছিল। আশরাফ সিদ্দিকীর মতে, এ জমিদারীরই এস্টেট ম্যানেজার ও চারানের ক্ষুদে জমিদার আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাইর সাথে জমিদার কন্যা নুরুন্নেসার প্রেম সফলতার মুখ দেখেনি। যার ফলশ্রুতি সাহিত্যিকের উদাসী, বিরাগ সঙ্গীত, প্রবোধ সঙ্গীত প্রভৃতি কাব্য ও সঙ্গীত রচনা- (সাক্ষাৎকার - ২০০০)।

১৪৩। M.T. Litu, *Islam in India and Pakistan*, London 1930 page-21.

১৪৪। কেদার নাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত পৃ- ৪৬-৫০

১৪৫। ঐ

১৪৬। কেদার নাথের বিবরণ এবং সেন্সাস ও অন্যান্য রিপোর্ট সমূহ এবং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ।

১৪৭। ডব্লিউ হান্টার, বিনয় ঘোষ, সালাহ উদ্দীন, এ আর মল্লিক, সুফিয়া আহমদের থিসিস সমূহ, অধুনা আনিসুজ্জামান, ওয়াকিল আহমেদ ও মুনতাসির মামুনের গবেষণা গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য;

মুনতাসির মামুন এদের সকলের খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি বিশ্লেষণের সমালোচনা করেছেন, আংশিক মেনে নিয়েছেন, আংশিক খন্ডন করেছেন। সর্বোপরি ঔপনিবেশিক সমাজ গঠন কিংবা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনে নতুন শ্রেণী বিন্যাসের দৃষ্টি সম্পর্কে তারা কোন আলোচনা করেননি বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তারা 'সমাজ' নিয়ে আলোচনা করেছেন 'সমাজ গঠন' নিয়ে নয়। অন্য কথায় সমাজের উপরিকাঠামো নিয়ে। মুনতাসির মামুন, ৩টি আংশিক ধনবাদী ও ২টি সামন্তবাদী বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক কাঠামোয় সমাজ গঠন ও উৎপাদন পদ্ধতির চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শ্রেণী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

১৪৮। মুনতাসির মামুন,পূর্বোক্ত, পৃ- ৮২

১৪৯। ঐ, পৃ- ৮৯ , আলভী, সোস্যাল রেজিষ্ট্রারে প্রকাশিত প্রবন্ধ পৃ- ১৮৬

১৫০। ঐ, ৯১ , ঐ পৃ -১৮৭

১৫১। ঐ পৃ- ৯০

১৫২। ঐ পৃ-৯৫, উদাহরণ, বিচিত্রা ৭ম বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

১৫৩। ঐ,পৃ -৯৮

উল্লেখ্য 'ময়মনসিংহ জেলার এক অষ্টমাংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশ জমিদার ছিলেন শহরে অবস্থানকারী অনুপস্থিত জমিদার W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal Vo.V*, Reprint, Delhi 1973 p-214, 333, 458 (১৮৭৩ সনের হিসেবে) পরবর্তীতে এই সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায়।

১৫৪। ঐ পৃ- ৯১

১৫৫। ঐ পৃ- ১০৫, বাংলাদেশের ইতিহাস, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা- পৃ-৬৮৫-৯০

১৫৬। ঐ, ১০৭

১৫৭। বাংলাদেশের ইতিহাস ৩য় খন্ড, দ্রষ্টব্য

১৫৮। ঐ , পৃ- ৬৮৮

১৫৯। ঐ,পৃ- ৬৮৯

১৬০। ঐ. পৃ- ৬৯০

১৬১। ঐ , পৃ- ৬৯০

১৬২। ঐ, পৃ- ৬৯১

১৬০। মুনতাসির মামুন, পূর্বোক্ত -পৃ- ১০৩

১৬১। কেদার নাথ, পূর্বোক্ত -পৃ- ১৫১-১৫২

১৬২। ঐ, পৃ- ১৫২

১৬৩। "The general prosperity of the District (Mymensingh) in such that even Landless Laboures belonging to the lowest classes who exist on the margin of starvation in Western Bengal and Bihar, can here live comfortively without the necessity of working everyday: W.W. Hunter, *Imperial Gazzetter* vol. IX.

১৬৪। Serajul Islam, '*Life in Mufassal Towns*' in Ballhatchet and Harrison (eds), The City in South Asia, p-232.

১৬৫। শরীফ উদ্দিন আহমেদ, নগরায়ন ও নাগরিক শ্রেণী, বাংলাদেশের ইতিহাস ৩য় খন্ড; ঢাকা : ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০ - ১৯২১), একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স, ঢাকা-২০০১ দ্রষ্টব্য ; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি পৃ- ১৩৮, ১৫২, ১৫৮; Sharif Uddin Ahmed, Dacca: *A Study in Urban History and Development*, London, 1986; বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট সমূহ দ্রষ্টব্য

১৬৬। মুফাখখারুল ইসলাম, টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য মোহাম্মদ বাকের সম্পাদিত, জেলা পরিষদ টাঙ্গাইল - ১৯৯৭, পৃ- ১১-১৮

১৬৭। টান আইল'ই পরবর্তীতে আদমশুমারিকালে ডোমিনেটিং কালচারের প্রভাব ও ভূমিকায় 'টাঙ্গাইল' নামে বিবর্তিত হয়।

১৬৮। খন্দকার আবদুল রহিম ,পূর্বোক্ত, পৃ- ১৩২

১৬৯। ডালেম চন্দ্র বর্মন, স্থানীয় সরকার, বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড, পৃ- ৪৮৯-৫০৭

১৭০। ঐ, পৃ- ৪৯১।

১৭১। মুহম্মদ বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮৭।

১৭২। ডালেম চন্দ্র বর্মন, পূর্বোক্ত, পৃ- ৪৯৫।

১৭৩। খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৩৬, ৩৫৭-৩৫৮

১৭৪। মোহাম্মদ বাকের, লোকাল বোর্ডের ১৯১২-১৩ অর্থ বছরের বিভিন্ন খাতের ব্যয়ের একটি বিবরণ তুলে ধরেছেন, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮৭, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৭৫। কেদার নাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের বিবরণ, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৩১

১৭৬। কেদার নাথের মতে, লোকাল বোর্ডের অধীনে সড়ক পথ নর্মিত হয় মোট ১৯৮ মাইল এবং কাঁচা পথ মোট ১২৬ মাইল। সব মিলিয়ে ৩২৪ মাইল। (ময়মনসিংহের বিবরণ, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

১৭৭। কেদার নাথের মতে- ১টি হেড অফিস, ১৩টি সাব অফিস ও ৩৪টি ব্রাঞ্চ অফিস এ সময় পর্যন্ত ছিল। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৭৮। এফ,এ সাকচীর সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, সেন্সাস রিপোর্ট- ১৯০১, এবং কেদার নাথের বিবরণ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

১৮৯। ঐ

১৮০। কেদার নাথ, খন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ্য বাংলায় আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৮১৩ সালে শহর চৌকিদারের জন্য প্রথম স্থানীয় কর প্রবর্তনের মাধ্যমে। ১৮১৪, ১৮১৬ ও ১৮৩৭ সালের আইনের মাধ্যমে সকল শহরের জন্য চৌকিদার ব্যবস্থার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা হয়। শহর সমূহকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মেরামতের জন্য আরোপিত করের একটি অংশ ব্যায়ের আইন করা হয়। যেমন একজন করদাতার সর্বোচ্চ করের পরিমান মাসিক ২ টাকা ধার্য্য করা হয়। স্থানীয় উন্নয়নে এটাই ছিল সর্ব প্রথম কর (Chowdhury, *Rural Government* P-165) ১৮৪২ সালের দি বেঙ্গল পিপলস অ্যাক্ট ছিল বাংলায় প্রবর্তিত প্রথম মিউনিসিপ্যালটি আইন। যদিও এর ব্যবহার যথাযথ হয়নি কেননা এই অ্যাক্টের অধীনে মিউনিসিপ্যালটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল শহরের বাড়ির মালিকদের উপর, তাও যদি দুই -তৃতীয়াংশ মালিক চাইতেন তবেই। এই বিশেষ সমস্যাটি নিরসনের জন্যে

Dhaka University Institutional Repository

মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৮৫০ পাস করা হয়। এতে পুর্বের আইন সংশোধন করে বলা হয়, প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ে মিউনিসিপ্যালটি গঠনের উদ্যোগ সরকারী প্রশাসন যন্ত্রই গ্রহণ করবে। এই আইনের অধীনে মিউনিসিপ্যাল কমিটি সমূহ ময়লা ইত্যাদি নিষ্কাশন পূর্বক শহর পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তা মেরামত ও তাতে আলোর ব্যবস্থা করা, উপবিধি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনবোধে জরিমানা আরোপের মাধ্যমে পরিচালিত করার দায়িত্ব পালন করা, পরোক্ষ কর ধার্যকরণ ইত্যাদি ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত ছিল। (Tinker, *Foundation of Local self Government*, P- 29-33) টাউন পুলিশ অ্যাক্ট নামে আরেকটি আইন পাস করা হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। এর উদ্দেশ্য ছিল বাসিন্দাদের মতামত ব্যতিরেকেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে তাদের উপর স্থানীয়ভাবে করারোপ অধিকার প্রদান। বাংলায় অনেক শহরে এই আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তখনো মিউনিসিপ্যাল সংগঠন তেমন গড়ে উঠেনি। জেলা মিউনিসিপ্যাল উন্নয়ন আইন, ১৮৬৪ পাস হবার পর বিভিন্ন বড় জেলা শহরে মিউনিসিপ্যালটি গড়ে ওঠে। অতঃপর ছোট শহরে মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৬৮ সালে দি ডিস্ট্রিক্ট টাউন অ্যাক্ট নামে একটি আইন বেঙ্গল কাউন্সিলে পাস হয়। বাংলার স্থানীয় সংস্থা সমূহের জন্য পূর্বে প্রবর্তিত সকল আইনকে সংহত ও সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৭১ সালে উত্থাপিত বিল সংশোধিত আকারে ১৮৭৩ সালে পাশ হয়। এতে বড় বড় শহরে কর প্রদানকারী দ্বারা কমিশনার নির্বাচন বিধান করা হয় এবং একজন নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানের বিধানও এতে রাখা হয়। ১৮৭৪ সালে মিউনিসিপ্যালটি কে কিছু বর্ধিষ্ণু কাজ ও ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৮৭৮ সালে মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টকে আরো সুসংগঠিত করে ১৮৬৪ ও ১৮৬৮ সালের আইনে বর্ণিত মিউনিসিপ্যালটি সমূহকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ১৮৫৬ ও ১৮৫০ সালের আইনের অধীন শহর সমূহকে যথাক্রমে ইউনিয়ন ও ষ্টেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য ১৮৮৪ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ইউনিয়ন ও ষ্টেশন সমূহ মিউনিসিপ্যালটি মর্যাদা হারায় এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন ১৮৮৫ প্রয়োজনীয় বিধান প্রবর্তন করা হয়। এই আইনে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন ও নিজেদের কার্য্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাধীনতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণ যাতে কার্যকর নিয়ন্ত্রন প্রয়োগ করতে পারেন তারও ব্যবস্থা রাখা হয়। (Rokeya Rahman Kabir, *Administrative policy of the*

Dhaka University Institutional Repository

Government of Bengal, Dhaka 1965 p-39; ডালেম চন্দ্র বর্মন , পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য)।

১৮১। মোহাম্মদ বাকের, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৯২।

১৮২। কেদার নাথ মজুমদার, পূর্বোক্ত পৃ- ১২৬; ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী টাঙ্গাইল পৌরসভার জনসংখ্যা ১,০৪,৩৮৭ জন এবং আয়তন ২১.৮০ বর্গ কিলোমিটার (মোহাম্মদ বাকের - পূর্বোক্ত পৃ- ১৯৩)

১৮৩। ঐ, পৃ- ১৫২-৫৩।

১৮৪। খন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৩৬

১৮৫। কেদার নাথ মুজমদার, মোহাম্মদ বাকের, সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, পুরনো ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার্স দ্রষ্টব্য।

১৮৬। খন্দকার রহিম ,পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৩৫

১৮৭। ঐ- পৃ- ৪২২

১৮৮। ঐ পৃ- ৪২৪

১৮৯। ১৯৩৭ এর নির্বাচনে উত্তর টাঙ্গাইল থেকে ধনবাড়ীর নওয়াবজাদা হাসান আলী চৌধুরী প্রজা পার্টি থেকে নির্বাচিত হন। মুসলিমলীগ প্রার্থী অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ পরাজিত হয়। আবার দক্ষিণ টাঙ্গাইল থেকে প্রজাপার্টির প্রার্থী দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদার লেঃ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীকে পরাজিত করে মুসলিম লীগ প্রার্থী করটিয়ার মসউদ আলী খান পন্নী বিজয়ী হন। ১৯৪৫ এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী মাসউদ আলী খান পন্নী নির্বাচিত হলেও দেলদুয়ারের জমিদার স্যার আবদুল হালিম খান গজনবী প্রজাপার্টি থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হন এবং রাজনীতি থেকে প্রায় অবসর গ্রহণ করেন। ৪৭ এর স্বাধীনতা উত্তর কালে জাতীয় রাজনীতিতে পন্নী পরিবারের ভূমিকা অব্যাহত থাকে। দেলদুয়ারের জমিদারদের ভূমিকা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বে দেয়ার পর্যায়ে সীমিত হয়ে পড়ে ।

দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদার সৈয়দ মহব্বত আলী চৌধুরী ও উত্তর বাড়ীর গজনবী সাহেবের জামাতা শাহ আলী জালালী ওরফে বিজু মিয়া পাকিস্তান আমলে স্থানীয় প্রশাসনে মিউনিসিপ্যালটিতে এবং স্থানীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব এবং দেশ স্বাধীনতা উত্তর কালে দেলদুয়ারের জমিদারদের বংশধরদের

আর কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। তবে ধনবাড়ীর চৌধুরী ও করটিয়ার পন্নী পরিবারের ভূমিকা এর পরও অব্যাহত থাকে।

১৯০। শেখ আবদুস সোবহান ' হিন্দু মোসলমান' ঢাকা, ১৮৮৯ পৃ- ৪৮; মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ, পৃ- ৯৫ এ উদ্ধৃত; ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য।

১৯১। হায়ওয়ান অর্থ জানোয়ার । হায়ওয়ান আলী নাম করণের কারণ তিনি জমিদারকে 'জানোয়ার' সদৃশ্য প্রাণী সাব্যস্ত করে থাকবেন। (মুনতাসির মামুন, পূর্বোক্ত পৃ- ১২১)

১৯২। মুনতাসির মামুন- পূর্বোক্ত, পৃ- ১২১।

১৯৩। ঐ, পৃ-১২১।

১৯৪। মশাররফ রচনাবলী ৩য় ও ৫ম খন্ড, কুলসুম জীবনী, আমার জীবনী গ্রন্থে মীরের নিজের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত।

১৯৭। মশাররফ রচনাবলী, পূর্বোক্ত , ভূমিকা, পৃ- সাতাত্তর

১৯৮। তার অমর গ্রন্থ ' বিষাদ সিন্ধু' এখানেই রচিত হয় যা তিনি দেলদুয়ার জমিদার করিমুন্নেসা খানমকে উৎসর্গ করেন।

১৯৯। গাজী মিয়ার বস্তানী - ১ম সংস্করণ , ১৮৯৯ পৃ- ৩৫২; বিবি কুলসুম ১ম সংস্করণ, ১৯০৯ পৃ- ৯৬; মশাররফ রচনাবলী, পূর্বোক্ত পৃ- ৪১৬।

২০০। মশাররফ রচনাবলী, কুলসুম জীবনী পৃ- ৪১৬ পৃষ্ঠার বিবরণে অনুমিত হয়। আশরাফ সিদ্দিকী ও সৈয়দ মারহামাত আলীর সাক্ষাৎকার; খোন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৪৬-১৪৮।

২০১। এডভোকেট সৈয়দ মাবহামাত আলীর সাক্ষাৎকার ও সমকালীন বিশ্লেষণ।

২০২। খোন্দকার আব্দুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৪৯।

সে সময়ে নব গঠিত টাঙ্গাইল মহকুমায় পুরুষ জমিদারদের অকাল মৃত্যুর ফলে স্ত্রীলোকের নেতৃত্বের একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ঠিক এসময় বিখ্যাত বিষাদ সিন্ধুর লেখক, সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন দেলদুয়ার জমিদারের এক তরফে ম্যানেজার পদ গ্রহণ করে কুষ্টিয়া থেকে টাঙ্গাইলে আসেন। তিনি টাঙ্গাইল মহকুমায় ১৮৮৪ সন থেকে ১৮৯৩ সন প্রায় পর্যন্ত দশ বছর মতান্তরে ১৮৯৬ সন পর্যন্ত ১২ বছর ছিলেন। দেলদুয়ারের জমিদার আবুল হাকিম খান গজনবীর ইন্তেকালের পর জমিদারী পরিচালনার ভার পড়ে শিক্ষিতা স্ত্রী করিমুন্নেসার উপর। করিমুন্নেসার বড়জা ও স্বামীর চাচাত বোন রাহাতুন্নেসা নিজের পৈত্রিক অংশ ও স্বামীর অংশ নিয়ে দবদবা জমিদারী ফেঁদে বিশেষ শান শওকতের সাথে শাহী মউজে চলছিলেন। এবং তার দুই ননদ বেগম

Dhaka University Institutional Repository

নজমুন্নেসা ও নুরুন্নেসা জমিদারী ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে তারাও একদম কম চলছিলেন না। এই সব শান শওকতের পরিবেশে স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর বেগম করিমুন্নেসা তারই দুই শিশু সন্তান আব্দুল করিম ও আবদুল হালিম গজনবীকে নিয়ে সাময়িকভাবে বিব্রত হলেও বুদ্ধিমতি বিদূষী মহিলা বেগম করিমুন্নেসার পক্ষে সব দিক দিয়ে সামলে নিতে বেশী সময় লাগে না। সে সময় কুষ্টিয়ার মীর মশাররফ হোসেনের পৈত্রিক জমিদারীর বিভিন্ন মহল নিলামে বিক্রি হয়ে এমন পর্যায়ে এসেছে যে, জমিদারীর আয়ের উপর ইজ্জতের সাথে বাস করা দায় হয়ে পড়েছে। মীর সাহেব তাই এমন একটা চাকুরীর সন্ধান করছিলেন যাতে জমিদারের শরাফতী বজায় থাকে আবার বেগম করিমুন্নেসা ও এমন একজন ম্যানেজার সন্ধান করছিলেন যিনি শরাফতীর মাফকাঠিতে কম না হন।

জমিদারের ম্যানেজার হিসেবে সে আমলে সমাজে যে কদর পাওয়া যেতো, সেটা অনেক সময় জমিদারকেও ছাড়িয়ে যেতো। বেগম করিমুন্নেসা এস্টেটের ম্যানেজার হিসেবে, তদুপরি তার কালজয়ী প্রতিভার বলে মীর সাহেব অল্পকালের মধ্যেই টাঙ্গাইল মহকুমায় বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হলেন। মহিলা জমিদারকে প্রজাগণ সবসময় কাছে দেখতে পেতো না, দেখতো তার ম্যানেজার মীর সাহেবকে, প্রজাগণ তাই ইজ্জত দিতে হলে মীর সাহেবকেই দিতো।

সেজন্যই মীরের নিজের ভাষায়, 'ভোলানাথ হাকিম বাহাদুরের ষড়যন্ত্রমূলক রায় ঘোষণায় তাকে জেলে যেতে হয়। পরে জজ আদালতে আপিলের সময় ব্যারিষ্টার সাহেব উপস্থিত হইয়া ঘটনার আদি অন্ত জজ বাহাদুরের নিকট ধীর গম্ভীর ভাবে সুযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলে নিরপেক্ষ বিচারপতি ভেড়াকান্তকে নির্দোষী সাব্যস্তে খালাস দিলেন। ডিপুটির যাবতীয় হুকুম রদ হইল। ভেড়াকান্তের বেকসুর খালাসের সংবাদে অরাজকপুরের যাবতীয় লোক সন্তুষ্ট হইল...'এ রায়ের ফলে ভোলানাথ হাকিম নিদারুন লজ্জায় বাসগৃহ হতে দুইদিন বাহিরেই আসিলেন না'। বস্তানী পৃ- ৮২-৮৩।

সে সময়ে দেলদুয়ারের বিভিন্ন তরফের মধ্যে আদাওতি, রেষারেষী ইর্ষাপরায়নতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। জমিদারীর চারটা তরফেই মহিলা কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে মিল মহব্বত সম্প্রীতি আদৌ ছিল না। ছিল পরস্পরে প্রতি অবিশ্বাস ও হিংসা। .... দেলদুয়ারের এ মহলে সে মহলে যে সব মামলা মোকাদ্দমা লেগেই ছিল, তার মধ্যে চারটি তরফই কমবেশী জড়িত থাকতেন। সেই সব মোকদ্দমার দিন তারিখ এসে গেলেই চারটি তরফের একটা মিলিত শলা পরামর্শ

Dhaka University Institutional Repository

দরবার হতো, কিন্তু কে করে সেই শলা পরামর্শ। চারটি তরফের মধ্যে একরূপ মুখ দেখাদেখি বন্ধ। মীর সাহেব নিজ প্রচেষ্টায় এই অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি জমিদারীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন করিমুন্নেসার সংগে শলা পরামর্শ করতেন, তার হুকুম হাকাম তালীম করার চেষ্টা কতেন, তেমনি অপর তিনটি তরফ অর্থাৎ বেগম রাহাতুন্নেসা, বেগম নুরুন্নেসা ও বেগম নজমুন্নেসার সঙ্গে ও প্রয়োজন মাফিক দেখা সাক্ষাৎ করে শলা পরামর্শ করতেন। কিন্তু মীর সাহেবের এই ধরনের অবাধ মেলামেশার ফল ভাল হওয়ার পরিবর্তে কালক্রমে সেটা খুব খারাপের দিকেই মোড় নিলো।

মীর সাহেব কোন তরফে কোন দিনে অনেক সময় নিরিবিলিতে কাটিয়েছেন, কার সাথে শলা পরামর্শ করতে গিয়ে একটু বেশী ঘন হয়ে মিশেছেন ইত্যাদি কানাঘুষা দিন দিন বেড়েই চলতে লাগলো। পরে সেই কানাঘুষাই চারটি তরফের মধ্যে ইর্ষার আগুন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিল। বেগম করিমুন্নেসার সাথে মীর সাহেবের মনকষাকষি প্রথম প্রথম ছিল কিছুটা অভিমানের পর্যায়ে কিন্তু শেষে সেটা দাঁড়ালো শত্রুতায়।

মামলা থেকে খালাস পাওয়ার পরও তিনি দীর্ঘদিন টাঙ্গাইলে ছিলেন বলে মনে হয়, ১৮৯৪ সালে করিমুন্নেসার বড় পুত্র এ কে গজনবী বিলেত থেকে ফিরে জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করলে মশাররফ হোসেন দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজারের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এর পরই সম্ভবত একদিন নীরবে লোকচক্ষুর আড়াল দিয়ে টাঙ্গাইল থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়তে হলো রংপুরের উদ্দেশ্যে। মীর সাহেব দেলদুয়ার থেকে রংপুরে গিয়ে অবস্থান কালে কাল্পনিক নাম ব্যবহার করে দেলদুয়ার এস্টেটের স্মৃতি কথাই লিখেছেন, কিন্তু তার নাম দিয়েছেন গাজী মিয়ার বস্তানী। খন্দকার আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৪৬-৪৮

২০৩। স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, ' স্ত্রীলোকের ঘাট ঘোলমালের হাট' 'স্ত্রীলোক ইর্ষার বশবর্তী হলে শয়তানকেও ছাড়িয়ে যায়' দেলদুয়ারের চার তরফে, সন্তোষের দু তরফে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

২০৪। আশরাফ সিদ্দিকীর সাক্ষাৎকার।

২০৫। বংশ তালিকা দ্রষ্টব্য, দেলদুয়ার ছাড়া সমকালীন হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের বংশতালিকা দেখলে ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

২০৬। চিত্রসূচী দ্রষ্টব্য, Syad Mahamat Ali, Op.cit.

২০৭। চিত্রসূচী দ্রষ্টব্য Syad Marhamat Ali, Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

২০৮। Syad Marhamat Ali, Ibid

২০৯। চিত্রসূচী দ্রষ্টব্য,সৈয়দ মারহামাত আলীর সৌজন্যে

২১০। চিত্রসূচী দ্রষ্টব্য,খোদাদাদ খান গজনবীর সৌজন্যে

২১১। চিত্রসূচী দ্রষ্টব্য,সংশ্লিষ্ট জমিদার পরিবার সমূহের সৌজন্যে

২১২। নূরী, পূর্বোক্ত পৃ- ১১৩

২১৩। ঐ, পৃ- ১১৩

২১৪। ঐ, পৃ- ১১৫, খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য।

২১৫। খোন্দকার রহিম, পূর্বোক্ত দ্রষ্টব্য।

২১৬। নূরী, পূর্বোক্ত,- ১১৮

২১৭। ঐ, পৃ- ১১৯, ১২৩

২১৮। ঐ, ১২৪।

২১৯। মোহাম্মদ বাকের,খোন্দকার আব্দুর রহিম দ্রষ্টব্য।

২২০। আতাউর রহমান সামাদ ও নীল মাধব সেন, টাঙ্গাইলের শিল্প, বাকের পূর্বোক্ত পৃ- ৪১৭,৪২০।

২২১। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য, প্রতিষ্ঠান সমূহ ও দানের তালিকা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। এ পরিবর্তনের অভিঘাত ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজকাঠামো ও অর্থনীতির গভীরে প্রবেশ করে।

অভিঘাতটি এই যে, অনভিজ্ঞ ও তরুন ইংরেজ কর্মকর্তা জেলা ও মহকুমা প্রশাসনে এসে গ্রামীণ অভিজাত জমিদার ও নিম্নবিত্তের পেশাজীবী শ্রেণীর উপর নতুন আচার আচরণ, নতুন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চালু করে। সমাজের চালিকা শক্তি সমাজকে যে দিকে নিয়ে যায়, সমাজ সে দিকেই পরিচালিত হয়। এ তত্ত্ব বাংলার আঞ্চলিক ও জাতীয় ইতিহাসে খুব বেশী প্রযোজ্য হয়।

আলোচ্য গবেষণায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে, দেলদুয়ারের জমিদার পরিবার পাঠান বংশোদ্ভুত। পাঁচশত বছরের বাংলার ইতিহাসে পনের থেকে বিশ প্রজন্ম ধরে এদেশের আলোবাতাস , মাটির গন্ধ আর গাছগাছালির ছায়ায় তারা বাঙ্গালী হিসেবেই বেড়ে উঠেছে। পারস্পরিক ভাব, চেতনা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের মাধ্যমে তাদের হাতে বাংলার জাতীয় অর্থনীতি ও সমাজ বিকশিত,সুশোভিত ও সুসমৃদ্ধ হয়েছে। দেলদুয়ার-টাঙ্গাইলের মানস ভূমি এর ফলে জন্ম দিতে পেরেছে কতেক ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ। বাংলার অনেক অঞ্চল যখন নূন্যতম নেতৃত্বহীন, যুগ- চেতনা থেকে অনেক দূরে, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের ঐতিহ্য ধরে রেখে নিভু নিভু করে জ্বলছে । সে সময় দেলদুয়ার-টাঙ্গাইল অঞ্চল দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের উর্বরভূমি হিসেবে নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। দু' ঐতিহ্যবাহী রক্তধারার মিশ্রনই দু' উন্নত সংস্কৃতির মিলনই মেধাবী ও যুগধর্মী নেতৃত্ব উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে।

রংপুরের উন্নত সংস্কৃতির ধারক করিমুন্নেসার গর্ভেই শুধুমাত্র এ,কে,গজনবী ও এ,এইচ গজনবী জন্ম নিয়েছে এবং যথাযথ পরিবেশ, পরিচর্যা পেয়ে নিজেদের জন্মগত প্রতিভাকে বিকশিত করেছে। নিঃসন্দেহে এটি কোন অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃতিক কোন বিষয় নহে বরং বস্তুবাদী বিবর্তন ও পরিবেশের বিকশিত ফল। সমাজ চেতনার ধারক মানুষদের জন্য এর মধ্যে নিঃসন্দেহে শিক্ষা ও গবেষণার বিষয় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার জমিদাররা প্রজাদের শোষণ করেছে প্রজা ও ভূমির উন্নয়ন করেনি। আবাদ আন্দোলনের মাধ্যমে চাষাবাদের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে তার কৃতিত্ব মধ্যস্বত্বভোগীদের, জমিদারদের নয়। এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী আবার অবৈধ উপায়ে ঔপনিবেশিক শাসনের কুফলের অবৈধ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিক, গবেষকরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ঔপনিবেশিক নীতির প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট নয়া জমিদার সমাজ অর্থনীতির এই সব ধারা প্রবণতা সমূহ চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন জমিদার শ্রেণী আর ইংরেজ বেনিয়া মুৎসুদ্দি শ্রেণীজাত নব্য জমিদার শ্রেণীর মধ্যেকার প্রজা শোষণের পার্থক্য ঐতিহাসিকরা তেমন ভাবে তুলে ধরেননি। অথচ সব অঞ্চলে সব জমিদার প্রজা শোষণ ও নির্যাতন একই মাত্রায় করেননি।

এক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে দেলদুয়ারের গজনবী ও সৈয়দগণ প্রজা শোষণ ও নির্যাতন খুব একটা করেননি। শুধু দেলদুয়ারের সৈয়দ ও গজনবীরাই নয়, করটিয়া, শায়েস্তাবাদ, বগুড়ার জমিদার, রংপুরের সাবের পরিবার, এদের কোনটির ক্ষেত্রেই প্রজা শোষণ বা প্রজা নির্যাতনের তথ্য পাওয়া যায় না। তাদের জমিদারীতে তাই প্রজা বিদ্রোহ সংঘটিত হতে দেখা যায়নি। ব্যতিক্রম শুধু ধনবাড়ীর ও সন্তোষ জমিদারী। টাঙ্গাইলের এই দু' জমিদারীতে চিরায়ত জমিদারী ও সামন্ত শোষণের বহুচিত্র ও তথ্য উদঘাটিত হয়েছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে দেলদুয়ার ও করটিয়া জমিদারীতে প্রজা নির্যাতনের যে ছিটে ফোটা তথ্য পাওয়া যায়, তা মূলতঃ অলস জমিদারদের নায়েব ও গোমস্তাগণ, স্বীয় জমিদারদের অগোচরে উদ্দেশ্য মূলক ভাবে করেছেন।

প্রথম দিককার দেলদুয়ার ও সংশ্লিষ্ট জমিদাররা যে অলস ছিলেন তা গবেষণায় প্রমাণিত। কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষ জমিদাররাই ছিলেন অগ্রগণ্য। মহিলা জমিদারগণ ছিলেন তুলনামূলক কর্মঠ। মূলত কিছু সময় অর্থাৎ ১৮০৯ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত তারাই দেলদুয়ার ও সংশ্লিষ্ট জমিদারী বহুলাংশেই পরিচালনা করেন। বস্তুত পক্ষে দেলদুয়ার ও সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের জমিদারী সমূহে এ সময় মহিলা নেতৃত্বের হিড়িক পড়ে এবং পুরুষ জমিদারগণ হয় অল্প বয়সে মারা যাচ্ছেন, নচেৎ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। বিজ্ঞান সম্মত কারণ অবশ্যই থাকতে হবে। আর তা হচ্ছে উন্নত পরিবেশ ও রক্তের মিশ্রনের বৈজ্ঞানিক

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফল। অন্য কথায় দু' ধারার উন্নত রক্তের মিশ্রন এবং শৈশব-কৈশোরে মগজ, মন ও মানস তৈরীর উন্নত পরিবেশ থাকা না থাকা। সুতরাং সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সমগোত্রে চাচা, মামাত, ফুফাতো ভাইবোনে আন্তঃ বিবাহে এহেন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে ভূমিষ্ঠ সন্তান না দুই রক্তের মিশ্রন হয়, না উন্নত ও নতুন পরিবেশ পায়।

দেলদুয়ার জমিদারীর পাঁচশত বছরের বংশীয় ও পারিবারিক ইতিহাসের শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে দেলদুয়ার টাঙ্গাইলের বহু পুরনো অঞ্চলের পাঁচশত বছরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের উৎস কাগজপত্র কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ফলে এতদাঞ্চলের পাঁচশত বছরের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এতে একদিকে প্রজাস্বত্ব যুগের দেলদুয়ার ও সংশ্লিষ্ট জমিদারী ব্যবস্থাপনায় ভূমি, কৃষি, বাণিজ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধারা প্রবণতা সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। অপরদিকে ধর্ম, শিক্ষা, সংবাদপত্র, সভা সমিতি আইন ও বিচার ব্যবস্থার এবং লোক শিল্প ও লোক ঐতিহ্য ধারায় জনগনের আচার-আচরন সহ সামাজিক ইতিহাসের ধারা প্রবণতা সমুহ তুলে ধরা হয়েছে। এই ধারা প্রবণতায় দেলদুয়ার-আতিয়ার সাম্প্রতিক কৃষি অর্থনীতি, পণ্য ও বাণিজ্য অর্থনীতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অর্থনীতি, সর্বোপরি অভিজাত জমিদার ও মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর, মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী এবং সাধারণ কৃষক ও জনঅর্থনীতিতে বহু নয়া বৈশিষ্ট্য ও উপাদান সংযোজিত হয়েছে।

প্রথমতঃ ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানে বাংলার অধিকাংশ থানা ও জেলার সাধারণ ভূমির পরিবর্তে পলি বিধৌত চর ভূমি, সাধারণ সমতল ভূমি এবং অরণ্যভূমির ত্রিমুখী উৎপাদনের সংযোগ প্রকৃতি এখানে করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ কৃষি অর্থনীতিতে চাষাবাদ বৃদ্ধি এবং পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দেলদুয়ার -আতিয়া ছিল ব্যতিক্রমী। অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে চাষাবাদ বৃদ্ধি শুধুমাত্র মধ্যস্বত্বভোগী পত্তনিদাররাই করেনি বরং সরাসরি জমিদাররাই করেছেন। দেলদুয়ারের গজনবীরা ১৮৮০ পর্যন্ত উপস্থিত জমিদার ছিলেন। সৈয়দ বংশীয়রা সম্পূর্ণভাবেই উপস্থিত জমিদার ছিলেন। ফলে নিজেরাই রায়তের মাধ্যমে সরাসরি চাষাবাদ করে পরিমাণ ও গুণগতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা এতদাঞ্চলে দেশের অন্য স্থানের তুলনায় সবচেয়ে কম মধ্যস্বত্বভোগীর বাস ছিল। এখানে কৃষি পণ্য উৎপাদন এবং একর প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন বৃদ্ধিতে আবদুল করিম গজনবী অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। অপর পক্ষে এই জেলা ও মহকুমার অনুপস্থিত অন্যান্য জমিদারের জমিদারীস্বত্ব ও এস্টেটগুলো বারো বছরের জন্য লীজ নিয়ে কর্ণওয়ালিসের কৃষি বিপ্লবের সুযোগ বাস্তবায়নে প্রথম প্রচেষ্টা ও শুভ সূচনা করেছিলেন এ কে গজনবী। কিন্তু সমন্বিত কোন উদ্যোগ না হওয়ায়, সর্বোপরি মূল 'সামন্ত' ব্যবস্থা অটুট থাকায় এই ব্যক্তি উদ্যোগ বাংলার ইতিহাসে তেমন কোন পরিবর্তন বয়ে আনতে পারেনি।

এতদাঞ্চলের ধান ও পাট প্রভৃতি উৎপাদিত দ্রব্য আঞ্চলিক চাহিদা মিটিয়ে কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় রপ্তানি হতো। মধুপুর বনাঞ্চলের কাঠ সহ বিভিন্ন পণ্যের বাড়তি রপ্তানি আয়ে এ মহকুমার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অন্য যে কোন মহকুমার চেয়ে স্বচ্ছল।

জমিদারদের পারিবারিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে এতদাঞ্চলে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটে। তাকে কেন্দ্র করে নয়া উৎপাদক শ্রেণী গড়ে ওঠে। এতদাঞ্চলের জমিদারদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতায় টাঙ্গাইলে কাগজশিল্প, তাঁত শিল্প, জামদানী শিল্প, মিষ্টান্ন দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রের বিকাশ হয়েছে। এতদাঞ্চলের প্রাকৃতিক অবস্থানগত সুবিধার সাথে যোগ হয়েছে দেশীয় উৎপাদন কৌশল। সংযুক্ত হয় মধ্যএশীয় ও মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব, ইরানি , তুর্কি, মুঘল , আফগান এবং সর্বশেষ ইউরোপীয় নয়া উৎপাদন কৌশল। তবে কৃষি উৎপাদনে নয়া কোন কৌশল কিংবা আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি খুব একটা প্রয়োগ হয়নি। তবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কিছুটা হলেও নয়া উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ হয়। জমিদার, নবাবদের দরবারে ও পরিবারে নতুন নতুন পোষাক ও খাদ্য সংস্কৃতি বিশেষ ভাবে বিকশিত হয়। এযুগে সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক চালিকা শক্তি ছিল কৃষি অর্থনীতি ও ভূমিজ শ্রেণী সমাজ।

বৃটিশ শাসনের দু'শত বছরে ভূমিকে কেন্দ্র করে তিনটি শ্রেণী সমাজ বিকশিত হয়। প্রথমতঃ অভিজাত জমিদার শ্রেণী , দ্বিতীয়তঃ পত্তনীদার মধ্যস্বত্বভোগী, ১৯৩৮ সালের দিকে এসে যারা 'জোতদার' শ্রেণী নামে পরিচিত হয়। বস্তুত এই অবৈধ শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বীকৃতি ও তাদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদ থেকে শুরু হয় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্বের বিকাশের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ সাধারণ কৃষক শ্রেণী। এই শ্রেণী আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথাক্রমে (ক) স্বচ্ছল ও ধনী কৃষক (খ) বর্গাদার ও (গ) ভূমিহীন দিনমজুর। দেশের অন্যত্র বর্গা প্রথা ও ভূমিহীন শ্রেণীর বিকাশ ব্যপকভাবে হলেও এতদাঞ্চলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। কেননা এতদাঞ্চলের সাধারণ অর্থনীতি ছিল কৃষক ও বর্গাদারের অনুকূলে।

সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও দেলদুয়ার আতিয়া অঞ্চলের সামাজিক কাঠামো ও সমাজ শ্রেণীর বিকাশে ব্যতিক্রমী উপাদান ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু বেনিয়া জাত নব্য জমিদার এবং ইংরেজি শিক্ষিত ঔপনিবেশিক চরিত্রজাত নয়া মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী উভয়ের মধ্যে ইংরেজদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ প্রিয়তা বিকাশ লাভ করে। এর সাথে যুক্ত হয় অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে দাবী আদায় এবং তোষামোদীর রাজনীতি ও সংস্কৃতি। এতদাঞ্চলের জনমানুষের চরিত্রে অদ্যাবধি সেই জমিদারী উদ্ভুত অপসংস্কৃতি গুলোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে উকিল-ব্যরিষ্টার শ্রেণী এবং আদালতকে কেন্দ্র করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও পেশাজীবীর অভ্যুদয় ঘটে। ধান-পাটের বাজার পেয়ে গ্রামীণ স্বচ্ছল প্রজা শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। এই শ্রেণীর অভ্যুদয় সম্ভবত পুরো ঔপনিবেশিক আমলের একটি ইতিবাচক দিক।

সাধারণভাবে জমিদাররা জমিদারীতে অনুপস্থিত থাকায় জনমানসের ও প্রজার সাথে দূরত্ব তৈরী হয়, ফলে নায়েব-গোমস্তার সাথে সাধারণ জনগনের সম্পর্ক তৈরী হয় । সুতরাং লোকায়ত জীবন মানস গঠনে জমিদারদের ভূমিকা নেই। এ স্বীকৃতি তত্ত্ব দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে,কেননা দেলদুয়ার জমিদারগণ কলকাতায় প্রবাস জীবন যাপন করা সত্ত্বেও গ্রামের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেননি। ফলে এতদাঞ্চলের লোকায়ত মানস গঠনে জমিদারী সমাজ ব্যবস্থার অনুকূল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জমিদাররা চরিত্রহীন, অত্যাচারী, জ্ঞানহীন ও শোষকের প্রতিভু এই তত্ত্ব দেলদুয়ার-আতিয়া জমিদারদের উপর ঢালাও ভাবে প্রযোগ করা যায় না। প্রজাস্বত্বের বিকাশের পূর্বে দু'একজন জমিদারের মধ্যে এহেন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেলেও অধিকাংশের ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ উল্টো তথ্য। তন্মধ্যে সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী, আবুল হাকিম খান গজনবী এবং হায়দার আলী খান পন্নী ও ওয়াজেদ আলী খান

Dhaka University Institutional Repository

পন্নী প্রজা কল্যাণের প্রতিভু ছিলেন। গজনবী ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এ. এইচ. গজনবী ছিলেন যুগধর্মের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী।

সার্বিকভাবে জমিদাররা ইংরেজদের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বদা কাজ করেছে। প্রাথমিক জমিদারদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হলেও পরবর্তী জমিদারদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নহে। এ,এইচ, গজনবী ও ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছিলেন আজন্ম বৃটিশের কার্যক্রম বিরোধী ও প্রতিবাদী আন্দোলনকারী; বিভিন্ন সংস্থায় নেতৃত্ব দিয়ে তারা জনগণকে সংগঠিত করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন।

মুসলমান জমিদার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু নায়েব গোমস্তা, সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান প্রজা অপরদিকে হিন্দু জমিদার ও হিন্দু নায়েব গোমস্তা কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রজা; এই প্রজার উপর হিন্দু জমিদার ও নায়েব গোমস্তার অত্যাচার এখানে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়। আবার দুই জমিদারের মধ্যে উপরে উপরে সম্পর্ক থাকলেও ভিতরে ভিতরে মানসিক ও সামাজিক স্বার্থগত দ্বন্দ্ব পাশাপশি চলতে থাকে। আবার একই জমিদার পরিবারের আন্তঃ জমিদারী সংঘাত, তার কদর্যরূপ হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। দেলদুয়ার জমিদারের বিশেষ সুখ্যাতি ও কৃতিত্ব বহুলাংশে তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্যই বহুলাংশে। স্বতন্ত্র নিবন্ধে তাদের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক প্রশাসনিক জীবন ও কর্ম ব্যাপক গবেষণা ও বিশ্লেষনের দাবী রাখে। তাতে করে একটি জমিদারের ও জমিদারী অঞ্চলের জনসমাজের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে।

দেলদুয়ারের জমিদার পরিবারের অর্থনৈতিক ভূমিকা টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক অর্থনীতির একদশমাংশ ভূমিকা পালন করে এবং বাংলার জাতীয় অর্থনীতিতে এক শতাংশ ভূমিকা পালন করে। দেলদুয়ার থানা ও তার জমিদারী অঞ্চল একই হারে কিংবা কিছুটা কমবেশী হারে টাঙ্গাইল মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে আসছে। খুব কম জমিদারীই সে সময়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় অর্থনীতিতে এরূপ অবদান রাখতে পেরেছে। একই কথা প্রযোজ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। আর রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভূমিকা শেষ পঞ্চাশ দশকে উপরোক্ত পরিসংখ্যানকে ছাড়িয়ে যাবে। যা গবেষণার মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

দেলদুয়ারের জমিদারগণ বাংলার আর্থ-সামাজিক বিকাশ ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করে জমিদার পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছেন। যা জমিদারী উচ্ছেদের পরেও এতদাঞ্চলের জনজীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুদুর প্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। তারা রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শুধু নিজেদের বিকশিতই করেননি, বরং রাজনীতি ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস ধারাই নির্মাণ করে দিয়েছেন। পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীনতা উত্তর পুরো সত্তরের দশকে জোতদার শ্রেণীর অর্থনীতি এবং তাকে কেন্দ্র করে ভূমি ভিত্তিক ধনী কৃষক, বর্গাদার ও ভূমিহীন শ্রেণী সমাজ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্বেরই কুফল। এর জন্য জমিদাররা দায়ী ছিলেন না। সামন্ত পদ্ধতির জমিদারী ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক শাসন নীতি এজন্য দায়ী ছিল।

সামাজিক শ্রেণী কাঠামোতে জমিদারদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস বৃদ্ধির প্রধান মাধ্যম ছিল শিক্ষা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, শিক্ষার উন্নয়ন এবং বৃত্তি ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এর স্বরূপ প্রকাশ পেত। টাঙ্গাইল অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও দান খয়রাতে পার্শ্ববর্তী করটিয়ার জমিদারদের কাছে দেলদুয়ারে জমিদারদের ভূমিকা ম্লান হয়ে যায়। অর্থাৎ এতদাঞ্চলের মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশে দেলদুয়ার জমিদারের ভূমিকা গৌন। ৪৭ এর স্বাধীনতার পূর্বে দেলদুয়ার পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও স্বাধীনতার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত এ পরিবারের আত্মীয়তা সংশ্লিষ্ট পন্নী জমিদার পরিবারের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা বেশী ছিল।

সার্বিক ভাবে এতদাঞ্চলের জনমানসে তথা পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক বিকাশে ঢাকার নবাবদের পরেই দেলদুয়ার-টাঙ্গাইলের নবাব ও জমিদারদের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল । ব্যতিক্রমী ব্যক্তিক ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, ব্যতিক্রমী জমিদারী ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, ব্যতিক্রমী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সত্ত্বেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইউরোপীয় উন্নত চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দর্শন নিজেদের মধ্যে লালন করা সত্ত্বেও তারা বাংলার সামন্তবাদী অনড় কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়নি। সামন্ত গর্ভ থেকে উত্থিত, চলমান ভূমি ও অর্থ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতিরেকে পুঁজিবাদী বিকাশ বা জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেলদুয়ারের জমিদারদের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা এবং জমিদারীর ব্যবস্থাপনার বিশেষত্ব তাই প্রমাণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে আজ প্রয়োজন ঔপনিবেশিক ও সামন্ত মানস থেকে উত্থিত চলমান ভূমিনীতি ও কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির ব্যাপক সংস্কার সাধন এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এর মাধ্যমে পুঁজির বিকাশ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর গঠনমূলক ভূমিকা পালন। কৃষি ও শিল্পে ব্যাপক বিনিয়োগ এবং টেকসই উন্নয়নের জাতীয় উদ্যোগ ও নীতি গ্রহণ। এক্ষেত্রে প্রয়োজন জমিদারি ও সামন্ত মানস থেকে উত্থিত কঠিন পরিশ্রম ছাড়াই অতিদ্রুত বিত্তবান হওয়ার মানসিকতার পরিবর্তন। একটি আর্থ-সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব। অর্থাৎ রাজনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে সমাজকে পরিবর্তন ও জাতিকে টেকসই উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করার পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক. অপ্রকাশিত উৎস

১. অমুদ্রিত সরকারী নথিপত্রঃ ন্যাশনাল আর্কাইভাস, ঢাকায় সংরক্ষিত।

Dhaka Divitional Commissioners Office old Records. (I) Revenue (2) Judicial (3) Court of Word Records, 20,000 (files) (4) Others

District Record of Dhaka (1783-1859): 189 Volume

District Record of Mymensigh (1787-1869): 37-volume

Mymensingh Old District Record of Pargana Survey and Mouza Maps of 1850 and other Records, Vol-2, 3, 5/vand. No 19, 37, 42. Atia Pargana Revenue Survey and others papers. 1848-1852, under 5 Volumes, All sanads etc.

Proceedings from Secretarial Record Room, "A" (Printed copy), "B"/Not printed) land Revenue, Total 81184 proceedings, 34 Items, Total 3, 50, 240 Volumes and Files.

২. মুদ্রিত সরকারী নথিপত্র ঃ ন্যাশনাল আর্কাইভাস, ঢাকায় সংরক্ষিত।

Proceedings from Secretarial Record Room, Land Revenue, Total Vol. 0A-666: 1858-1932

Proceedings, Printed Catagory "A", Important Volumes 473- 666 (1911-1932)

Vol. 482- October 1911, page- 27-98; The Musalman Woqf Validating Bill 1911, letter of Nawab Abdul Zabber to Under Secretary Govt.

Dhaka University Institutional Repository

Vol. 490: Index – B. 68, Budget for the Additional Deputy Collector at Tangail in Mymensingh:

Vol. 491, Report on the Survey and Settlement Operation in Eastern Bengal and Assam for the Year Ending 30th September 1911. Printed at the Eastern and Assam Government Central Press, Dacca, 1912 page-73.

Vol. 496, December 1912 pages- 31-37. 41-42, 49-63, 77-76 Order Kalamge Estate.

Vol.- 492: Allotment for Survey and Settlement, Chargeable to Provincial Renewordering 1912-13. Proceeding-36 to 40, file no-2 L.K., Date of Order 23 rd July page-51-118; Specially 51, 54-117, 127, 129, Vol. 493,

Proceedings no-	file no.	Date	pages
66-71	L.R. 10A/4	1st Aug	83-88 Specially-

83-85, 90-102, 105-108-10

Vol- 494 pages 75-77, 82-86, 94-95, 101- 102, 111-112.

Vol. 495-November 1912 pages 3-64

Vol: 497-Final Report on the Survey and Record or Right of a Group of Estates in the Brahmaputra Diara in the Distrct of Pabna (Including Part of Atia Parganah Under Tangail Sub-Divitions of Mymensingh Collectorate). Pages- 3-18- 19-130, 131-150, 151-205, 209-213, 221-224, 256-259-315-319, 5 Mouzas & 7 Seven Mouzaes-total 12 Mouzes-Deldrapur, Armasuka, Bohalakal, Pakutia, Sambhudia, Parchas Simulia, and Goynalandi, Sura,

Dhaka University Institutional Repository

Katalia, Dhudalia and Singuli (under Estate Mirkutia Digor) bearing Touzis no- 5031, 5032, 10, 16 of Mymensing Collectorate in Pargana Atia.

Six Resumed Estate Char Mirkutia Digor, Char Shusuria Digor, Char Pukuria Digor, Char kawalea Digor, Char Hejudia Digor Kirmat Kawalia bearning Tauzi no 1830, 1829, 1939, 1835, and 1738 of the Pabna Collectorate and some Government Estates.

Vol 474, 497, 498, 499, 500, 503, 509, 512, 513, 532, 535, 548, 549, 553, 560, b 571, 579, 583, 585, 604, 629, 640, 650

Proceeding 'B' Category Vol-OA-472, (1859-1910)

Vol. OA, 1859, January, P, 98, 49, Library Pro-7, p 2-3

Vol. IB-1861 (March-May), Proceedings no. 830, 75

Vol, 05-1860, p-317

Vol. OH, p. 37, 192

Vol. 01. p-9

Vol. ID, pr. 31, 35, p. 38, 43

Vol. 15 p-29, 32, 108, May-Pr. 9, p. 1-23

Vol. IH, June p- 53-59, 97-101, July 19, Sep. 17, Oct, 53

Vol. IR, 1866 Pro. 65, p. 1-32

Vol IT, 1867 Pro. 11, p. 9-10

Vol. 10, June, Pro. 17, p. 10-18 etc.

Vol. IV, Jan-Aug.

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka Divitional Commissioners Office Documents and Important Books of Miscellaneous, 2305 Vol. Books. Including all Government Report, Acts Bills, Proceedings, Circulars and Published Books. (Latest Collection of National Archives)

Nawabs Family Collections- Dhaka Nawabs, Nawab Ali Chowdhury, Vowal Sannasies and Vowal Raj Estate, Mir Mosaraf's Home Collections etc. (Uncomfiled)

Newspaper Clip and Radio Monitoring Reports

Microfilm Collections of Old Newspapers and Rare Important Books in Archives (And D.U. Library)

Old Maps and latest Maps of India, Bangladesh, Districts, and Thana wise.

৩. ব্যক্তিগত নথিপত্র

আব্দুল করিম গজনবী এস্টেটের ওয়াক্ফনামা ও দলিল সংকলন, ১৯৩৬ সালের টাঙ্গাইল সদর রেজিষ্ট্রি অফিসের সীল মোহর স্বাক্ষরিত দলিল দস্তাবেজের অনুলিপি। (দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী, গজনবী বংশের সপ্তদশ পুরুষ বর্তমান মুতওলি খোদাদাদ খান গজনবী বংশের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

দুলাই জমিদারীর শামসুন্নেসা এস্টেটের ওয়াক্ফনামা এবং বিভিন্ন রায়ত স্বত্ব ও লীজ স্বত্বের বিবরণ, ১৯৪৫ সালের পাবনা সদর রেজিষ্ট্রি অফিসের সীল মোহর স্বাক্ষরিত দলিল দস্তাবেজ (দুলাই জমিদারীর প্রধান ধারার বর্তমান প্রজন্ম রওশন জান চৌধুরী ও তদীয় কনিষ্ঠা কন্যা নাজলী চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

সৈয়দ বংশ তালিকাঃ দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী ঃ (দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর প্রধান পুরুষ, সৈয়দ মারহামাত আলী সৌজন্যে প্রাপ্ত)

Dhaka University Institutional Repository

ছবির অ্যালবাম ঃ (সৈয়দ মারহামাত আলী ও খোদাদাদ খান গজনবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

কলকাতা সিটি কলেজ, গজনবী ট্রাষ্টডীড ঃ আব্দুল হালিম গজনবীর কলকাতাস্থ সম্পত্তির ট্রাস্টকৃত দলিল, সিটি কলেজ, কলকাতা, ১৯৪৮।

৪. ইংরেজী ও বাংলা অভিসন্দর্ভ

Dacca: A study in Urban History and Development, Sharifuddin Ahmed, London, 1986.

The Emergance of Muslim Middle class in Bengal: Attitudes and phetoric of Communalism 1920-1947, Mohammad Golam Kibria, University of London, 1990,

The Modern Muslim Political Elite in Bengal, N. Karim, University Of London, 1964.

Rural Indebtedness in Bangladesh 1935-1947, Latifa Khanum, University of Dhaka, 1988

Peasant and Politics in East Bengal, 1920-1947, Tajul Islam Hasmi University of Western Australia, 1986;

Social Ideas and Social Changes in Bengal 1818-1835, A. F. Salahuddin, Leiden 1965, 2nd ed. Calcutta 1976.

Some Aspects of the Social History of the Bengal with Special Reference to the Muslims, 1958-1884, Latifa Akand, University of London. 1980, I.F.B 1982.

বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নবাব পরিবারের অবদান, মোঃ আলমগীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৯.

Dhaka University Institutional Repository

বেগম শাসসুন্নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি, শহিদা পারভীন, আই, বি, এস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬

৫. স্মৃতিকথা ও অন্যান্য রচনা

Memories of Delduar Zamindary, Syad Marhamat Ali, Tangail, 1961 (Unpubished)

'দুঃখ তরঙ্গিনী' ও 'মানস বিকাশ' গ্রন্থ এবং সাবের বংশের জনৈক কন্যা, শীর্ষক কবিতার আংশিক সংকলন, বেগম করিমুন্নেসা খানম, কলকাতা।

তথ্যসূত্রঃ লুকানো রত্ন, বেগম বোকেয়া, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী ১৯৭৩; ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী; মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী; বেগম পত্রিকা, নুরনাহার সম্পাদিত এবং জমিদার পরিবারের বংশধর খোদাদাদ খান গজনবী।

দি ওয়ার্কিং অব দি ডায়ার্কিকাল সিসটেম ইন বেঙ্গল, পিল গ্রিম ট্রাফিক টু হেজাজ এন্ড প্যালেষ্টাইন, মুসলিম এডুকেশন ইন বেঙ্গল, আবদুল করিম গজনবী, রচনাকাল ১৯১৫-১৯৩৮, কলকাতা,

মীর মশাররফ হোসেনের ডায়েরী ও অপ্রকাশিত রচনা, মীরের বাড়ী থেকে সম্প্রতি উদ্ধারকৃত এবং ন্যাশনাল আর্কাইভাস, ঢাকায় সংরক্ষিত।

ঢাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকার নওয়াব পরিবারের ভূমিকা, সুফিয়া আহমেদ, নভেম্বর ১৯৮৯, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ (অপ্রকাশিত)

Dhaka University Institutional Repository

খ. প্রকাশিত উৎস

৬. সরকারী রিপোর্ট ও প্রকাশনা

Adams Report of Vernacular Education in Bengal and Bihar 1835, W. Adam, Calcutta, 1868.

Annual General Report, Dacca Divition 1880/ 1881, 12 July 1881.

A Report of Indian Education Commission, Hunter, W.W, Calcutta Govt, Press 1883.

Annual Report to the Board of Revenue, Date 1.1.1976, F.L. Gross National Archives.

Bengal Board of Economic Enquiory Report 1935, Suppliment of the Calcutta Gazette, 24 January 1935, National Archives.

Bengal Administration Report 1911-12, Historical Summary, Calcutta,

Bengal Legislative Council Proceeding Official Reports, Bengal Govt, Calcutta.

Bengal Tenancy Act, 1885, Calcutta, Book No- 136, 155 National Archives Collection from Dhaka Divisional Commissioner Office Documents and Important Books of Miscellaneous, 2305 Vol. of Books.

Bengal Tenancy Act, E.P. Government Act of 1885 and upto 1963. National Archives

District Census Report of 1872, 1881, 1891, 1901, 1921, National Archives.

District Census Report of Tangail, 1974, 1981, 1991, Dhaka University, Library.

District Rev. Reports, The Revenue Reports of Mymensingh 1872-73, Dhaka University Library.

Different Reports, Proceedings, Bills, Parliamentary Papers etc. in National Archives and Rare Section in Dhaka University Library.

Eastern Bengal And Assam Govt. Report of the Administration of Eastern Bengal and Assam 1910-11, Dacca.

Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Mymensingh, 1908-1919, F.A. Sachse, Bengal Secretariat Book Depo. 1920.

Final S.A. Report of Tangail, Mymensingh 1955-61, Bengal Dist. 1963, Dhaka.

Final R.S Report of Tangail, Dhaka 1987.

General Administration Report 1881-82, Land Revenue Proceedings, National Archives, Dhaka.

Historial Introduction to the Bengal Portion al the Fifth Report, 1812 Vol. 1, II, W.K. Firminger, Neeraj Publishing House, Delhi, 1962.

Land Settlement Report 1956, Dhaka. National Archives and Dhaka University Library.

List of Settlement Village in the Survey of 1958-62, Tangail Subdivision, Dhaka 1963, Dhaka University Library.

Report of the Indian Education Commission, W.W. Hunter, Calcutta 1883.

Dhaka University Institutional Repository

Resolution of the Government General in Council, 29 April, 1859, Bengal Government proceedings, National Archives, Dhaka.

Report on the History and Statistics of the District of Mymensingh 1863-1867, H.J Rynald, Calcutta. 1869.

Report on the Administration of Eastern Bangal and Assam 1905- 1912 Shilong, Bengal Secretariates, National Archives, Dhaka.

Report of the Land Revenue Administration in Bengal 1930-31, Calcutta.

Report of the Indian Industrial Commission 1916-18 (Perliamentary paper xv ii of 1919).

Resolution of all Bengal Land Holders Conference, 13 August 1933, Government of Bengal, Archives B: Procedings, Bundle No. 1. July 1936 No. 2-3.

Report of the Committee Appointed by the Government of Bengal to Consider Ouestions Connected with Muhammadan Education, Calcutta 1915.

Reports on the State of Education in Bengal 1835 and 1848 (ed. by Anath Nath Basu) Calcutta 1941.

Report of Disterbances Submitted by Magistrate of Mymensingh to the Commissioner, Date 5, 9,1833, O.D.R National Archaives.

Report on the Cultivation of Jute in Bengal, H.C. Karr, Calcutta 1873.

Report on the Administration of the Registration Department in Bengal 1860-70. Calcutta 1871.

Report of the Land Revenue Commission 1940, Bengal (Alipore: Bengal Government Press), Calcutta.

Dhaka University Institutional Repository

Report of the land Revenue Commission Govt. of East Pakistan, 1959.

Report on the Administration of Bengal, 1885-86, Calcutta, 1887.

Report of the Indigo Commission, Calcutta, 1860.

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থা মূল্যায়ন কমিটি রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৮৯.

Report on Islamic Education and Madrasha Education in Bengal (1861-1977), Education Report Vol. II.III, Sekander Ali Ibrahimi, Islamic Foundation, Dhaka, 1985, 1987.

Report on the Census of Bengal 1872, Calcutta, 1872, Beverly H. Calcutta 1876.

Report on the Census of Bengal 1881, J.A. Bourdillion, Calcutta, 1883.

Report on the Census of India, 1891, Vol. V, Lower Provinces of Bengal and their Feudateries, Donnel C. J. O. Calcutta, 1893,

Report on the Census of India, 1901, Vol-VI, Bengal. by E. A. Gait, 1903

Proceedings of the Bengal Legistative Council, August 26, 1924.

Statistical Accounts of Bengal (1875-77) Vol. V. Dhaka, Mymensingh, W.W. Hunter, Calcutta, 2nd Edition New Delhi, Dhaka University Library.

State Acquisition and Record Report of Tangail Subdivitons, East Pakistan Government 1950, National Archives and D.U. Library.

The Second Five-year Plan 1960-65, Govt. of Pakistan, Planning Commission 1961, Karachi.

The East Bengal State Acquisition and Tenancy Act 1950, Dacca: East Bengal Government Press 1951.

Dhaka University Institutional Repository

The Revenue Reports of Rangpur 1872-73, Notes on the Old Revenue Serveys of Bengal, Bihar, Osissa and Assam by Captain F.C. Herst i.A, Serector of Serveys Bengaland Assam, Calcuta Thacker Spink & Co. 1912.

The Bengal Administration Report of 1872-73, Hailing Bery, Calcutta.

Third Report on the State of Education in Bengal, 1838, W. Adam. Calcutta.

৭. গেজেট ও সংবাদপত্র

Bengali Gazetta, 22 Dec. 1864, Calcutta.

Bengal District Gazetters, Vol. A-1901, Vol B-19/15/921 F. A . Sachse.

Bengal Post 1885 Vol.1, 2 and 1909, Calcutta.

Bangladesh District Gazetters, Tongail District 1983, Major. M. A. Latif.

Imperial Gazzetters W.W. Hunter, 1881 Vol. IX. Mymensingh District, D.U. Library.

Star of India, 27 February, 2 March 1937, Calcutta.

The Amrita Bazar Patrika, 27 February 1937, Calcutta.

আখবারে ইসলামিয়া, টাঙ্গাইল, ১৮৯২, এপ্রিল সংখ্যা (১ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা) 'কি ভিষন সংবাদ' শিরোনাম।

আজাদ, কলকাতা, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭, ২৫ জুলাই ১৯৩৯

আহমদী, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৯২, নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা।

ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা ১৮৬৩-১৯২১ (ঢাঃ বিঃ গ্রন্থাগার), ৯ জানুঃ ১৮৮১, ১০ সেঃ ১৯০৩, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০২, ৩০ আগষ্ট ১৮৯৬ ৫৩.২ ডিসেম্বর ১৮৮০, ১৩ জানুয়ারী ১৮৮৭, ১২

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর ১৮৯১, ১৮৯৩, জানু-১৮৯৪ ১৯০৪, মার্চ ১৯১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯১৩, জুন ১৯১৪ আগষ্ট ১৯২৪.

দৈনিক আজাদ, ঢাকা - মার্চ এপ্রিল মে, জুন ১৯৫৬, ২২মার্চ প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনী গেজেটে প্রকাশিত। ৮ই এপ্রিল, ১২ ই এপ্রিল, ১৬ এপ্রিল, ২৯ এপ্রিল।

মোসলেম ক্রনিকল, কলকাতা

ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৮৩, নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা।

মিহির ও সুধাকর

সওগাত, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৭০ বাং

৮. ইংরেজিতে প্রকাশিত গ্রন্থ

Anisuzzaman : Factory Correspondence and Other Bengali Documents in India Office Library and Records, London 1981.

A. Aspinal : Cornwalis in Bengal, Manchester 1931.

A. Mazed Khan : The Transition in Bengal 1956-1775: A study of Sayed Muhammad Reza khan, Cambridge, 1963,

Abdus Salam (tr.) : The Riaz-us-Salatin by Gulam Hossain Selim, Baptist Mission press, Calcutta, 1904.

Ascoli F.D : Final Report of the Survey and Settlement Operation in the District of Dhaka, Calcutta 1917.

Abul Fazal : Akbar Nama, tr. H. Beveredge, Delhi, 1977.

: Ain -I- Akbari vol-1, tr. Blochmann, Vol-11, tr. Jarrett Calcutta, 1949.

A. F. S. Ahmed : Bangladesh: Tradition and Transformation, Dhaka 1987.

A.B.M. Mahmud : Revenue Administration of Northern Bengal, Dhaka.

A. j. Shamsuddin : Sociology of Bengal Politics and Other Essays, Dhaka 1973.

A.C. Ray : The Carerer of Mirjafar Khan, 1757-1765, Calcutta-1953.

A.C. Banerjee : Indian Constitutional Document, Calcutta 1945.

A.C. Compbell : Glimpses of Bengal, Calcutta, 1907

Adam Smith : An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, London 1819.

A.R. Khan : The Economics of Bangladesh, London 1972.

A.R.Mallik : British Policy and Muslim of Bengal (1757-1856), London, Dhaka Reprint 1977.

Abdul Karim : Murshid Quli Khan and His Times, Dhaka, 1963.

: Decca the Mughal Capital, Dhaka 1964.

: Social History of the Muslims of Bengal, 2nd

Dhaka University Institutional Repository

Edition, Chittagong-1985.

Akbar Ali Khan : Discovery of Bangladesh, Dhaka, 1997.

: Some Aspects of Peasant Behavinour in Bengal 1890-1914: A New Classical Study, Asiatic Society of Bangladesh, 1982.

A.M.A. Muhit : Bangladesh: Emergence of a Nation, Dhaka-1978.

A.K. Nazmul Karim : The Dynamics of Bangladesh Society, Dhaka 1980.

Akhlaqur Rahman : Partition, Integratoin, Economic Growth and Interregional Trade, Karachi, 1963

A.K. Bagchi : Private Investment in India 1900-1939, Delhi 1969, Asiatic Society of Pakistan Publication No. 14, Calcutta Zamindary 1698-1557, 24 Porgana Zamindary 1958-1772, Appendix A Revenue Admin, B. Talukdary, C. the Institution of the Qanungo.

A. Sen : Agrarian Structure and Tenancy Laws in Bengal, 1550- 1900 in Perspectives, Calcutta.

Arnold Toynbee : A Study of History, Alendred, London 1950.

A. Tripthi : Trade and Finance of Bengal Presidency 1793-1833, Calcutta 1956.

Dhaka University Institutional Repository

A.Z.M.IftekharulAwal : The Industrial Development of Bengal 1900-1939, Dhaka- 1983.

Bazlur Rahman Khan : Politics in Bengal 1927-1936, Dhaka 1987

Blair B. Kling : The Blue Munity: The Indigo Distrrabes in Bangla 1859-1862, Philadelphia, 1966, Calcutta, 1977.

: Economics Foundation of Bengal Renaissance in Aspects of Bengali History and Society ed. R.V. M Baurnier Delhi, 1976.

B.B. Misra : The Central Administration of the East India Company 1773-1834, Manchester, 1959.

The Indian Middle Classes in Modern Times, Oxford University Press, London.

Broom field J.H. : Elite Conflict in a Plural Society of Bengal (1912-1947), Berkeley,London 1968.

:Mostly About Bengal Essays in Modern South Asian History, John, Delhi, Manohr Pub.1982, XVI, 256.

Brijen K. Gupta : Sirajuaddaulah and the East India Company 1756-57, Leiden, 1962.

Dhaka University Institutional Repository

Benoy K. Chowdhury	: Agrarian Economy and Agrarian Relation in Bengal 1859-1885, Calcutta.
C. Prasad Sarkar	: The Bengal Muslims (1912-1929): A Study of their Politicization, New Delhi, 1991
Chittabrat Palit	: Tentions in Rural Society of Bengal: Land lords, Planters and Clonial Rule-1830-1860, Calcutta 1975, : Civil Disterbances During the British Rule in India (1765-1785), Calcutta.
C.H. Philips (ed)	: The Evaluation of India and Pakistan 1858-1947: Select Documents, London 1962.
D.B. Mitra	: The Catton Weabers of Bengal, Calcutta 1979,
D.N. Banerjee	: East Pakistan, A Case Study, Delhi, 1969.
D. Koaf and Joarder ed	: Reflections on the Bengal Renaissance, Rajshahi 1977.
D.D. Kosambi	: An Introduction to the Study of Indian History, Bombay, 1956.
	: The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline, A.S.B, Dhaka, 1973.
D.H. Buchanan	: The Development of Capitalistic Enterprise in India, London, 1966.
Enayetur Rahim	: Provincial Autonomy in Bengal, Rajshahi 1981.

Dhaka University Institutional Repository

Ex. Civilian : life in the Mofassil of the Civilian in Lower Bengal, London and Description on Mymensingh.

General Wallastan (ed) : Knight Bachelors 1938-1939. Nineteenth Edition, London, 1939.

: Analysis of the Finances of Bengal, 1791 Calcutta (in Fifth Report).

G.N. Gupta : A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-08, Shillong-1908.

Gulam Hossain Tabatabai : Sier-Al-Mutaakkherin, tr Hazi Mustafa, Calcutta, 1902.

Hamilton, walter : A Geographical, Statistical and Historical Description of Hindostan and the Adjacent Country, 2 Vol. London-1820.

Hossainur Rahman : Hindu Muslim Relations in Bengal 1905-1947, Nachiketa Publications ltd. Bomby, 1974

Humaira Momem : Muslim Politics in Bengal: A Study of Krishak Proja Party and the Election of 1937, Dhaka 1972.

Harun-or-Rashid : The foreshadowing of Bangaldesh: Bengal Muslim Leaque and Muslim Politics 1936-1947, Dhaka 1987.

Henry Vansittart : A Narrative of the Transaction in Bengal from 1760 to 1764, London 1766.

Humayun Kabir : Muslim Politics 1906-1947 and Other Essays, Calcutta, 1969.

Irfan Habib : The Zamindlars in the Ain, Delhi 1958.

: Agrarian System of Mughal India, New York, 1963.

I. H. Quraishi : The Muslim Community of India-Pakistan Subcontinent, the Hague, 1962.

: The Administration of Mughal Empire, Pabna 1979.

J.N. Sarkar : The History of Bengal Vol. Dhaka University, 1972.

: Bengal Nowabs, Calcutta, 1952.

: Mughal Administration, 2nd Edition, Calcutta 1963.

Jamini Mohan Gosh : Sannyasi and Fakiri Raiders in Bengal, Calcutta 1930.

James Waise : Notes on the Races, Castes, and Trade of Eastern Bengal, London 1883.

James Grant : An Inquiry into the Zamindary Tenant in the Landed Property of Bengal 1791.

J.D. Currninghum : A History of the Shaiekhs, Calcutta 1903.

Dhaka University Institutional Repository

J.H. Harington : An Analysis of the Laws and Regulation Enacted by the Governor General in Council at Fort William in Bengal, London 1821.

Khalid B. Sayeed : Pakistan: The Formative Phase, 1857-1948, Karachi; Oxford University Press, 1968.

Kamruddin Ahmed : A Political History of Bengal, Dacca 1970.

: The Social History of East Pakistan, Dacca, Crescent Bank Centre, 1967.

Karl Marx : The Future Result of British Rule in India in Karl Marx and Frederick, English Selected Works, Mdsqow, 1962.

K.K. Sengupta : Pabna Disturbances and the Politics of Rent 1873-1885, New Delhi 1974.

Khondakar Fajli Rubbee : The Origin of Muslim in Bengal, Calcutta, 1895.

K.M. Mohsin : A Bengal District in Transition, Murshidabad 1965-1793, Dhaka, 1973.

K.N. Chawdhury : The Economic Development of India under the East India Company 1813-58, Cambridge 1971.

Kamal Siddique : The Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh, Dhaka, 1987.

: Land Reforms and Land Management in Bangladesh and West Bengal: A Comparative Study, Dhaka- 1988.

Latifa Akand : Social History of Bengal, 1854-1884, Islamic Foundation, Dhaka 1980.

Lokenath Ghosh : The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc. Part II, Calcutta, 1879.

M. Azizul Haque : History and Problems of Moslem Education in Bengal. Calcutta, 1917.

M. Gulam Kabir : Minority Politics in Bangladesh, Delhi, 1980.

M. Mohar Ali : History of the Muslims of Bengal, Riyadh 1985.

M.M. Islam : Bengal Agricultural 1920-1946, Cambridge, 1978.

Muin Uddin Ahmed Khan: History of the Faraidi Movement, Karachi, 1956.

Maudud Ahmed : Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy, Dhaka, UPL, 1991.

Moreland W.H. : Agrarian System of Muslem India, Cambridge, 1929.

: Agranican System in Modern India, Allahabad 1929.

M.A. Rahim : Social and Cultural History of Bengal, Karachi, 1961 Vol I & II.

: The History of Afghans in India, Karachi, 1961.

: Muslim Society and Politics in Bengal (1757-1947) D. U 1978.

M. Hoque : East India Companies Land Policy and Commerce in Bengal (1698 -1784) Dhaka, 1964.

Mustaq Ahmed : Politics without Social Change, Karachi 1971.

M.N. Das : India Under Morely and Mintoo: Politics Behind Revolution, Repressin and Reforms, London, 1964.

M.T. Titu : Islam in India and Pakistan, London, 1960.

Nazma Chowdhury : The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functionong of the East Bengal Legislature, 1947-58, Dhaka University, 1980.

Narhari kabiraz : A peasant Uprising in Bengal, 1783.

Nirad C. Chowdhury : Autobiography of an Unknown Indian, London, 1951.

Nilmant Mukherjee : Bengal Zamindar, Joy Kisna Mukharjee and his time (1808-1888), Calcutta.

Naresh Kumar Zain ed. : Muslim in India "A" Biographical Dictionary, List of the Zamindar in Bengal, Calcutta, 1936, 37, 38; Delhi 1976.

N.K. Sinha : The History of Bengal 1575- 1905, Calcutta.

Dhaka University Institutional Repository

	: Economics History of Bengal 1773-1848, Calcutta, 1958.
Nafis Ahmed	: An Economic Geography of East Pakistan, London 1958, Calcutta.
Pakistan Historical Society	: A History of the Freedom Movement, Karachi 1961.
P.C. Joshi	: Land Reform and Agrarion Change in India and Pakistan since 1947, Delhi 1970.
P.C. Roy	: The Rent Question, Calcutta 1881.
Pitter Hardy	: The Muslims of British India, Cambridge, 1972.
P. Saran	: The Provencial Government of the Mughals, 1526-1658, Allahabad 1951, 2nd ed. Bomby 1973.
P. Sinha	: Nintheenth Century General Aspects of Social History, Calcutta, 1965.
Taylor, James	: Bhawal Sannyasi Case, 1930.
Rafiuddin Ahmed	: The Bengal Muslims (1871-1906), A Quest for Identity, Delhi, 1981.
Rajat Kanty Ray	: Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875-1972, Delhi 1984.
R. Guha	: A Rule of Property for Bengal, An Essay on the Idea of Permanent Settlement.

Dhaka University Institutional Repository

Ram Gopal : Indian Muslims, A Political History (1858-1947), Asia Publishing House, Calcutta, 1964.

Rokeya R. Kabeer : Administrative Policy of the Government of Bengal, 1870-90, Dhaka, 1965.

Ratnalekha Ray : Change in Bengal Agrarian Society 1760-1850, New Delhi- 1979.

R.H. Hallingbury : The Zamindary Settlement in Bengal 2.vol, London, 1868, 1887.

Radha K. Mukherjee : The Changing Face of Bengal: A Study in Reverine Economy, Calcutta, 1938.

R. Muir : The Making of British India (1756-1858), London 1915, Pakistan, Reprint 1969.

Robert Orme : History of the Military Transaction of the British Nation in Hindostan, London, 1808.

R. Patone Dutt : Problem of Contemporary History, London, 1963.

R.S. Sharma : The Religious Policy of the Mughal Emperors, Lahore, 1977.

Sarmila Benerjee : Studies in Adminisrative History of Bengal (1880-1898), New Delhi, 1978.

S.C. Roy : Permanent Settelment in Bengal, Calcutta, 1915.

S.C. Hill : Bengal in 1956-57: Lows Memoier, London, 1905.

Sirajul islam : Bangaldesh District Records: Dacca District 1784-1787, Dhaka 1981.

: Rural History of Bangladesh, A Source Study, Dhaka 1977.

: Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Mode of Operation, Bangla Academy 1979.

: History of Bengal (ed) 3 vol. ASB. 2nd ed. 2000.

: Rent and Raiyat, Society and Economy of Eastern Bengal 1859-1928, Dhaka 1989.

: Bengal Land Tenure: The Origin and Growth of Intermadiate Interests, the 19th Century, Clacutta 1988.

Sarif. U. Ahmed (ed) : Dhaka: Past, Present, Future, Dhaka 1991.

Sinha. N : Freedom Movement in Bengal 1818- 1904, 1905 Calcutta.

Sah Mohammad (ed) : The Indian Muslims: A Documentary Records 1900-1947, Delhi, 1985.

S.A.Q. Hussaini : The Administration Under the Mughals, Dhaka 1952.

Shirin Akhter : The Role of the Zamindars of Bengal 1707-1772, Asiatic Society & Bangladesh, Dhaka 1982.

Dhaka University Institutional Repository

Sila Sen : Muslim Politics in Bengal (1937-1947), New Delhi, 1976.

Syad Raziwaste : Lord Minto and the Indian Nationlist Movement, 1905-1910, London, 1964.

S.K. Sen : Studies in Economic Policy and Development of India 1848-1926, Calcutta, 1966.

Sufia Ahmed : Muslim Community in Bengal (1884-1912), OUP, London, Dhaka 1974.

Sugata Bose : Agrarian Bengal, Economy Social Structure and Politics 1920-47,London 1986.

Susil Chowdhury : Trade and Commercial Organizatins in Bengal 1650-1720 with Special References to the English East Indain Company, Calcutta, 1975.

Sumit Sarkar : The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908, New Delhi 1973.

S. Nurul Hasan : Thoughts on Agrarian Relations in Mughal India, Delhi, 1973.

S.N. Banerjee : A Nation in the Making, Calcutta, 1925.

Sir Stantly Red (ed) : The Indian yearbook, Whos who, Indian Princes, Chiefs and Nobels. Twenty-three year of Issue, Vol. XXIII 1936-37, Calcutta 1938.

Sushobhon Sarkar : Bengal Renaissance and Other Essays, New Delhi, 1970.

Dhaka University Institutional Repository

Tapan Ray Chowdhury	: Bengal under Akbar and Jahangir, Calcatta, 1953.
S.M. Jamil	: The Muslim YearBook of India and who's who (1948-49), Bombay 1948.
S. Gopal	: British Policy in India 1858-1905, Cambridge, 1965.
S.A. Ibrahimi	: Compiled Reports on Islamic Education and Madrasha Educaton, Vol 1-V, Islamic Foundation, Dhaka, 1985, 1987.
Thomas Law	: A Sketch of Some Late Arrangements and a View of the Rising Resource in Bengal, London 1792.
Tripta Verma	: Farkhanas Under the Mughals From Akber to Aurangazeb: A Study in Economic Development, Calcutta.
T. D. Bannerji (Comp.)	: The Zemindars and the Ryat in Bengal, Calcutta, 1883.
Themas G.	: Revenue Resources of the Mughal Empire in India, London 1871.
W.K. Firminger	: Historical Introduction to the Bengal Porsition of the 'Fifth Report', Calcutta, 1917, 2nd ed. Indian Studies, Delhi 1962.

Dhaka University Institutional Repository

W.W. Hunter : Statistical Account of Bengal Vol. V. London, 1876 Reprinted to India by D.K. Publishing House, New Delhi, 1974.

: Analys of Rural Bengal, Readings in Indian History.

: Imperial Gazzetter of India, Famin Aspects of Bengal Distreets.

: History of Indian Peoples, 1903, 21st ed. New Delhi.

: A History of British India, Vol 1,2 Newyork, AMS Press, 1966.

: Imperial Gazzette of India-Vol. I, II, III, (26 Vol. 1810-1909).

: The Indian Empire its Peoples History and Product, New York, AMS 1966.

: The Indian Musalmans Hed, Dhaka 1975.

: The Marquess of Dalhousie and the Final Development of the Company Rules, S. Chand & Co. 1961.

: Bengal M.S. Records: A Selected list of 14136 Letters in the Board of Revenue 1782-1807.

Vol-I, 1765-1782-1793 etc.

Vol-III- 1798-1801.

Vol-IV-1802-1807.

Dhaka University Institutional Repository

Index to Volume-I, II, III, IV.

Volume-I: 1782

R.N.I., Revenue & Expenditure p. 99, Revenue Figure p-106, 136,

January 1782:

R.N.4 Petition from Zamindars of Mymensingh and Alapsing Jan-30;

R.N. 177, Petitions from Zamindary Mymensingh, July;

R.N. 224, Petions from Dhaka Sept. 25

R.N. 23o Petitions Mymensingh Zamindary.

R.N. 243 Circular Octo-24. 244-297 Circular, Chief of Dacca Oct-July;

R.N. 254 Zamindar of Vowal. Oct 31.

R.N. 256 Zamindar of Mymensingh Oct 3.

262 Village head of Mymensingh Nov. 25

173: R.N. 311 Chief of Dacca Jafarsahi January 13;

R.N. 367 Chief of Dacca March 24; R.N. 395,. 96 Head & Zamindar of Mymensingh March 27;

R.N. 484 Solbaris Pargana March 17 528 Cheif Collectro to all Zamindar Oct. 6

Dhaka University Institutional Repository

A.D. 1784- R.N. 619, 631, 687;

1785-R.N. 884, 885, 889, 895, 921, 922;

1786-R.N. 1151;

1787-R.N. 1342;

1788-R.N. 1377, 1378, 1392, 1409, 1442,

1789-R.N. 1470, 1490, 1509, 1559;

1790- R.N. 1586, 1578, 1639, 1651, 1676, 1701, 1708, 1729, 1730,

1731, 1732, 1785, 1800, 1803, 1832, 2165, 2175, 2176;

1792-R.N. 2422, 2422, 2542;

1793-R.N. 2568, 3044, 3146, 3247, 3248, 3249;

Vol. II: 1794-1797;

1794-R.N. 3335, 3336, 3385, 3430, 3493, 3511, 3531, 4018, 4032;

1795-R.N. 4578, 4580, 4582, 5291-93;

1796-R.N.5471-73, 5618, 6596;

Yusuf Hussain (ed) : Selected Documents from the Aligrh Archives, Asia Publishing House, Calcutta, 1967.

৯. ইংরেজি জার্নালে ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ

A : The Bengal Zamindars and Ryots, The Bengal Magazine, 1783 Vol. 2.

Abdul Hai Dhali : Triends in Muslim Social Thought in Early Twenteenth Century Bengal, Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

Historical Studies, Journal of the Bangladesh History Aoʂociation, Vol. XII-XIV, 1989-90, p-1-12.

Bazler R. Khan : Muslim Business Community and Politics in Bengal, 1920-1940, B.H.A. Vol. V-Vi 1980-81, P-1-12.

B.H. Boden-Powell : "Origin of the Zamindari Estates in Bengal" Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. XXXII. 1987.

Faruq. U. Khan : A Tripical Coloni·:al Zamindar House, নিবন্ধমালা, উচ্চতর মানবিক বিদ্যা, গবেষনা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬ জুন ১৯৯১।

Irban Habib : The Zamindars in the Ain, Indian History Congress, 1958.

N. H. Chowdhury : Pabna Pesant Movement of 1873: A Reintepretation, Bangladesh Historical Studies, Bangaldesh History Association, Vol. XVII, 1996-98, p-34-57.

HamzaAlavi : India and the Colonial Mode of Production, R. Meliband and J. Savilk (eds), the Sociallist Register 1975, London 1975.

Partha Chatterjee : " Bengal Politics and the Muslims Masses 1920-1947", The journal of Commonwealth and Comparative Politics, XX:1, 1982.

S. Nural Hasan : " Zamindars Under the Mughals" in Fry, Ken beng (ed), Land Contral and Social Structure in Indian History, New Delhi. 1979.

Sonia Nishat Amin : " Rokeya Sakhawat Hossain and the Legacy of the Bengal Rnaissance" Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka- 1988.

Sakhar Banddopadhy : Caste, Class and Census: Aspects of Social Mobelity Under British in the Late Ninetenth and Early Twentienth Century Bengal, 1882-1932 Centre for Southeast Asian Studies, University of Calcutta.

Sirajul Islam : "Life in Mafassal Towns", The City in South Asia Edited by Ballhatchet and Hassisan. Bangladesh History Association, Dhaka University.

S. Nurul Hassan : The Position of the Zamindars in the Mughal Empire, Indian Economic and Social History Review-1.

H. Hosten : The Twelve Bhuyans or Lords of Bengal, Journal Asiatic Society of Bengal, 1913, Imperial Gazettors of India, Bengal II, Calcutta 1909.

J. Wise : On the Barabhuyans of Eastern Bengal, Journal Asiatic Society of Bengal, 1974.

Moreland W.H. : The Pargana Headman (Chowdhury) in the Moughul Empire, Journal of the Royal Asiatic Society, 1938.

১০. ভ্রমন বৃত্তান্ত, মানচিত্র ও নির্দেশিকা

Bernier, Frencois : Travles in the Mughal Empire 1956-68, Translated by Iving Brock and Revised by V.A. Smith, Oxford, 1914 Reprint Delhi, 1968.

J.B. Tavernier : Travels in India (Balls Edition), London 1889.

Martin R.M : The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, London 1838.

National Archives Collections : Old maps of Mymensingh District, Vol, 9,16, 40 etc.

: Rennel's Survey Maps (1764-1772).

: Thakbast Survey Maps (1825-34)

: Revenue Survey Maps (1847-63).

: Cadastral Survey and Settlement Maps (1880-1940).

: State Equiziation Survey and Settlement Maps (1956-61).

: Revitonal Survey and Settlement Map's (1965-1988), National Archives, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

Rennell : Description of the Roads in Bengal and Bihar, London, 1778.

: A Bengal Atlas, London, 1782.

: Memors of the Maps of Hindustan, 1788.

Sebastian Manrique : Travels of Fray 1629-49, Translted by Eckford Luard, Oxford 1927.

Irfan Habib : An Atlas of Mughal Empire, Delhi 1982.

Taylor, James : A Sketch of the Toporgraphy and Statistic of Dacca, Calcutta 1840.

Thomas Bowry : A Geographical Accounts of Country Round the Bay of Bengal 1669, 1679, Cambridge, 1905.

১১. বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও পুস্তিকা

অতুল চন্দ্র গুপ্ত ঃ ইতিহাসের মুক্তি, কলকাতা, বিশ্ব ভারতী ১৯৫৭।

ঃ শিক্ষা ও সভ্যতা, কলকাতা, ১৯২৭।

অতুল সুর ঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাস, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬ইং।

ঃ বাংলা মুদ্রনের দুশো বছর, কলকাতা ১৩৮৫ বাং।

অতুল চন্দ্র রায় ঃ কলকাতা ৩০০ বছরের পটভূমি ও ইতিহাস, কলকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য, ১৯৮৮।

অজয় রায় ঃ বাংলা ও বাঙালী, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

ঃ বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

	ঃ আমাদের জাতীয় বিকাশের ধারাঃ জাতীয়তাবাদ ও জাতিসত্ত্বা বিকাশের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ১৯৯১।
	ঃ আমাদের জাতীয় বিকাশের ধারা, মুক্ত ধারা ১৯৮১।
অজিত কুমার রায়	ঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৬ ৬ষ্ঠ সংস্করণ।
অশোক কুমার মিত্র	ঃ বাংলা প্রহসনের ইতিহাস ১৭৯৫- ১৯৮৮, কলকাতা।
আকবার উদ্দীন (অনুবাদ)	ঃ বাংলার ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৮ মূল (ফার্সি) রিয়াজুস সালাতীন, ইংরেজি অনুবাদ আবদুস সালাম, কলকাতা ১৯০৪।
আবদুল মান্নান, কাজী	ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৯।
	ঃ মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ম-৫ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৬।
আবদুল কাদির সম্পাদিত	ঃ রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৭৩।
	ঃ মাশহাদী রচনাবলী, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৭০।
	ঃ ইব্রাহিম খাঁ রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
আ.ক.ম, জাকারিয়া	ঃ কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, জেলা পরিষদ কুমিল্লা, ১৯৮৪।
আবুল মনসুর আহমেদ	ঃ আত্মকথা, ঢাকা, ১৯৭৮।
	ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ২য় সংস্করণ ১৯৭৫ ৩য় সংস্করণ ১৯৭৬।
আবদুল করিম	ঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) ২য় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।
	ঃ বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল) ১৫৭৬-১৬২৭, ১ম খন্ড রাজশাহী, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

ঃ বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৭৫৭), বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।

ঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাস (১৭০৪-১৭৫৭), ঢাকা।

আবদুল করিম খান মোক্তার ঃ তরফ গৌরাঙ্গীর ইতিহাস, টাঙ্গাইল, ১৩২৯, বাংলা।

আবু জাফর শামসুদ্দিন ঃ মুসলিম বাংলা আমার যুগে, ১৯৬৮ মূল আব্দুল লতিফ, নওয়াব।

আবদুল্লাহ ফারুক ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ১৯৭৪ইং বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩।

আবু মুহামেদ হাবিবুল্লাহ ঃ সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রুপান্তর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯

ঃ দি ইন্ডিয়ান মুসলমান (অনুবাদ) বাংলা একাডেমী ১৯৬৪।

আতিউর রহমান ও লেলিন আজাদ ঃ অর্থনেতিক পটভূমি, ঢাকা ১৯৮৬।

আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯।

ঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৪।

আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত ঃ লোক সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৩।

এম, আনিসুজ্জামান ঃ পল্লী বাংলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ মূল ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার।

ঃ বাংলার লোক সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

এস এম আকাশ ঃ দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫ মূল (ইংরেজী), ডব্লিউ ডব্লিউ, হান্টার।

এম, দেলওয়ার হোসেন ঃ ইতিহাস তত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

এস, কে, রায় চৌধুরী ✓ ঃ ময়মনসিংহের বরেন্দ্র, ব্রাক্ষন, জমিদার, ২য় খন্ড, কলকাতা, ১৯১১।

ওসমান গনি ঃ বাংলার কৃষক, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২ মুল (ইংরেজী) এম, এ, হক।

ঃ পল্লী বাংলার ইতিহাস (মূল ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার), ঢাকা, ১৯৬৯।

ওয়াকিল আহমেদ ঃ উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা ১ম ও ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩।

ঃ বাংলার লোক সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫।

ঃ সম্পাদিত বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, রজত জয়ন্তী, ১৯৯৩, ১৯৯৬।

ঃ বাঙালীর চিন্তাধারা আধুনিক যুগ, উ, স, বি গবেষনা কেন্দ্র, ঢাঃ বি, ১৯৯০।

কামরুদ্দীন আহমেদ ঃ বাংলার মধ্যবিত্তের আত্ম বিকাশ, ১ম ও ২য় খন্ড ঢাকা, ১৯৭৯।

কাজী মোহাম্মদ মিছের ঃ পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা, ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৯৭৬।

ঃ রাজশাহীর ইতিহাস, কাজী প্রকাশনী, বগুড়া।

কেদার নাথ মজুমদার ঃ ময়মনসিংহের ইতিহাস, কোলকাতা, ১৯০৬।

ঃ ময়মনসিংহের বিবরণ, কোলকাতা, ১৯০৪।

ঃ ঢাকার বিবরণ, কলকাতা, ১৯১০।

খন্দকার আবদুর রহিম ঃ টাঙ্গাইলের ইতিহাস, টাঙ্গাইল, ১৯৭৭, ১৯৮১, ১৯৮৬ইং।

খান সাহেব আবদুল্লাহ ঃ মোমেন শাহীর নতুন ইতিহাস, নাহরা, বোকাইনগর, প্রথম প্রকাশ মার্চ- ১৯৭১।

খালেক দাদ চৌধুরী ঃ বাহারিস্তান-ই-গায়রী, ১ম ৪র্থ খন্ড বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮-৮৯ (ফার্সি) মির্জা নাথান আলাউদ্দিন ইস্ফাহানী।

জেমস ওয়াইজ ঃ পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ঢাকা।

দীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পাদিত) ঃ ময়মনসিংহ গীতিকা, কলকাতা, ১৯৫৮ (৩য় সংস্করণ)।

বজলুর রহমান খান ঃ বাংলার রাজনীতি (১৯২৭-১৯৩৬), এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

বদরুদ্দীন ওমর ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, ঢাকা ১৯৭২।

ঃ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম ও ২য় ও ৩য় খন্ড মাওলা বাদার্স ১৯৭০, ৭৫ তৃতীয় খন্ড চট্টগ্রাম বই ঘর, ঢাকা ১৯৮৫।

তোফায়েল আহমদ ঃ বিখ্যাত বাঙালী, ঢাকা, ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

দিলওয়ার হোসেন (অনুবাদ) ঃ বৃটিশ নীতিও বাংলার মুসলমান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ মূল এ, আর, মল্লিক।

বিনয় ঘোষ ঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১০০০-১৯০০), পাঠ ভবন, কলকাতা ১৯৭০।

ঃ বাংলার বিদুৎ সমাজ কলকাতা, ১৯৭৩ প্রকাশনা ভবন ১৯৪৮।

ঃ বাংলার নব জাগৃতি দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা ১৯৭১, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিসিং হাউস।

ঃ সাময়িক পত্রের বাঙলার সমাজ চিত্র, ৫ খন্ড কলকাতা, পাঠ ভবন, ১৯৬২- ৬৮।

রঙ্গ লাল সেন ঃ সমাজ কাঠামো, পুজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

রওশন আরা বেগম : নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ব বঙ্গের সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৩।

রতন লাল চক্রবর্তী : সিপাহী বিদ্রোহ ও বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪।

রসিক চন্দ্র বসু : আটিয়ার ইতিহাস, আটিয়ার চাঁদ স্বরনিকা, টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত, ১৯৩৮।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৮।

রেবর্তী বর্মন : সমাজ ও সভ্যতার ক্রম বিকাশ, কলকাতা, ১৯৪৮।

হাবিবা খাতুন : ঈসা খাঁ ও সমকালীণ ইতিহাস, ঢাকা-২০০০,বংশাই প্রেস।

হাবিবুর রহমান খান লোহানী : সুলতান মাহমুদ শাহ বাহার খান ও দুদু বেগম, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ঢাকা।

হাসান মোহাম্মদ সম্পাদিত : সন্দ্বীপ সমীক্ষা, সন্দ্বীপ এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম আর্কাইভস লাইব্রেরী, ঢাকা।

হাসানুজ্জামান : আর্থ- সামাজিক বিকাশঃ বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ ও বৃটেনের মধ্যকার সম্পর্ক, ঢাকা, ১৯৮২।

প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৮।

মাহাবুবুর রহমান : বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১) ঢাকা, ১৯৯৯।

মুনতাসির মামুন : উনিশ শতকের পূর্ব বঙ্গের সভাও সমিতি, ঢাকা ১৯৮৪।

: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ, ঢাকা, ১৯৭৫।

: পূর্ব বাংলার সামজ ও রাজনীতি, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ঃ পূর্ব বঙ্গের সমাজ জীবনের কয়েকটি দিক, ১৮৫৭-১৯০৫, ঢাকা।

ঃ উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র, ১-৪ খন্ড, ঢাকা, ১৯৮৫-৯১।

ঃ ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ব বঙ্গের সমাজ, ঢাকা, ১৯৬৫।

মুনীর চৌধুরী ঃ মীর মানস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫।

মীর মশাররফ হোসেন ঃ জমিদার দর্পন, কলকাতা, ১৮৭৫।

ঃ উদাসীন পথিকের মনের কথা, টাঙ্গাইল, ১৯৮৫।

ঃ আমার জীবনী, কলকাতা, ১৯০৮-৯।

ঃ গাজী মিয়ার বস্তানী, (১ম সংস্করণ, ১৮৯৯ খৃঃ), কলকাতা।

ঃ কুলসুম জীবনী, কলকাতা, ১৯০৯।

মফিজুল্লাহ কবীর ঃ নীল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিবন্ধ, সমাজ নিরীক্ষণ, সম্পাদনা, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, ঢাকা নভেম্বর, ১৯৭৮।

মমতাজুর রহমান তফদার ঃ ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১।

ঃ ইতিহাস দর্শন, বাংলা একাডেমী, পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ১৯৮১।

মনসুর মুসা (সম্পাদিত) ঃ বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৪।

মুসা আনসারী ঃ ইতিহাসঃ সমাজও সাংস্কৃতিক ভাবনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল ঃ মীর মশাররফের গদ্য রচনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৫।

মোহাম্মদ আফসার উদ্দীন আহম্মদ (সম্পাদিত) ঃ এ, কে, নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ, ঢা. বি, ১৯৮৪।

মোস্তফা নুরুল ইসলাম ঃ সাময়িক পত্রে জীবনও জনমত (১৯০১-১৯৩০) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।

ঃ বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা (অনুবাদ), বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ মূল ইংরেজী, ৩য় আজিজুল হক আবহমান বাংলা সাগর পাবলিশার্স ১৯৯৩।

ঃ বাংলাদেশঃ বাঙালী, আত্ম পরিচয়ের সন্ধানে, ঢাকা ১৯৯০।

মোঃ হাবিবুর রহমান ঃ গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

মোকাচ্ছের রহমান ঃ মুর্শিদ কুলী খান ও তার যুগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯ মূল (ইংরেজী) আবদুল করিম।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ঃ নওয়াব সলিমুল্লাহ জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮৬।

ঃ নওয়াব আলী চৌধুরী জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮৭।

ঃ বাংলাদেশের দশ দিশারী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

ঃ আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, সেরহিন্দ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।

ঃ মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রে ধর্ম ও সমাজ চিন্তা ১৯০১-১৯৪৭, একাডেমী, ১৯৯৫।

ঃ ভারতে বিদ্রোহের কারণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মূল (উর্দু) স্যার সৈয়দ আহমদ খান,আসবাবে বাগওয়াত-ই- হিন্দ।

মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ঃ মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকা ১৯৬৪।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ রাসুল ঃ কৃষক সভার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭০।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ বাকের (সম্পাদক) ঃ টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ, ১৯৯৭।

মালেকা বেগম ঃ নারীমুক্তি আন্দোলন, ঢাকা ১৯৮৫।

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ঃ অনুবাদ, বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী ১৯৮২ অনুবাদ।

ঃ কোম্পানী আমলে ঢাকা, ১৯৭৮ আহমদ পাবলিশার্স হাউস।

মুহাম্মদ আবদুর রহিম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা-১৯৭৬।

মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ বৃটিশ শাসনের শেষ অধ্যায়, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ মূল (ইংরেজী), লিওনার্দ মসলি।

মোহাম্মদ হান্নান ঃ বাঙালীর ইতিহাস, ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ১৯৮৯।

শরীফ উদ্দীন আহমদ সম্পাদিত ঃ ঢাকাঃ ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১) একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবর্লিসার্স লিঃ, ঢাকা ২০০১।

ঃ দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইতিহাস সমিতি, ঢাকা।

ঃ সিলেট জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইতিহাস সমিতি , ঢাকা।

শামসুন্নাহার মাহমুদ ঃ বেগম রোকেয়া জীবনী, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৮।

শ্রী রাধা রমন সাহা ঃ পাবনার ইতিহাস, ৮খন্ড, কলকাতা, ১৯২৬।

শওকত আরা হোসেন ঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (১৯২১-৩৬)ঃ অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি ঢা. বি. ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

শরিফা খাতুন ঃ আধুনিক শিক্ষা ও উনিশ শতকে বাংলার নারী সমাজ, এনামুল হক স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা ১৯৮৫।

সত্যেন সেন ঃ বাংলাদেশের কৃষক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৯৭২।

ঃ বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়	ঃ বাংলার আর্থিক অবস্থা-অষ্টাদশ শতাব্দী, ঢা. বি. লাইব্রেরী।
সুশীল কুমার	ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাগরণ, ঢা.বি. লাইব্রেরী।
সিরাজুল ইসলাম	ঃ বাংলার ইতিহাসঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো (১৮৫৭-১৮৫৮), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪।
	ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস-১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক), সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা ১ম, ১৯৯৩, নতুন সংস্করণ, ২০০০।
	ঃ ভূমি সংস্কার ও সমাজ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
সরদার ফজলুল করিম ও মুনতাসির মামুন	ঃ ইতিহাস কোষ, ১ম খন্ড, ঢাকা ১৯৮৩।
সুকুমার বিশ্বাস	ঃ বাংলাদেশের নাট্য চর্চা ও নাটকের ধারা (১৮৬৭-১৯৭১), ঢাকা, ১৯৮৮।
সেলিম জাহাঙ্গীর	ঃ মীর মশাররফ হোসেন জীবন ও সাহিত্য, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ঢাকা।
সৈয়দ আমিরুল ইসলাম	ঃ বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট, ঢা. বি. লাইব্রেরী।
সৈয়দ মর্তুজা আলী	ঃ হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ঢাকা।
সু প্রকাশ রায়	ঃ ভারতের বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮০।
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন (সম্পাদিত)	ঃ বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, ঢাকা, ১৯৮৬।
সালাহউদ্দিন, অজয় রায় ও মমতাজুর রহমান তরফদার	ঃ আবু মহাম্মেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা-১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সাব্বির আহমদ (সম্পাদিত) ঃ ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ময়মনসিংহ, ১৯৭৮

সৈয়দ আলী নকী ও
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঃ নৃ-বিজ্ঞান, ঢাকা-১৯৮৯।

১২. বাংলা সাময়িকী ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও রিপোর্ট

আবদুল করিম ঃ জাহাঙ্গীরের আমলে মুসলমানদের ত্রিপুরা রাজ্য বিজয়, বাংলা একাডেমী পত্রিকা শ্রাবন, আশ্বিন, ১৩৯৯।

আবদুর রহিম ঃ কোম্পানীর আমলে বাংলার মুসলমান জমিদারী, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ১২৩, ১৩৮০ বাংলা।

আবদুল মোমিন চৌধুরী ঃ উপমহাদেশের ভূমিস্বত্ব ও ভূমি সম্পর্ক - প্রাক মুসলিম যুগ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১০ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা বা ১৩৮৩।

আবুল কালাম মোঃ জাকারিয়া ঃ টাঙ্গাইল জেলার প্রত্মকীর্তি, টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, টাঙ্গাইল, ১৯৯৭।

আর, গ্রোবার ঃ বাংলাদেশে জমিদারী ও তালুকদারী প্রথার বিকাশ (১৫৭৬-১৭৬৫), ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ১৯৭৩।

আশরাফ সিদ্দিকী ঃ টাঙ্গাইলের লোক সাহিত্য, টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ১৯৯৭।

এ, কে, এম, ইদ্রিস আলী ঃ বঙ্গীয় বাণিজ্যে বৃটিশ কোম্পানীর উষালগ্ন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ঢাকা, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, প্রথম তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৯৬।

ঃ বঙ্গ বঙ্গ ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ ও রাজনীতি, বাংলাদেশ ইতিহাস, পরিষদ পত্রিকা, চর্তুবিংশ বর্ষ, প্রথম তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯৭।

ঃ এ, কে, এম, ফজলুল হক ও সমসাময়িক রাজনীতি, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯৮ পৃঃ ৯৫-১০২।

ঃ উসমানীয় খিলাফত ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বত্রিশ বর্ষ- ১ম-৩য় সংখ্যা-১৪০৫ (১৯৯৮-৯৯)।

ওয়াকিল আহমেদ ঃ কলিকাতা মাদ্রাসা ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা (১৭৮০-১৯০০), ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৯ম সংখ্যা, ১৩৮৭ বাংলা।

কানাই লাল চট্টোপাধ্যায় ঃ সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের প্রগতিশীল চিন্তাধারা, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা ১৪শ বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা, বাংলা ১৩৮৬।

কামাক্ষা নাথ সেন ঃ টাঙ্গাইলে আইন ও বিচার ব্যবস্থা, টাঙ্গাইল জেলার ইতহাস ও ঐতিহ্য, ১৯৯৭।

কামাল সিদ্দিকী ঃ বাংলাদেশে ভুমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, ঢাকা-১৯৮১।

কে, এম, করিম ঃ ডায়ার্কী শাসনে বাংলাদেশ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, পৃ- ৫৫,বর্ষ, ১৩৮৩।

খুররম হোসাইন ঃ টাঙ্গাইল জেলার ভু-প্রকৃতি ও নদ-নদী, টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ১৯৯৭।

গোলাম আম্বিয়া নুরী ঃ টাঙ্গাইলের জন সমাজ, নৃ-তাত্ত্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি, টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ১৯৯৭।

গ্রন্থ সমালোচনা ঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারি বাঙলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী-২০০০, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, তেত্রিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ১৪০৬ বাংলা ।

নজরুল ইসলাম ঃ মুসলিম শাসনাধীন আটিয়ার ইতিহাস, বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দপ্তদশ খন্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৯৯।

মকসুদুর রহমান ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া ও রানী ভবানীর রাজ্য নাশ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২১শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, ১৩৯৪।

মহাম্মদ আবদুল বাকী ঃ নওয়াব সৈয়দ মুআযযম হুসাইনঃ জীবন ও কর্ম, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯৮।

মুফাখখারুল ইসলাম ঃ প্রত্নময় উত্তর টাঙ্গাইল, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, একাদর্শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা।

ঃ টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ ইতিহাস প্রসঙ্গ, টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ১৯৯৭।

ঃ জিলা টাঙ্গাইলের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯৭৫ বা ১৩০০।

ঃ জেলা নথিপত্র ও বাংলার ইতিহাস, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৫ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা-১৯৭৩।

মুহাম্মদ জাকারিয়া খান ঃ বাংলার জামদানী শিল্প, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, চৌত্রিশ বর্ষ, ১ম, ৩য় সংখ্যা, ১৪০৭ বাংলা, ঢাকা-২০০১।

মোঃ আলমগীর ঃ ঢাকার নওয়াব পরিবারের ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২০০১ আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস সংখ্যা, চৌত্রিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ১৪০৭ বাংলা।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম ঃ তাজখান কররানীঃ পশ্চিম ও প্রাথমিক জীবন, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা একত্রিশ বর্ষ প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা ১৪০৪ বাংলা।

মোহাম্মদ বাকের ঃ টাঙ্গাইলের রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাস, টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ১৯৯৭ টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ প্রশাসন ও স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ইতিহাস, টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যস, ১৯৯৭।

মোহাম্মদ গোলাম রসুল ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ভূমিকা, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১২ শ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৩৮৫, বাংলা।

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ ঃ বাংলার মোঘল শাসনের ইতিহাস রচনার উপাদান বিচারঃ প্রসঙ্গ বাহারীস্তান-ই-গায়বী, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ১৮-১৯ সংখ্যা ১৩৯৬-৯৭ (১৯৮৯) পৃ।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান শেলী ঃ 'ষাটের দশকে উঠতি বাঙালী মধ্যবিত্তের ভূমিকা' ঈদ সংখ্যা, বিচিত্রা, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭।

মোহাম্মদ সিরাজ মান্নান ঃ হক জিন্নাহ মতান্তর (১৯৪০-৪১) ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১১-১২ সংখ্যা, ১৩৮৯-৯০ বাংলা।

মোহাম্মদ শাহ ঃ বঙ্গ ভঙ্গ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, জুন, ১৯৯৩।

রতন লাল চক্রবর্তী ঃ ১৮৭২ এর আদমশুমারীঃ সোনাদিয়া গ্রামবাসীদের বিদ্রোহ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ২১শ বর্ষ, ১ম- ২য় সংখ্যা, ১৩৯৪।

ঃ গ্রাম বাংলার প্রশাসনিক বিভাজনঃ একটি সমীক্ষা, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১১-১২ সংখ্যা, ১৯৮১।

শরিফ উল্লাহ্ ভূঁইয়া ঃ বাংলার প্রথম আদমশুমারী ও জনপ্রতিক্রিয়া, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ১৮-১৯ সংখ্যা, বর্ষ- ১৩৯৬, ৯৭ বাংলা।

শফি উদ্দিন আহমদ ঃ মোগল বারভূঁঞা দ্বন্দ্বঃ প্রসঙ্গে মানিকগঞ্জ জেলা, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম- ৩য় সংখ্যা বৈশাখ-চৈত্র ১৩৯৮, ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিরিন আখতার ঃ মুঘল আমলের জমিদারদের ইতিবৃত্ত, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা- ১৩৯৬-৯৭।

সরকার নুরুল মোমেন ঃ টাঙ্গাইলের উপজাতি গারো সম্প্রদায়, জীবন ও সংস্কৃতি, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ১৯৯৭।

সনৎ কুমার সাহা ঃ বাংলাদেশঃ অর্থনৈতিক পটভূমি, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা ১৩৯৭।

সুফিয়া আহমেদ ঃ নওশের আলী খান ইউসুফজাই কর্তৃক ১৯০৩ সালে লিখিত বাংলায় মুসলিম শিক্ষার উপর বক্তব্য সম্পর্কে একটি ভাষ্য, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৯শ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা।

সাজেদা ইউসুফ ঃ ধনবাড়ীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বত্রিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা ১৪০৫ বাংলা।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ঃ বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া শাসনতান্ত্রিক বিশ্লেষণ, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা ১৩শ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা ১৩৮৬।

১৩. স্মৃতিকথা, স্থানীয় পর্যায় সাক্ষাৎকার ও আলোক চিত্র সংগ্রহ

করটিয়া ও পন্নী বংশের স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার, বায়েজীদ খান পন্নী।

দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার খোদাদাদ খান গজনবী।

দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী স্মৃতি কথা, সাক্ষাৎকার সৈয়দ মারহামাত আলী চৌধুরী।

পাকুল্লা স্মৃতি কথা, সাক্ষাৎকার, সৈয়দ আল মামুন হাসান চৌধুরী।

সাক্ষাৎকার, আসাদুজ্জামান, কর্মকর্তা, ভূমি ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, উর্দূ ও ফার্সি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাক্ষাৎকার আশরাফ সিদ্দিকী, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সাক্ষাৎকার আশিকা আকবর, ধনবাড়ী জমিদার বাড়ী মুতওলি, ঢাকা।

স্থানীয় কেয়ারটেকার সাক্ষাৎকার, দেলদুয়ার উত্তর বাড়ী, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১ ঃ প্রথম অধ্যায় সংশ্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ১.১ ঃ দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জমিদার নবাব স্যার আবদুল করিম গজনবীর সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।

The Indian Year Book 1936-37 volume-XXIII

GHUZNAVI, THE HON. ALHADJ NAWAB BAHADUR SIR ABDELKERIM ABU AHMED KHAN, of Dilduar, Kt. *Born:* 25th August 1872.

Married: in 1894, Nawab Begum Lady Saidennessa Khanum. One son and four daughters.

Educated: at St. Peter's School, Exmouth, Devonshire: Wren and Gurney's Institution in London: Universities of Oxford and Jena (Germany). At an early age he was sent to a Public School in England. Appeared in the I.C.S. Examination in 1890. He has travelled almost all over the Continent of Europe where a number of years was spent in studying the indigenous institutions in France, Germany and Italy. He knows French, German and Italian languages.

He returned to India in 1894 and settled in his estates, handed down by his ancestor Fatehdad Khan Ghuznin of the Lohani clan who succeeded his brother Osman Khan Ghuznin Lohani, the last independent Chieftain of Bengal. Represented the whole of Eastern Bengal and Assam in the old Imperial Legislative Council 1909-12 and the Muslims of Bengal in the Viceroy's Council 1913-16. Exempted from the Indian Arms Act 1925. Chairman, Bengal Provincial Simon Committee 1928 and General-Chairman, All-India Provincial Simon Committees 1929. Member Executive Council of Governor of Bengal, 1929-34. Minister of Government of Bengal in 1924 and 1927. Was instrumental in saving the historic town of Sirajgunge from engulfment by river. Initiated a " Waterways Trust " for Bengal and many other far-reaching constructive works in all the Government Departments under his charge, some of which are now bearing fruit.

In 1913, he went on a political mission to the late Ex-King Hossain of the Hedjaz as well as to Palestine and Syria to enquire into the question of Pilgrim Traffic. In 1931, he visited as State Guest, the Court of King Ibn Saud of the Hedjaz and Nejd and thereafter travelled extensively in Sudan, Egypt, Palestine, Syria and Iraq in order to study irrigation problems and other matters connected with the constitution of those countries. He is writing a memoir of his tours, which will be illustrated with photographs taken by his son, Alhadj Mr. I.S.K. Ghuznavi, B.Sc., who accompanied him.

Publications: " Pilgrim Traffic to the Hedjaz and Palestine (1913)"; " Muslim Education in Bengal "; " The Working of the Dyarchial System in Bengal (1928), " etc.

Address: Lohani Manor, P. O. Lohanisagardighi, Mymensigh, Bengal; North House, P. O. Dilduar, Mymensingh, Bengal; *Club:* Calcutta Club, Calcutta.

উৎস ঃ ১৯৩৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত "ইন্ডিয়ান ইয়ার বুক" গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ১.২ ঃ দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জমিদার স্যার আবদুল হালিম গজনবী এবং জামাতা, কুমিল্লা রতনপুরের জমিদার নবাব স্যার কে, এম, ফারুকীর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

GHUZNAVI, Sir Abdul Halim, M.L.A., cr. 7th March, 1936, at New Delhi. *Son of the late Abdul Hakim Khan Ghuznavi, of Dilduar, by his wife the late Karimannessa Khanum Ghuznavi, dau. of the late Abu Ali Chowdhury Saber ; b.* 1876 *; m. Marim Kariam Khatoon (decd.), dau. of the late Hafiz Muhammad Ali Khan Panni.* Educated St. Xavier's College, Calcutta. Eelected Member Indian Legislative Assembly since 1926 ; President of Muslim Conference at Cawnpore 1929 ; Delegate to all the three Round Table Conferences in London ; Member Consultative Committee (in India) 1933 ; Delegate to Joint Parliamentary Committee 1933 ; Railway Statutory Board Committee 1933 ; Reserve Bank Committee 1933 ; Member Advisory Board to the Indian Delegation to the World Economic Conference 1933 ; Member Court University of Dacca ; Member Court University of Aligarh ; Sheriff of Calcutta 1935 ; Hon. Secretary Their Majesties Silver Jubilee Celebration in Calcutta. Address : 18 Canal Street, P.O. Entally, Calcutta. Clubs : Calcutta ; Gymkhana ; New Delhi.

FAROQUI, The Hon. Khan Bahadur Nawab Sir Mohuiddin, cr. 7th March, 1936, at New Delhi. *Son of Kazi Rayazuddin Muhammad Faroqui ; b.* 1891 *; m. Quatrina Sultana Zobeida, dau. of the Hon. Alhadj Nawab Bahadur Sir Abdelkerim Ghuznavi.* Educated Dacca College, Bengal. Khan Bahadur 1924 ; Nawab 1932 ; First Chairman Tippera District Board (county council) ; Commissioner Comilla Municipality ; Member Assam Bengal Railway Advisory Board ; Member Dacca University Court ; Hon. Magistrate and a Member of the Governing Body of the Comilla College ; as Chairman of the District Board he has promoted and supported various schemes of Public utility ; Member Bengal Legislative Council, and is Leader of the House in the Council ; represented the Province of Bengal in the Provincial Simon Committee ; since 1929 has been Minister in charge of the Departments of Agriculture, Industries and Public Works ; as Minister to the Government he has given effect to a considerable number of measures which have already had far-reaching results in improving the conditions of agriculture and industry of the Province ; he introduced and successfully piloted the State Aid to Industries Act, and took steps to establish Co-operative Land Mortgage Banks for the relief of agricultural indebtedness. Address : 8 Ripon Street, Calcutta.

উৎস ঃ ১৯৩৯ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত "নাইট ব্যাচেলর" গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ১.৩ ঃ আতিয়ার আদি পন্নী জমিদারীর বংশতালিকা (অপূর্ণাঙ্গ)।

বংশ লতিকা ১৭১

বায়জিদ খাঁ

সাঈদ খাঁ

ফতেহ খাঁ

সলীম খাঁ

মোজাফ্ফর খাঁ

মঈন খাঁ

মোহাম্মদ খাঁ

মনারেম খাঁ

খোদানেওয়াজ খাঁ

আলেপ খাঁ চৌধুরী (১৭৮৭ইং সনে ৷৷৹ আনা অংশ ইমাম বক্সের সংগে বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।)

ইমাম বকস খাঁ

আলিয়ার খাঁ (১৭৮৭ ইং সনে ৷৷৹ অংশ বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন।)

কোচালি খাঁ (কয়েস আলী খাঁ। (আলেপ খার পুত্র ৶৹ অংশ পান।)

ফয়েজ আলী খাঁ (অবশিষ্ট ৷৶৹ আনা অংশ পান।)

জাফর আলী খাঁ (কোচালি খাঁর বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলে উক্ত ৶৹ আনার ৴৹ আনা হিস্যা পান।)

বিরাম খাঁ (নিকাহিতা স্ত্রীর পুত্র ,১৮৷৹ কড়া অংশ পান।)

রণ খাতুন নিকাহিতা স্ত্রীর কন্যা ,১৮ কড়া হিস্যা পান।)

রহিমউদ্দিন চৌধুরী (দেলদুয়ারের চৌধুরী সাহেব জাফর খাঁর ৴৹ আনা অংশ ক্রয় করেন।)

রেজ আলী চৌধুরী। রাজ আলী চৌধুরী (ধনবাড়ীর চৌধুরী সাহেব রন খাতুনকে বিয়ে করে ,১৮ কড়া হিস্যা লাভ করেন)

উৎস ঃ ১৯৭৭, ৮৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত "টাঙ্গাইল ইতিহাস" গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ১.৪ ঃ আতিয়ার মূল জমিদার করটিয়া পন্নীদের বংশ তালিকা।

টাংগাইলের ইতিহাস

আলেপ খাঁ

ফয়েজ আলী খাঁ
(অবশিষ্ট ।৶০ আনা অংশের
মালিক ।)

ভগ্নি
(ছলিম নগরে বিবাহিতা
ভগ্নি ।৴০ অংশ
পান ।)

তাহের আলী

ঢাকার নবাব
(বাকী অংশের
।৶০ আনা হিস্যা
পান

সাদত আলী খাঁ
(অবশিষ্ট অংশের ।।৴০ আনা
হিস্যা পান)
(১৯২৬ ইং সনে তাঁর নামেই
করটিয়া সাদত কলেজ স্থাপিত হয়েছে।)

মাহমুদ আলী খাঁ
(১৯১৯ ইং সনে তাঁর নামে
করটিয়া হাই স্কুল স্থাপিত হয়েছে)

ছাদেক আলী খাঁ | ওসমান আলী খাঁ | হায়দার আলী খাঁ | এলাহীদাদ খাঁ | মুজাফ ফর আলী খাঁ | ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চাঁন মিয়া

সাঈদ খান পন্নী | মেহেদী আলী খান পন্নী | জাফর আলী খাঁ | মসউদ-আলী খান পন্নী ওরফে নবাব মিঞা

দাবুদ খান পন্নী | বায়জিদ খান পন্নী | নঈম খান পন্নী | মঈন খান পন্নী

ছোলেমান খান পন্নী | হুমায়ুন খান পন্নী | খুররম খান পন্নী

সাব্বির আলী খান পন্নী | তারেক আলী খান পন্নী | মোরশেদ আলী খান পন্নী | ওয়াজেদ আলী খান পন্নী

উৎস ঃ খোন্দকার আবদুর রহিম, টাঙ্গাইলের ইতিহাস গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১.৫ ঃ দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারদের সৈয়দ বংশের তালিকা।

রহিমউদ্দিন চৌধুরী

সদর উদ্দিন চৌধুরী

আশরাফুন্নেছা, দৌলত খাতুন ও শফিকুন্নেছা
(সদরউদ্দিনের স্ত্রী সদরউদ্দিনের দু'কন্যা)

চাঁদ চৌধুরী
সদরউদ্দিনের ছেলে। এর মৃত্যুতে
এর মা ও দু'বোন পাকুল্যায়
বসবাস করার জন্য চলে যান।)

মুছলেম আলী চৌধুরী
ওরফে মুচি মিয়া
(চাঁদ চৌধুরীর অকাল বিধবা স্ত্রীকে
বিয়ে করেন এবং পরে তাঁর দু'বোনকেও
বিয়ে করেন। এবং তাদেরকে পাকুল্যা
থেকে দেলদুয়ারে ফিরিয়ে আনেন)
এভাবে ⁄ আনা জমিদারীর মালিক হন।)

দৌলত খাতুন
(মুচি মিয়া মক্কা যাবার সময়
স্ত্রীকে উক্ত জমিদারীর ।৶১০ সাড়ে
সাত আনী অংশ হেবা করে দিয়ে যান।

জব্বার মিয়া ওরফে
সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী
(দৌল খাতুনের ছেলে)

আবদুস সোবহান চৌধুরী
(ইনি বগুড়ার জমিদার)

নওয়াবজাদা আলতাফ আলী চৌধুরী
(ইনি নানার সম্পত্তি লাভ করেন।)

মোহাম্মদ আলী
(পাকিস্তানের প্রধান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী)।

সৈয়দ আহমদ
হোসেন চৌধুরী

লেঃ সৈয়দ মহাম্মদ হোসেন
চৌধুরী এর কন্যা হামিদা
বেগমের স্বামী বগুড়ার মহম্মদ
আলী পাকিস্তানের প্রাক্তন
প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী।)

লেঃ সৈয়দ নুর
আহমদ চৌধুরী

সৈয়দ মহব্বত
আলী চৌধুরী

১। সৈয়দ এনায়েত আলী চৌধুরী ২। সৈয়দ মারহামাত আলী চৌধুরী এড
৩। সৈয়দ শাশারৎ আলী চৌধুরী ৪। সৈয়দ নজাবত আলী চৌধুরী ৫। মুনীরা
এ, রহমান স্বামী-মেজর জেনারেল এম; আতিকুর রহমান ৬। মুজিয়াএ, জাহান,
স্বামী-আজাদ জাহান এম, এড, ৭। নায়েরা খাতুন ৮। নাজেরা খাতুন।

উৎস ঃ টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও বাংলাদেশের দশ দিশারী গ্রন্থদ্বয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১.৬ ঃ গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত আদি সৈয়দ বংশ তালিকা।

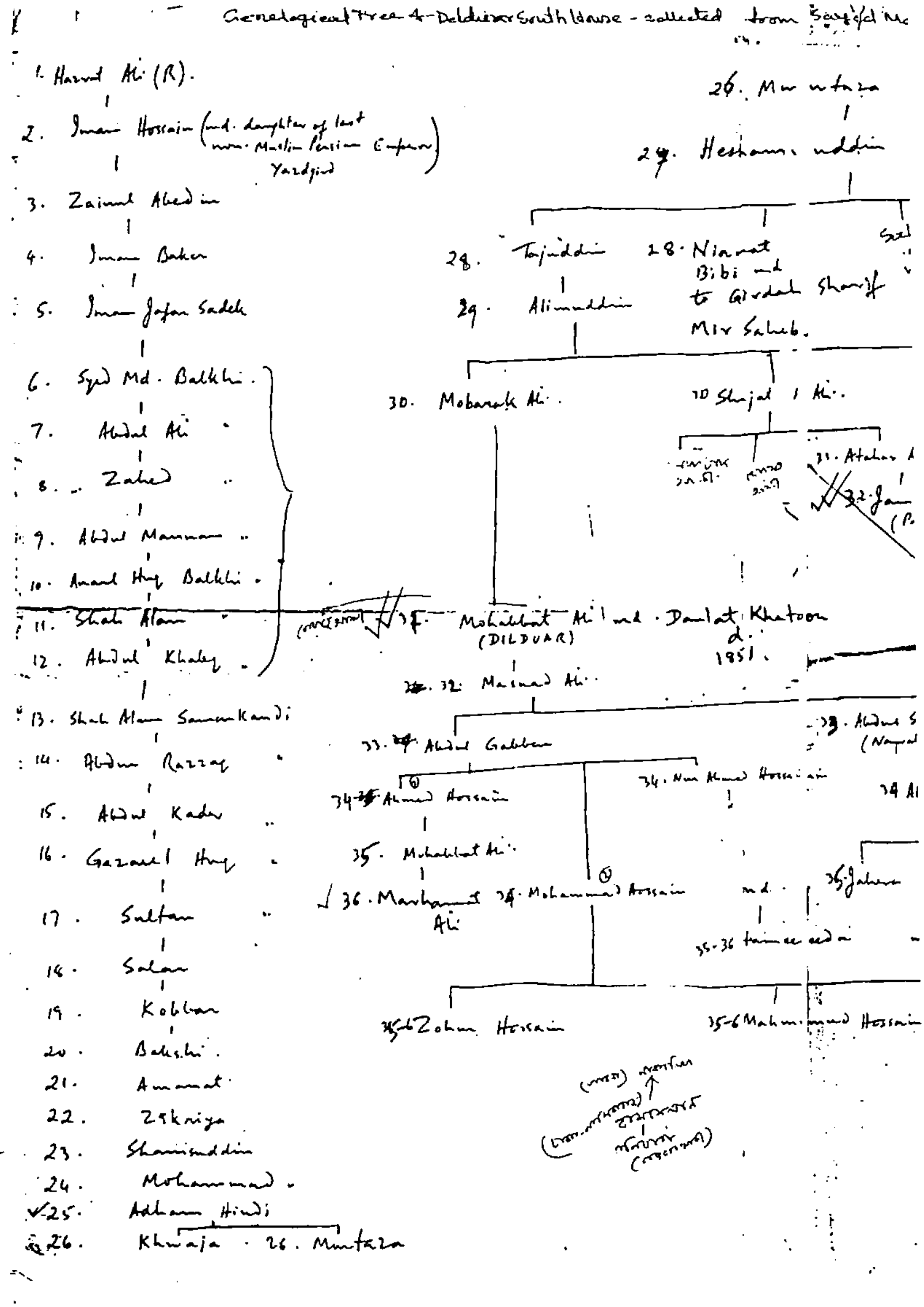

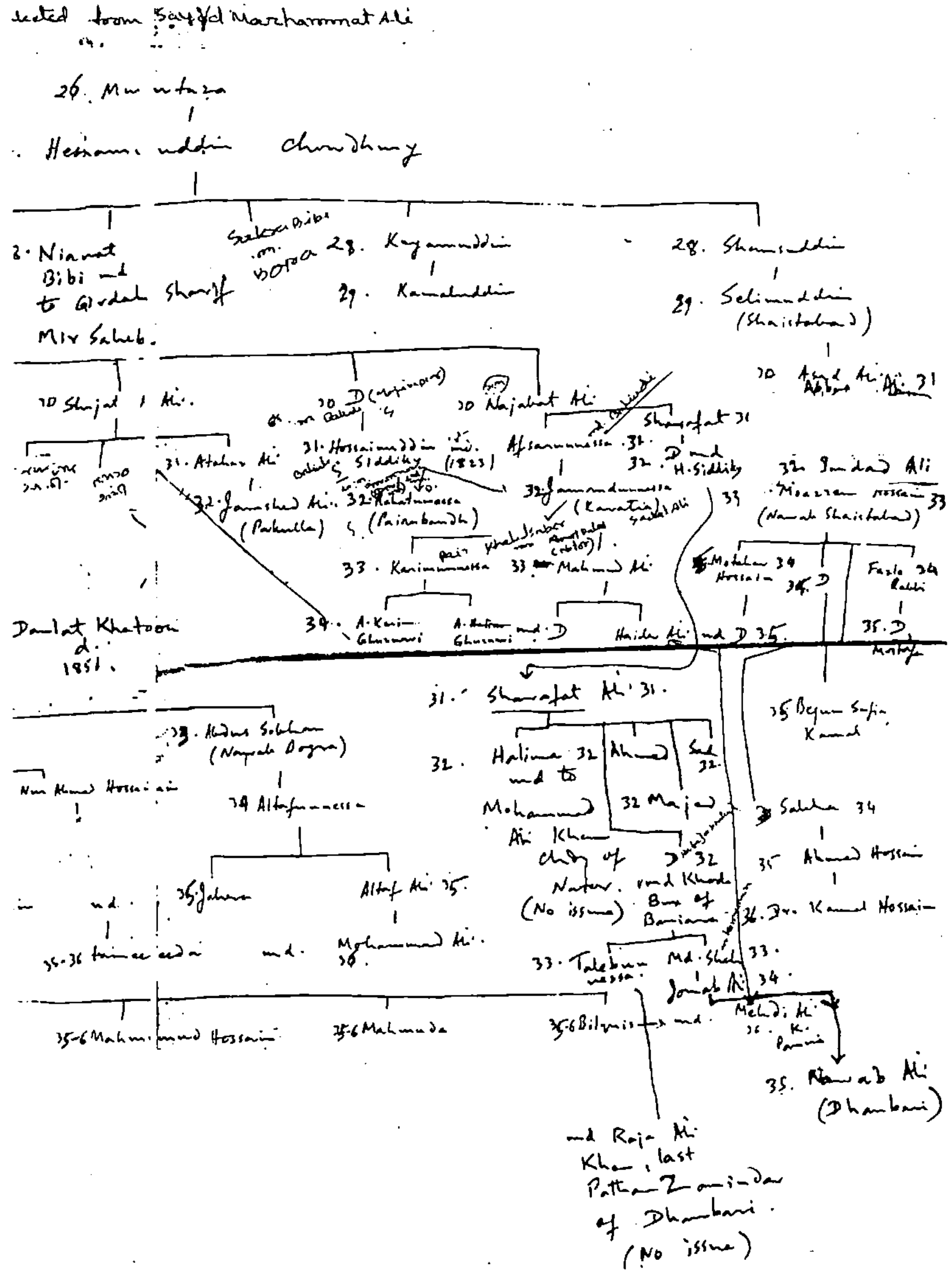

উৎস ঃ দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর সৈয়দ মারহামাত আলীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১.৭ ঃ দেলদুয়ার উত্তর বাড়ীর জমিদারদের গজনবী বংশ তালিকা (অসম্পূর্ণ)।

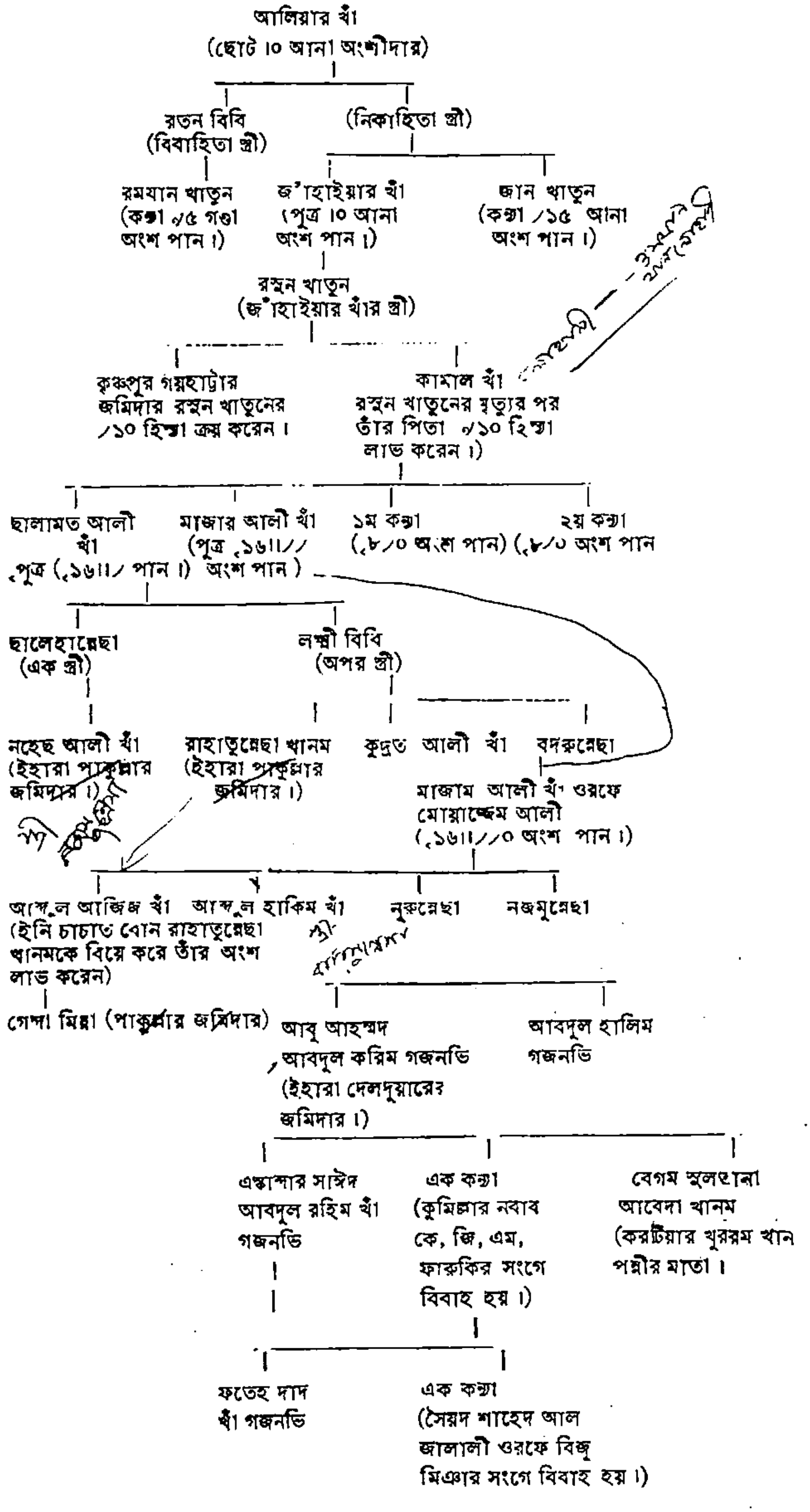

উৎস ঃ খোন্দকার আবদুর রহিম, টাঙ্গাইলের ইতিহাস গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১.৮ ঃ গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত গজনবীদের সঠিক বংশ তালিকা।

গজনবী বংশ তালিকা

মালিক খানজী লোহানী
(ইলোর ও পাহলোয়ান পুরের প্রিন্স,রাজস্থান, উত্তর পশ্চিম ভারত)

↓

মালিক গজনবী খান লোহানী
(জন্ম ১৫২৯, মৃত্যু-১৫৯৯ খৃঃ)

↓

- কুতলু খান লোহানী (চির,উড়িষ্যা)
- ইসা খান লোহানী (জন্ম -১৫৫২ খৃঃ)

↓

- খাজা ওসমান খান লোহানী (জন্ম ১৫৭০. মৃ-১৬১২ একমাত্র কন্যা (এর সাথে ভাতৃষ্পুত্রের বিয়ে)
- খাজা মালহী খান
  ↓ দাউদ খান বা. ফতেহ দাদ খান
  ↓ জাওহার খান
  ↓ তাজউদ্দীন খান
  ↓ . . . ↓ . . . ↓
- খাজা সোলায়মান খান
- খাজা ইব্রাহিম খান
- খাজা ওয়ালী খান

↓

- দরিয়া খান
  ↓ সওদল খাতুন স্বামী শাহনেওয়াজ খান পত্নী
- নামদার খান
  - কামাল খান(চারানের তালুকদার) স্ত্রী হায়তান খাতুন(কন্যা রওশন খাতুন, স্বামী জাঁহাইয়ার খান পত্নী সূত্রে দেলদুয়ার জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন)
  - কামদার খান
- লাল মোহাম্মদ খান

কামাল খান ↓

- সালামত আলী খান মৃত-১৮৫৭ (দেলদুয়ার বড় বাড়ী প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিলুপ্ত স্ত্রী সালেহান্নেসা
- মাজামত উদ্দীন আলী খান (মৃ-১৮৫৫)
- রওশন খাতুন (মৃ-১৮৪৯)
- ঈদুন খাতুন (পাকুল্লা সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা)
- দৌলত খাতুন (দেলদুয়ার সৈয়দ বংশ প্রতিষ্ঠা
- জয়নব খাতুন

↓

- সাইসউদ্দীন আলী খান স্ত্রী নজমুন্নেসা
  ↓ ৮ কন্যা/১১ কন্যা (ইস্যুহীন)
- ইসমাইল খান
- খোরাশেদুন্নেসা
- রাহাতুন্নেসা
- আবদুল আজিজ খান (১৮৩৭-১৮৭৪) স্ত্রী খোরশেদুন্নেসা,রাহাতুন নেসা
  ↓ আবরার রহমান খান স্ত্রী সুরাইয়া খাতুন (ইস্যুহীন)
- আবদুল হাকিম খান (১৮৪১-১৮৭৮)
  - আবদুল করিম খানগজনবী (মৃ-১৯৩৯)
    ↓ ইস্কান্দার সাঈদ খান গজনবী ও চার বোন
    ↓ খোদাদাদ খান গজনবী ও ২ সন্তান
  - আবদুল হালিম খান গজনবী (মৃত-১৯৫৩) (ইস্যুহীন))
- নজমুন্নেসা
- নুরুন্নেসা

Dhaka University Institutional Repository

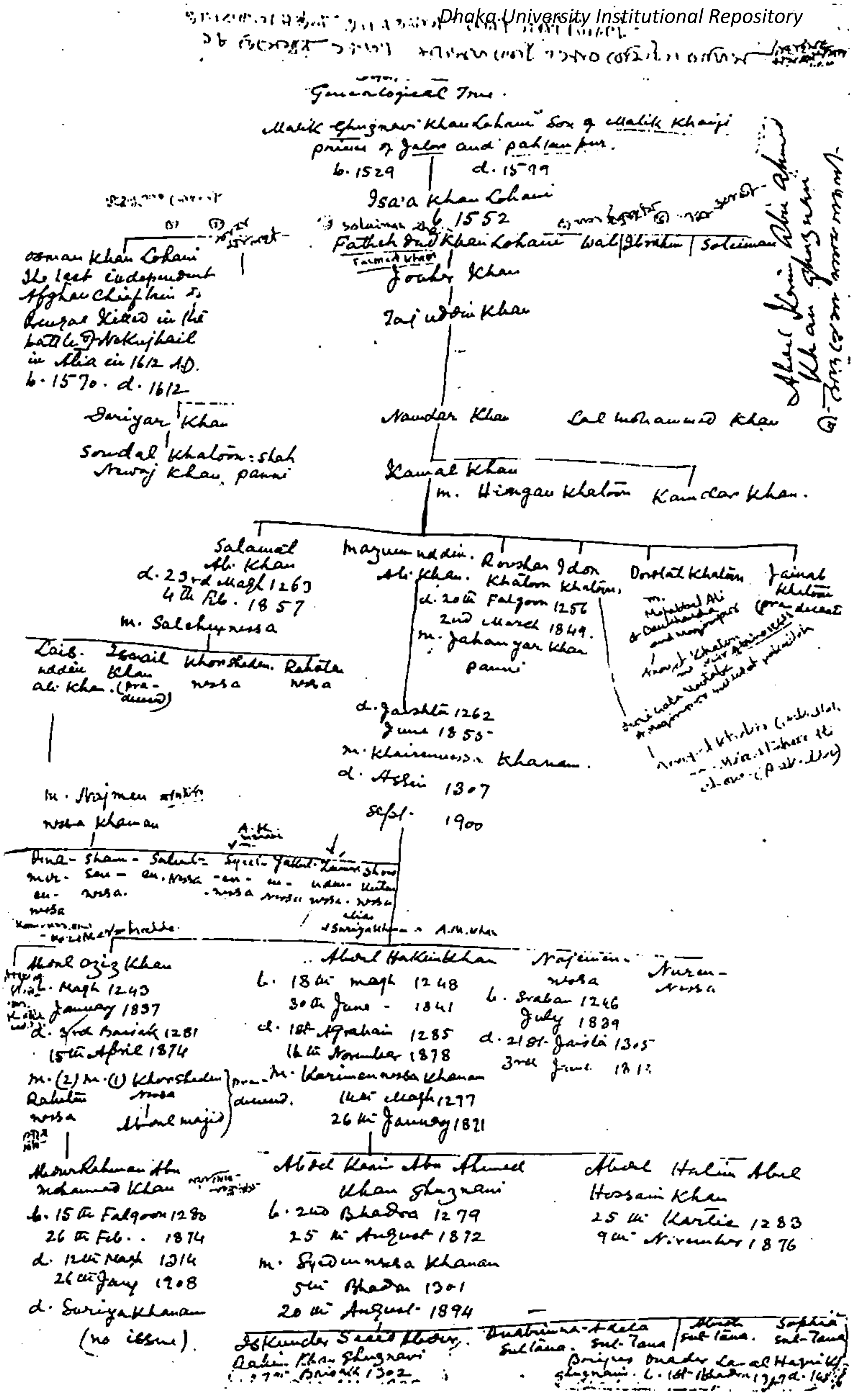

উৎস ঃ এ.কে. গজনবী স্বাক্ষরিত, ১৯৩৬ সালের ওয়াক্‌ফ আল আওলাদ দলিল সংকলন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১.৯ ঃ পন্নী ও গজনবী বংশধরদের আত্মীয়তা সুত্রের অপর মুসলিম জমিদারদের বংশ তালিকা।

ক, পাকুল্লা জমিদার বংশ তালিকা

সৈয়দ আতাহার আলী স্ত্রী এনায়েত খাতুন (আনুমানিক ১৭৯৬-১৮৪৮)

(মকীমপুরের সৈয়দ আদম হিন্দির (১৬০৮ খৃঃ, ৭ম অধঃস্তন বংশধর)

↓

সৈয়দ জামসেদ আলী চৌধুরী — লতিফুন্নেসা, স্বামী সৈয়দ আবু নজর চৌধুরী

↓

সৈয়দ আব্বাস আলী চৌধুরী

↓

সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী

↓ সৈয়দ শমসের আলী চৌধুরী

↓ সৈয়দ মেহেদী আলী চৌধুরী

↓ সৈয়দ আকবর আলী চৌধুরী

↓

সৈয়দ আলমগীর আলী চৌধুরী (পাওয়ার চৌধুরী)

(সৈয়দ আবু নজর চৌধুরী ও লতিফুন্নেসার সন্তান:)

↓ সৈয়দ শাহ আবদুল করিম চৌধুরী — আখতারুন্নেসা আবুল

↓ সৈয়দ আবদুর রহমান চৌধুরী

↓ সৈয়দ আবদুল গফুর চৌধুরী

↓ কন্যা — স্বামী সৈয়দ জব্বার চৌধুরী

↓

সৈয়দ আবুল হুসেন চৌধুরী (২ বিয়ে)

↓

↓ ১ম স্ত্রী (১ ছেলে, ৪ মেয়ে)

↓ ২য় স্ত্রী (৭ ছেলে, ১ মেয়ে)

উৎস ঃ পাকুল্লা জমিদার বংশধর, সৈয়দ আল মামুন চৌধুরী সৌজন্যে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ধনবাড়ির জমিদার

ধনবাড়ির জমিদারদের একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের সূত্রাদি সংগ্রহ করেছিলেন "তরফ গৌরাঙ্গীর ইতিহাসের" লেখক টংগাইলের প্রবীন উকিল আব্দুল করিম খান সাহেব। তদনুসারে ধনবাড়ির জমিদারদের একটি বংশ লতিকা এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে :—২

রাজা যশোধর
(ইনি ফলদার রাজা
ছিলেন বলে কথিত
আছে।)
|
ধনুয়ার খাঁ
(ইনি রাজা যশোধরের
সেনাপতি ছিলেন। ইনি
কৌশলে রাজাটি দখল
করেন বলে কথিত আছে।)
|
ইস্পিঞ্জির খাঁ — মনোয়ার খাঁ
|
পিয়ার আলী খাঁ
|
একাব্বর খাঁ
(এর আমলেই চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত হয় বলে
প্রকাশ)

একাব্বর খাঁ
|
রাজা আলী খাঁ
ইনি নিঃসন্তান
অবস্থায় এন্তেকাল
করেন।)
|
সৈয়দানী তালেবন্নেছা
(রাজা আলী খাঁর
বানিয়ারা নিবাসী স্ত্রী
সম্পত্তির মালিক হন।)
|
সৈয়দ খোদাবকস্ শাহ
(সৈয়দানী তালেবন্নেছার
বানিয়ারা নিবাসী পিতা
মেয়ের সম্পত্তি লাভ করেন।)
|
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ
|
সৈয়দ জোনাব আলী চৌধুরী
|
অনারেবল নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী
|
- সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী (বগুড়ায় নানার সম্পত্তি লাভ করেন।)
  |
  মোহাম্মদ আলী (সাবেক পাকিস্তানের পররাষ্ট্র ও প্রধান মন্ত্রী।)
- নওয়াবজাদা হাসান আলী চৌধুরী
  |
  একমাত্র কন্যা
  সুলতানা বিলকিস্ বানু

উৎস : খোন্দকার আবদুর রহিম, এম. আবদুল্লাহ এর গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

গ. সৈয়দ বংশ তালিকা (দেলদুয়ার, শায়েস্তাবাদ, বগুড়া, ধনবাড়ী)

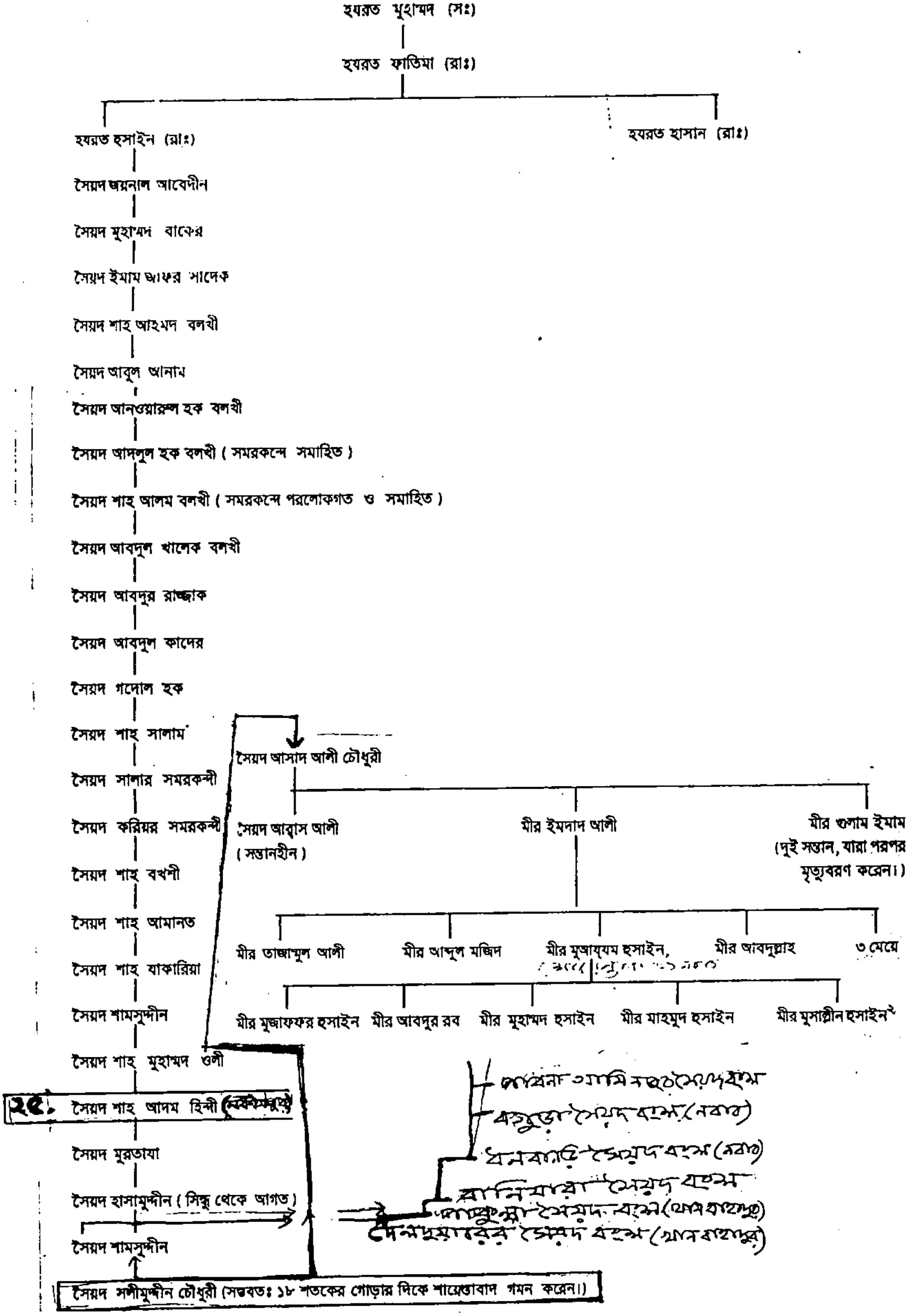

উৎস : ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১.১০ ঃ পন্নী ও সৈয়দ সূত্রের আত্মীয় বংশধর পাবনার দুলাই চৌধুরীদের বংশ তালিকা।

দুলাই জমিদার বংশ তালিকা পাবনা

আতিয়ার পন্নীদের বংশধর

মুন্সী রহিম উদ্দীন চৌধুরী,১৭৫৫-১৮২০, (১৭৭২ -৯৭ মধ্যবর্তী কোন সময়ে দুলাই জমিদারী প্রতিষ্ঠা, দুলাই মসজিদ প্রতিষ্ঠা ১৭৯৭-৯৮)

↓

আজিম উদ্দীন চৌধুরী (১৮০৫-১৮৭৫, বিখ্যাত জমিদার, তার সময় দুলাই জমিদারী সীমা ও প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়)

↓ ↓

* হায়দারজান চৌধুরী | আহম্মদ জান চৌধুরী (ফরিদপুরে নিবাস স্থাপন) বংশধর, সাবেক মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) মহব্বতজান চৌধুরী

↓ (হায়দারজান চৌধুরী)

** হোসেন জান চৌধুরী (মৃ-১৯৫৬) | ফসিউদ্দীন জান চৌধুরী | আবদুল বাসেদ জান চৌঃ

↓ (হোসেন জান চৌধুরী)

১ম স্ত্রী ছৈয়দাতুন্নেসা | ২য় স্ত্রী আমাতুন্নেসা | ৩য় স্ত্রী সামছুন্নেসা (১৯৪৫ সালে প্রথম ওয়াক্‌ফ নিজ নামে, ১৯৫৩ সালে পুনঃ ওয়াকফ দলিল সম্পাদন করেন সন্তানদের অনুকূলে)

↓ (৩য় স্ত্রী সামছুন্নেসা)

রওশনজান চৌধুরী (সর্বশেষ জমিদার, বর্তমানে জীবিত) | মহসিন জান চৌধুরী | সাবওয়ারজান চৌধুরী | বিজ্ঞিয়াজান চৌধুরী | মাহবুবজান চৌধুরী | রফিকজান চৌধুরী | দিলওয়ারা চৌধুরী

↓ (রওশনজান চৌধুরী)

অফিফা চৌধুরী | আফসানা চৌধুরী | আহমদজান চোধুরী | ফারহানাজান চোধুরী | আহমদজান চোধুরী | আসাদজান চোধুরী | এরশাদজান চোধুরী | নাজলী চোধুরী

* তিনি কলকাতা নিবাস স্থাপন করেন, ১৩/১/১ নং আহিরী পুকুর, নিউ রোড, কলকাতা।

** তিনি পাবনা শহরে বর্তমান রওশন জান চৌধুরী ভোগদখলকৃত বাড়ী ও কাছারিতে বসতি স্থানান্তর করেন। ১৯১৫ সালের সার্ভে রিপোর্টে এবং খতিয়ানে হোসেন জান চৌধুরীকে প্রভাবশালী জমিদার দেখা যায়। ১৯৪৫ সালে বিভিন্ন স্ত্রীর অনুকুল মুতওলিতে জমিদারী ওয়াক্‌ফ করেন।

উৎস ঃ পাবনা নিবাসী দুলাই জমিদার পরিবারের নাজলী চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১.১১ ঃ আতিয়া পরগনার বহুধা বিভক্ত জমিদার বংশধরদের বংশচক্র।

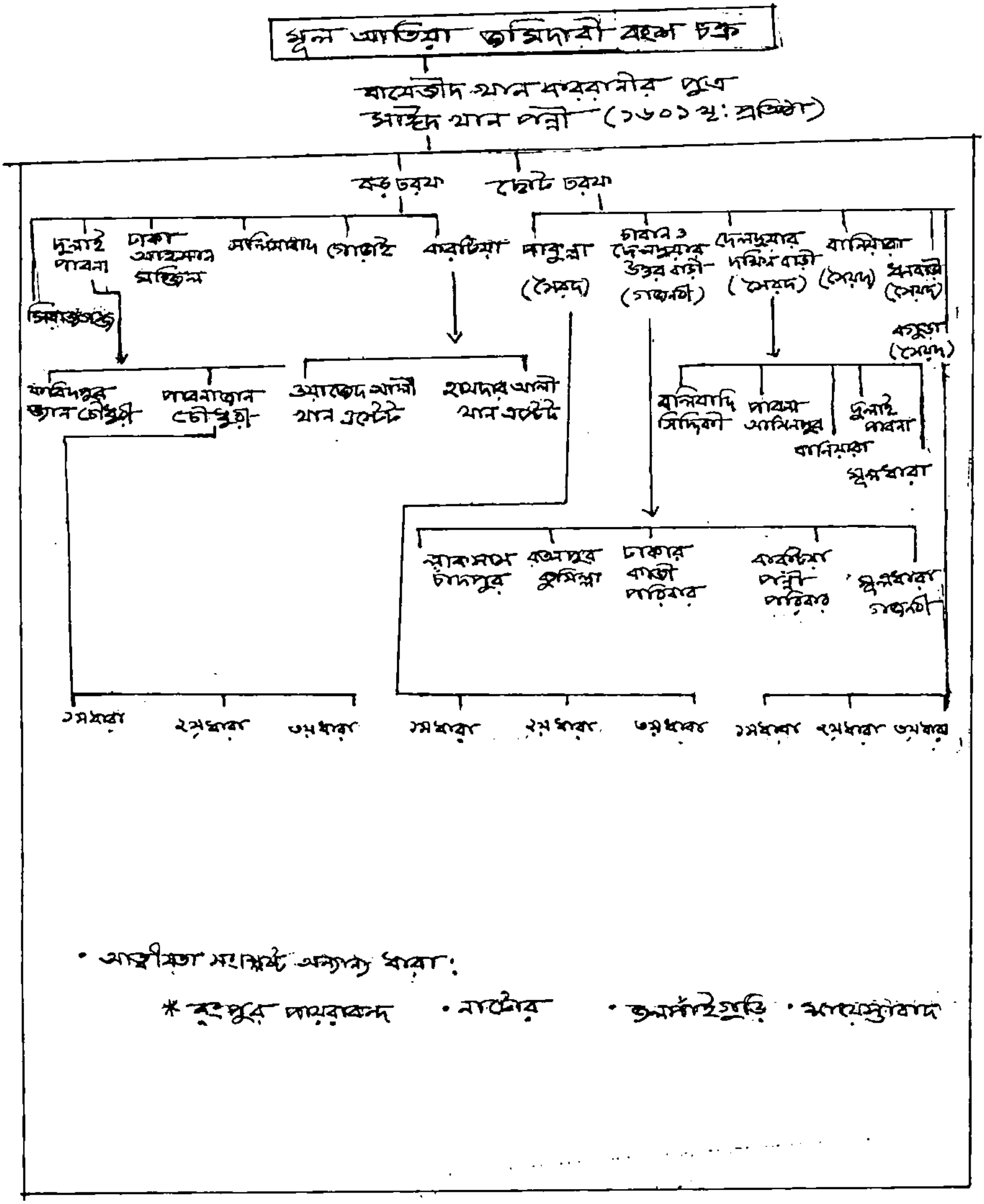

উৎস ঃ গবেষক কর্তৃক প্রণীত, বিভিন্ন অঞ্চলের জমিদারী ইতিহাস থেকে উদ্ধারকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১.১২ ঃ ১৭৯৩ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত বাংলার জমিদারদের সংখ্যাগত তথ্যকণিকা।

লর্ড হেস্টিংসের

সময় বড় জমিদারীর সংখ্যা ছিল কমবেশি ১০০ ; একশ' বছর পরে ছোটবড় জমিদারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৪২০০।[২৫] ১৮৫৫ সালে কাউন্সিল সদস্য জে, পি. গ্রান্ট বলেন যে, বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমির মালিক ছিলেন তালুকদার-পত্তনিদারগণ।[২৬]

১৭৯৩ সালে জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৩১৭টি। সিটনকারের হিসাব মতে ১৮৫৮ সালে 'সদর জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৪,৫৫০টি। ইচ্ছামতী থেকে গঙ্গা পর্যন্ত এই সদর জমিদারীগুলি বিস্তৃত ছিল। এগুলির মালিক ছিলেন যথাক্রমে হিন্দু ৩,৮৫৫টি (৮৫%), মুসলমান ৬৪৩টি (১৪%) এবং ইউরোপীয়ান ৫২টি (১%)।[৬৪] মুসলমানের জমিদারীগুলির বৃদ্ধি ছিল না, উপরন্তু এগুলি উত্তরাধিকারী আইনের ফলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে এককালের জমিদার কয়েক পুরুষের ব্যবধানে ভূমি-কৃষকে পরিণত হন।[৬৫]

মুসলমান আমলে লাখেরাজ বা নিষ্কর রায়তিস্বত্বের অধিকারা এক শ্রেণীর ভূমি-মালিক ছিলেন। সমাজের উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা ও গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি এসব লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। মসজিদ, মন্দির, দরগাহ নির্মাণ, ধর্মানুষ্ঠান পালন, এমন কি নিঃস্ব ভিখারী ও মুসাফিরের জন্য লাখেরাজ দানস্বত্ব ছিল। খোন্দকার ফজলে রাব্বি এরূপ ভোগদখলকারীর ২৭ প্রকার নাম করেছেন, যেমন জায়গীর, আল-তমঘা, মদদ-ই-মাশ, আয়মা, মসকান, নজুরত খানকাহ, ফকিরান, নজরি দরগাহ, নজরি ইমামাইন, জমিন-ই-মসজিদ, নজরি হজরত, খরচি মুসাফিরান, মেরামতি মসজিদ, মা-আফি, পীরান, খয়রাতি, খারিজ জমা, মিনহাই, ব্রহ্মোত্তর, মেহতেরান, মালেক ও মালেকানা, দেবোত্তর, শিবোত্তর, সুরজপর্বত ইনাম ও মানকর।[৬৬] এগুলির মধ্যে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর, সুরজপর্বত, এই পাঁচটি কেবল হিন্দু এবং জায়গীর, আলতমঘা, খারিজ জমা, মিনহাই, মালেকানা, ইনাম ও মানকর এই সাতটি হিন্দু-মুসলমান উভয় এবং বাকী পনেরটি মুসলমানরা ভোগ করত। রাব্বি সাহেব কয়েকটি জেলার কেবলমাত্র আয়মা সম্পত্তির একটি তালিকা দিয়েছেন এরূপে :[৬৭]

বর্ধমান	১,৭০৫
হুগলী	৮৯৪
মুর্শিদাবাদ	৭০০
বগুড়া	৬৯৪
২৪-পরগণা	১৬
মেদিনীপুর	১২
সর্বমোট	৪,০২১

১৮২৮ সালের 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনে' এসব সম্পত্তির অধিকাংশে মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। ফলে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার দরিদ্র অথবা ধ্বংস হয়ে যায়।

বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, নাটোর থেকে শুরু করে ছোটবড়ো জমিদারী এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যায়। যাঁরা জমিদারী কিনতেন, তাঁরা বেশির ভাগ কলিকাতার নব্য বিত্তবান।[৬২] তাঁরা কোম্পানির দেওয়ানী, বেনিয়াগিরী, মুৎসুদ্দীগিরী, দালালী, গোমস্তাগিরী, পোদ্দারী, মহাজনী করে টাকা উপার্জন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ শ্রেণী হিন্দু সমাজের লোক। পুরাতন হিন্দু ও মুসলমানের জমিদারী নব্য হিন্দু বিত্তবানের হাতে যায়। ১৮৭২-৭৩ সনে বাংলা বিহারের মোট ৩৮টি জেলায় জমিদারের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :[৬৩]

বড় জমিদারী (২০,০০০ একর ও তদূর্ধ্বে)	৫৩৩
মাঝারি জমিদারী (৫০০-২০,০০০ একরের মধ্যে)	১৫,৭৪৭
ছোট জমিদারী (৫০০ একরের নীচে)	১৩৭,৯২০
সর্বমোট	১৫৪,২০০

১৮৭১-৭২

সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্ব-উপস্বত্বভোগী ও কর্মচারীদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার নিম্নরূপ একটি তালিকা দেওয়া যায়।[২৭]

সারণি—৭

কৃষক	৬৩৯১০৭৪
জমিদার	৪২৬১৮
ইতমামদার	৫৮৬
ঠিকাদার	৩০৩
ইজারাদার	৩৩৫৪
লাখেরাজদার	২৩০৭০
জায়গীরদার	৩৬৫
ঘাটোয়াল	৬৬৮
আয়মাদার	২৩০৪
মকরারীদার	৯৯০৩
তালুকদার	৯৬০৫১
পত্তনিদার	৩৩০২
খোদকস্ত প্রজা	৭৫৫২
মহলদার	১১২৮
জোতদার	১৯৫৬৪
গাতিদার	৩৮২৪
হাওলাদার	৯৩৪৩
গোমস্তা	১৮৪০২
তহশিলদার	১০৫৪৬
পাটোয়ারী	১৩৭৬
পাইক	১৪৭৯৭
জমিদারের ভৃত্য	১১০৩০
দফাদার	২০২
দেওয়ান	১০৪
মণ্ডল	১৬২০
নায়েব	৫৮১
এস্টেট ম্যানেজার	২১

হিন্দুর সহিত তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম হলেও তাঁদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করার মত ছিল না। বরং গ্রামজীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে তাঁরাই সমাজের কর্ণধার হিসেবে কাজ করেছেন। প্রয়োজনে তাঁরাই সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিঞা মধ্যবিত্ত জোতদারের সন্তান ছিলেন ; ওয়াহাবী আন্দোলন বাংলার কৃষকের ঘর থেকে মুজাহিদ (স্বেচ্ছা-বাহিনী) ও চাঁদার অর্থ সীমান্ত-শিবিরে শহরের মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অনেক আগে গ্রামের জোতদার-তালুকদারগণ কৃষকদের সংগঠিত করে 'শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। অবশ্য উভয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি আলাদা ছিল বলেই এরূপ সম্ভব হয়েছে।

১৯৫০ সালের এক হিসাবে জানা যায় যে, বাংলার ২,২৩৭ জন বৃহৎ ভূস্বামীর ভেতর মুসলমান ভূস্বামীর সংখ্যা ছিল ৩৫৮ এবং তাদের অধিকাংশই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার বাসিন্দা।[২৫] এছাড়া, ঐ সময়ে পূর্ববংগ সরকারের ভূমিরাজস্ব বিভাগ সূত্রে জানা যায় যে, Eighty out of 89 Estates with an annual income of over Rs. 1,00,000 and 122 out of 137 Estates earning between Rs. 50,000 and Rs. 100,000 annually were owned by the Hindus।"[২৬] এদিক থেকে বলা যায় যে, মুসলমানদের ভেতর যারা উচ্চতর ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীভুক্ত তারা হিন্দু উচ্চ-জাতিবর্ণের ভূস্বামীদের কনিষ্ঠ সহযোগী বৈ কিছু নয়।

উৎস ঃ ওয়াকিল আহমেদ ও রঙ্গলাল সেন এর গবেষণা গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানী সরকার এক সুশৃঙ্খল, সুসংহত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো গড়ে তোলে। যে সব বনিক–বণিক ব্যবসায় ত্যাগ করে প্রথম হাত জমিদারী ক্রয় করেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সমাজ কাঠামোর একপ্রান্তে ছিল গ্রামে বসবাসকারী সদ্য-অধিকারচ্যুত স্বত্বহীন কৃষক সমাজ। কারিগর শ্রেণীর লোকেরাও তাদের বৃত্ত হারিয়ে কৃষক সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করে — অন্যপ্রান্তে জমিদার সামন্ত শ্রেণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে যেসব বণিক জমিদার হয়ে শহর কলকাতায় বসবাস করেন তারা কিন্তু ইংল্যাণ্ডের টিউডর যুগের (১৪৮৫-১৬০৩ খ্রীঃ) নব্য-ভূস্বামী (Landlord) দের সঙ্গে কোনক্রমে তুলনীয় নন। জমিদারদের একটি স্বল্পাংশ পুরানো অভিজাত সামন্ত বংশধর ছিলেন। তাদের মধ্যে নদীয়া রাজ, বর্ধমানরাজ, রাজশাহীরাজ, চাঁচড়ারাজ, মহেশপাশারাজ, দিনাজপুরের রাজবংশ উল্লেখযোগ্য। এসব পুরনো সামন্ত পরিবার ছিল মূল বঙ্গজ সমাজপতি এবং ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

তথাপি কলকাতার জমিদাররা শিক্ষা-ঐশ্বর্যে বলীয়ান হয়ে বঙ্গজ সামন্ত সংস্কৃতি লালন করতে চেষ্টা নিয়ে সমগ্র বাংলা সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।[১১] বড় বড় জমিদারা গ্রামে গ্রামে অসংখ্য তালুকদার, পাওনিদার বা জোতদার সৃষ্টি করেন। এরা ভাবাদর্শে ও জীবনধারার বিচারে ক্ষুদ্র সামন্ত এবং গ্রাম্য সমাজের উপর প্রভাবশালী এবং উদীয়মান শক্তি কাঠামোর প্রথম ধাপ। বিত্তের হিসাবে এরা ভূমিজ মধ্যবিত্ত হিসাবে পরিচিত হলেও কোন ক্রমেই তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ বিশেষ মধ্যবিত্ত নয়। ১৮৭২-৭৩ সালের এক পরিসংখ্যানে বাংলার সামন্ত শ্রেণীর একটি চিত্র পাওয়া যায় : বিশ হাজার একরের উর্ধ্বে ভূস্বামীর সংখ্যা ৫০০ জন, ৫০০ হতে ২০০০ একরের ভূস্বামী ১৬০০ জন, ৫০ হতে ৫০০ একরের ভূস্বামী ছিল ১,১৫০০০ জন। আরো জানা যায়, জমিদার, জোতদার ও তাদের আমলা-কায়েনা মিলে ৭ লক্ষ লোকের একটি সামন্ত সামাজিক স্তর তৈরি হয়েছিল।[১২]

১৮৭২ এর আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলার ২৭টি জেলায় জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৩৭২৫৪টি। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গে (যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা) এর সংখ্যা ছিল ২৪৯২২টি। পূর্ববঙ্গে জমিদারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল চট্টগ্রামে ১৩০৪৪টি। ঐ আদমশুমারীতে কৃষক ও জমিদারের মাঝে উপস্বত্বের দেওয়া তালিকা থেকে পূর্ববঙ্গের এ তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। কোন অঞ্চলের কোন স্তরের সংখ্যা বেশী তা বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে।

জমিদার	২৪২৩২
ইজারাদার	৫৮৩ (একমাত্র চট্টগ্রামে)
তালুকদার	১৭২ (সিলেটেই ১৬৮ জন)
টেকেদার	২৩৫৩ (ত্রিপুরাতেই ১০৮৮ জন)
লাখেরাজদার	১১,৯৪১ (সিলেটেই ৮৮৮৫ জন)
চাকরানদার	২৯ (রাজশাহীতেই ২৬ জন)
ঘাটোয়াল	৬০ (একমাত্র যশোরে)
তালুকদার	৫২,১৯৫ (চট্টগ্রামে ১৭,৩০০ জন)
পত্তনিদার	১৭৮২ (সিলেটে ৫২৩ জন)
মহলদার	১২৬ (নোয়াখালীতে ২১ জন)
জোতদার	৫৮২৫ (যশোর ৫০১৭)
গাঁতিদার	২৬৭ (একমাত্র যশোরেই)
নোকদা	৮৫৩২ (চট্টগ্রামে ১৮০৬)
তহশীলদার	৮৪৮৩ (ঢাকা ২০১৬)
পাটোয়ারী	৮৩১ (দিনাজপুরে ২৪৬ জন)
পাইক	১৭৫৫ (রাজশাহীতে ১৭৭০)
জমিদারের ভৃত্য	৩৬৭৫ (সিলেটে ২৯৮৬। কিন্তু আদমশুমারীতে দেখানো হয়েছে নোয়াখালীতে এর সংখ্যা মাত্র ১ জন। তা কি ভাবে সম্ভব?)
দফাদার	৬০ (পাবনা ২২ জন)
দেওয়ান	৫০ (ঢাকায় ৩০ জন)
মণ্ডল	১১১৭ (ময়মনসিংহে ৪৮৬ জন)
নায়েব	৭৪ (পাবনা ২৪ জন)
এস্টেট ম্যানেজার	২৮ (বাখরগঞ্জ ৯ জন)

বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন, *Census 1872.*

১. উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সবচেয়ে বেশি ছিল ময়মনসিংহে (৯০০০), তারপর মেদিনীপুরে (৩০০০), চট্টগ্রামে (১৫০০) ও ঢাকায় (৪০০)। দ্রষ্টব্য সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, "বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০)", (কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ ২৬৩।

২. উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা জেলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে তালুকদারের সংখ্যা ছিল ৩৮০, যা ১৮৩৬-৩৭ সালে ৭১৫৪ এ দাঁড়ায়। এছাড়া, অন্য এক হিসাবে জানা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাত্র এক দশক পরে ১৮০৩ সালে ঢাকা ও বাখরগঞ্জে (শেষোক্ত জেলা তখন ঢাকা ক্যালেক্টরেটের অধীন ছিল) ভূম্যধিকারীর সংখ্যা ১৬,০০০ এ পৌঁছায়, এবং এর ফলে রাজস্বের পরিমাণ সাড়ে বার লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, ১৮৩৬-৩৭ সালে ঢাকা জিলায় এক হাজার টাকার উপরে রাজস্ব দাতাজমিদারের সংখ্যা ছিল ৬৩, এদের ভেতর ৪০ জন হিন্দু, ২০ জন মুসলমান ও ৩ জন খৃষ্টান। আর ৪০ জন হিন্দু জমিদারের ভেতর ১১ জন ব্রাহ্মণ, ৮ জন বৈদ্য, ১৪ জন কায়স্থ ও ৭ জন শূদ্র। শেষোক্তরা খুব সম্ভব নবশাখা ভুক্ত, যাদের সৎ শূদ্র বলা হয়। Taylor, op. cit, p. 156, pp. 208

৩. উল্লেখ্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগেও বাংলাদেশে পত্তনী প্রথার অস্তিত্ব ছিল। তবে একথা ঠিক যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই এ প্রক্রিয়াকে জোরদার করে, এবং ১৮১২ সালের পত্তনী আইনের মাধ্যমেই এটা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

৪. অবাধ পত্তনী প্রক্রিয়ার ফলে ১৯২১ সালে বাংলার মধ্যস্বত্বভোগী খাজনা গ্রাহক পরিবারের সংখ্যা ১,৩১৯,৩০২-এ পৌঁছায়।

উৎস : মুসা আনসারী ও মুনতাসির মামুন এর গবেষণা গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার ক্ষুদ্র মুসলিম অভিজাত শ্রেণী যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৃহত্তর কৃষক জনসাধারণ, যাদের ভেতর অধিকাংশই মুসলমান। ১৯১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলার লোক-সংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ মুসলমান, ৪৫ ভাগ হিন্দু ও অবশিষ্ট অন্য ধর্মাবলম্বী।[১২] কিন্তু অন্যপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যারা লাভবান হয় তারা অধিকাংশই বাংগালী হিন্দু উচ্চ জাতিবর্ণভুক্ত এবং তাদের পূর্বপুরুষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে প্রাক্-বৃটিশ যুগের ভূমিব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় জমির নব্য মালিকশ্রেণী হিসাবে এরা তাদের উত্তরাধিকারীরূপে বৃটিশ-প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থায় ফায়দা লুটবার পরম সুযোগ পেয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে দেখা যায় জাতি-বর্ণের দিক থেকে বাংলার ভূমিমালিকানা বেশির ভাগই একটি ক্ষুদ্র ধনী হিন্দু উচ্চ-শ্রেণীর ভেতর কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ বরিশাল জেলায় (যেটা ফজলুল হকের জন্মস্থান) শতকরা ৬৪.৮ ভাগ মুসলিম জনসাধারণ মাত্র ১০ ভাগেরও কম জমি-জমার মালিক, এবং আদায়কৃত রাজস্বের মাত্র শতকরা ৯ ভাগ তাদের তরফ থেকে প্রাপ্ত। অনুরূপভাবে আরেকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ময়মনসিংহ জেলায় জমির মালিকদের মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ মুসলমান এবং তারা আদায়কৃত রাজস্বের মাত্র ১০ ভাগের সামান্য কিছু বেশি সরকারকে দেয়।[১৩] এভাবে অতিশীঘ্রই, বিশেষ করে বাংলার ভূমিমালিকদের

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর মাত্র ৯৩ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে, জমিদারদের দেয় খাজনার পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন থেকে ১৮০ মিলিয়ন টাকায় পৌঁছায়।[১৪] এ অবস্থায় একদিকে ভূমিহীন কৃষক ও যৎসামান্য জমি-জমার মালিক কৃষকরা লোভী মহাজনের কাছে ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং অন্যদিকে মহাজন ও বৃহৎ জমিদারসহ সকল মধ্যস্বত্বভোগীদের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা বলতে গেলে এক পরজীবী অনুৎপাদক শহুরে গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ এরা বৃহত্তর কৃষক জনগোষ্ঠীর শ্রমে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রধান উপভোগকারীতে পর্যবসিত হয়। দরিদ্র কৃষককুলের আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়ে যে সেজন্যে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরীন ১৮৮৭ সালে এক ফরমান জারী করে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে একটা জরীপ কার্য চালাবার নির্দেশ দেন, এবং এর ফলে যে সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাতে দেখা যায় ভারতবর্ষের শতকরা ৪০ ভাগ গ্রামীণ জনসাধারণ দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবনধারণ করে, অর্থাৎ বাঁচার মতো ন্যূনতম আহার্য ও তাদের জোটে না। ঐ Dufferin Enquiry of 1888 revealed that "Over

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতিতে রাজস্ব, জমিদারী খাজনা ও মহাজনী সুদের হার বৃদ্ধিতেই শুধু ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা ও তাদের সংখ্যা বাড়েনি, ১৮৩৩ সালের Charter Act অনুযায়ী ভারতে বিলেত থেকে পুঁজি আমদানির ফলে দেশীয় কুটিরশিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্যে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।[১৭] ফজলুল হকের কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবনের সমকালীন বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষিতে নিযুক্ত লোকসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি থেকে তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের একটা নিখুঁত চিত্র পাওয়া যেতে পারে। যেমন, ১৮৮১ সালে মোট জনসংখ্যার ৫৯.৬ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত ছিল, যা ১৮৯১ সালে ৬১.০৬ ভাগে, ১৯০১ সালে ৬৬.০০ ভাগে ১৯১১ সালে ৭৭.২০ ভাগে, এবং ১৯২১ সালে ৭২.৯৮ ভাগে উন্নীত হয়।[১৮] অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশে সামগ্রিক ভাবে যে বাড়তি লোকসংখ্যা দেখা যায় তার প্রায় সবটাই ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়ে তাদের বর্তমান সংখ্যা আরও বাড়িয়ে তুলে। এই নিদারুণ পরিস্থিতিটা কার্ল মার্কসের ভারত সম্বন্ধীয় মূল্যবান নিবন্ধে বিবৃত ভারতে বৃটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক (Destructive)[১৯] ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে শুধু ভূমিহীন দরিদ্র খেত-মজুরের সংখ্যাই বাড়েনি, মধ্যস্বত্বভোগী Rentier class-ভুক্ত লোকের সংখ্যাও ক্রমশঃ চক্রবৃদ্ধিহারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হতে বাড়তে থাকে "by the processes of parcelling out of old zamindaries and sub-infeudation and sub-letting।"[২০] উদাহরণস্বরূপ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে পত্তনী প্রথার (Sub-infeudation) বহুল প্রচলনে কিভাবে বাংলায় একদিকে মধ্যস্বত্বভোগী ও খেত-মজুরের সংখ্যা বেড়েছিল এবং অন্যদিকে ছোট, মাঝারী ও মোটামুটি সচ্ছল কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল তার একটা নমুনা হিসাবে নিম্নের পরিসংখ্যানগুলি উদ্ধৃত করা হ'ল। যেমন, ১৯২১ সালে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা ছিল ৩,৯০,৫৬২, যা পরবর্তী দশ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে ৬,৩৩,৮৩৪-এ পৌঁছায়; অর্থাৎ এদের সংখ্যা শতকরা ৬২.২৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এবং খেত-মজুরের সংখ্যা যেখানে ১৯২১ সালে ১৮,০৫,৫০২ ছিল সেটা ১৯৩১ সালে ২৭,১৮,৯৩৯-এ দাঁড়ায়। অর্থাৎ এদের সংখ্যাও শতকরা ৫০. ৫৯ ভাগ বাড়ে। আর অপরদিকে যারা বাংলার কৃষিভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যস্তরে অবস্থান করছে তাদের অর্থাৎ রায়ত অথবা মালিক কৃষক শ্রেণীর সংখ্যা যেখানে ১৯২১ সালের ৯২,৭৪, ৯২৪ ছিল তা ১৯৩১ সালে হ্রাস পেয়ে ৬০,৭৯,৭১৭ হয়। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা শতকরা ৩৪.৪৫ ভাগ কমে যায়।[২১]

এখানে একথাটি উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে, যে পত্তনী-প্রথা মধ্যস্বত্বভোগী ও দরিদ্র ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধিকারী একটি ক্ষতিকর ব্যবস্থা তা বাংলার সব কয়টি জেলাতে কমবেশি প্রচলিত থাকলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ব বাংলার জেলাগুলিতে এর প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তার পিছনে অবশ্যই ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণ রয়েছে। ভারতীয় ভূমিব্যবস্থা বিশারদ বাংলার খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানী রাধাকমল মুখার্জী পরিসংখ্যান দিয়ে এটা প্রমাণ করেছেন যে, ১৯২০ সাল নাগাদ পূর্ববংগের জেলাগুলিতে চূড়ান্ত পর্যায়ে একজন বৃহত্তর ভূম্যধিকারী কর-প্রাপকের অন্ততঃপক্ষে ১২ থেকে ৫৮ জন পর্যন্ত অধস্তন রাজস্ব-আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। কিন্তু পশ্চিমবংগের জেলাগুলিতে এদের সংখ্যা মাত্র ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত ছিল।[২২] উপরোক্ত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, পূর্ববাংলা যার বর্তমান রাজনৈতিক নাম বাংলাদেশ সেটা বৃটিশ আমলের শেষ অর্ধশতাব্দীতে বস্তুত পক্ষে মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা প্রভাবিত একটি দেশ ছিল। তন্মধ্যে যে জেলাটি ফজলুল হকের জন্মস্থান সেই বরিশালই ছিল সবচেয়ে বেশি পত্তনী প্রথা প্রপীড়িত অঞ্চল। সেখানে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা ৫২-তে উঠেছিল।[২৩] এখানে বৃটিশ শাসনের শেষ দশকে বাংলার কৃষিভিত্তিক সামাজিক কাঠামোয় হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক অবস্থান কিরূপ ছিল তার একটা চিত্র ধরলে বোধহয় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। রামকৃষ্ণ মুখার্জী তাঁর এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, যেখানে ১৯৪৬ সালে বাংলার মোট জনসংখ্যার ভেতর মুসলমান কুদে জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষকের হার শতকরা ৩ ভাগ, সেখানে এসব শ্রেণীর হিন্দুদের হার শতকরা ৫ ভাগ। মুসলিম জনগোষ্ঠীভুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিক-কৃষকের হার শতকরা ৪৪ ভাগ, আর হিন্দু জনগোষ্ঠীভুক্ত এদের হার শতকরা ৩৭ ভাগ। মুসলিম বর্গাদার ও খেত-মজুরের হার শতকরা ৫৩ ভাগ, আর ঐসবশ্রেণীভুক্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হার শতকরা ৫৮ ভাগ।[২৪] উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা বোঝা যায় যে, যদিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলায় সংখ্যানুপাতের দিক থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে মুসলমানদের হার কম তবুও নেহাৎ নগন্য নয়। কেননা তাদের হার হিন্দুদের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য একটু বেশি বৈকি। তবে একথা ঠিক যে, বৃহৎ জমিদারদের ভেতর (যাদের হার উপরোক্ত চিত্রে পাওয়া যায়নি) গুটিকয়েক মুসলিম জমিদার বাদে প্রায় সবই হিন্দু উচ্চজাতিবর্ণভুক্ত

উৎস ঃ রঙ্গলাল সেন, সমাজ কাঠামো ঃ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ২ ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় সংশ্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ২.১ ঃ ১৭৭৮ সনে প্রকাশিত র‍্যানেলের মানচিত্রে 'আতিয়া' পরগনার চিত্র।

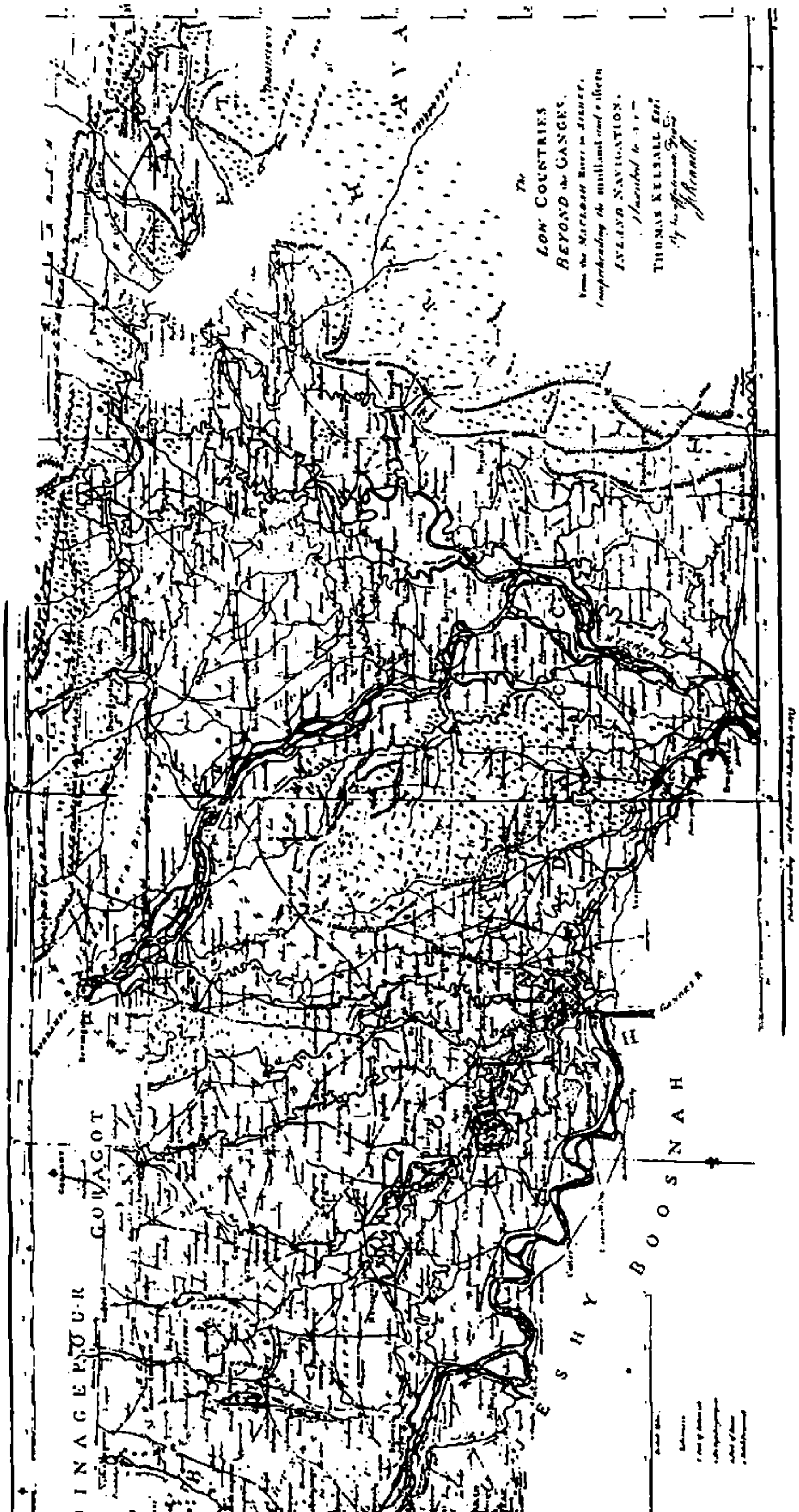

উৎস ঃ ওল্ড ম্যাপ ভল্যুম, ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২.২ ঃ ১৮৪৮-৫২ সালের রেভেনিউ সার্ভে, 'আতিয়া' পরগনা এর ৫ খন্ডে প্রণীত ফিল্ডবুকের প্রতি খন্ডে প্রদত্ত সাধারণ তথ্য (প্রথম খন্ডের প্রথম পাঁচ পাতা)।

TOPOGRAPHICAL ITEMS.

No.	Item	Colour	No.	Item	Colour
1	City or Town	Lake	35	Sluice Gate (of Masonry Large)	Lake
2	Village	Burnt Sienna	36	Iron Suspension Bridge	
3	Deserted Village		37	Nuddee	
4	Haut or Bazar	Lake	38	Ferry	
5	Pucka Fort	D°	39	River	
6	Mud Fort	Burnt Sienna	40	Paun Garden	
7	Pucka Houses	Lake	41	Garden	
8	Pagodah or Hindoo Temple	D°	42	Mango Tope	
9	Musjid or Mahomedan Temple	D°	43	Tamarind Trees	
10	Salt Golah	Burnt Sienna	44	Palmyra or Tar Trees	
11	Dak Bungalow	Lake	45	Cocoanut Trees	
12	Indigo Factory	Prussian Blue	46	Date D°	
13	Silk D°	Burnt Sienna	47	Betel Nut Trees	
14	Sugar D°	Lake	48	Bamboo Jungle	
15	Burial Ground	Burnt Umber	49	Forest D° (Large & Small Trees intermixed)	
16	Pucka Wells	Lake	50	Low D°	
17	Kucha Well	Burnt Sienna	51	Jhow D°	
18	Deputy Magistrates & Moonsiff's Kutcherry	(Lake)	52	Grass D°	
19	Thannahs	Gamboge	53	Waste or Grazing Ground	(Flat Shade of Green)
20	Police Chowkeys	Blue	54	Salt Waste	(Burnt Umber with Ink Dots)
21	Signal Staff	D° & Lake	55	D° With Jungle intermixed	(Salt Waste shade with Trees)
22	Light House	Lake	56	Salt Pans	
23	Pucka Semaphore or Telegraph	D°	57	Ravines	
24	Boundary or Revenue Survey Pillar D°		58	Jheel	
25	D° Wooden Post	Burnt Umber	59	Lake or Tank	
26	Principal Stations of the Great Trigonometrical Survey	(Lake)	60	Choor or Sand bed	(Ochre with light Red dots)
27	Secondary D° D° D° D° D°		61	High Ground	(Indian Ink)
28	High Road	Lake with Ink Edge	62	Sand Hills	(Light Red)
29	Village D°	Burnt Sienna with D°	63	Hills (Ridge with Peaks)	
30	Foot Path	Burnt Sienna	64	Ridge	
31	Rail Road	Lake		**For Village Plans**	
32	Bunds	Burnt Sienna	65	Cultivation	
33	Bridge Pucka	Lake	66	Lately thrown out of Cultivation	(Light Green with corn stalks)
34	D° Wooden	Burnt Sienna	67	Fit for Cultivation	(Light shade of Green)

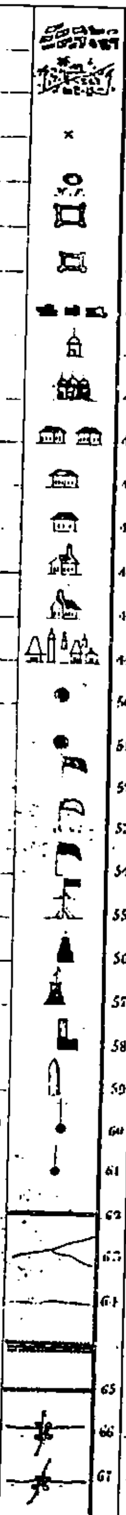

List of Colors, used in these Items

Indian Ink, Prussian Blue, Lake, Light Red, Burnt Sienna & Gamboge

Large Towns above 200 Houses	LIMBAE	Stone Capitals	Style for Purgunnah Title or Adjoining Names — KOTRANG
Smaller or Purgunnah Towns from 100 to 200 Houses	REKCHO	Italic Capitals	

উৎস ঃ ওল্ড ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড অব পরগনা সার্ভে, আতিয়া ফিল্ডবুক, ন্যাশনাল আকাইভস, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

Bengal Beegahs of 14400 Sq. Feet or 1600 Sq. Yards

Acres into Beegahs		Beegahs into Acres	
1	3.025	1	0.330
2	6.050	2	0.660
3	9.075	3	0.990
4	12.100	4	1.320
5	15.125	5	1.650
6	18.150	6	1.980
7	21.175	7	2.310
8	24.200	8	2.640
9	27.225	9	2.970
10	30.250	10	3.300

The Local Beegah Table obtaining in this Subdivision is as follows. Viz

Measure in use		Length of measuring Rod, Rope, Chain &c. or Pole employed		[illegible]	No. of English Acres or fractional parts of an Acre in the highest denomination of Area					
		Feet	Inches		Acres	Roods	Perches	Yards	Feet	Inches
4 Cowries =	1 Gundah	21	10½	20 in length by 6 in breadth or 120 Square Nulls	.5	1	3	70	0	108
7½ Gundas =	1 Pakhee									
16 Pakhees =	1 Khadah									

The Beegah or Khadah is = 918864 Inches or 76572 Sq. Feet or 2552 Sq. Yards. Hence an Acre is = 0.1896254 of a Khadah and a Khadah is = 5.2735537 Acres.

Acres into Khadas or Local Beegahs		Khadas into Acres	
1	0.1896254	1	5.2735537
2	0.3792508	2	10.5471074
3	0.5688762	3	15.8206611
4	0.7585016	4	21.0942148
5	0.9481270	5	26.3677685
6	1.1377524	6	31.6413222
7	1.3273778	7	36.9148759
8	1.5170032	8	42.1884296
9	1.7066286	9	47.4619833

উৎস ঃ ওল্ড ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড অব পরগনা সার্ভে, ন্যাশনাল আর্কাইভস, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

Number	Names of Villages		Contents		
			Area		
	Brought over		60841	3	32
248	Jeghoree	1	67	[illegible]	15
376	Jeghoree	1	64	1	[illegible]
386	Jeghoree [illegible]	1	88	1	[illegible]
216	Jeghoree [illegible]	1	38	[illegible]	[illegible]
292	Jeorera ghera	1	9	[illegible]	[illegible]
251	Ulara	1	125	[illegible]	[illegible]
	Grand Total		61170	2	11

Ext by J. Kennedy

		Area			Total		
		Acres	R	P	Acres	R	P
Note. Detached villages of Pergh Attia surrounded on two sides by Pergs Bablazur & on one side by a detached portion of Pergh Kagmaree ... viz	237 Cram Zafa	107	"	"			
	235 Bool Zafa	122	2	"	229	2	"
Do. On the left bank of the Jumoona River	236 Majoolera	43	"	16	43	"	16
	3 Villages	Total attached			272	2	16
Detached villages of District Dacca situated within the limits of the portion of Pergh Attia bound up ... Pergh Chandupartap	Pachooria	229	[illegible]	[illegible]			
	Buageorie	218	1	"			
	Ant para	107	"	24			
	Agosh	34	"	"			
	Soondulara	57	2	"			
	Shurpbaree	17	1	24	698	1	32
Of Pergh Enahabad	Pachpara	26	"	"	26	"	"
Of Pergh Shahzadpore	Basla	72	"	24	72	"	24
		Total Subtracted			796	2	16

J. Wyatt
Rev. Surveyor

উৎস ঃ ওল্ড ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড অব পরগনা সার্ভে, আতিয়া (১ম খন্ড), ন্যাশনাল আর্কাইভস।

Dhaka University Institutional Repository

উৎস   ঃ   ওল্ড ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড অব পরগনা সার্ভে, আতিয়া (১ম খন্ড), ন্যাশনাল আর্কাইভস।

Dhaka University Institutional Repository

Abstract Statistics

Number of Villages			Hindoo Houses		Mussulman Houses		Total	Hindoos		Mussulmans		Total	Total
[illegible]	[illegible]	Total	Pucka	Kutcha	Pucka	Kutcha	Houses	Agricultural	Non Agricultural	Agricultural	Non Agricultural	Population	No. of [illegible]
127	23	150	2	1286	—	1579	2867	5186	629	7777	2[illegible]	138[illegible]	[illegible]

উৎস ঃ ওল্ড ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড অব পরগনা সার্ভে, আতিয়া (১ম খন্ড), ন্যাশনাল আর্কাইভস।

পরিশিষ্ট-২.৩ ঃ রেভেনিউ সার্ভে প্রণীত গ্রাম বা মহাল ভিত্তিক 'খাসরা ম্যাপ'। পরগনার মোট ৯৫০ টি গ্রামের মধ্যে গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রধান জমিদার বাড়ীর তিনটি গ্রামের জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

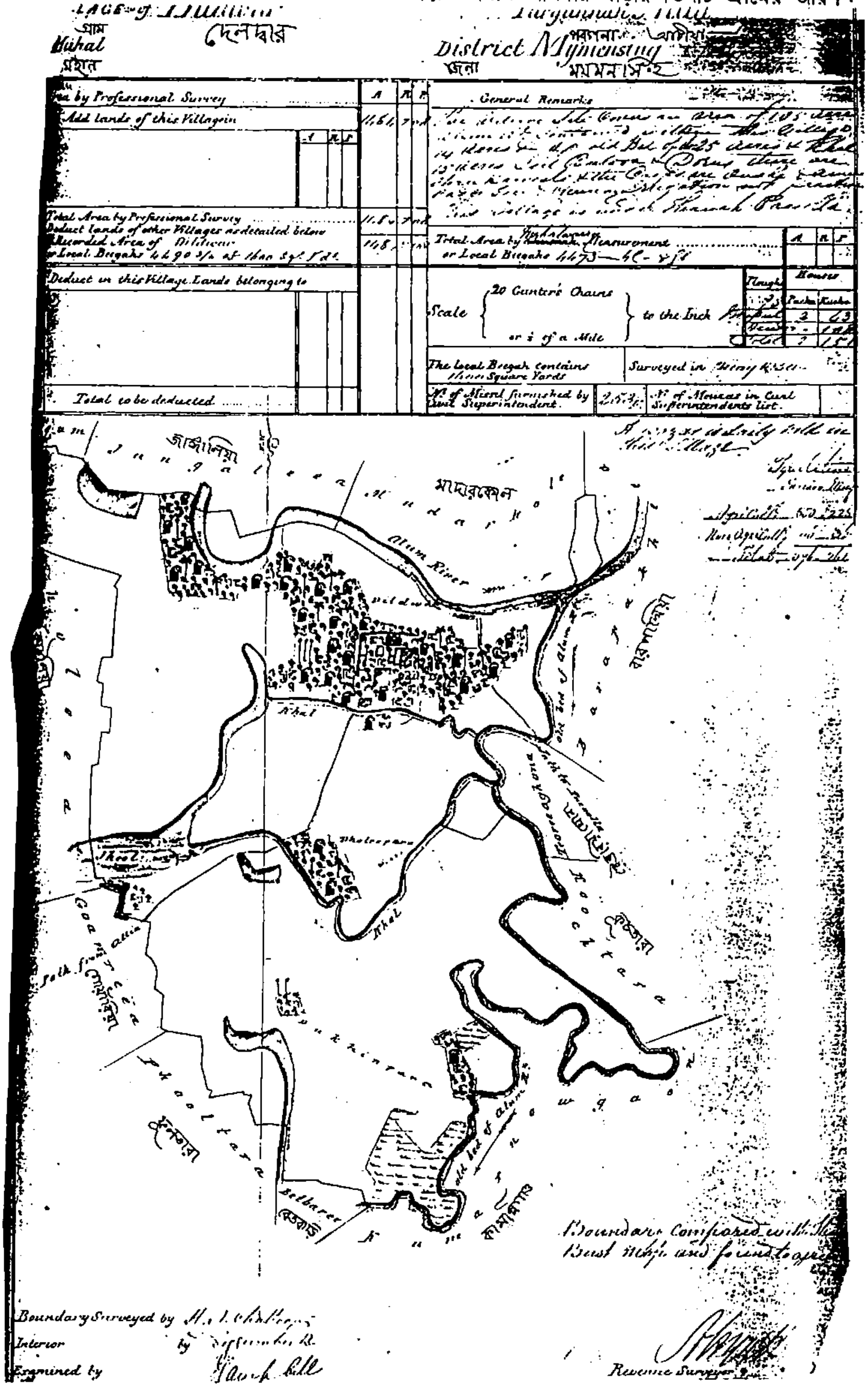

উৎস ঃ পরগনা সার্ভে, আতিয়া (১ম খন্ড) গ্রাম-দেলদুয়ার, ন্যাশনাল আর্কাইভস।

Dhaka University Institutional Repository

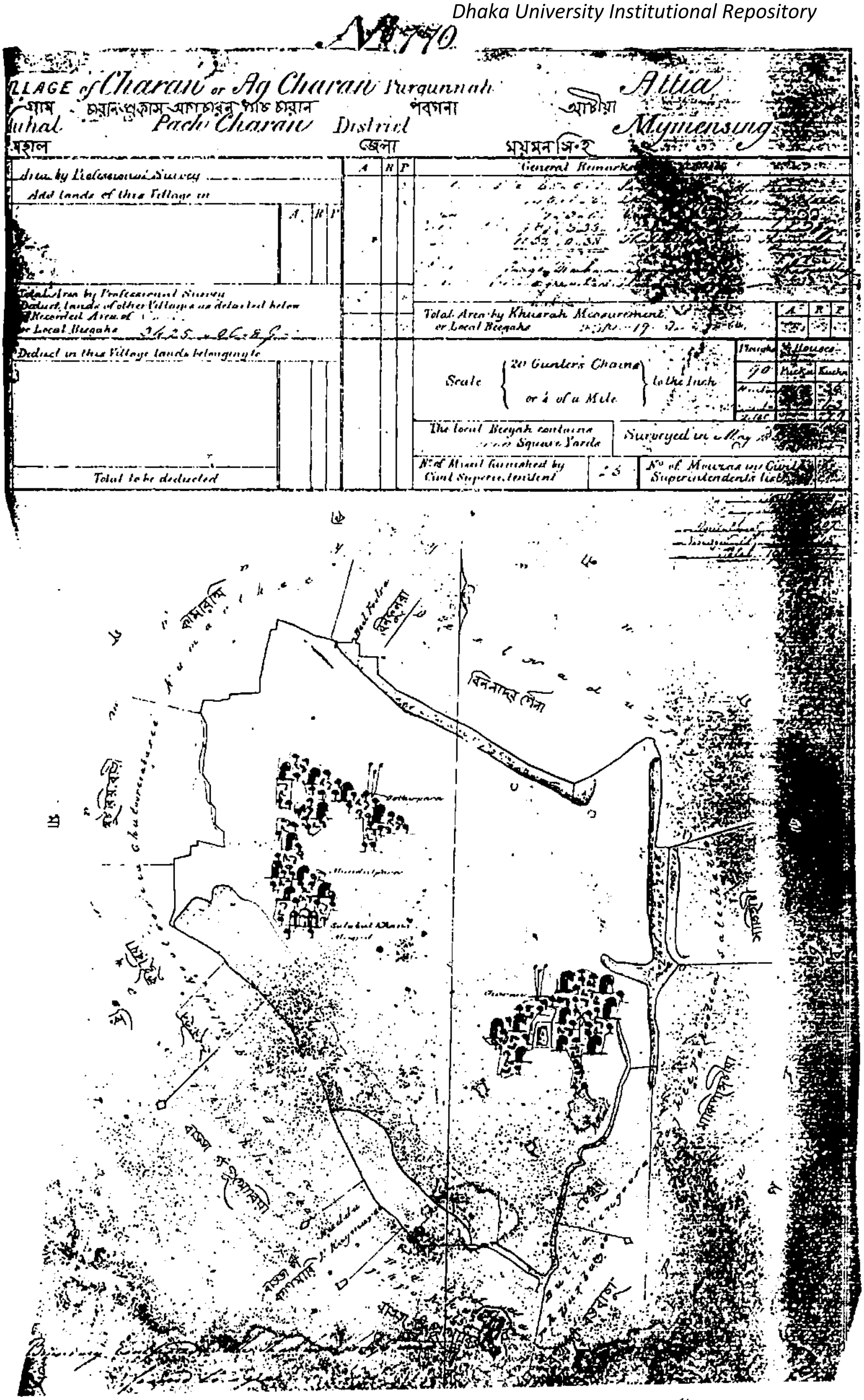

উৎস ঃ পরগনা সার্ভে, আতিয়া (৫ম খন্ড) গ্রাম-চারান, ন্যাশনাল আর্কাইভস।

Dhaka University Institutional Repository

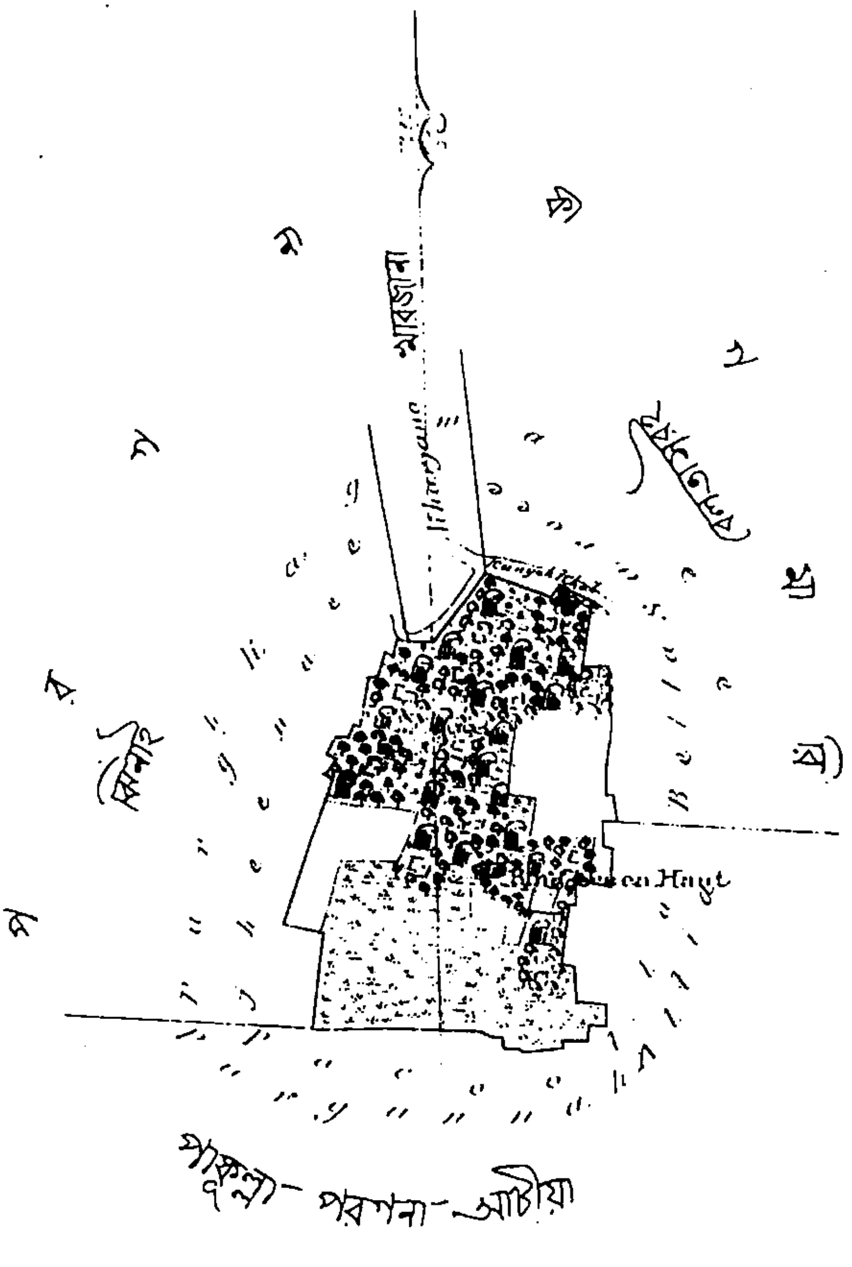

১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জারিকৃত একটি মৌজা ম্যাপ

উৎস ঃ মোহাম্মদ বাকের, টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ২.৪ ঃ ১৮৫০ সালের রেভেনিউ সার্ভে ' আতিয়া পরগনা' এর সাধারণ তথ্য চার্ট।

১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের জরিপে আতিয়া পরগনার মৌজার সংখ্যা ছিল ২৬৩। উল্লেখযোগ্য মৌজাগুলো হচ্ছে-কাউলজান, কল্যাণপুর, কোয়েলা, বাশাইল, কাশিল, মটেশ্বর, ফতেপুর, আদাজান, হাবলা, গুরান, কটরা, উজানবাড়ি, হানালিয়া, দেওভোগ, হাড়ভাঙা, তেতুলিয়া, বাইমহাটি, মির্জাপুর, কয়ড়া, নাগরপাড়া, কৈলভট্ট, পথহারা, ময়মননগর, বৈত্রাসি, গোবরা, কুকরাইল, ছিলিমপুর, রসুলপুর ইত্যাদি। সার্ভে নকশায় আতিয়া পরগনার ভূমির পরিমাণ ছিল ৪৪১৩৩০ একর, ৩ রোড, ৩৪ পোল এবং পরিমাণফল ছিল ৬৮৯.৫৮ বর্গমাইল। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে আতিয়া পরগনার রাজস্ব ছিল ৫৪,১৩৬ টাকা। লোকসংখ্যা ছিল ঃ

কৃষিজীবী মুসলমান – ১৪৭৭৬ জন।
কৃষিজীবী হিন্দু – ১২৮৮৮ জন।
অকৃষিজীবী মুসলমান – ২৩২৮ জন।
অকৃষিজীবী হিন্দু – ২৭১৩ জন।

২১২ টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ২.৫ ঃ ক্যাডাস্টাল সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্টে প্রদত্ত থানা ভিত্তিক মৌজা ম্যাপ সমূহের নমুনা। এতে একটি মৌজার বাউন্ডারী বা তৌজি নম্বর কৃত নকশা এবং তার অধীন ক্ষুদ্র প্লট বা দাগ নাম্বার।

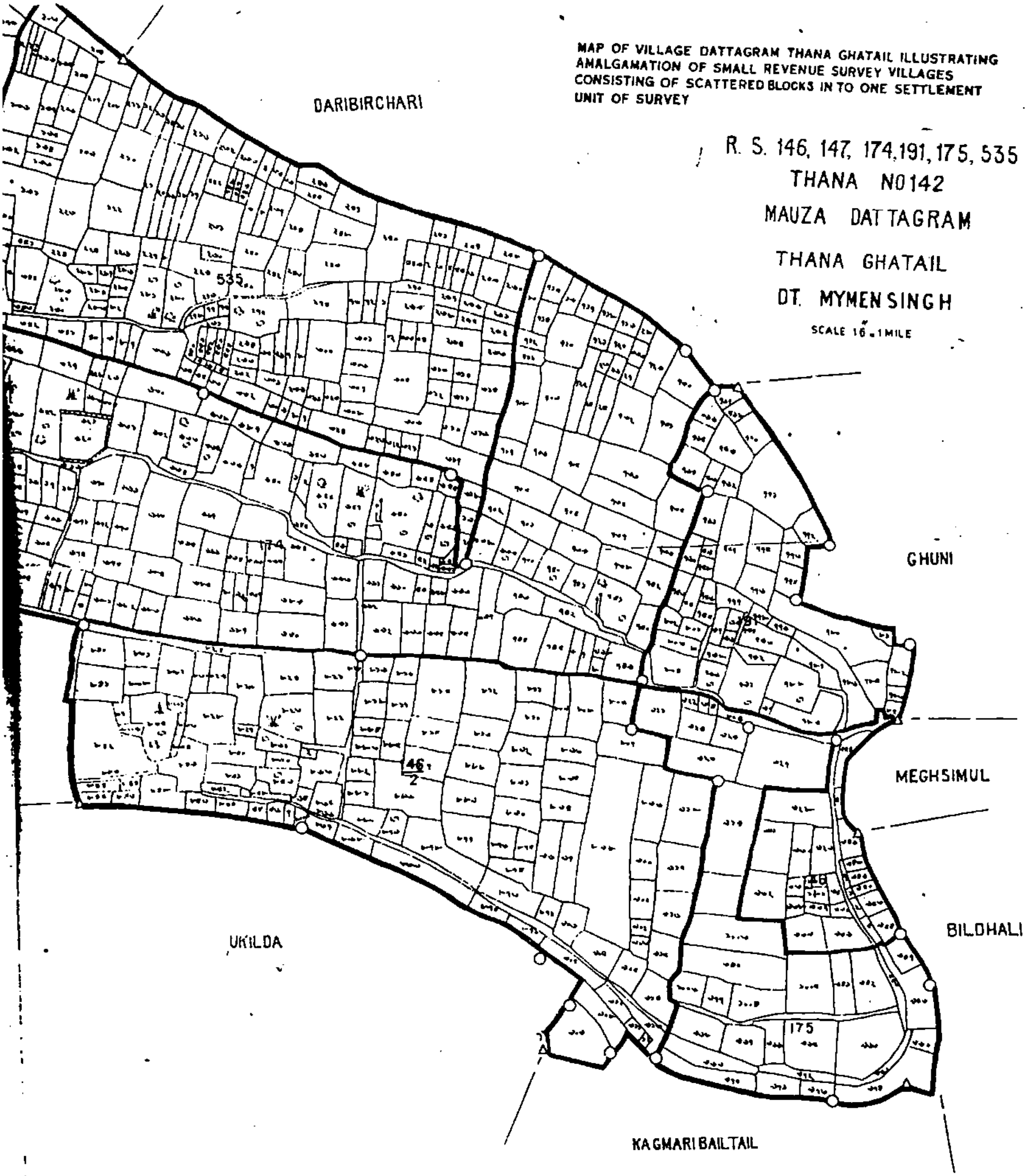

উৎস ঃ ১৯২০ সালে এফ. এ. সাকচী প্রণীত ময়মনসিংহ জেলার ফাইনাল সার্ভে রিপোর্ট।

Dhaka University Institutional Repository

APPENDIX F

MAP OF

PICHURIA, THANA GOPALPUR.

ILLUSTRATING CLOSE AGREEMENT OF THAK CHAKS WITH SETTLEMENT MAPS

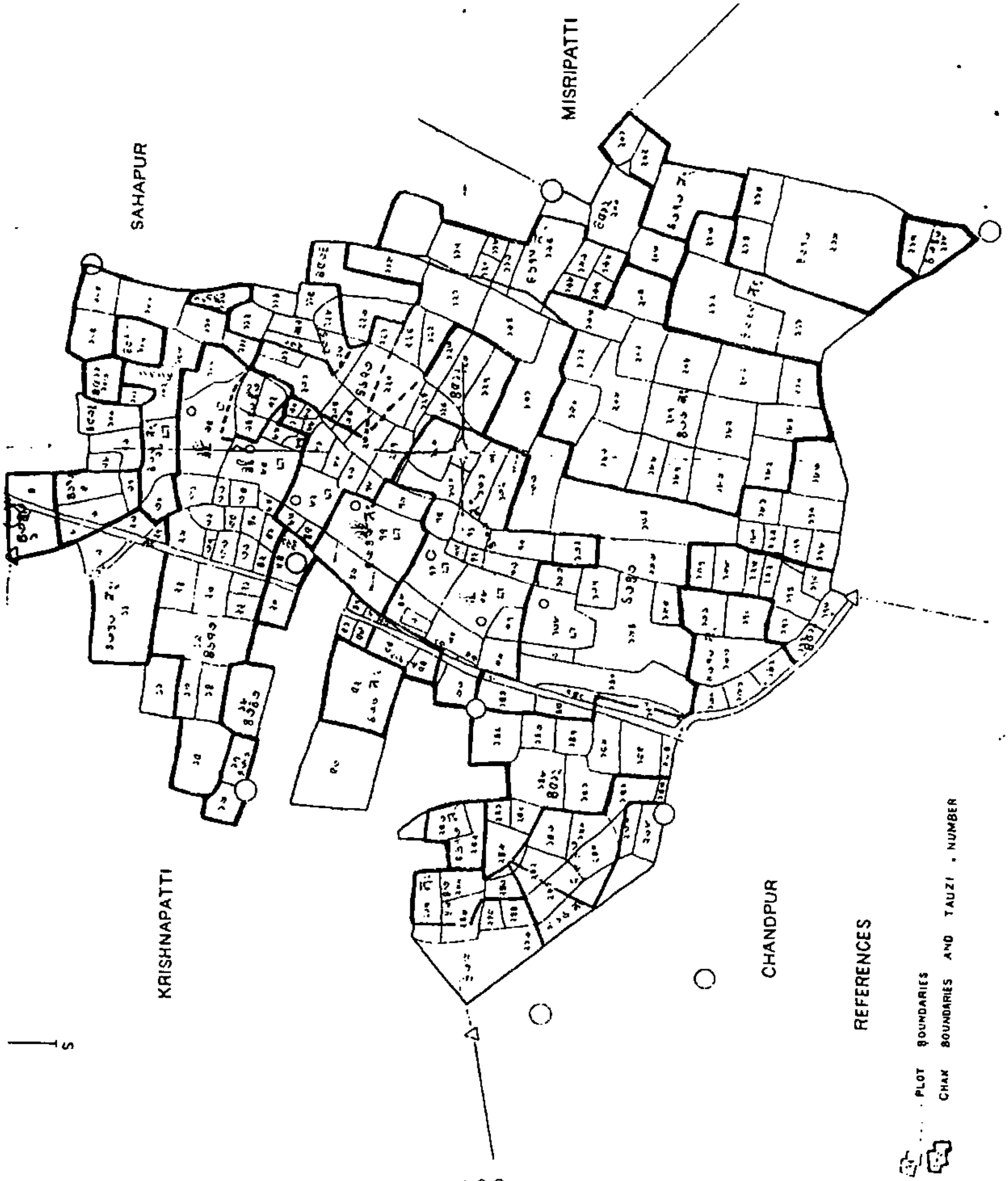

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ২.৬ ঃ জমিদারদের বিভিন্ন এজমালি সম্পত্তির বিভিন্ন তৌজির শরিকদের অংশ বর্ণিত চার্ট।

Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Mymensingh 1908-1919, F.A. Sachse.

Appendix XVI. Nal- Memos or Tables Local Land Measurement

The Scale marked with asterisks are the most usual in the parganas named-

Parganas Atia, Kagmari, Pukhuria, Jafarshahi, BaraBaju and Pratap Bazu-

4 kags ... 1 Kara

4 karas ... 1 Ganda

$7\frac{1}{2}$ Gandas ... 1 Pakhi

16 Pakhis ... 1 Khada

	Length of a hath or cubit inches	Length of anal in haths or cubits	Compos ition of pakhi by nals	Equivalent or a pokhi in acre and decimals		Equivalent oftan acre in pakhi and ganda etc				Remarks
	inches	cubits	Nals	Acre	Dec	Pakhi	Gds	K-	Krs	
Atea	$19\frac{1}{2}$	16	6x5	0	.47	2	1	0	2	
	25	14	6x5	0	.59	1	5	1	1	
Kag	$22\frac{1}{2}$	12	6x5	0	.35	2	6	0	1	
	23	14	6x5	0	.50	2	0	0	2	
	18	16	6x5	0	.40	2	4	0	2	
Pukuria	18	14	6x5	0	.30	3	2	0	3	
	22	14	6x5	0	.45	2	2	2	3	
	20	14	6x5	0	.45	2	1	2	3	
	22	12	6x5	0	.33	3	1	0	0	
	19	$16\frac{1}{2}$	6x5	0	.49	2	0	3	0	
	$19\frac{1}{2}$	14	6x5	0	.35	2	0	0	1	
Bara Baju	24	14	6x5	0	.54	1	6	1	2	

উৎস ঃ এফ.এ. সাকচীর ফাইনাল সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, পরিশিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

Apendix XIX List of Important Notification

S.N	Acts	
1.	Bengal Survey(Actc (V of 1875)Section-3	
2.	Bengal Teinancy Act, VIII of 1885 Section 101(1)	Preparation of a Records of right
3.	Act IX of 1847, Section-3, Diara operations	
4.	Bengal Tinancy Act, (VIII of 1885), section 101(2) D	
5.	Bengal Tenancy Act, (VIII of 1885), Section 114	0
	Personal Notification	
3.	Regulation VII of 1822	0
4.	Regulation XI of 1825	0
5.	Regulation III of 1828	0
6.	Regualtion, IX of 1833	0
7.	Bengal Tenancy Act, VIII of 1885, section54	
8.	Bengal Census Act, IX of 1880, power of collector under chap-II, IV, VII of Act 1 or 1880	
9.	Bengal Tenancy Act, 1885 section, 198A, powers	
10.	Bengal Tenancy Act , 1885 , Section 109, power	

Appendix XXI (a)

* Specement Khatians of Shalika to Illustrate system of Ijmali Khatians
* Village- Shalika- Pargana -Atia
* Thana Madhupur- Distri- Mymensingh
* Tanawarar No- 231- Touzi no-9, 10,11,12,5031-35,5151-5153
* Serial No of Their Khatian- 211, R.S. No.799

Sl. no.	Particulars and holders	Shares				
		An	G	K	Kr	Tib
1.	Possession of Syed Fayzal Bari Mohammad Altab Ali Chowdhury	0	4	0	2	0
	life interst Izara possession of Nawab Abdus Soban Chowdhury	0	0	0	0	0
2.	Syed Ahmmad Hossen chowdhury and others	0	4	0	2	0
3.	Syed Ahmmad Hossen Chowdhury and others	0	1	0	0	12
4.	Honourable Mr Abdul Karim Abu Ahmed Gaznabi	0	2	3	2	8
5.	Abdul Halim Abu Hossain Gazanavi	0	2	3	2	8
6.	Motali possession of Honourable Mr. Abdul Karim Abu Ahmed Gaznabi	0	7	2	0	15
7.	Samsherenessa Khatun Chowdhurani and others	0	7	2	1	2
8.	Abdul Rahman Chowdhury	0	1	1	1	0
9.	Abdul Hakjan chowdhury	0	1	0	0	11
10.	Motali possession of Ali Mohammad Khan Chowdhury	0	5	3	0	0

11.	Ali Ahmad Khan Chowdhury	0	1	1	0	6
12.	Syedali Khan Chowdhury	0	0	2	1	6
13.	Asira Khatun Chowdhury and others	0	0	0	2	9
14.	Nowab Habibullah Bahadur and others	0	0	2	1	10
15.	Wajed Ali khan panni	0	0	3	1	2
16.	Hyder Ali Khan panni and others	0	0	1	2	15
17.	Gircish chandra Roy chowhdury and others	0	0	1	0	0
18.	Sabhaness Khatun chowdhurani	0	0	0	2	5
19.	Basiranessa Khatun chowdhurani and others	0	2	1	2	3
20.	Rajndra Kumar Ray Chowdhury and others	0	3	2	1	9
21.	Rahimanessa Khanam Chowdhurani	0	0	0	1	13
22.	Ali Mahmmad Khan Chowdhury and others	0	0	0	0	c
	Patni possessioan of Rajendra Kumar Ray Chowdhury and others	0	0	3		

Touzi No. 10

31	Matuali possession of Nawab Habibullah Bahadur	2	4	1	1	0
32	Wazedali Khan panni	1	17	2	2	9
33	Hyderali Khan panni and Others (under court of words)	0	19	1	0	11

Touzi no-11

34	Syed Ahmad Sarip Abdul Hafiz and others	0	3	0	0	0
35	Girish Chandra Ray chowdhury and others	0	1	2	1	10
36	Asrafannessa Begam Pattani possession of Girish Chandra Ray chowdhury and others	0	0	1	1	10

Touzi no-12

37	Sarat Chandra Ray chowdhury	0	7	1	1	12
38	Jogendra Lal Ray Chowdhury and others	0	6	2	0	15
39	Jotindra Mohan Ray Chowdhury and others	0	3	3	1	8
40	Syed Nawab Nababali Chowdhury	0	1	3	0	0
41	Bejoy Govindra ray chowdhury and others	0	0	1	2	5

Touzi no-16

42	Nawab Habibullah Bahadur and others	0	10	2	1	10
43	Syed Fazl Bari Mahmad Altabali Chowdhury Life interst Izara possession of Nawab Abdus Soban chowdhury	0	4	2	2	5
44	Syed Ahmad Hossen chowdhury and others	0	4	2	2	5

Touzi no-5031

23	Nawab Habullah Bahadur and others	2	5	0	0	0

Touzi no-5032

24	Nawab Habibullah Bahadur and others	1	15	0	0	0

Touzi no-5033

25	Surendra Prasad Lahari chowdhury Patni possession of Sarnamayi Debi chowdhury	1	10	0	0	0

Touzi no-5034

26	Uday Tara chowdhurani and others	1	10	0	0	0

Touzi no-5035

27	Sarat Chandra Ray chowdhury and others Patni possession		0	4	1	27
		0	0	0	0	0

28	Bijoy Gobinda Mukherjee	0	2	2	2	0
	Patani possession of Saral Chndra Roy chowdhury and others	0	0	0	0	0
29.	Loknath Ray chowdhury and others	0	2	0	2	18
	Patni possession of Sarat Chandra Ray Chowdhury and others	0	0	0	0	0
30	Kalika Prasad Mukharjee	0	0	2	2	0
	Patni possession of Girish Chandra Ray Chowdhury and others					
Touzi No-5151						
45	Prasama Nath Ray Chowdhury	0	4	2	2	0
Touzi No-5152						
46	Wazed Ali Khan Panni	0	3	0	0	13
47	Hayder Ali Khan panni (under court of Wards) and others	0	1	1	0	7
Touzi No-5153						
48.	Syed Ahmad Sarif Abdul Hafez and others	0	2	3	0	12
49.	Girish Chandra Ray Chowdhury and others	0	1	1	2	18
50	Ashrafannes Begum	0	0	1	1	10
	Patni possession of Girish Chandra Ray Chowdhury and others					

Khatian- 2.2, Vill- Shalika, Ijmali lands of Saham NO-32

Particulars of the lands in the Khas posession of holders of this interest.

Plot No-	Holders -	Class of lands	Remark	Acre	Dec.
5	Vill.Mahimara	Khauda	Ublic possession	1	11
14	-	Plot	Ublic possession	1	62

Total-54 plot in all 50 Co shares) orTotal area of land in own possession74 - 07
Total Area of lands in are portion of Tenans,
Khatian No of -158,157,159 <u>14-40</u>
Grand Total 88 - 47

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ২.৭ ঃ ১৯১৩ সালে লেন্ডিজ কমিশন প্রস্তাবিত ময়মনসিংহ জেলা কে তিনিটি জেলায় বিভক্তির পরিকল্পনা ম্যাপ।

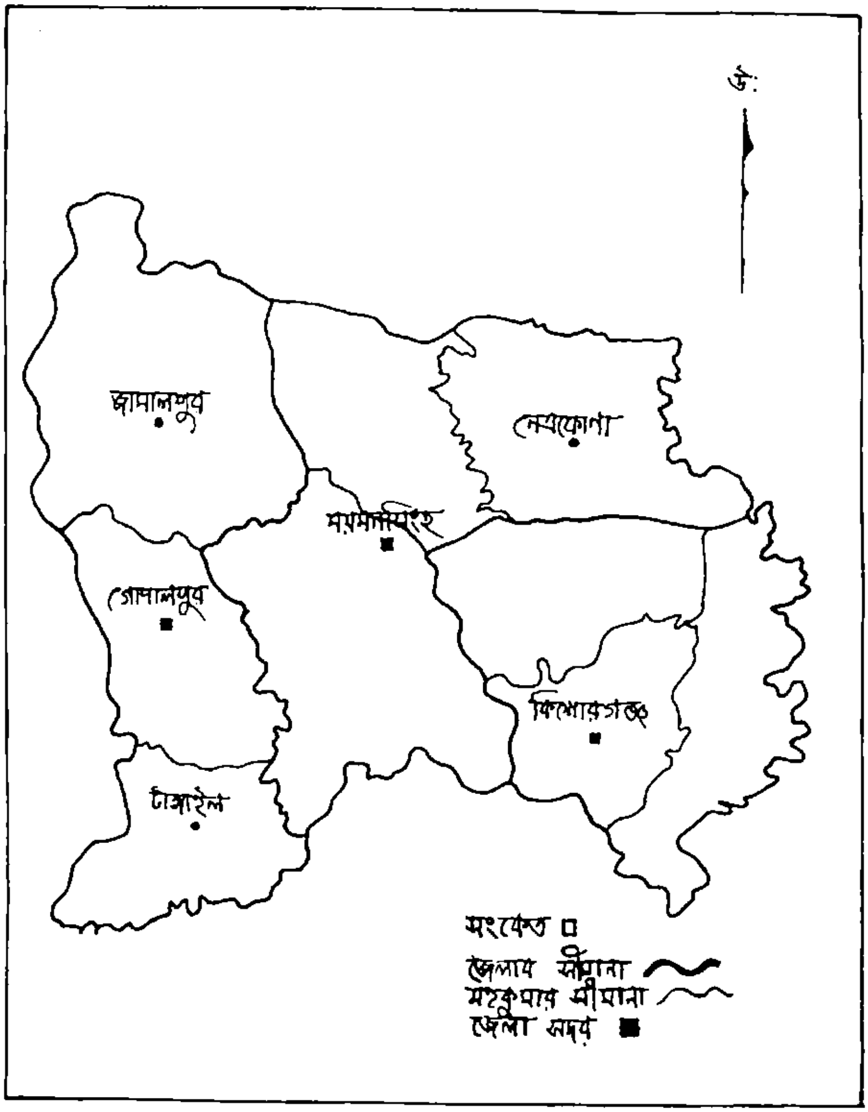

মানচিত্র ঃ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লেন্ডিজ কমিশন প্রস্তাবিত কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও গোপালপুর জেলা

উৎস ঃ মোহাম্মদ বাকের. টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থ।

পরিশিষ্ট- ২.৮ ঃ ১৯২০ সাল পর্যন্ত টাঙ্গাইল মহকুমার ৫টি থানার ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও প্রশাসনিক মানচিত্র।

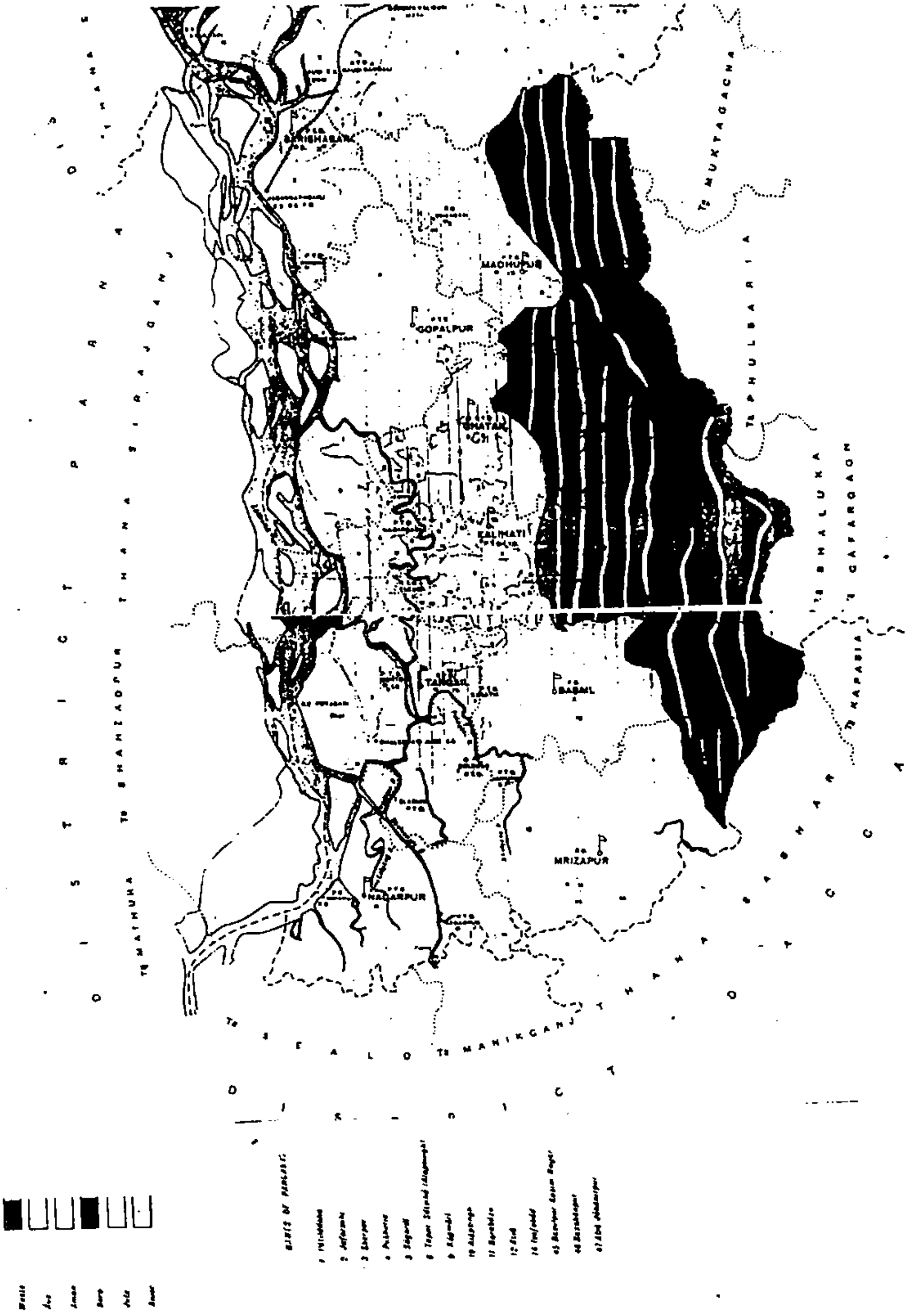

উৎস ঃ এফ.এ. সার্কিচী প্রণীত ফাইনাল সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট রিপোর্ট।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ২.৯ ঃ দুলাই জমিদারীর আতিয়া পরগানাস্থ সম্পত্তির দীজ দলিল।

দুলাই ওয়াক্ফ আল আওলাদ' পাবনা, ২০ জুলাই ১৯৪৫

দুলাই জমিদারীর শামসুন্নেসাকৃত ওয়াকফ দলিলে আতিয়া বিবরণ (অংশ বিশেষ)

নং ১৬ তফসিল সম্পত্তি ঃ

জেলা ময়মনসিংহ কালেক্টরী তৌজির ৯,১১ ও ৫১৩০ নং জমিদারী ও কয়েক নম্বর তালুক যাহা পরগনে আটিয়ার অন্তর্গতও বটে এবং যাহা অনারেবল স্যার এ,কে, গজনবী সাহেবের নিকট সদর রাজস্ব পথকর এবং অন্যান্য Public demand বরাত দেওয়া বাদ মালিকানা বার্ষিক ৪৯৯ টাকার রাজস্ব বাবত নিজ ।০ আনা অংশ ১২৪η আনা জমায় পত্তনী বন্দোবস্ত আছে, তাহা থানা ও সাবরেজিষ্ট্রি টাঙ্গাইল ও আটিয়া দিং।

১। পাবনার ১৪৯/৬ নং জমিদার-১৬ আনা- ৬৬০ টাকা রাজস্ব

২। " ১৪৯ নং এজমালী জমিদারী √ ৪ পাই- ৩৪৮/৪ পাই রাজস্ব

৩। " ১১ নং তৌজির ১৬ আনা -৮৫η√ ৩ পাই

৪। " ১৫০ নং তৌজি √৪ পাই- ২২৬μ√৪ পাই

৫। " ৮৭/২ নং " √৪ পাই- ২৪।।১০ পাই

৬। " ৪২৭/৬ নং " √৪ ৭√১ পাই

৭। " ১৬২/৬ নং " ৭৮ ৪ পাই

৮। " ৭৬৭ নং " পাই

৯। " ২৯১/৫২ নং ৬ ক্রান্তি -১১৫√৮ পাই

১০। " ৮৬৯ নং তৌজিভূক্ত ১৬ আনা - ২৭টাকা রাজস্ব

১১। " ৮৬ নং " √ ৪ পাই

১২। " ১০০ নং " √ ৪ পাই

১৩। " ৭৪৬ ও ৭৪৯ নং তৌজিভুক্ত √ ৪ পাই

১৪। " ৯৭ তৌজিভুক্ত √ ৬ পাই ক্রান্তি

১৫। "বগুড়া ৭২/১ নং তৌজিভুক্ত

১৬। পাবনা ১১২ নং ৬৪৫√৪ পাই রাজস্ব

উৎস ঃ ১৯৪৫ সালে ওয়াক্ফকৃত দুলাই জমিদারীর শামসুন্নাহার কৃত দলীল।

পরিশিষ্ট- ২.১০ঃ ১৯৯০ সাল পর্যন্ত টাঙ্গাইল জেলার ১১টি থানার ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক মানচিত্র।

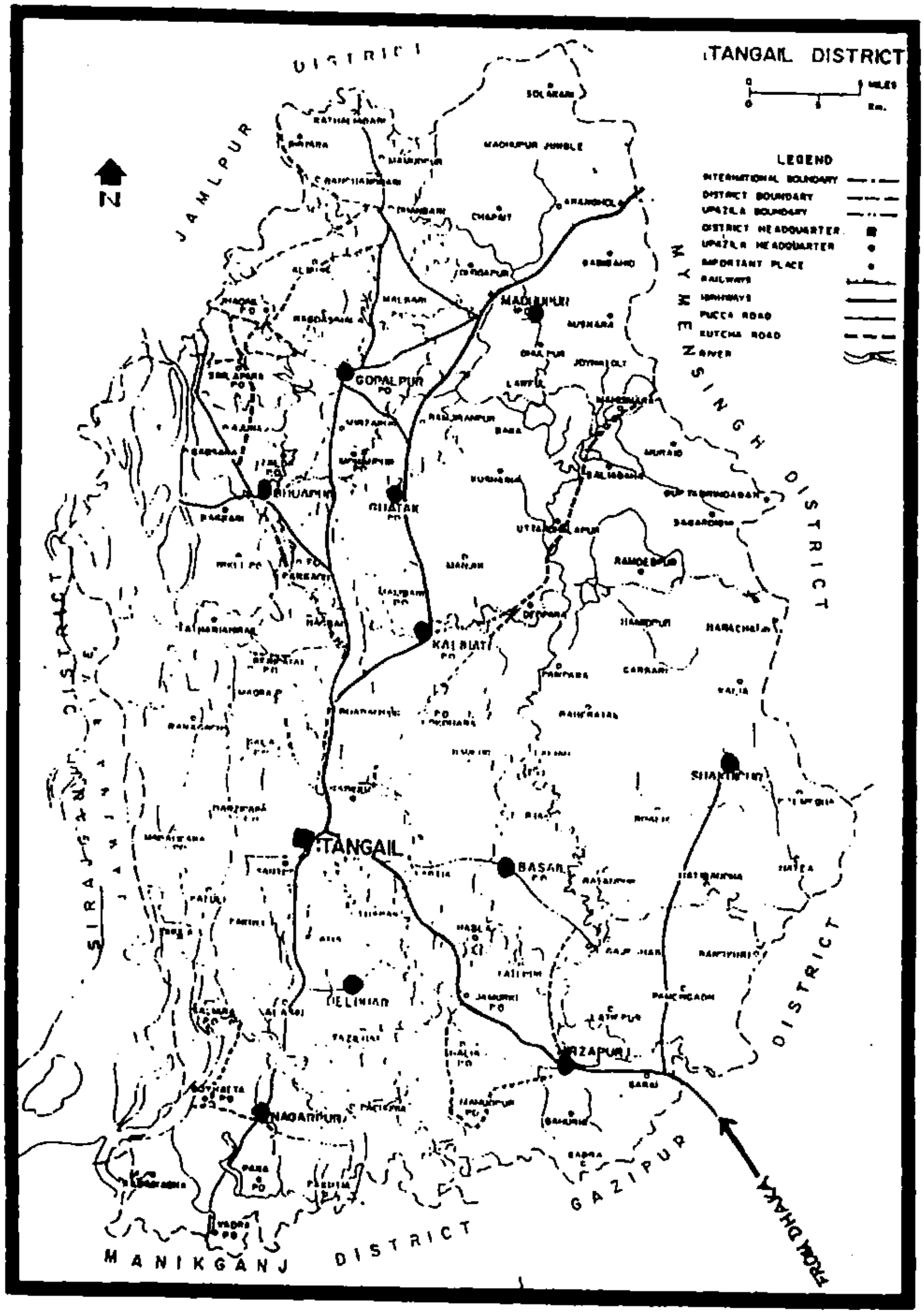

টাঙ্গাইল জেলার মানচিত্র

উৎস ঃ মোহাম্মদ বাকের. টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ২.১১ ঃ দেলদুয়ার জমিদারী ও আতিয়া পরগনা অঞ্চল চিহ্নিত মানচিত্র।

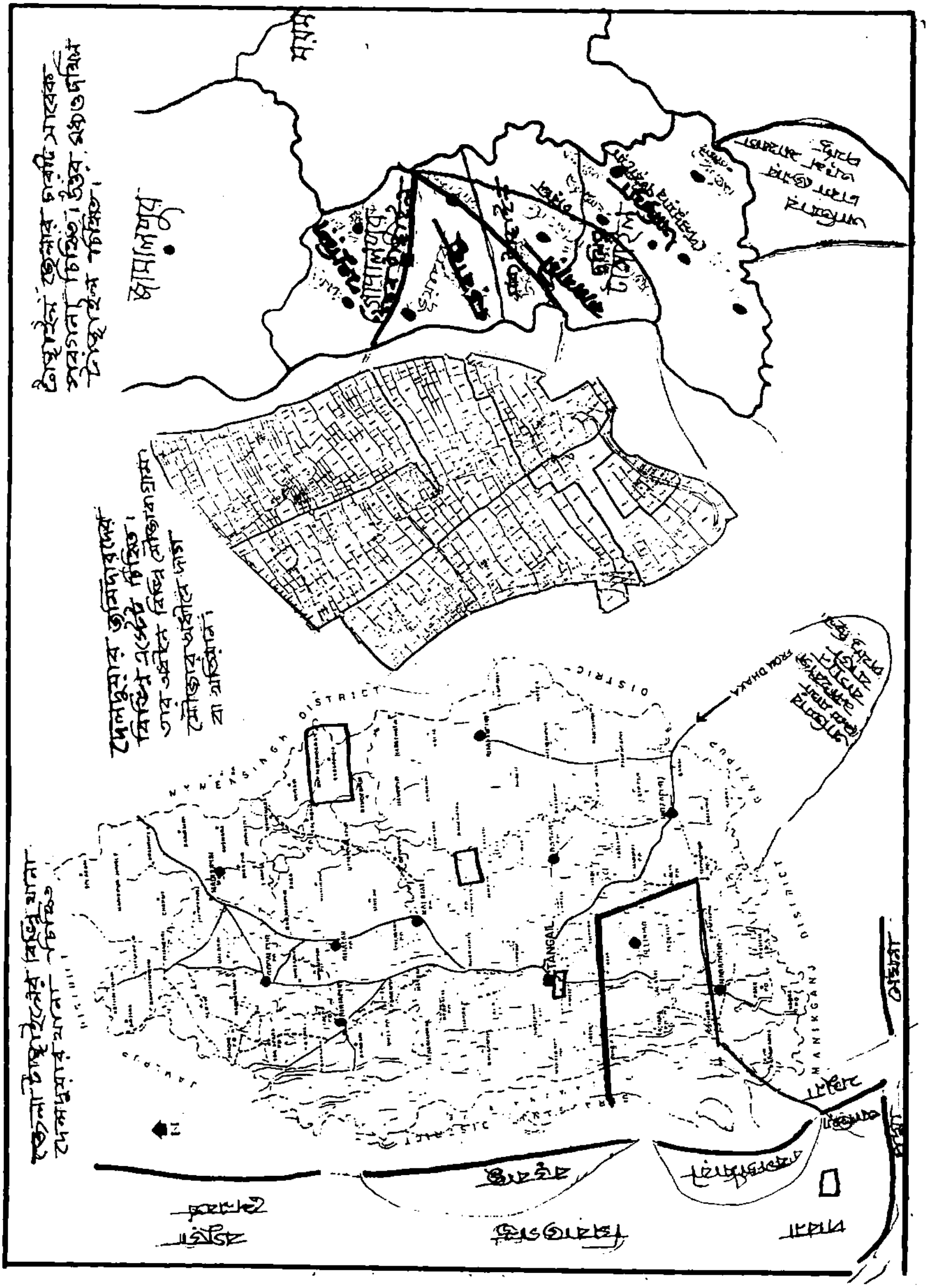

উৎস ঃ গবেষক কর্তৃক প্রণীত দেলদুয়ার জমিদারী সীমা রেখা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ৩ ঃ তৃতীয় অধ্যায় সংশ্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩.১ ঃ ১৯১৪ সালে গঠিত হর্নেল কমিটির বিবেচনার জন্য মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে আবদুল করিম গজনবী প্রদত্ত নোট।

আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাঙলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী

পরিশিষ্ট ঃ ৬

১৯১৪ সালে গঠিত হর্নেল কমিটির বিবেচনার জন্য মুসলিম বালিকাদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রদত্ত আবদুল করীম গযনবীর একটি নোট ঃ

(A Note on the Education of Moslem Girls By the Hon'ble Mr. A.K. GHUZNAVI)

In my previous Note on Mussalman education I have already stated that the question of Female Education is, if anything, more important than that of Male Education. Indeed the future of Moslem society depends on the proper grasp of this situation and on the earnestness with which Mussalmans are inclined to grapple with this question and proceed to its solution. Both Government and more particularly our own community have hitherto been culpably apathetic with regard to Mussalman education in general and female education in particular. But now that the Mussalmans are manifesting a growing interest in the education of their girls and Government. Particularly since the visit of His Most Gracious and Imperial Majesty the King-Emperor, have launched forth their generous educational policy and have profferred us substantial help, co-operation and guidance, and have awakened to their sense of responsibility, it behoves all right thinking members of our community to heartily co-operate with Government and to evolve such a system of education for our girls that would meet all our peculiar needs and at the same time be in keeping with the best traditions of our community.

I need hardly repeat that it is well known that the Prophet of Islam ever impressed the value of knowledge. His blessed sayings which have come down to us in the shape of what is known as the Hadis, bristle with admonitions for the acquirement of knowlwdge; and on many occasions, he laid stress on female education with no uncertain voice. According to a well known Hadis, this is how he spoke: "The acquisition of knowledge is a duty incumbent on every Moslem, male and female."

উৎস ঃ এম. আবদুল্লাহ্ ও সিকান্দার আলী ইব্রাহিমী।

Dhaka University Institutional Repository

"It is my wish" so spoke our Gracious Sovereign in the course of that noble message which he delivered to his Indian people on the 6th January 1912, "that the homes of my Indian subjects may be brightened and their labours sweetened by the spread of knowledge with all that follows in its train, a higher level of thought, of comfort and of health; and it is through education that my wish will be fulfilled." No words could have been more nobly spoken, more truly uttered, and it is primarily through the spread of Female Education that such a happy consummation can be effected. While therefore we look to Government to give effect to the pledge of our Sovereign it is also our duty to assist and advise Government as to the method that ought to be adopted and the direction in which efforts should be made.

On the 15th September 1912 I had the honour of submitting a Note to the Hon'ble Sir Harcourt Butler on the question of female education and on the 27th of the same month this is what he wrote, "I have now found time to read your Notes from which I am gratified to find that you are interested in education. *** I am particularly glad to see that you are interested in female education. That is a matter which I have very much at heart."

The present moment therefore is particularly auspicious when from the Sovereign and the Head of the entire Education Department down to all educational officers of Government, they are all awake to the necessity of fostering female education in this land of ours.

"In the forefront of their policy" writes the Hon'ble Mr. Sharp in the 6th Quinquennial Review "Government desire to place the formation of character of the scholars and undergraduates. In the formation of character, the influence of home and the personality of the teacher play a large part. There is reason to hope, in the light of acquired experience, that increased educational facilities under better educational conditions, will accelerate social reform, spread female education and secure better teachers." I may at once say that no real formation of character is possible unless there is a proportionate spread of female education among our community.

Dhaka University Institutional Repository

Now, let us survey for a moment the state of literacy among Mussalman females in Bengal. We find that in Bengal out of a total of 11,860,013 Mussalman females only 27,525 are literate and 855 are literate in English, whereas out of a total of 10,097,162 Hindu females 197,222 are literate and 8,087 are literate in English. Roughly speaking, there are 24 millions of Mussalmans in Bengal and 21 millions of Hindus. Out of this population some 12 millions are Mussalman and 10 millions Hindu females. Now, the number of Hindu girls under instruction in various stages is 171,187 whereas the number of Mussalman girls is only 66,503. These figures ought to be enough to make us pause and reflect.

But there is a ray of hope. In the chapter on the education of girls in the 6th Quinquennial Review, para 516, we find figures for the whole of India. In 1907 there were 121,699 Mussalman girls throughout India under instruction, whereas, in 1912 there were 213,247. Although this gives a percentage of those at school to population of school going age as 4.5 which compares miserably with the percentage of Hindu girls 19.6, Indian Christians 26.6, Parsees 88.9, Europeans and Anglo Indians 100, yet at the same time it is some consolation to find that the percentage of corresponding increase in Mussalman girls in 5 years from 1907 to 1912 works out at 75.2. The report from Eastern Bengal and Assam in 1912 is also reassuring to read. This what it contains : "The system of child marriage and the general indifference of parents to the education of their daughters still act as checks to progress. But that there has, of recent years been a marked change in the attitude of both Hindus and Mahomedans to this question, there can be no doubt. Parents are gradually awakening to the fact that the education of their daughters is as much a part of their duty as the education of their sons. They have realised though dimly that education need not make their girls more independent of their lawful guardians or less observant of established customs and domestic duties. And they have found by practical experience that with the progress of boys' education the selection of a bride now-a-days, depends no less upon her ability to read and write with tolerable case than upon her wealth and general appearance."

Dhaka University Institutional Repository

Further in the Adminstration Report for Bengal on Education, 1913-14 in para 580 it says: "The number of female scholars in all classes of institutions increased from 222,749 to 230,729, the increase of Muhammadan girls students (6,013) was particularly noticeable." In the Indian Education Report published by the Government of India, 1913-14 it says" the number of girls in public institutions has increased from 929,927 to 1,019,544 and the total from 1,006,636 to 1,102,242. Though however this shows that only 5.9% of the female population of school-going age are under instruction, it is recorded that in Madras the number of Mussalman girls at school has more than doubled in the last 2 years, and similarly in Bengal the increase among Moslem girls pupils was more than 4 times of the increase of the previous year, although the progress made by Moslems as a whole is very slight."

These fingures that I have quoted above are slightly reassuring in as much as they show not so much that there has been a very great increase in the number of Mussalman girls who have taken to education but as an indication of the growing interest on the part of Mussalmans in the education of their girls.

• **Analysis of the causes of unpopularity of female education among Moslems.**

I shall now analyse the causes which have hitherto stood in the way of Mussalman female education and are even now the main stumbling blocks.

(a) Want of Religious Instruction

The first and foremost is the absence of any provision for religious instruction for Mussalman girls hitherto in all girl's schools, both Government and Private. Now, the want of provision for religious instruction in Government schools has practically been the most important factor which has militated againgst all Muslim education both male and particularly female. As far back as 1895 Sir Alfred Croft wrote "I regard the want of some kind of religious instruction in schools as a blot in the system of education in this country."

Dhaka University Institutional Repository

In my previous Note on Mussalman education I laid great stress on this fact and pointed out that the absence of any provision for religious instruction suitable to Mussalman boys from all educational institutions patronised by Government was the chief cause why these institutions were not availed of and therefore of our backwardness. And this applies more strongly in the case of Mussalman girls. Therefore, our principal aim is to organise a system of education which would provide religious instruction for Mussalman girls and will therefore be popular and acceptable to Mussalmans.

(b) Want of Purdah Schools

The absence of observance of strict purdah in the hitherto existing girl's schools has been, to my mind, the second cause which has kept Mussalman girls from attending these schools.

(c) Want of a different system of Education for Moslem girls.

The third great cause has been the want of a system of education suitable for Muslim girls. The prevailing sytem of education is neither in harmony with their sentiments nor is it in conformity with the requirements of our community. While on this subject, I must confess my inability to agree with the remarks of the Secretary. In para 55 of his Note he says "If Government is to provide separate institutions for the members of the various communities, the rate of progress is bound to be very slow. It will be much better if Government can establish a system of education designed for all irrespective of creed." To my mind if Government cannot see its way to provide separate institutions for Mussalman girls at least for the present, not only will the rate of progress be slow but there will be no progress at all.

Government has recently appointed a committee to consider and advise on the educatinal needs of orthodox Hindu girls. Further, the majority of girls' schools that already exist are more or less schools for Hindu girls "on lines consistent with the best traditions of Hinduism." The rest of the girl's schools are either conducted by Missonaries or by Brahmons, in neither of which the Mussalman girl can find an atmosphere congenial to her traditions

Dhaka University Institutional Repository

or consistent with the best traditions of Islam. Hence unless Government resolve to establish separate institutions suitable for Mussalman girls, one system of education for girls of all communities irrespective of creed will have no attraction, for the Mussalman community. Let me not be misconstrued. What I desire to emphasise is this. That at present, when there is such great backwardness in respect of Muslim female education, it is imperative to start schools purely for Mussalman girls. But I certainly look forward to a time when as prejudices will gradually disappear, it will be possible slowly and cautiously to formulate a system of education for females with provisions to meet the particular wants of the different communities attending a common institution.

(d) Want of qualified female teachers.

Just as we require separate schools for Mussalman girls, we also require lady teachers competent to teach them. Want of such teachers has also been one of the causes of the slow progress of Moslem female education.

(e) Want of Conveyance.

Majority of the hitherto existing girls' schools all over Bengal, have had no arrangement for suitable conveyance for girls to take them to school. This has been another reason why Mussalman girls have been obliged to keep away from these schools, even in the case of those who otherwise might have joined.

The last Female Education Committee laid great stress on the importance of this difficult question and were of opinion that if the provision for conveyance were enlarged, the number of pupils would very largely increase. Even in localities where moderately well conducted purdah schools exist, absence of conveyance for girls deters them from joining the same. Therefore in all schools where Mussalman girls are expected to go, there should be provision for conveyance.

(f) Want of Central Model Schools.

The last, though not the least and perhaps the greatest of all wants is the absence of really first class well conducted central model purdah schools aided and managed by Government and

Dhaka University Institutional Repository

intended chiefly and purely for Mussalman girls. In my letter addressed to the Hon'ble Sir Harcourt Butler dated 5th May 1913 in connection with the Government of India's Resolution dated April 3rd, 1913, I said "The question of female education I know is very much near to your heart as it is to mine. The necessity of having Government aided, Government managed fully equipped central model school at every important centre such as Calcutta and Dacca in Bengal and elsewhere in other provinces is very essential. *** "As a matter of fact there is not a single girl's school for Mussalman girls' anywhere in Bengal which can be looked upon as a model to be copied by any private or public institutions that may be started from time to time, and it is next to useless and waste of public money for Government to aid those which are supposed to be schools for Mussalman girls, but which are being run in a haphazard fashion.[6]

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনে পশ্চিম বংগের মুসলিম বালক-বালিকাদের শিক্ষার মাধ্যম উর্দু হওয়া উচিত বলে মিঃ মাহমুদ সুহরাওয়ার্দী মন্তব্য করেন এবং বলেন : The consensus of Muslim opinion in Bengal is that Urdu should be the medium of instruction,

সে সময় কোন কোন পত্রিকা আবদুল করীম গযনবীর অভিমতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। সেই অভিযোগ খন্ডন করে অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইনসপেক্টর মৌলবী আবদুল করীম বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এক বিবৃতিতে বলেন :

It is rediculous to question Sir Abdul Karim Ghuznavi's authority in a matter like this. Being in intimate touch with his co-religionists all over Eastern and Northern Bengal, if not in the whole province, he is perhaps in a better position than others to express an authoritative opinion regarding this important matter concerning the vital interests of the community. Although I do not see eye to eye with him in certain political matters, I am in entire agreement with him, in what he stated regarding the medium of instruction for Muslim children in Bengal and also with his views regarding the education of Bengal Muslims, expressed before the Hartog Committee.[২২৯]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ৩.২ ঃ ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত আবদুল করিম গজনবীর ভাষণ।

পরিশিষ্ট ৬ 'ক'

জুমার নামায পড়ার জন্য শুক্রবার সাড়ে বারটা হইতে দুইটা পর্যন্ত সিভিল কোর্টসমূহের কাজ স্থগিত রাখার প্রস্তাব অবলম্বনে ১৯২৬ সালের জুলাইতে অনুষ্ঠিত বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত আবদুল করীম গযনবীর ভাষণ

I move that this Council recommends to the Government to take whatever steps may be necessary, whether by legislation or otherwise, to secure that all civil courts in Bengal be closed on Fridays between the hours of 12-30 p.m to 2 p.m., so that Moslem officials, employees, litigants, witnesses or members of the Bar may have the same freedom to say their Jumma prayers as is now enjoyed by similar persons attending criminal and revenue courts.

In order to fully appreciate the importance of this question, it is necessary for me to trace its history from the very beginning.

Now, Sir, ever since the establishment by law of British supremacy in India Mussalman employees, as well as members of the Mussalman public having business in law courts, had been suffering the greatest inconvenience, if not actual hinderance, in the performance of their Jumma or Friday prayers, as there was no rule entitling them to leave to say their Jumma prayers between the hours of 12-30 and 2 p.m. on Fridays. In other words, the Moslem Sabbath had so far not received public recognition at the hands of Government.

In order to obtain the recognition of this Sabbath I moved the Imperial Government for the first time on the 18th September, 1912, at Simla. The Government of India showed the utmost consideration and expressed their wllingness to grant the said leave to all Mussalman employees, and Sir Reginald

উৎস ঃ এম. আবদুল্লাহ্ এর গ্রন্থ এবং পার্লামেন্টারী পেপারস, প্রসিডিংস।

Dhaka University Institutional Repository

Craddock, the then Home Member, advised me to move local Governments.

It was then my privilege to approach the Government of His Excellency Lord Carmichael, and at my instance the Government of Bengal by their notification No. 5746 p., of the 21st November, 1912, granted this privilege. Mr. Beatson-Bell, the then Commissioner of Dacca, whilst transmitting the orders of the Government of Bengal, added in a circular to his subordinate officials that facilities should also be afforded to Mussalman pleaders, mukhtears and litigants to say thir Jumma prayers. Thereafter, as a result of my exertions, this privilege was extended throughout British India and Burma.

It has since been found that mere grant of leave has not afforded that relief which was sought to be given. In the mufassal law courts it has often happened that whenever Mussalman litigants have absented themselves to say their Jumma prayers, cases have been called up and struck off for default. Further, there have been officials who did not like to have as their immediate subordinates Mussalmans who would leave their work for an hour and a half or two hours regularly every Friday, and such appointments as readers, peshkars, judgment writers, clerks, copyists, etc., which are often entirely in the gift of such officers, were kept back from Mussalmans and given to members of other communities who would work constantly with them. From time to time various complaints have appeared both in the public press as well as voiced on public platforms wich have gone to show that mere leave to say their prayers has, instead of affording facilities, in many instances worked to their detriment.

At the July session of this Council, in answer to an interpellation put by Shah Syed Emdadul Haq, Government agreed to inquire further into this matter and issue fresh

Dhaka University Institutional Repository

instructions if necessary. As a result Government circular No. 8288J., dated the 23rd December. 1923, with further instructions, was issued.

The purport of these instructions was that Moslem employees, litigants, witnesses, pleaders, etc., could absent themselves without formally asking for permission. It will thus be seen that these instructions did not remove the difficulties at all. Therefore, what I wish to press is that on fridays, between the hours of 12-30 and 2 p.m., work in mufassal courts should be kept in abeyance out of deference to our Moslem Sebbath. As a rule, every day work does cease for half-an-hour or three-quarters of an hour in those courts owing to adjournment for tiffin. Therefore, if once a week the tiffin adjournment were only extended to an hour and a half, it would meet the requirements of the case and at the same time give intense satisfaction to the entire Moslem public of this province and outside it.

I may mention that out of deference to the religious beliefs of their Moslem subjects, Friday is a recongised holiday in some and half-holiday in other Feudatory Hindu States in India, although in some of those States Moslem subjects constitute almost a negligible minority.

Now, Sir, the Mussalman community entertain very strong opinion on what is a vitally important religious matter. The Holy Quoran lays down: "Ya ayiahul Lazeena umanu iza nudia lissalat-i-min yum-ul-Jumua't-i-fasao ila zikirillah wa zarul baiy", i.e., "Oh, ye who believe ! When the call is made for prayer on Friday, then hasten to the remembrance of God and leave off all business."

Thus the demand made for unrestricted opportunity to say our Jumma prayers cannot be called in the least unreasonable.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-- ৬ 'ক'

It has been pointed out in serious debates in this very Council that so long as the position remains one where permission is granted on request, there will be difficulty and discord arising from the action of ministerial officers. The dissatisfacton caused may not be openly voiced, but it is deeply felt. In a matter such as this it is hardly becoming that no action should be taken unless and until there are compliants by the persons affected ; many of these are not in a poition to complain ; others would undoubtedly be made to suffer if they did complain. Opportunity to observe the essential forms of one's own religion ought not to be granted grudgingly as a concession because of complaints, but rather granted freely and even in anticipation of demand as being a right to which every subicct is entitled. So long as the courts and offices remaind open at the time of Jumma prayers, so long will there remain misunderstanding and the possibility of interference. It is most undesirable that a Mussalman who goes to say his Jumma prayers should do so with the feeling that his case may be called and disposed of in his absence.

I may at once say that this view of the matter has been accepted by the Government of Bengal, and they thought that the only real solution was that courts and offices should be closed down at the time of Jumma prayers. It will than be impossible for a Muhammadan to suffer because he attends to his religious duties ; there will be no possibility of any obstacles being put in the way of his saying his Jumma prayers. He cannot be made to go there just as a Christian may not go to Church on Sunday, but if he does he will not go there with the feeling that he is risking loss by so doing.

The Government, therefore, wished to pass orders that on firdays between 12-30 and 2 p.m. the working of all courts and offices subordinate to them will be suspended altogether, thereby enabling all Muhammadans, whether employees,

Dhaka University Institutional Repository

litigants or members of the Bar, to attend their Jumma prayers. This might entail a certian loss of working time, but on examination it has been found that the loss actually involved is less than at first appeared. It is well known that even when courts close and outside of court hours work is carried on both by presiding officers and clerks. It is not at all unlikely that this will continue in the case of Christians and Hindus. There is the further fact that in most civil courts one day in the week is set aside for small cause or miscellaneous work ; it is possible to fix Friday for such work and by due attention of arrangement of work, no serious interference with the day's routine need be experienced. Petty judgments, orders, routine work and inspection of registers, etc., can be done during the break in the middle of the day. The break will only be an hour at the utmost longer than the usual interval for tiffin, and it must be allowed that in many, if not most, courts advantage is taken of the interval for lunch to attend after lunch to minor office matters, correspondence or urgent matters which require orders to be passed on papers called for that morning, with the result that the customary half-hour is frequently exceeded.

It is obviously desirable that all courts, both criminal and civil, should adopt a uniform practice. If courts of all Magistrates are closed for a short interval to allow the Moslem community to observe what is an essential part of their religious duties, it can not but occasion serious hardship if the civil courts remain open. It would be most inconsistent that a Moslem on trial for his liberty should be allowed to go to say his prayers at the appointed time, while his brother-a tenant-defendant in a rent suit-should have to sit at the civil court lest his case be called and decreed in his absence. There ought to be completely uniformity in all courts in the province ; a claim which is in essence irrefutable cannot be allowed in the case of one set of courts and refused in the case of another.

Dhaka University Institutional Repository

Now, Sir, it appears from previous orders and instructions given in the past that both the High Court and the Government have issued orders of this nature in the case of civil courts ; the Government having had no desire on the present occasion to raise any question as to which is the exact authority from which orders in such a matter should issue to the civil courts, they intimated that they would be quite content if the High Court issued the necessary orders, or they would themselves be prepared to issue the orders if the High court approved of that course, and stated that they felt certain that the High Court on a perusal of the papers and debates in the council would appreciate the urgency and reasonableness of the request and would give it their utmost sympathetic consideration.

Unfortunately, Sir, that sympathetic consideration which the Government of Bengal pleaded might be extended to the Moslems by the High Court was, alas, denied to them, and thereupon the Bengal Government thought they had no other option but to issue orders that the criminal and revenue courts over which they felt they had unquestioned sway should remain closed between the hours of 12-30 and 2 p.m. on Fridays.

Thus, not only were the Moslems shown no consideration and were told to go without their Jumma prayers by a majority of the Judges of the High Court to whom the matter was referred by the Chief Justice but they assumed to themselves a prerogative which on an examination Inshaallh God willing I shall be able to show that they do not possess.

Sir, I shall now trace the history of the earliest orders with regard to the sitting and closing of all courts, The earliest orders regarding the hours of sitting of courts are contained in High Court's circular order No. 6 of 1864, which laid down that every Sessions Judge and Magistrate shall sit daily and punctually at hours appointed for the opening of his court. There is, however,

Dhaka University Institutional Repository

no mention of what the appointed hours were. In 1867, Government issued instructions to the Commissioners of Divisions, directing the observance in criminal courts of the holidays then recognised for the revenue courts, subject to arrangements made for the disposal of urgent business, and permitting all Muhammadans employed in the revenue and magisterial courts to absent themselves from office on certian days in connection with Muhammadan festivals. A copy of those orders were forwarded to the High Court for information.

In a resolution recorded in May, 1873, it was stated that "the Lieutenant-Governor will make it an invariable rule that all offices, etc., must be open and actually at work, and all officers in their places not later than 11 A.M. punctually. "A copy of the above resolution was forwarded to the High Court with the remark that" the Lieutenant-Governor thinks that the Hon'ble Judges may, recognising the importance of the matter, see fit to give some strict orders regarding the hours of attendance in the regular civil courts, analogous to those which have been issued in the resolution cited above."

But in the Government circular No. 409 J.-D., dated the 8th September, 1892, however, it was stated that "the Lieutenant-Go.ernor will be willing to give offect to the suggestion of the High Court that some Sessions Judges may be permitted to leave their sessions during the civil court vacation. "Here it will be noticed that the Government of Bengal authority is the civil court.

In 1899, to afford Muhammadans faclities to say their midday prayers, a general letter was issued by the High Court to all Sessions Judges, intimating that in the opinion of the Court it was advisable that there should in the case of trials by jury, or with the aid of assessors, be a short adjuournment daily (not

Dhaka University Institutional Repository

exceeding half-an-hour) at about 2 o'clock in the afternoon.

In 1902, in consultation with the High Court, a circular was issued by Government regarding District and Sessions Judges taking advantage of the civil court vacation. Here again it is the Government of Bengal that seen to have issued instructions to the civil courts.

The High Court in 1912, in forwarding a representation from the minist erial officers of the civil courts in Alipore for the early closing of the courts of saturdays, recommened "that the concession, if made, should not be confined to the courts at Alipore, but should be general." In view of rule I of the High Court General Rules and Circular-Orders (Civil), Volume I,Government did not issue any orders on the subject, but simply informed the High Court that there was no objection to the civil courts in the Presidency being colsed at 2 p.m. on Saturdays if the state of work permitted it. The Court in 1921 inquired if the local Government had any objection to the issue of a circular by the High Court to subordinate courts in the above sense, and on reply being given in the negative the circular was issued by the Court.

It will thus be seen that although on earlier occasions the High Court passed orders of this nature, during the later periods, it is the Government of Bengal that issued instructions to the Civil courts in matters of similar nature. Such being the case, the Government seemed to hesitate as to whether they or the High Court had requisite authority over the civil courts in such matters. I would, however do them the credit and say that I do not think they were lacking in backbone or that they were afraid of the High Court. It seems to me they only wish to travel in the line of least resistance—a procedure which often as not leads to nowhere.

By this time, however, I hope they have discovered, as we

Dhaka University Institutional Repository

have, that the massive portals of the High Court are closed to Moslem aspirations not only in this matter, but in other matters such as appointment of Moslems as Munsifs and so forth. It is not for me to suggest to Government what sesame by say of a mantram they have got to repeat for those portals to be flung open. I will leave it to them to exercise all the ingenuity they are capable of. I would only appeal in the name of all that is holy and all that is sacred, that the just demand put forward on behalf of 26 millions of His Majesty's fellow subjects may not be so highly brushed aside. If the Government desire to epmloy further the arts of cajolery and peruasion they are at liberty to do so. If, on the other hand, they are of opinion that the time has now come to take power upto themselves by way of legislation, I urge upon them to do so. I only plead that those God's creatures who desire to have communion with their creator on Fridays between the hours of 12-30 and 2 p.m. may not be withheld from doing so.

With these words I commend this resolution to the unanimous acceptance of this House.[৯]

৯. Proceedings of the Bengal Legislative Council, 9 July, 1926, Pp. 122-127

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩.৩ ঃ ১৯২৭ সালে কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী রূপে আবদুল করিম গজনবীর ভাষণ।

পরিশিষ্ট ৬ 'খ'

১৯২৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত বংগীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায়
কৃষি-বাজেট অবলম্বনে প্রদত্ত কৃষি ও শিল্প-মন্ত্রী রূপে
আবদুল করীম গযনবীর
ভাষণ

On the recommendation of His Excellency the Governor, I move that a sum of Rs. 21,27,000 be granted for expenditure under tha head "34-Agriculture (page 187, Civil Estimate)".

Sir, it will be observed that there are motions for the refusal or reduction of grants under this head : I am therefore inclined to think that a general explanation may help to clear the air and to remove misapprehension and perhaps induce the hon'ble members in whose names those motions stand not to move them and thus save the valuable time of the Council.

While speaking of the departments which have been committed to my care, I cannot overlook the important fact that the entire field of operations of the Agriculture, Veterinary and co-operative Departments is now under a sifting enquiry by the Royal Commission on Agriculture. To my mind it was high time that an enquiry was made into the working of these departments by a body of experts. I am sure every one will agree with me that the enquiries which are being made by the Commission are likely to lead to a proper appraisement of what is good and what is bad in the present system of working of the departments, and of the problems that lie before us in our endeavour to promote the welrare and prosperity of the great mass of the agricultural population — the real backbone of the country.

The "Veterinary Charges" budget which provides for the normal expenditure of the Civil Veterinary Department and of the Bengal Veterinary College calls for no remarks. The only noticeable item in the budget estimates for 1927-1928 is the

উৎস ঃ এম. আবদুল্লাহ্ এর গ্রন্থ এবং পার্লামেন্টারী পেপারস, প্রসিডিংস।

Dhaka University Institutional Repository

provision of Rs. 1,20,000 on account of cotribution to the Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals under the new Act.

The value of the work of the department in relation to the live-stock in this province on which its agricultural prosperity chiefly depends cannot be over-estimated. The serious economic loss which would have follwed but for the services of the officers of the department can be easily realised form the fact that out of 1.4/3 lakhs of bovines inoculated during outbreaks in the course of last year (1925-26) about 1,000 or 0.5 per cent only died.

Turning to agriculture proper, I would say that agriculture is and must always be the mainstay of the rural population in Bengal, and the aim of the Department of Agriculture in Bengal, as in other civilised countries, is the general improvement of agriculture so that the income of the cultivator who forms the great bulk of the population may be materally increased. It is idle to contend that the Agriculture Department has been barren in result. I am prepared to concede that much remains to be done for the agricultural development of the country, but the results already obtained by the department are sufficient to earn the whole-hearted support of those who are interested in the welfare of the country. I would only mention some of the results obtained which though not widely advertised have been none the less striking.

There are 2.4/3 million of acres under jute in Bengal. If all this area could be made to grow departmental races of jute, the increased net revenue of the jute cultivator at Rs. 20 per acre would be 52/1 crores of rupees per annum. The cultivation of departmental jute means a higher yield of fibre per acre. There is already a growing demand for departmental jute seed, and instances have come to notice in which unscrupulous persons have tried to pass their seed as departmental seed.

Dhaka University Institutional Repository

Ther are roughly 12 millions of acres of high land aus and transplanted aman paddy in Eastern and Northern Bengal and in the Presidency Division. The produce of a large proportion—say two thirds—of this area could be increased by something like three maund per acre by growing improved races of paddy already evolved by the Department.

The departmental varieties of sugarcane have also been an important factor in materially increasing the profits of the cultivator.

Turning to the provision of Rs. 40,804 for the Agricultural Engineer, I need hardly justify the necessity for the appointment. All the other major provinces have now their own Agricultural Engineers, but Bengal is still lagging behind. The result is that very little progress has so far been made in the province in the direction of introducing labour-saving machinery and appliances in agriculture which is one of the most important elements in agricultural improvement. It is only a whole-time Agricultural Engineer who can study the needs of the different parts of the province in this respect and make necessary recommendations as well as carry on propaganda work for the introduction of improved methods. Mechanical water-lifting by tube-wells and pumps is also essential for the purpose of irrigation. The appointment will, however, be made as an experimental measure for a period of five years, and if the experiment proves a success, the question of making the post permanent will be considered.

Nor has the important question of agricultural education been lost sight of. A scheme for an agricultural institute at Dacca has been under examination for some time, and it has now been definitely decided to proceed with it. As the Royal Commission on Agriculture is llikely to make valuable recommendations in regard to this Institute scheme, it is

Dhaka University Institutional Repository

proposed to await their recommendations before actually starting the institute. Meanwhile it is decided to preceed with the construction of buildings which are essentially necessary.

Next in importance is the scheme for the introduction of agricultural classes in middle and high English schools for which provision has been made in the Education budget. In the Agriculture bedget Rs. 5,830 has been provided for the training in Agriculture of teachers deputed from the schools participating in the scheme. It is not intended that the pupils passing out of the high English and middle English schools will be complete agriculturists, but it is believed that the course of agricultural training they will receive will have so widened their outlook that they will go back to the land with a receptive mind, able to apply what they had learnt in school and to tackle new problems which arise in the course of their work.

The need for providing a simple and inexpensive system of training in the elementary principles of agriculture has not also been overlooked. It is proposed to start three elementary agricultural schools in selected rural areas to Provide practical instruction in agriculture to youths after they have finished their primary education and have had some experience of work on the land. Enquiries are now on foot with a view to selecting suitable places where three farm schools of this description can be started as an experimental measure.

The problem of water-hyacinth naturally looms very large before the public eye now-a-days. Government have been accused of inaction, but this is hardly justified. Detailed preliminary enquiries have been made and a mass of information has been collected. During my recent tour at Madaripur, I was pleased to find that the District Officer was taking a great deal of interest in this question and he was able to throw a flood of light on this problem. The question of the

Dhaka University Institutional Repository

policy to be adopted in fighting this pest is at present engaging our anxious consideration. It is an admitted fact that the problem is vast and very difficult to tackle and requires cautious and careful handling. Hasty or ill-conceived action is doomed to failure as without the co-peration of all concerned no useful results are likely to be achieved. I would, therefore, ask our critics not to force our hands, but to allow us time to consider the various aspects of the problem before we come to a decision. The time that I ask for is not very long. I hope that in the course of this year we shall be able to decide what line of action we should pursue and then commence work accordingly.

I now turn to the Co-operative Credit budget. Undoubtedly the provision of easy credit facilities for the cultivators is essential, but if an all-round improvement in their condition is to be secured, they should be taught to purchase their necessaries and to sell their produce on a co-operative basis. A recent development in this direction is the establishment of co-operative sale societies and a great deal depends on the success of these experiments.

The movement is able now to attract with ease sufficient capital for meeting the seasonal requirements of agriculture and to do without outside assistance.

As to the budget itself, I would content myself by saying that public money could be spent on no better object than coperation.

The only item of new expenditure is Rs. 3,000 for revision of the pay of auditors of co-operative societies. These officers have hitherto been entertained from year to year on a fixed pay of Rs. 75. It is now proposed to raise their pay to Rs. 75-3-150, and to place their posts on a permanent and substantive basis. This revision is long overdue. The expenditure on the audit staff, however, is not entirely a charge on provincial revenue, but is mainly met out of the recoveries made from the societies in the shape of audit fees.[১]

১. Proceedings of the Bengal Legislative Council, 24 March, 1927, Pp. 485-488

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩.৪ ঃ ১৯১০-১১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট আলোচনায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য আবদুল হালিম গজনবী প্রদত্ত ভাষণ।

১৯১০-১১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট-আলোচনা প্রসংগে আবদুল হালীম গযনবী প্রদত্ত (এপ্রিল ১৯১০) ভাষণ

"My Lord, the dominant feature of the Financial Statement and the Budget is the new taxation. Curiously enough on the very first occasion when a public statement of the finances of the country was made and on the first opportunity of a public discussion of the 'budget' seventeen years ago, the Hon'ble Finance Member had to provide against a deficit, as in the present year, which inaugurates a new era in the discussion of the country's finances. I cannot help congratulating the Hon'ble Finance Minister on the way he has provided against the deficit and on tapping such new sources of revenue as are embodied in the scheme of taxation that he has devised. The taxation is indirect, and it is so in spite of the fact that the Hon'ble Member could have withdrawn the remissions of income-tax that were made a faw years ago. It is also satisfactory to note that no increase in the salt-duty was resorted to even when its reduction was held to have created a financial resereve for the Government of India, to be drawn upon whenever needed, These facts of omission and the tax on such luxuries as wines, spirits and tobacco are sufficient to indicate the solicitude of Your Excellency's Government for the poorer classes and the earnest desire not to tax their necessaries. The only tax about which I had some misgivings, my Lord, is that on petroleum, which is really a necessary of the poor in India. As however the enhancement of the duty of foreign petroleum may benefit the petroleum industry of the country, my doubts as to its expediency are to some extent removed. But if an excise-duty on petroleum is imposed, it will swallow up all this advantage. The consideration of an excise on tobacco that Government has

উৎস ঃ এম. আবদুল্লাহ্ এর গ্রন্থ এবং পার্লামেন্টারী পেপারস, প্রসিডিংস।

Dhaka University Institutional Repository

undertaken will, we are confident, lead to the conclusion that the revenue from such a source will be quite disproportionate to the cost of its collection and the attendant inconveniences there of.

"My Lord, the people of this country of all classes and creeds are practically unanimous with regard to most of the measures necessary to be adopted for the advancement to their country's welfare. Systematic and gradual extension of primary educaion, the provision of a 'modern' side to secondary schools, the making of all education more efficient by the supplying of trained teachers and better equipment and supervision, education yet again, technical and technological, and indusrtial research for the industrial development of the country, the fostering of agriculture by the diffusion of the knowledge of scientific and economic methods and by the relief of agricultural indebtedness, sanitation and extension of medical aid, form a comprehensive programme on which the country is united, as was recently pointed out by my distinguished co-religionist, His Highness the Aga Khan. These are also points which touch closely the most sympathetic instincts of the Council. Financial stringency may have hitherto prevented an adequate tackling of these questions, but we have the fullest confidence and faith in the ability and statesmanship of the Government of India in finding a solution to these problems and in providing for them in due course.

"My Lord, allow me to express my gratitude to Your Excellency's Government for the degrees in Agriculture that have been recently instituted. The grants that have been made in recent years towards the development of agricultural research, demonstration and instruction, are a source of considerable gratification to the public. I need not say, my Lord, that this country entertains the highest hopes and expectations from the extension of scientific education in agriculture and experiments

Dhaka University Institutional Repository

in agricultural farms, the latter of which should be widely distributed over the country, according to the nature of the soil and the produce. I venture to submit, however, my Lord, that the fruits of such an education, of such experiments and of the valuable researches of the scientific officers at the Pusa Institute, obtained at great cost, will not give us an adequate return, if together with them systematic attempts are not made to place their resutls within the reach of the vast agricultral population by means of pamphlets, itinerant preachers and by instruction in off-seasons or at night schools. We also look upon the measures that are being taken to relieve agricultural indebtedness with great satisfaction. A generous policy of agricultural loans and takkavi advances has been followed in recent years. Co-operative credit societies are also progressing favourably under State patronage throughout the country, and it is to be hoped that the financing and management of these will be more and more a labour of love to the moneyed and leisured as the years go on.

"My Lord, on behalf of Eastern Bengal and Assam I beg to be permitted to convey our thanks to Your Lordship's Government for the generous recognitiong of its financial claims. It is with gerat satisfaction that I note the raising of the status of the Chittagong College to the first grade, and the more liberal grants to high schools. Muhammadan hostels are very much needed in our province, and I am glad to find that our requirements in this direction have been met to some extent this year. I have confidence that this necessity will not be lost sight of. A grant of 10 lakhs of rupees has been allotted for the construction of a very necessary railway line helpful to the tea-idustry, and grants to the extent of about 16 lakhs of rupees have been given for the construction of lines in progress. We hope that these grants are an earest for more to come, as the new province requires more facilities in communications for its

Dhaka University Institutional Repository

material progress.

"My Lord, some of my Hon'ble colleagues have questioned the increased grants that have been given to the province that I have the honour to represent. I do not think, my Lord, that the Government of India ever maintained that the partition would entail no additional expenditure or that the increased efficiency of administration, which it was urged would be brought about by the partition, would be effected without any increase of cost whatsoever. The only question now is whether the increased efficiency and advantages have been commensurate with the increased expenditure. Any one acquainted with the conditions of the new province before and after the partition will be convinced that the progress achieved has been well worth the cost.

"My Lord, I beg leave to add that the increase of grant to the new province is nothig exceptional. The provincial contracts of all the provinces have been recently revised, according to the new system of quasi-permanent settlements that have been introduced, ensuring expanding revenue and self-dependence in the provinces. Under this system a larger share of the divided heads of revenue has been given to the different provinces. The revision therefore means much more, my Lord, to the other provinces with old-established administrations than it does to Eastern Bengal and Assam in the infancy of its administration. The grant given to Eastern Bengal and Assam is thus small compared to the increased grants that have been given in recent years, under this system, to all the other provinces, and this small grant should be beyond all cavil, specially when we take into consideration the area of the province and its population per square mile.

"My Lord, some of my Hon'ble colleagues have laid the responsibility of the new taxation on the shoulder of my

Dhaka University Institutional Repository

province, but they forget that the decline in opium-revenue, in the net receipts of railways and the recent years of famine and scarcity throughout many provinces, together with the necessity for increased expenditure in many directions, have been the real cause of the imposition of the new taxes.

"My Lord, I associate myself unreservedly with all the expressions of regret that have fallen from the lips of Hon'ble Members when referring to your impending relinquishment of the reins of government. This first session may possibly be the last in which Your Excellency will preside over the deliberations of this enlarged and reformed Council which has been brought into being by the foresight and statesmanship of Your Excellency. This Council will remain an everlasting monument to your deep sympathy for the people of India, and 'Sympahty' in my humble opinion has been the keynote of Your Excellency's policy. The clearest indication of this sympathy has again been recently given to us, my Lord, in the prompt action that has been taken in the matter of the emigration of indentured labour to Natal.

It is during your regime too, my Lord, that for the first time in the history of British rule in India, a distinguished countryman of mine sits on the Executive Council of Your Excellency. The reforms scheme, my Lord, may not satisfy visionaries, but in overcoming the limitations of actual facts and of the exigencies of the moment, in its eminently practical character, it is its own vindication. For such satesmanship and sympathy your name will go down to posterity as a maker of Modern India and as one of her greatest benefactors."[১]

১. Gazette of India, Part VI, 16 April, 1910, Pp. 429-431

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩.৫ ঃ টাঙ্গাইলের পৌরসভা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত তথ্যকণিকা।

ন্যূনপক্ষে আটহাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত দশ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডকে ন্যূনপক্ষে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হতো। এতে এক তৃতীয়াংশ মনোনীত এবং দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত সদস্য থাকতেন। সর্বনিম্ন একটাকা চৌকিদারি ট্যাক্স প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ ওয়ার্ডের নির্ধারিত সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রেসিডেন্ট এবং একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতেন। স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ইউনিয়নকে ছোট ছোট ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হতো।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন কাউন্সিল করা হয়। পরে ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটি আদেশ বলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের পরিবর্তে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত করা হয়। পুনরায় ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) আদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতকে ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ করা হয়।

১৯৭৬ সনে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং দুইজন মনোনীত মহিলা সদস্যের বিধান প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলায় সর্বমোট ১০৩টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

টাঙ্গাইল সদর থানা

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত হওয়ার সময়
১	করটিয়া	১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ
২	দাইন্যা	১৯৬২ "
৩	গালা	
৪	পোড়াবাড়ী	১৯৮৬ "
৫	হুগড়া	
৬	বাঘিল	১৮৯০ "
৭	ঘারিন্দা	
৮	ছিলিমপুর	১৯২২ "
৯	মগড়া	১৯৭৩ "
১০	কাকুয়া	১৩৫৪ (বাংলা)

উৎস ঃ মোহাম্মদ বাকের, টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত হওয়ার সময়
১১	কাতুলী	১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ
বাসাইল থানা		
১২	বাসাইল	১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ
১৩	হাবলা	১৯৬১ "
১৪	কাঞ্চনপুর	
১৫	কাশিল	১৯২৫ "
১৬	কাউলজানী	
১৭	ফুলকী	১৯৬১ "
ভুঞাপুর থানা		
১৮	বীরহাতি	১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ
১৯	অর্জুনা	১৯৯০ "
২০	গাবসারা	
২১	ফলদা	
২২	গোবিন্দাসী	১৯৬৩ "
২৩	নিকরাইল	
দেলদুয়ার থানা		
২৪	ডুবাইল	১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ
২৫	দেউলী	
২৬	ফাজিলহাটি	১৯১১ "
২৭	আটিয়া	১৯৬৭ "
২৮	এলাসিন	১৯৬৩ "
২৯	পাথরাইল	১৯৬০ "
৩০	লাউহাটি	১৯৪৮ "
৩১	দেলদুয়ার	১৯২৪ "
ঘাটাইল থানা		
৩২	জামুরিয়া	১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ

টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত হওয়ার সময়
৩৩	দিঘড়	১৯৬৪ "
৩৪	সন্ধানপুর	১৯৬৩ "
৩৫	ঘাটাইল	
৩৬	দেওপাড়া	১৯৭২ "
৩৭	দেওলাবাড়ী	
৩৮	ধলাপাড়া	১৯৬৪ "
৩৯	রসুলপুর	১৯৫৮ "
৪০	লোকেরপাড়া	
৪১	দিঘলকান্দি	
৪২	আনেহোলা	১৯৬১ "
সখিপুর থানা		
৪৩	যাদবপুর	
৪৪	বহেরাতৈল	১৯৫০ "
৪৫	হাতিবান্দা	
৪৬	কালিয়া	১৯৯০ "
৪৭	গজারিয়া	
৪৮	কাকড়াজান	১৯৭০ "
গোপালপুর		
৪৯	নগদাশিমলা	
৫০	আলমনগর	
৫১	ঝাওয়াইল	
৫২	ধোপাকান্দি	১৯৬২ "
৫৩	হাদিরা	১৯৮৫ "
৫৪	মির্জাপুর	
৫৫	হেমনগর	
কালিহাতি		
৫৬	সহদেবপুর	১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ
৫৭	কালিহাতি	১৯৬০ "

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত হওয়ার সময়
৫৮	দুর্গাপুর	১৯৭৬ "
৫৯	পাইকরা	১৯৫৯ "
৬০	নাগবাড়ি	১৯৬১ "
৬১	নারানদিয়া	
৬২	বীরবাসিন্দা	
৬৩	বাংড়া	১৯৬০ "
৬৪	বল্লা	
৬৫	এলেঙ্গা	১৯৩২ "
৬৬	সল্লা	১৯৫১ "
৬৭	কোকডহড়া	১৯৫৫ "

মধুপুর থানা

৬৮	আলোকদিয়া	১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৬৯	গোলাবাড়ি	
৭০	ধোপাকান্দি	১৯৩২ "
৭১	বীরতারা	১৯৬৪ "
৭২	পাইস্কা	১৮৮৫ "
৭৩	ধনবাড়ি	১৮৮৫ "
৭৪	মধুপুর	
৭৫	আউশনারা	১৩৬৮ বাংলা
৭৬	অরনখোলা	১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ
৭৭	মুশুদ্দি	
৭৮	সোলাকুড়ি	

মির্জাপুর থানা

৭৯	জামুর্কি	
৮০	মির্জাপুর	১৯৬৩ "
৮১	ওয়ার্শি	
৮২	ভাতগ্রাম	১৯৬২ "
৮৩	বাঁশতৈল	১৯৮৮ "
৮৪	বহরিয়া	১১৪৯ "

টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত হওয়ার সময়
৮৫	আজগানা	১৯৪২ "
৮৬	তরফপুর	
৮৭	মহেরা	১৯০৩ "
৮৮	ফতেপুর	১৯৬০ "
৮৯	বানাইল	
৯০	আনাইতারা	
৯১	গোরাই	১৯৩৩ "
নাগরপুর থানা		
৯২	ভাড়রাহ	
৯৩	পাকুটিয়া	১৯১৯ "
৯৪	মোকনা	১৯১৮ "
৯৫	গয়হাটা	১৯২১ "
৯৬	দয়ির	১৯৮৩ "
৯৭	সহবতপুর	
৯৮	নাগরপুর	১৯২১ "
৯৯	মামুদপুর	১৯৯৩ "
১০০	সলিমাবাদ	১৩৪৯ বাংলা
১০১	ধুবড়িয়া	১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ
১০২	ভাদ্রা	
১০৩	বেকড়া আটগ্রাম (নবসৃষ্ট)	১৯৯৬ "

টাঙ্গাইল জেলার পৌরসভা

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ এপ্রিল একই দিনে নাসিরাবাদ, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুর পৌরসভা স্থাপন করা হয়। মুক্তাগাছা পৌরসভা স্থাপিত হয় ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি নেত্রকোণায় এবং ১ জুলাই টাঙ্গাইল পৌরসভা স্থাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে ৫.২৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে স্থাপিত টাঙ্গাইল পৌরসভার সীমানা ছিল উত্তরে লৌহজং নদীর কিছু অংশ, সাবালিয়া, ধূল, দেউলা ও কোদালিয়া কৃষি অঞ্চলের কিছু অংশ। দক্ষিণে কাজিপুর, চরকাজিপুর, বেড়াবুচনা ও ভূতভুরিয়া গ্রাম। পূর্বে টাইট্টা, পয়লাবিল দরাত ও গোলাবাড়িয়া গ্রামসমূহ এবং লৌহজং নদীর কিছু অংশ। পশ্চিমে কাবিলাপাড়া, গদুরগাতি এবং বিন্নাফৈর গ্রাম।

টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর তারিখের এক সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা যায়, ঐ মাসেরই এক তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী টাঙ্গাইল পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত সদস্যগণ ছিলেন এক নং ওয়ার্ডে, চণ্ডীচরণ ঘোষ ও নিত্যহরি মিত্র, দুই নং ওয়ার্ডে প্রসন্ন কুমার ভাদুরি ও রামনাথ নিয়োগী, তিন নং ওয়ার্ডে নীলরতন চক্রবর্তী ও ঈশান চন্দ্র বসু। চার নং ওয়ার্ডে ভবানীচরণ ঘোষ ও কেদারনাথ নিয়োগীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক সর্বজনাব সফিউদ্দিন আহমদ, গুরুদয়াল দাস গুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, দীননাথ তালুকদার ও বিদ্যাধর ঘোষকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। টাঙ্গাইল পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন তদানীন্তন মহকুমা প্রশাসক জনাব শশী শেখর দত্ত।

১৮৯১ সনের আদমশুমারি সূত্রে জানা যায়, তখন টাঙ্গাইল পৌরসভার জনসংখ্যা ছিল ১৭৯৭৩ জন। টাঙ্গাইল পৌরসভার বর্তমান জনসংখ্যা (১৯৯১ সনের আদমশুমারি) ১, ০৪, ৩৮৭ জন এবং আয়তন ২১.৮০ বর্গ কিলোমিটার।

১৯২১ থেকে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টাঙ্গাইল পৌরসভার আয়ব্যয় ছিল নিম্নরূপ ঃ

অর্থবছর	১৯২১-২২	২২-২৩	২৩-২৪	২৪-২৫	২৫-২৬	২৬-২৭	২৭-২৮	২৮-২৯	২৯-৩০	৩০-৩১
আয়	১৬,৪৮৯ টাকা	১৭,৬৫২ টাকা	১৭,৪৯৭ টাকা	২২,০৩৭ টাকা	১৮,৬৪৫ টাকা	২৪,৩০৪ টাকা	২০,১৯১ টাকা	২২,১৫৪ টাকা	৩২,৪৫৬ টাকা	২১,৫৭৭ টাকা
ব্যয়	১৬,০৩৪ টাকা	১৫,৮৮০ টাকা	১৬,২৫০ টাকা	১৯,৯৫৭ টাকা	১৬,৮৩২ টাকা	১৮,৯০৬ টাকা	১৪,৮৮৮ টাকা	২২,৯০৫ টাকা	৩১,২৬৮ টাকা	২২,৫৬২ টাকা

বর্তমান (১৯৯৬-৯৭) অর্থবছরে টাঙ্গাইল পৌরসভার ৬,৬৭, ৩০,০০০ টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলায় ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তেত্রিশটি মহল্লা/ গ্রাম সমন্বয়ে গোপালপুর পৌরসভা স্থাপন করা হয়। গোপালপুর পৌরসভার বর্তমান আয়তন ১৯ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা পঞ্চাশহাজার। টাঙ্গাইল জেলায় ২০.০৩.৯৪ ইং তারিখে ভূঞাপুর, ২০.১২.৯৫ইং তারিখে মধুপুর এবং ১২.০৮.৯৬ইং তারিখে ধনবাড়ি পৌরসভা স্থাপন করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. *ময়মনসিংহের ইতিহাস : কেদারনাথ মজুমদার।*
২. *ময়মনসিংহের বিবরণ : ঐ*
৩. *ঢাকার বিবরণ : ঐ*
৪. *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস : এ. কে. এম. আবদুল আলীম।*
৫. *মুঘল রাজধানী ঢাকা : ডঃ আবদুল করিম।*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ৩.৬ : মীর মশাররফ হোসেন ও বেগম রোকেয়া কর্তৃক দেলদুয়ারের জমিদার বেগম করিমুন্নেসা খানমকে উৎসর্গ পত্র।

(ঙ)
'বিষাদ-সিন্ধু'র (১৮৮৫) 'উৎসর্গপত্র'

পূজনীয়া শ্রীমতি করিমন্নেসা খাতুন সমীপে
মাত!

যদিও আমি আপনার গর্ভজাত সন্তান নহি, কিন্তু সদরোপম আবদুল করিম ও আবদুল হালিম অপেক্ষা আমার প্রতি কোন অংশেই কোন দিন আপনার স্নেহ-মমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা দেখি নাই। সন্তানের উপার্জ্জিত অর্থ অনেক মাতাই আশা করিয়া থাকেন। যদিও মা, আপনার সে আশা নাই, জীবনে কখনও হইবে কিনা সন্দেহ, তথা আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া যাহা করিয়াছি তাহা আজ আপনার হস্তেই অর্পণ করিলাম। দুঃখী সন্তানের প্রদত্ত বলিয়া ঘৃণা করিবেন না, এই আমার প্রার্থনা। "বিষাদ-সিন্ধু" আপনার হস্তেই অধিকতর শোভা পাইবে।

চির আজ্ঞাবহ দাস
মীর মোশাররফ হোসেন।[৮]

(চ)
'মতিচুর' ২ খণ্ড (১৩২৮) গ্রন্থের 'উৎসর্গপত্র'

আপাজান!

আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণ পরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমি আশঙ্কা করিয়াছিলে যে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া বঙ্গভাষায় কথাবর্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্বাদে। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া ১১ বৎসর যাবত এই উর্দু স্কুল পরিচালনা করিতেছি, এখানেও পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দুভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উর্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আশীর্বাদের কল্যাণে। স্নেহ-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করিলে ধন্য হইব। এই পুস্তকে তোমার বড় সাধের 'ডেলিশিয়া হত্যা'ও দেওয়া হইয়াছে।[৯]

(ছ)
'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১) গ্রন্থ সম্পর্কে মতামত

Bangio Mussalmen by Moulvi Nowshre Ali Khan Yousufzai of Tangail, Mymensingh. It is a well written pamphelet on the political and social disintegration of the Mussalmen of Bengal. In a very impressive language the author has shown the decaying process of the aristocratic class of Muhammedans and has statistically proceed the gradial decline of cultivating classes into ignorance and imporerished circumstances. The general want of culture among our landlords. The want of education among our cultivating classes are to-day eating away the life blood of our Society. The book is on the whole thoughtfully got up, and would amply repay perusal in the hands of every behind of any position :

[The Moslem Chronicle, 7 Dec., 1895.]

উৎস : ওয়াকিল আহমেদের গ্রন্থ, মীর মশাররফ রচনাবলী, রোকেয়া রচনাবলী।

পরিশিষ্ট-৩.৭ ঃ দেলদুয়ারের জমিদারদের ও সংশ্লিষ্ট জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত লেখক, সম্পাদক, সংবাদ পত্রের তালিকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বেসব বাংলা পত্রিকা মুসলমানদের সম্পাদনায় পাওয়া যায়, তার একটি তালিকা এরূপ[২] :

সময়	পত্রিকা	শ্রেণী	সম্পাদক	স্থান
১৮৭৩	বালারঞ্জিকা	(সাপ্তাহিক)	সৈয়দ আবদুল রহিম	বরিশাল
১৮৭৪	আজীজননেহার	(মাসিক)	মীর মশাররফ হোসেন	চুঁচুড়া, হুগলী
,,	পারিল বার্তাবহ	(পাক্ষিক)	আনিসউদ্দীন আহমদ	ঢাকা
১৮৭৭	মহাম্মদি আখবার	(অর্ধ-সপ্তাহিক)	কাজী আবদুল খালেক	কলিকাতা
১৮৮৪	আখবারে এসলামীয়া	(মাসিক)	মোহাম্মদ নইমুদ্দীন	করটীয়া
,,	মুসলমান	(সাপ্তাহিক)	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
,,	মুসলমান বন্ধু	,,	,,	,,
১৮৮৫	ইসলাম	(মাসিক)	একিনউদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৮৬	নব সুধাকর	(সাপ্তাহিক)	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	,,
,,	আহমদী	(পাক্ষিক)	আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী	টাঙ্গাইল
১৮৮৭	হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী	(মাসিক)	গোলাম কাদের	কলিকাতা
১৮৮৯	সুধাকার	(সাপ্তাহিক)	শেখ আবদুর রহিম	,,
,,	ভারতের ব্যবনিবারণী	(ত্রৈমাসিক)	মোহাম্মদ আবেদীন	,,
১৮৯০	হিতকরী	(পাক্ষিক)	মীর মশাররফ হোসেন	লাহিনীপাড়া
১৮৯১	ভিষক-দর্পণ	(মাসিক)	এম. জহিরুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
,,	ইসলাম-প্রচারক	,,	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	,,
১৮৯২	মিহির	,,	শেখ আবদুর রহিম	,,
,,	হাফেজ	(পাক্ষিক, পরে মাসিক)	,,	,,
১৮৯২	টাঙ্গাইল হিতকরী	(সাপ্তাহিক)	মোসলেমউদ্দীন খাঁ	টাঙ্গাইল
১৮৯৫	মিহির ও সুধাকর	(সপ্তাহিক)	শেখ আবদুর রহিম	কলিকাতা
১৮৯৮	কোহিনূর	(মাসিক)	মহম্মদ রওশন আলী	পাংশা
১৮৯৯	প্রচারক	,,	মধুমিয়া	কলিকাতা
১৯০০	লহরী	,,	মোজাম্মেল হক	শান্তিপুর
,,	নূর-অল ইমান	,,	মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	রাজশাহী
১৯০১	মোসলমান পত্রিকা	,,	মাহাতাবউদ্দীন	যশোহর
,,	সোলতান	,,	এম. নাজিরুদ্দীন আহমদ	কুমারখালি
,,	নূরল ইসলাম	(বার্ষিক)	মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	যশোহর
,,	বালক	(সাপ্তাহিক)	এ. কে. ফজলুল হক ও নিবারণ চন্দ্র	বরিশাল
১৯০৩	নবনুর	(মাসিক)	সৈয়দ এমদাদ আলী	কলিকাতা
,,	মোহাম্মদী	,,	মোহাম্মদ আকরম খাঁ	,,
,,	হানিফি	,,	নুরুল হোসেন কাসিমপুরী	ময়মনসিংহ
১৯০৪	সুহৃদ	,,	এ. ডি. খান	কটক

এগুলির অধিকাংশের আয়ু ছিল ক্ষণকালীন; অনেক পত্রিকার কেবল নামধাম ছাড়া বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। দু'একটি সাময়িকপত্রের গুরুত্বও তেমন ছিল না। যেগুলির গুরুত্ব ছিল, সেগুলিও প্রায় অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। স্বল্প আয়ু, ক্ষীণ কলেবর, যাই থাক না কেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এসব পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই যে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সাংবাদিকতার সূচনা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহ। আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রচারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র। জনশিক্ষা ও জনমত গঠনেও এগুলির গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনেক। গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি ও দেশের শুধু মুখপত্র নয়, অনেক সময় মেরুদণ্ড হিসাবে পত্রপত্রিকা কাজ করে।

উৎস ঃ ওয়াকিল আহমেদের গবেষণা গ্রন্থ।

পরিশিষ্ট-৩.৮ ঃ দেলদুয়ারের জমিদারদের সমকালীন বাংলার জমিদার এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী ও অন্যান্য শ্রেণী সম্পর্কিত তথ্যকণিকা।

Dhaka University Institutional Repository

নাম	জন্মস্থান	শিক্ষা	কুল	বৃত্তি
মীর মশাররফ হোসেন	কুষ্টিয়া	ইংরাজী বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন	বড় জোতদার	জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার (দেলদুয়ার ও পদমদী)
মোহাম্মদ নইমুদ্দীন	টাঙ্গাইল	ছাত্রবৃত্তি, নর্মাল পাশ ও মাদ্রাসায় অধ্যয়ন	মাঝারি জোতদার	শিক্ষক, সাংবাদিক ও ধর্ম প্রচারক (টাঙ্গাইল)
আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী	,,	—	বড় জোতদার	জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার ও সাংবাদিক (টাঙ্গাইল)
কায়কোবাদ	ঢাকা	এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা ঢাকার উকিল	পোস্ট-মাস্টার (স্বগ্রাম-আগলা)
মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	রাজশাহী	এন্ট্রান্স পাশ ও এফএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা রেশম ব্যবসায়ী	শিক্ষক, সাবরেজিস্ট্রার (রংপুর, নাটোর, রাজশাহী)
রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী	টাঙ্গাইল	—	—	অধ্যাপক, জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার (কলিকাতা ও দেলদুয়ার)
শেখ আবদুর রহিম	২৪-পরগণা	এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা পাঠশালার শিক্ষক	শিক্ষক ও সাংবাদিক (কলিকাতা, নদীয়া)
মোজাম্মেল হক	নদীয়া	এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন	—	শিক্ষক (নদীয়া)
মোহাম্মদ নজিবর রহমান	পাবনা	নর্মাল পাশ	—	শিক্ষক (পাবনা)
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	যশোহর	পাঠশালা পর্যন্ত অধ্যয়ন	সাধারণ গৃহস্থ	দর্জি ও ধর্মপ্রচারক (যশোহর ও বিভিন্ন স্থান)
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	বরিশাল	ছাত্র বৃত্তি পাশ	মাঝারি জোতদার	শিক্ষক, সাংবাদিক (রূপসা, কলিকাতা)
শেখ আবদুস সোবহান	ঢাকা	—	—	মোক্তার (ঢাকা)
নওশের আলী খান ইউসফজয়ী	টাঙ্গাইল	এফএ পাশ ও বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	বড় জোতদার	জমিদার, সাবরেজিস্ট্রার (টাঙ্গাইল)
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ	চট্টগ্রাম	এন্ট্রান্স পাশ ও এফএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	—	শিক্ষক ও কেরানী (চট্টগ্রাম)
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন	কুষ্টিয়া	উচ্চ গ্রেড অব রিডার পাশ	মাঝারি গৃহস্থ	শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক (কুষ্টিয়া বিভিন্ন স্থান)
মতিয়র রহমান খান	ঢাকা	এন্ট্রান্সপাশ ও বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা মুন্সেফ	শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী (দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি)
শেখ ওসমান আলী	মেদিনীপুর	বিএ, বিএল পাশ	—	মুন্সেফ (বিভিন্ন স্থান)
আবু মা-আলী মোহাম্মদ হামিদ আলী	চট্টগ্রাম	মাদ্রাসা পাশ	—	শিক্ষক (নোয়াখালী)
মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী	,,	মাদ্রাসা পাশ	পিতা পাঠশালার শিক্ষক	শিক্ষক, সাংবাদিক ও ধর্মপ্রচারক (বিভিন্ন স্থান)
সৈয়দ এমদাদ আলী	পাবনা	এন্ট্রান্স পাশ ও এফএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	—	শিক্ষক, সাংবাদিক সি, আই, ডি, ইন্সপেক্টর (বিভিন্ন স্থান)
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	,,	উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা হেকেমী চিকিৎসক	বক্তা ও রাজনৈতিক কর্মী
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	রংপুর	গৃহশিক্ষা	পিতা জমিদার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	শিক্ষিকা ও সমাজ-কর্মী (কলিকাতা)
শেখ ফজলল করিম	,,	ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন	—	জুটফার্মের ম্যানেজার (কাকিনা)
কাজী ইমদাদুল হক	খুলনা	বিএ পাশ ও এমএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা মোক্তার	শিক্ষক, সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর (বিভিন্ন স্থান)

উৎস ঃ ওয়াকিল আহমেদের গবেষণা গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩.৯ ঃ দেলদুয়ারের জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক কাজের তালিকা।

দেলদুয়ারের জমিদারদের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ

১। স্যার আবদুল হালিম গজনবী উচ্চ বিদ্যালয়, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।

২। টাঙ্গাইল ইউনিয়ন হাইস্কুল, টাঙ্গাইল।

৩। জাহাঙ্গীর শহীদ স্মৃতি আশ্রম, শান্তিকুঞ্জ, টাঙ্গাইল।

৪। সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী সরকারী বিদ্যালয়, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

৫। সৈয়দা সাফিয়া খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

৬। সৈয়দ মোহাব্বত আলী মহা বিদ্যালয়, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

৭। কলকাতা সিটি কলেজ 'গজনবী ট্রাষ্ট বৃত্তি ও পদক' প্রদান এবং ট্রাষ্ট ডিডের মাধ্যমে কলকাতাস্থ গজনবীদের সকল সম্পত্তি কলেজকে দান।

৮। ঢাকা 'ডাফরিন মুসলিম হোস্টেল' এর জন্য সৈয়দ আব্দুল জব্বার চৌধুরীর ৫০০০ টাকা দান।

৯। এছাড়া নবাব সলিমুল্লাহ ও সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর আহবানে সকল শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কাজে দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর জমিদারগণ এবং বগুড়ার নবাবগণ (দেলদুয়ারের বংশধর) সর্বদাই এগিয়ে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ৪ ঃ চিত্রসূচী বা অ্যালবাম

Dhaka University Institutional Repository

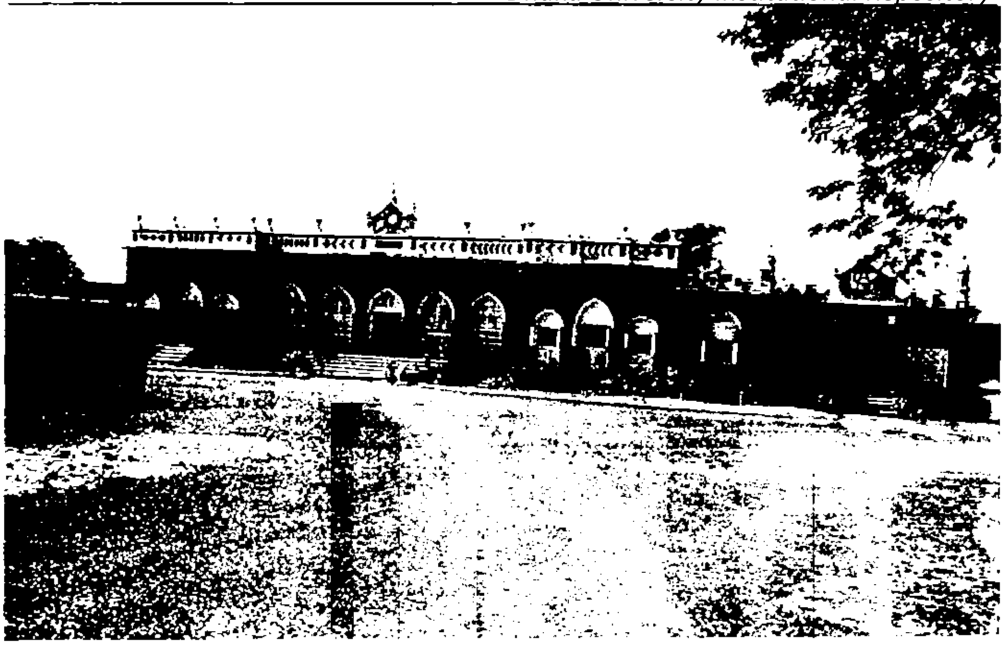

চিত্র নং- ৪.১ ঃ দেলদুয়ার গজনবী ভবনের ভগ্নাবশেষ। ১৮০৬ সালে ২২৫ বিঘা বাগান বাড়ী ঘেরা এই জমিদার ভবন নির্মাণ করেন দেলদুয়ার প্রতিষ্ঠাতা রওশন খাতুন। ১৯৭১ সালের আক্রমনে ভবনের একাংশ ভস্মিভূত হয়। উত্তর বাড়ীর দক্ষিণে যথাক্রমে বড় বাড়ী, মধ্যবাড়ী ও দক্ষিণ বাড়ী।

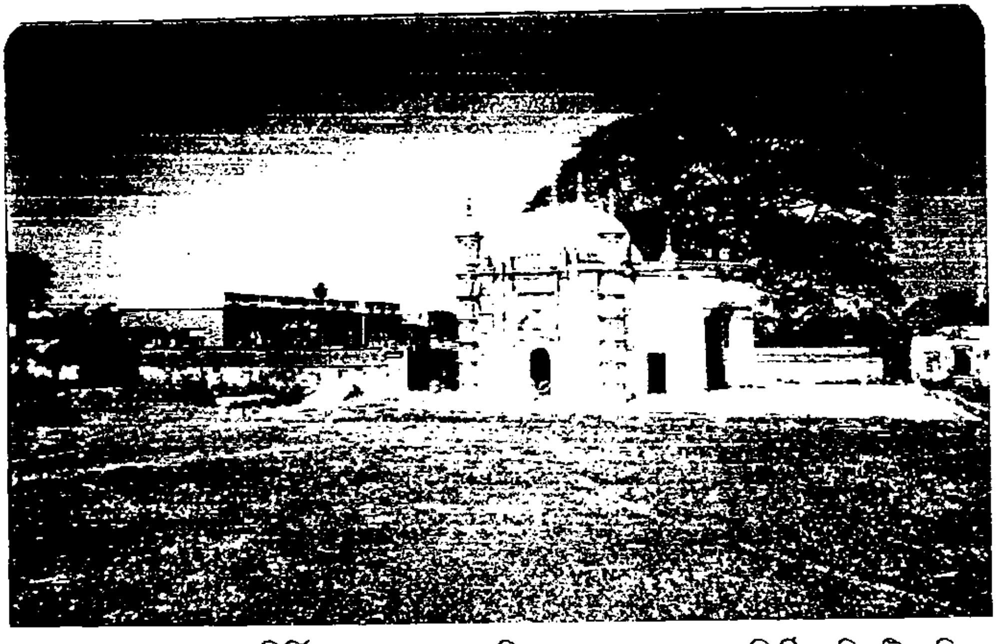

চিত্র নং- ৪.২ ঃ ১৮০৬ সালে নির্মিত দেলদুয়ার মসজিদ। রওশন খাতুন প্রতিষ্ঠিত তিনটি অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মসজিদের একটি। মসজিদের ডানে পারিবারিক কবরস্থান ও ঐতিহাসিক কৃষ্ণচূড়া গাছ, যার নীচে রৌদ্র ছায়ায় বসে মীর মশাররফ হোসেন বিখ্যাত 'বিষাদ সিন্ধু' রচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৩ ঃ লন্ডনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণরত অবস্থায় ১৮৮৫ সালে তোলা আবদুল করিম খান গজনবীর কৈশোরের ছবি।

চিত্র নং- ৪.৪ ঃ এ, কে, গজনবীর পরিবারের সদস্যবৃন্দ, পারিবারিক চিত্রে পিছনে নবাব স্যার, এ, কে, গজনবী, স্যার, এ, এইচ গজনবী, ইস্কান্দার সাঈদ খান গজনবী;

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৫ ঃ এ. কে. গজনবীর বয়োঃসন্ধিক্ষনের ছবি।

চিত্র নং- ৪.৬ ঃ পরিণত বয়সে নবাব, স্যার আবদুল করিম খান গজনবীর ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৭ ঃ এ, এইচ, গজনবীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং- ৪.৮ ঃ এ, কে, গজনবীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং- ৪.৯ ঃ ধনবাড়ীর জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং- ৪.১০ ঃ সন্তোষ ছয় আনির জমিদার শ্রীমতি জাহ্নবী চৌধুরীর ফাইল ফটো।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-৪.১১ ঃ সন্তোষ ছয় আনি জমিদার শ্রীমতি প্রমথ নাথ রায় চৌধুরীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং- ৪.১২ ঃ হেম নগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরীর ফাইল ফটো।

চিত্র নং-৪.১৩ ঃ সন্তোষ ছয় আনির বিখ্যাত জমিদার মহারাজা মন্মথ রায় চৌধুরীর ফাইল ফ...

চিত্র নং-৪.১৪ ঃ করটিয়ার বিখ্যাত জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর ফাইল ফটো।

Dhaka University Institutional Repository

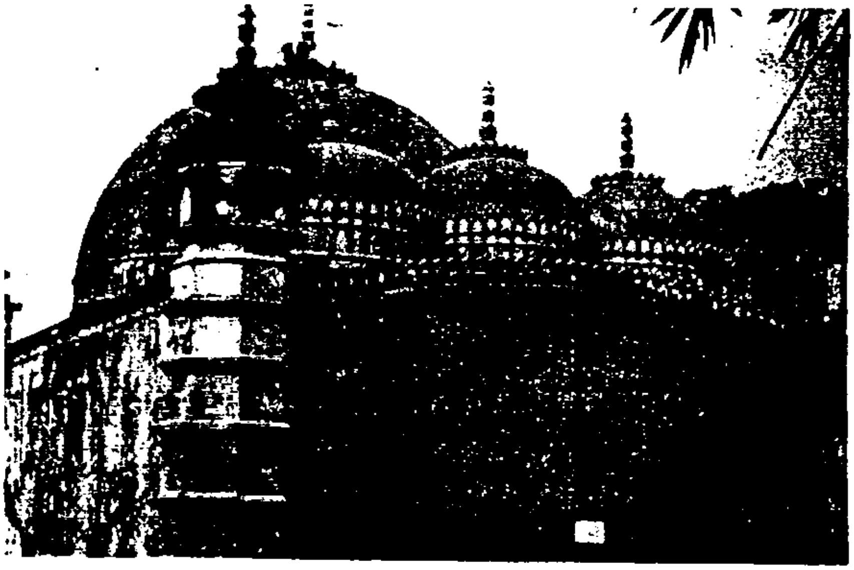

চিত্র নং-৪.১৫ ঃ ১৬০৮ সালে সাঈদ খান পন্নী নির্মিত আতিয়া মসজিদ।

চিত্র নং- ৪.১৬ ঃ হিন্দু জমিদারদের নির্মিত পাকুল্লা মঠ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.১৭ ঃ মুসলমান জমিদার নির্মিত কদিম হামজানি মসজিদ।

চিত্র নং- ৪.১৮ ঃ রওশন খাতুন নির্মিত দেলদুয়ার মসজিদ।

চিত্র নং-৪.১৯ ঃ কাগমারী পরগনার (সন্তোষ) প্রতিষ্ঠাতা পীর শাহজামানের মাজার, সমাধি।

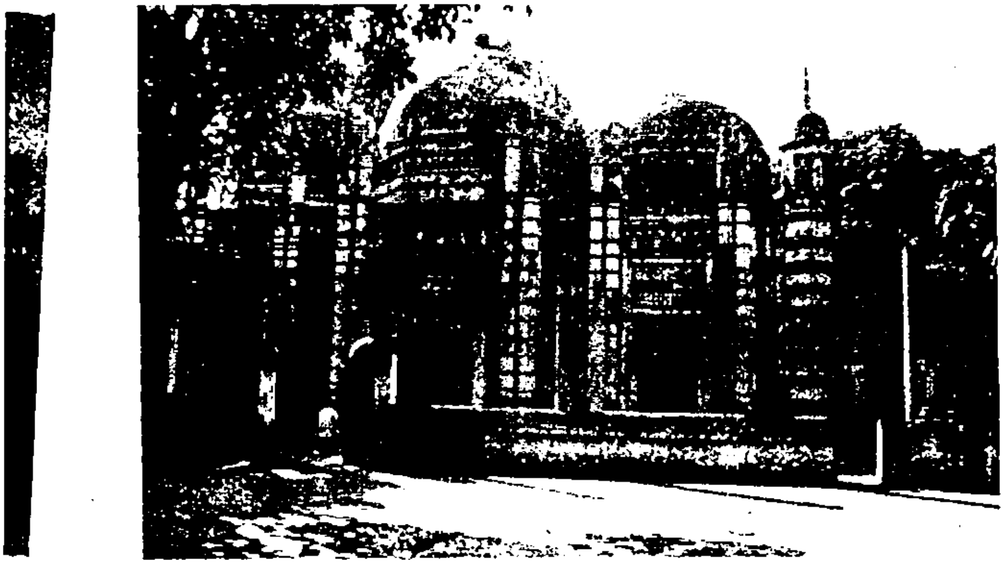

চিত্র নং-৪.২০ ঃ দেলদুয়ারের জমিদার রওশন খাতুন নির্মিত পাকুল্লা মসজিদ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.২১ ঃ সুলতানি যুগের নিদর্শন গোপালপুর খামার বাড়ী মসজিদের ধ্বংশাবশেষ।

চিত্র নং- ৪.২২ ঃ সাদাত আলী খান পন্নী নির্মিত করটিয়া জমিদার বাড়ী।

Dhaka University Institutional Repository

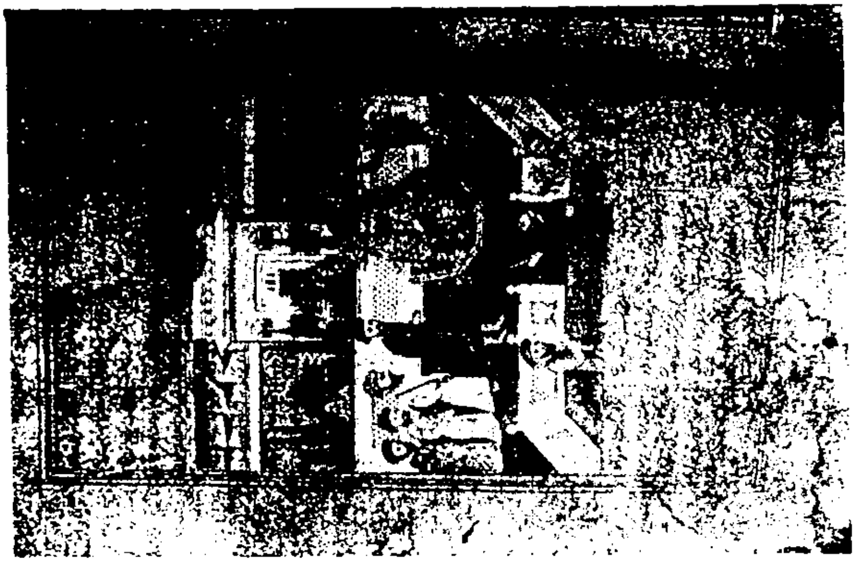

চিত্র নং- ৪.২৩ ঃ হাতে লেখা শাহনামা। সাদৎ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত

চিত্র নং- ৪.২৪ ঃ আটিয়া মসজিদের অভ্যন্তরস্থ দেয়ালচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.২৫ ঃ সন্তোষ জমিদারদের নির্মিত জাহ্নবী হাইস্কুল।

চিত্র নং- ৪.২৬ ঃ সাকরাইল, চন্দ্র নারায়ন দাস এর মঠ।

Dhaka University Institutional Repository

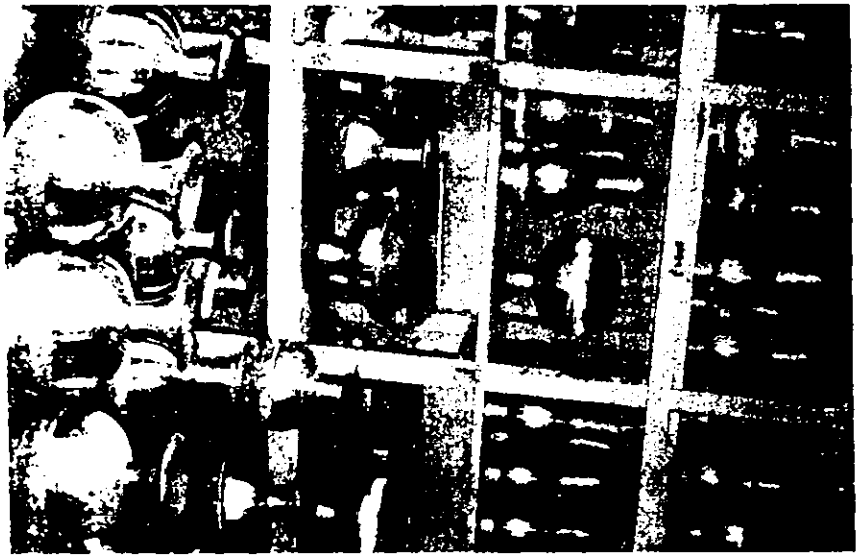

চিত্র নং- ৪.২৭ ঃ টাঙ্গাইলের কাঁসা শিল্প।

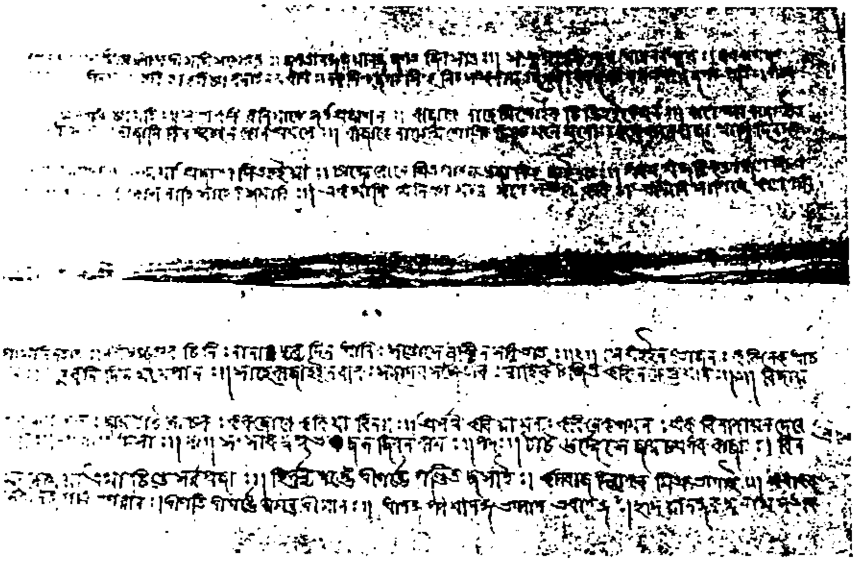

চিত্র নং- ৪.২৮ ঃ পদ্মপুরাণঃ ১২৪৪ বাংলা সনে রামচন্দ্র গুহ রায় কর্তৃক লেখা। কালিহাতি থানার দৌলতপুরের চন্দন গুহ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

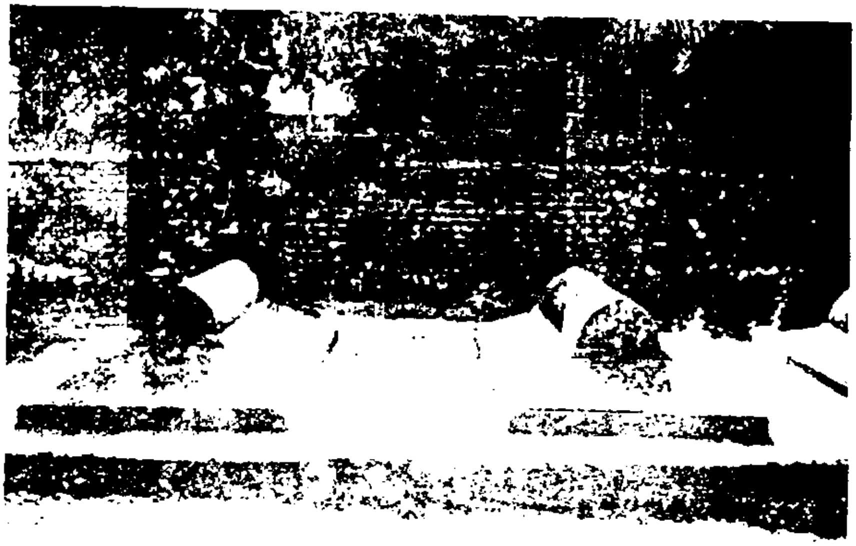

চিত্র নং- ৪.২৯ ঃ ধনবাড়ীর জমিদারীর দুই আদি প্রতিষ্ঠাতার কবর।

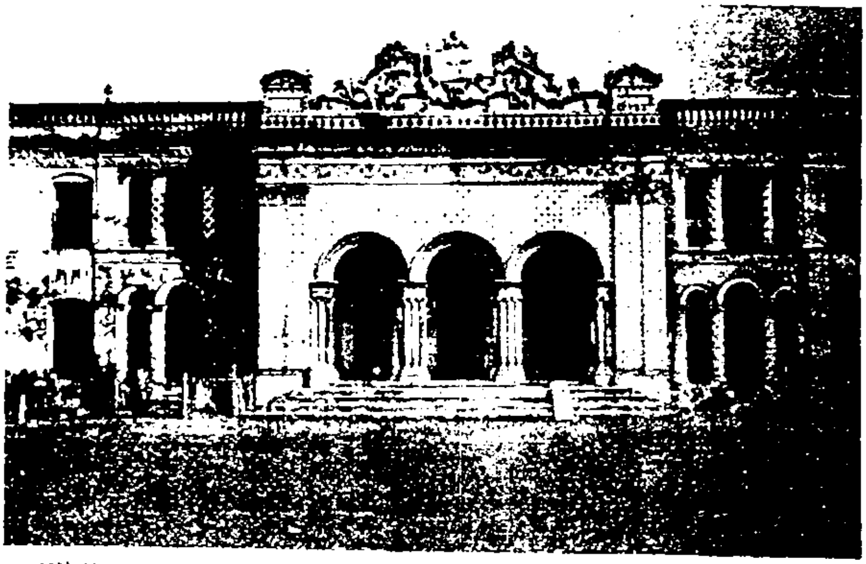

চিত্র নং- ৪.৩০ ঃ গোপালপুরের হেমনগর জমিদার বাড়ী।

Dhaka University Institutional Repository

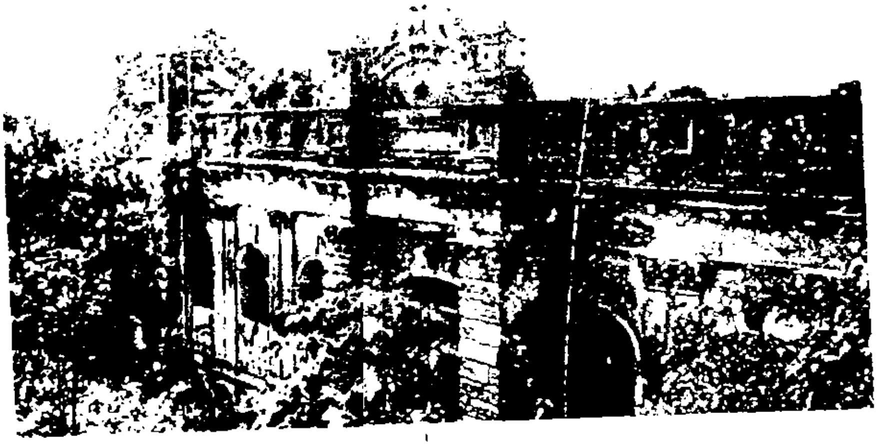

চিত্র নং- ৪.৩১ ঃ সন্তোষ জমিদার বাড়ী (কাগমারী)।

চিত্র নং- ৪.৩২ ঃ দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা রায় চৌধুরী খ্যাত মহেড়া জমিদার বাড়ী।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৩৩ ঃকরটিয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান প্রতিষ্ঠিত সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

চিত্র নং- ৪.৩৪ ঃ রমেশচন্দ্র হল (বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগার)। সামনে শহীদ মিনার

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৩৫ ঃ নাগরপুরের জমিদার উপেন্দ্র মোহন চৌধুরীর বাড়ি (বর্তমানে নাগরপুর মহিলা কলেজ)

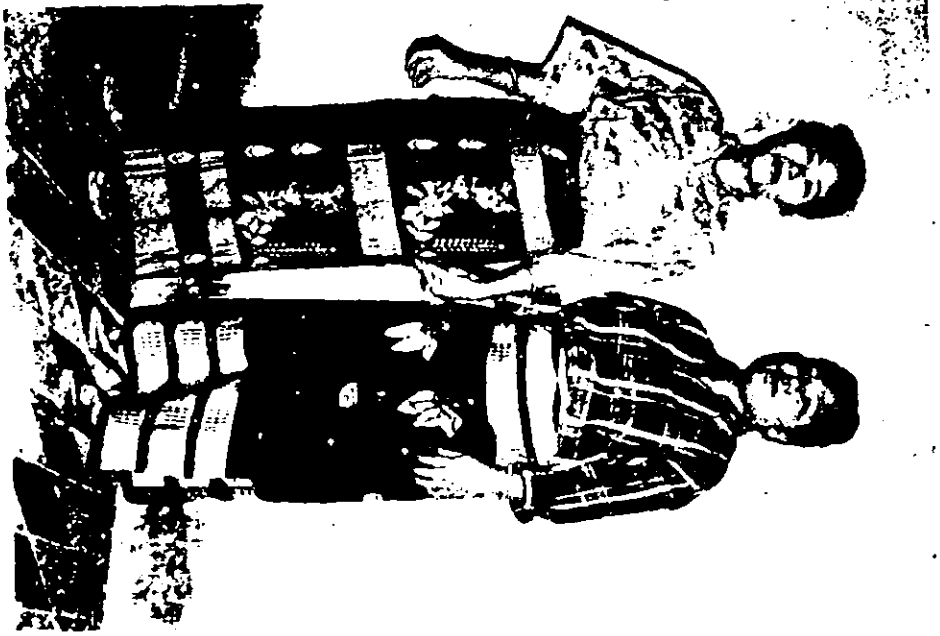

চিত্র নং- ৪.৩৬ ঃ ঐতিহ্যবাহী গারো পোষাকে মধুপুর বনের উপজাতি।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৩৭ ঃ টাঙ্গাইল-দেলদুয়ারের তাঁত শিল্প।

চিত্র নং- ৪.৩৮ ঃ টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ী চমচম ও মিষ্টান্ন শিল্প।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৩৯ ঃ মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মাজার (বাইরে থেকে)

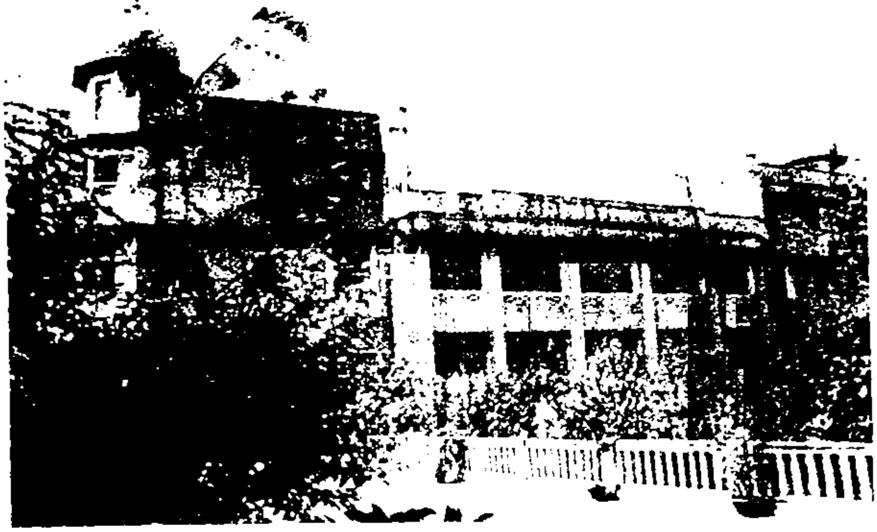

চিত্র নং- ৪.৪০ ঃ কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৪১ ঃ টাঙ্গাইলের সার্কিট হাউজ।

চিত্র নং- ৪.৪২ টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ ভবন।

Dhaka University Institutional Repository

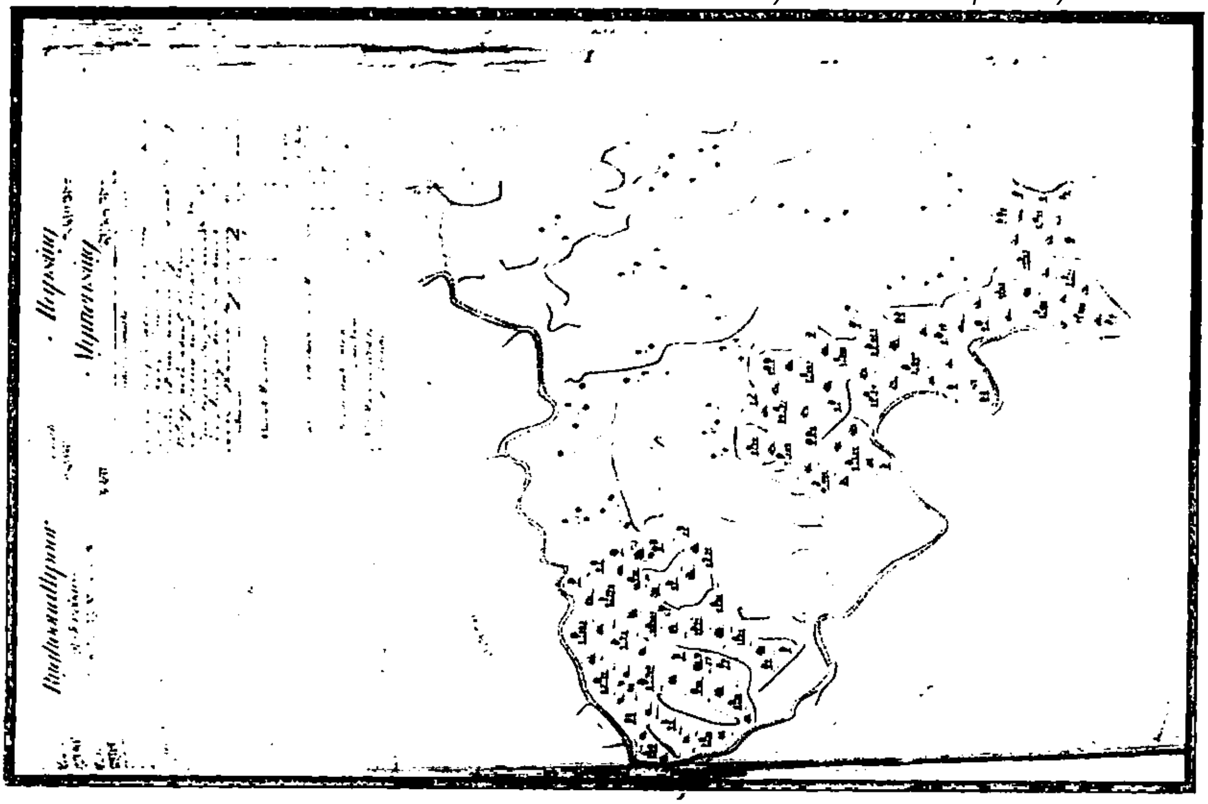

চিত্র নং- ৪.৪৩ ঃ ১৮৫৪ সালের আলাপসিং পরগনার সার্ভে ম্যাপের ভিউকার্ড। ন্যাশনাল আর্কাইভস কর্তৃক ময়মনসিংহ জেলা রেকর্ডরুম থেকে উদ্ধারকৃত দলিল পত্র থেকে ঐতিহাসিক নির্দশনের নমুনা স্বরুপ কয়েকটি দলিলের ভিউকার্ড প্রকাশ করে।

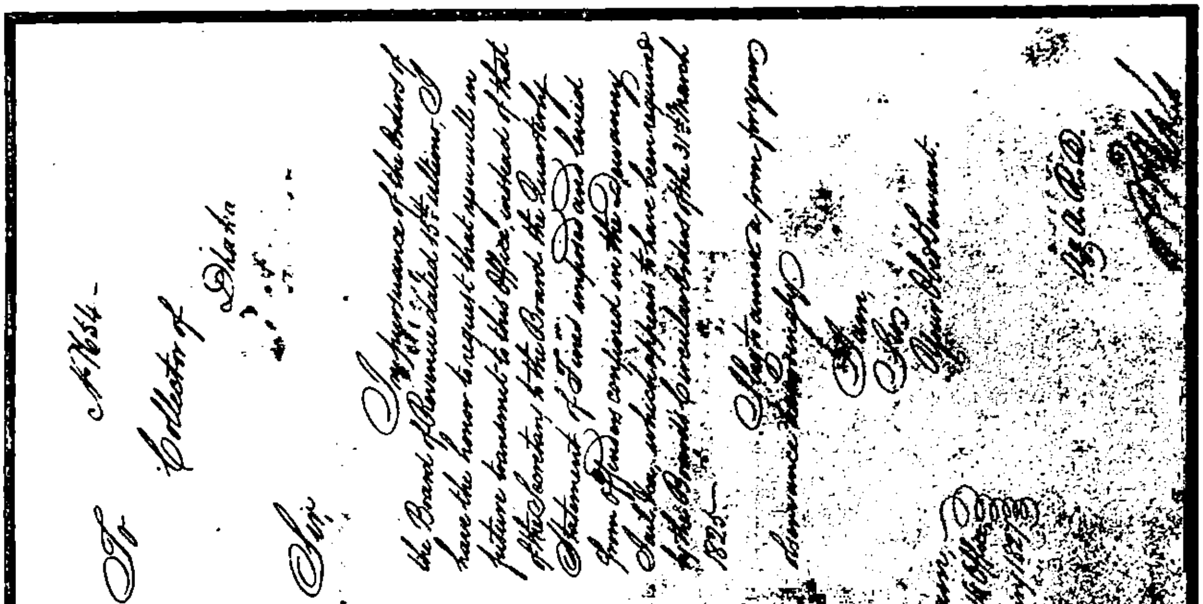

No 654 –

To

Collector of Dhaka

Sir,

In pursuance of the orders of the Board of Revenue dated 15th Ultimo, I have the honor to request that you will in future transmit to this Office, instead of that of the Board, the Quarterly Statement of Fines ...

চিত্র নং- ৪.৪৪ ঃ ৩১ জানুয়ারী ১৮২৭ সালে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক ঢাকার কালেক্টর বরাবরে লেখা চিঠির ভিউকার্ড।

Dhaka University Institutional Repository

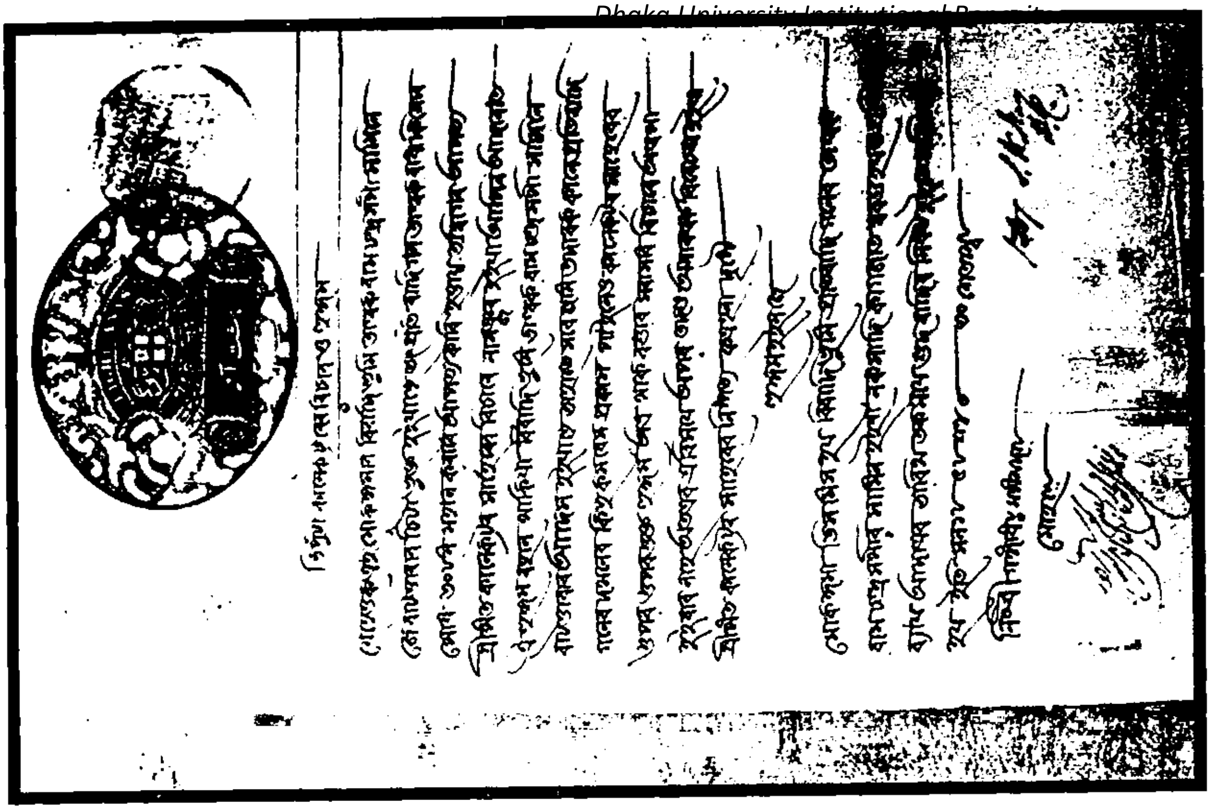

চিত্র নং- ৪.৪৫ ঃ কোম্পানী শাসনকালে জমি সংক্রান্ত মামলায় ডিপুটি কালেক্টরের আপীল রায়ের

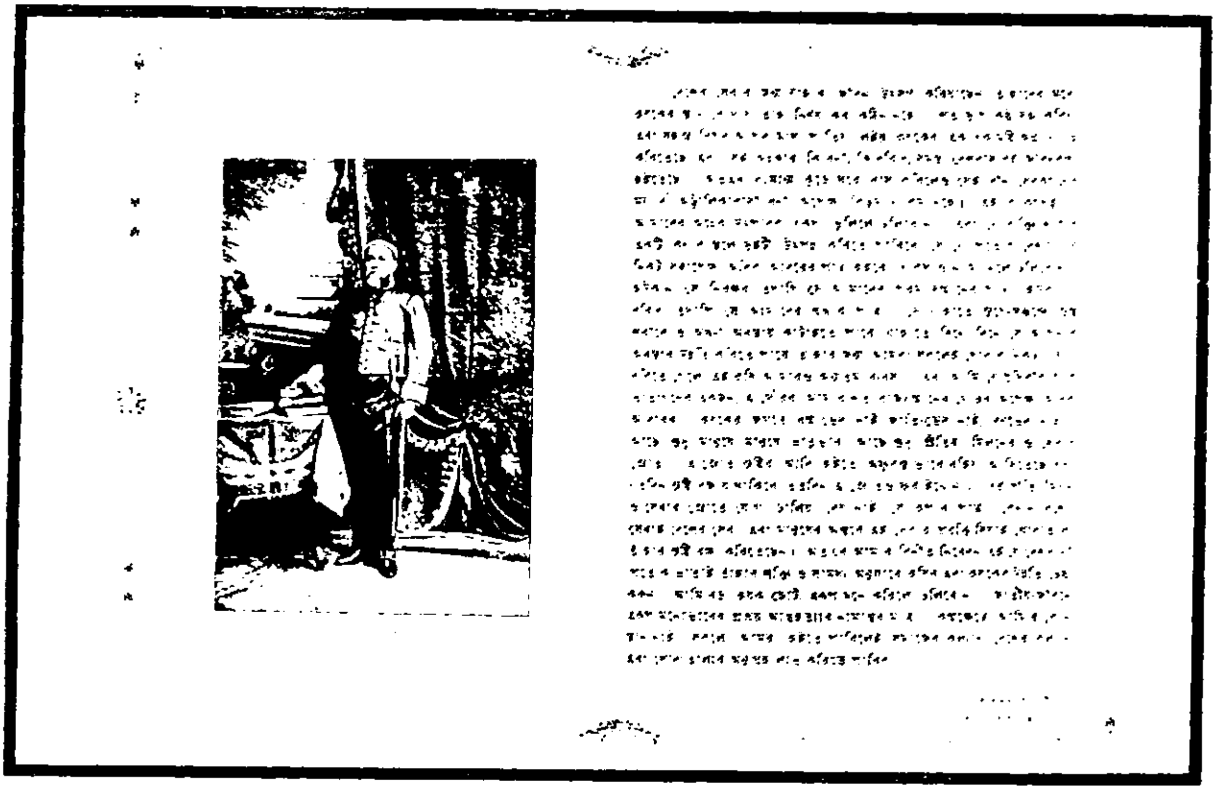

চিত্র নং- ৪.৪৬ ঃ ধনবাড়ীর জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বঙ্গীয় কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী হিসেবে কৃষক সমাজের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ অনুলিপি। ন্যাশনাল আর্কাইভস কর্তৃপক্ষ সচিত্র ভিউকার্ড আকারে প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৪.৪৭ ঃ দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ী জমিদার ভবন।

দেলদুয়ার দক্ষিণ বাড়ীর প্রধান ফটক।

চিত্র নং- ৪.৪৮ ঃ পাবনা দুলাই জমিদারদের শহরের বাড়ী। নাজলী চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

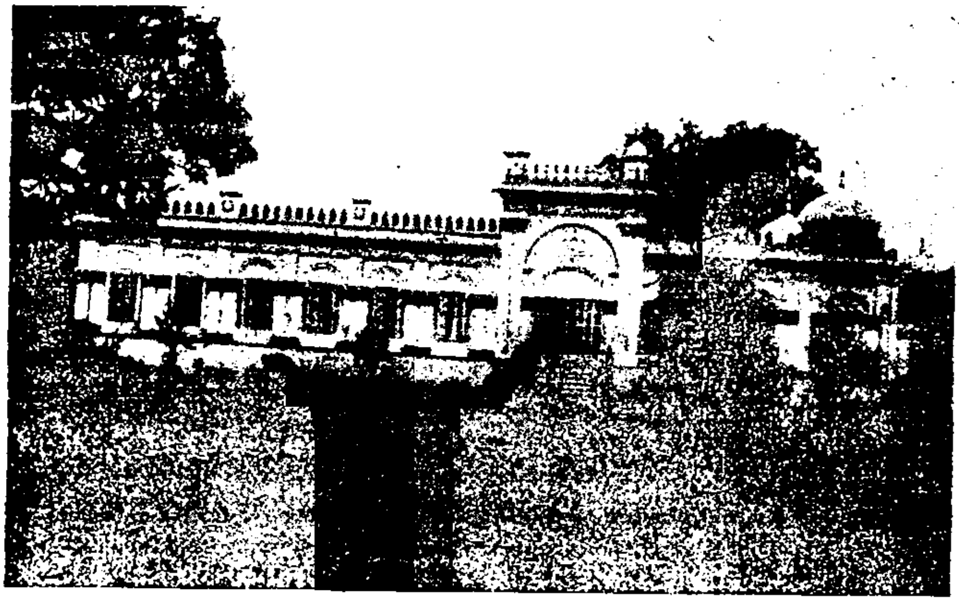

চিত্র নং- ৪.৪৯ ঃ ধনবাড়ী জমিদারদের প্রাসাদ

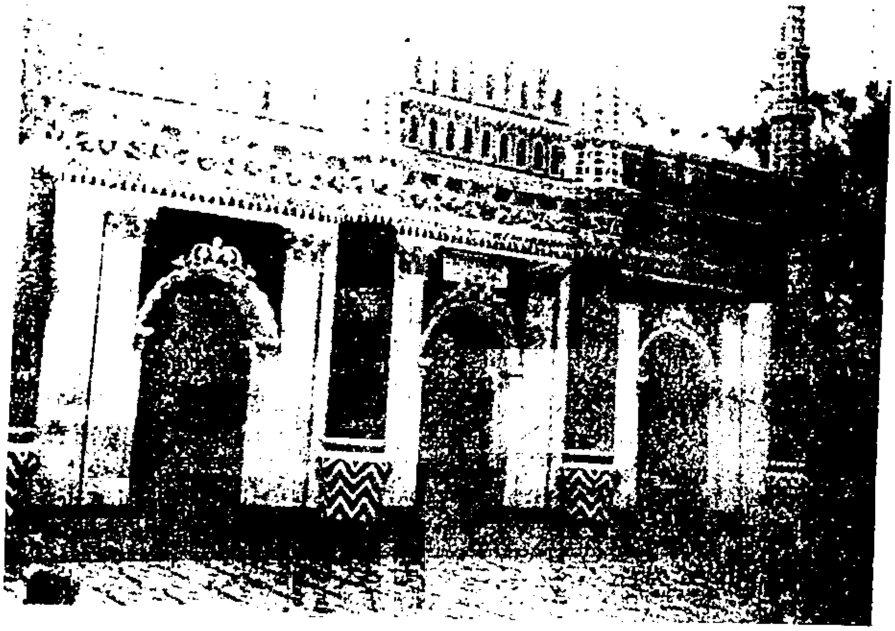

চিত্র নং- ৪.৫০ ঃ ধনবাড়ী জমিদারদের মসজিদের চিত্র